সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন

(*Raghunandana*—A *Social Reformer*)

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্
থিসিস্‌রূপে অনুমোদিত)

ডঃ বাণী চক্রবর্তী এম্. এ., ডি. ফিল্
কাব্যস্মৃতিতীর্থ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)
অধ্যাপিকা, মুরলীধর গার্লস্
কলেজ, কলিকাতা



শ্রীবাণী চক্রবর্তী
১১, কালীকুমার ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-২

প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৪ (জুলাই)
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭০ (ফেব্রুয়ারী)

মুদ্রাকর :
শ্রীশতদল গোস্বামী
নব গ্রন্থনা
৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য—দশ টাকা



পরমপূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী

ও

পরমপূজনীয়া মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভাদেবীর

শ্রীচরণেষু

মহামান্য ভারত

যে নির্দেশ দিয়াছেন

রহিয়াছে তাহা দেখি

প্রকাশিত হইতেছে।

স্মার্তভট্টাচার্য রঘু

শতাব্দীতে বঙ্গদেশের

ধর্মকার্যাদিতে যে বি

ধারণ করেন। তিনি

ধার্মিক গৃহস্থ হইয়াও

লাভ করিয়াছেন।

ইহা সম্ভবপর হইয়া

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, তৎক

বিশেষ বিশেষ স্থলে

না হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

তবে কেহ কেহ

উদারনীতি তাঁহার

গ্রন্থগুলি সম্পর্কে এবং

এই সম্পর্কে বিস্তারি

বর্তমানে এই বিষয়ে

রঘুনন্দন প্রমাণব

থাকিলেও তাহা অনু

আলোচিত হইয়াছে।

দ্বারা অপহৃত হইয়া

হিন্দুধর্ম হইতে পতিত

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই হিন্দু

(পৃঃ ২৪৮)। ইহা

আরও দেখা যায়,

নিবেদন

মহামান্য ভারত সরকার আমার এই গ্রন্থের কয়েক শত কপি কিনিবার জন্য যে নির্দেশ দিয়াছেন এবং স্থানীয় কিছু লোকের এই গ্রন্থ পাইবার জন্য যে আগ্রহ রহিয়াছে তাহা দেখিয়া পূর্ব সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে।

স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দন সর্বজনমান্য শাস্ত্রকার এবং সমাজ-ব্যবস্থাপক। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে বিধর্মীদের অনাচারে এবং অত্যাচারে সমাজের ধর্মকার্যাদিতে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহার নিরসনকল্পে রঘুনন্দন লেখনী ধারণ করেন। তিনি যোগী বা সিদ্ধপুরুষ নহেন, ঋষিও নহেন, কেবল নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক গৃহস্থ হইয়াও সমাজে সকলের শ্রদ্ধা এবং সমাজ-ব্যবস্থাপক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সমাজ-ব্যবস্থা সকলে একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রব্যাখ্যায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, তৎকালীন সমাজ ও কাল উপযোগী সাধারণভাবে উদার এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে কঠোর নীতির প্রবর্তন দ্বারা। রঘুনন্দন সেই সময়ে আবির্ভূত না হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষা পাইত না এবং বর্ণাশ্রমধর্মও সুরক্ষিত হইত না।

তবে কেহ কেহ বলেন যে, রঘুনন্দন কেবল কঠোর নীতিই প্রবর্তন করেন, উদারনীতি তাঁহার শাস্ত্র-আলোচনায় দেখা যায় না। এই মতবাদ রঘুনন্দনের গ্রন্থগুলি সম্পর্কে এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞানতার পরিচায়ক। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বে লিখিত ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছি। বর্তমানে এই বিষয়ে কয়েকটি স্থান নির্দেশ করিতেছি।

রঘুনন্দন প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করেন যে, পূর্বে সহমরণ প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকিলেও তাহা অনুসৃত না হইলে দোষ হয় না। ইহা বর্তমান গ্রন্থে (পৃঃ ২০৬) আলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রঘুনন্দনের সময়ে বহু নারী বলপূর্বক যবনদের দ্বারা অপহৃত হইয়া অন্য পুরুষ সংসর্গে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহারা হিন্দুধর্ম হইতে পতিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের উদ্ধারপূর্বক অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে একমাত্র রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন (পৃঃ ২৪৮)। ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার উদারতার পরিচয় বহন করে।

আরও দেখা যায়, রঘুনন্দন দেশে সিদ্ধ চাউলের ব্যাপক প্রচলন দেখিয়া তাহা

হবিষ্যান্ন ব্যতীত অন্য সময়ে ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভোজনের নির্দেশ দিয়াছেন। আর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই হবিষ্যান্ন ব্যতীত মৎস্য ও মাংস ভোজনে তিনি অনুমতি দিয়াছেন। এই প্রকার কয়েকটি মাত্র উদারনীতির বিষয় এখানে দেখান হইল। সমগ্র গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন মিলিবে।

প্রেসের অধিকর্তা শ্রীনির্মলকুমার চক্রবর্তী এবং শ্রীরাখালচন্দ্র দাস মহাশয় আমাকে গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে সাহায্য করিয়া অশেষ উপকারসাধনে ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা সামান্য, অতএব অনিচ্ছাবশতঃ ভুলত্রুটি থাকিতে পারে। সুধীজনের নিকট এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য, এই গ্রন্থ সকলের নিকট আদৃত হইলে নিজে ধন্য হইব।

২রা ফেব্রুয়ারী,
১৯৭০।

শ্রীবাণী চক্রবর্তী

া নির্দেশ দিয়াছেন। আর
ায ও মাংস ভোজনে তিনি
ীতির বিষয় এখানে দেখান

শ্রীরাখালচন্দ্র দাস মহাশয়
াকারসাধনে ধন্যবাদভাজন

এব অনিচ্ছাবশতঃ ভুলত্রুটি
করিতেছি।
স নিজে ধন্য হইব।

শ্রীবাণী চক্রবর্তী



Mahamahopadhyaya
Gopi Nath Kaviraj M. A., D. Litt.
Padma Vibhushan

বর্তমান ঠিকানা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
ভদৈনী, বারাণসী

শ্রীবাণী চক্রবর্তী এম্. এ. রচিত 'সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম।

আজও বঙ্গদেশের ধার্মিক আচার ব্যবস্থাদি পরম স্মার্ত শ্রীরঘুনন্দনের আলোচিত নিবন্ধসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু রঘুনন্দনের নিবন্ধসমূহ সম্যক্ আলোচনাপূর্বক তাহার যথাযথ মূল্যনিরূপণ বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না। বিদুষী গ্রন্থরচয়িত্রী রঘুনন্দনের নিবন্ধসমূহ আলোচনা করিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের সিদ্ধান্তের দুর্বলতা এবং আলোচ্য নিবন্ধকারের মৌলিকতা এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতি রঘুনন্দনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া রঘুনন্দনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষিতসমাজে রঘুনন্দনের স্মৃতিব্যবস্থাদি সম্বন্ধে একটি প্রতিকূল মনোভাব বর্তমান। বঙ্গদেশে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে রঘুনন্দনের স্মৃতিব্যবস্থা তাঁহাদের দৃষ্টিতে কঠোর বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী নানা উদাহরণ উপস্থিত করিয়া রঘুনন্দনের কোমলতা উদারতা প্রভৃতি গুণাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রঘুনন্দন স্বীয় প্রতিভার আলোকে তৎপূর্বগামী সূরীগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্বক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত গতানুগতিক পথে আলোচনা না করিয়া নবীন শৈলীতে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহা করিতে যাইয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য কোথাও লঙ্ঘিত হয় নাই—বিদুষী গ্রন্থকর্ত্রী রঘুনন্দনের নিবন্ধসমূহ সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া এই তথ্য গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

রঘুনন্দন যে যুগে বঙ্গদেশে স্বীয় নিবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছেন, সে যুগ এক বিশৃঙ্খলার যুগ। মুসলমান শাসনে দেশের সমাজব্যবস্থা সর্বথা বিপর্যস্ত, সে সময়ে যথেচ্ছাচারই সমাজে বলীয়ান্। এই যুগে রঘুনন্দন ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণকে

সুব্যবস্থিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন। সেইজন্যই আমরা দেখি তাঁহার ব্যবস্থা কোথাও অতীব কঠোর ; কেন না কঠোর অনুশাসন ভিন্ন অব্যবস্থিত সমাজ সুস্থ ও ব্যবস্থিত হইতে পারে না। আবার কোথাও তিনি উদার, কেন না দীর্ঘ দিন ধরিয়া শাস্ত্রনির্দেশের বিপরীত কতিপয় আচরণে সমাজ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সবলে তাহাকে দমন করা সম্ভব নয় বলিয়া তিনি উদার হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রানুকূল এবং যুক্তিগ্রাহ্য করিয়াছেন। এইভাবে গ্রহণ ও বর্জনের নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি এক বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারকের রূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজও বঙ্গদেশে ধার্মিক আচার ও অনুষ্ঠানে যে পরিপাটী পরিলক্ষিত হয় তাহা শ্রীরঘুনন্দনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্গদেশ যেরূপ রঘুনাথ শিরোমণি প্রবর্তিত নব্যন্যায়ের প্রচলনে গর্ব অনুভব করে সেইরূপ রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

২৪-২-৭২ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

ডঃ সুনীতিকুমার

"I have be
dipped into c
you for a lot
congratulate
Hindus, for
would enable
Brahmanical H
ed in early m
kind that I c
a contribution
Sanskrit literat
centuries has b
Dr. P. V. Kan
Dharma Sastra
no lack of Smri
have remained
knowing schola
laudable and qu
and message of
and his anxiety
period of Hindu
general sanity o
are things abou
will remove a gre
One great se
is by making yo
speak too high
quotations from t
texts. By quoti
Nibandhakaras,

করেন। সেইজন্যই
কঠোর অনুশাসন
আবার কোথাও
কতিপয় আচরণে
সম্ভব নয় বলিয়া
গ্রাহ্য করিয়াছেন।
ক বিশিষ্ট সমাজ-
বঙ্গদেশে ধার্মিক
শ্রীরঘুনন্দনের জন্যই
শ যেরূপ রঘুনাথ
ইরূপ রঘুনন্দনের

থ কবিরাজ

সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন সম্পর্কে বিভিন্ন মত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ., ডি. লিট্,
ভারতের জাতীয় অধ্যাপক, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৬৭।

"I have been very much impressed by the book, and I have dipped into considerable portions of it, and I have to thank you for a lot that I have come to know from your book. I congratulate you as well as the people of Bengal, particularly Hindus, for giving us such a fine and useful work which would enable one to know something about the bases of your Brahmanical Hindu culture, as they were sought to be established in early mediaeval times. This is the first work of its kind that I can think of, and it is as valuable and as eminent a contribution as we could expect from a serious student of Sanskrit literature. The development of Smriti usage in recent centuries has been neglected, although a scholar of the calibre Dr. P. V. Kane has dedicated his life to the study of the Dharma Sastra as a branch of Sanskrit learning. We have no lack of Smriti scholars in Bengal, but their contributions have remained more or less restricted within the Sanskrit-knowing scholarly groups alone. You have made a very laudable and quite successful attempt to bring the personality and message of an eminent son of Bengal like Raghunandana and his anxiety to preserve Hindu society during a very critical period of Hindu history in Muslim times as well as the general sanity of his views inspite of the orthodox background, are things about which we have no knowledge. Your book will remove a great want, and for this we all feel grateful to you.

One great service you have done to Sanskrit scholarship is by making your work well-documented and one can not speak too highly of your method in giving the apposite quotations from the works of Raghunandana and other relevant texts. By quoting Raghunandana himself and other great Nibandhakaras, you have done a good thing in vindicating

their service to Hindu society and placing them in their proper pedestal in the Hall of India's Sanskrit culture."

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্.এ, ডি. লিট্

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।

"I have read with great interest the Bengali work on "Social Reformer Raghunandana" by Sm. Bani chakrabarty. She has discussed the views of Raghunandana on a variety of topics, giving full references. The book gives evidence of great industry and powers of critical study and research. Though Raghunandana's work is acknowledged as the most authentic, even in the modern Hindu society of Bengal, and are often referred to for guidance, very few Hindus ever have any opportunity to read the voluminious text or understand it. As such Miss Chakrabarty's book will prove of great value to any one who seeks to understand the social condition of Mediaeval Bengal."

ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এম্. এ., ডি. লিট্

অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

৮ই এপ্রিল, ১৯৬৮।

"In this work the author, though very young, has shown her capacity of understanding Raghunandana's terse language and following his arguments successfully and given a creditable account of Raghunandana's valuable contributions as a social reformer. Although Raghunandana is recognised universally as the greatest Smriti-writer of Bengal, who by his wide study and mature thought, saved the Hindu society from disintegration, it is a pity that there are very few who know even partially where in Raghunandana's greatness lies. This long felt want has been removed to a great extent by Sm. Chakravarti's work."

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এম্. এ., ডি. লিট্

অধ্যক্ষ, সেন্টার অব্ অ্যাড্ভান্সড্ ষ্টাডি, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।

"I am glad to find that the book exhibits your industy and erudition·········I consider your work a creditable performance."

মনু, যাজ্ঞবল্ক
সমাজব্যবস্থার সু
স্মৃতিনিবন্ধগুলিও
সাধনের জন্য রচি
সমাজে প্রচলিত
বলিয়া প্রমাণ
সিদ্ধান্ত দেখা যায়
মাতুলকন্যাপরিণয়
অন্য কন্যা বিবাহ
প্রচলিত সামাজিক
করিবার প্রয়াস
স্বমত স্থাপনের জন
চূড়ামণি এবং র
তাই তাঁহাদের নি
এই কারণেই তাঁ
দুর্বোধ্য। যাঁহারা
হউন না কেন র
অভিমানী পণ্ডিত ম
কেবল নবমীতে
সেটা করিবে না—
প্রণয়ন করিয়াছেন
শ্রদ্ধাহীন তাঁহারাই
"রঘুনন্দন সমাজকে
সর্বনাশ করিয়াছেন
ক্রমবিকাশের ধারা
অথচ তাঁহারাই রঘু
প্রমাণ করিতে চাহেন
জন্য যেরূপ পাণ্ডিত্য
স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ প
কল্যাণীয়া শ্রীমত
রঘুনন্দন" নামক গ্র
করিলাম। স্মৃতিশাস্ত্র

em in their proper
re.''

|

ali work on "Social
akrabarty. She has
a variety of topics,
nce of great industry
n. Though Raghu-
t authentic, even in
l are often referred
ave any opportunity
id it. As such Miss
due to any one who
ediaeval Bengal."

ত কলেজ, কলিকাতা

ing, has shown her
terse language and
given a creditable
ibutions as a social
ognised universally
o by his wide study
from disintegration,
now even partially
This long felt want
akravarti's work."

াড়ি, প্রাচীন ইতিহাস ও
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।

s your industy and
ble performance."

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতাগুলি যেরূপ বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনপূর্বক সমাজসংস্কারের জন্য রচিত হইয়াছিল, স্মৃতিনিবন্ধগুলিও সেইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। স্মৃতিনিবন্ধগুলির সাহায্যে নিবন্ধকার তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ও বহুজন পরিগৃহীত আচার, অনুষ্ঠান, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এইজন্যই বিভিন্ন স্মৃতিনিবন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোনও দেশে মাতুলকন্যাপরিণয় শাস্ত্রবিগর্হিত, আবার কোনও দেশে মাতুলকন্যালাভ সম্ভবে অন্য কন্যা বিবাহ করা উচিত নহে। এইরূপে বুঝা যায় যে স্মৃতিনিবন্ধগুলি প্রচলিত সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং উহা প্রমাণ করিবার জন্য ও পরমতখণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপনের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুরূহ মীমাংসাশাস্ত্রে অতি প্রবীণ ছিলেন। তাই তাঁহাদের নিবন্ধে মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনা প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই কারণেই তাঁহাদের গ্রন্থ সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। যাঁহারা মীমাংসাশাস্ত্র সম্যক্ অবগত নহেন তাঁহারা যত বড়ই সংস্কৃতজ্ঞ হউন না কেন রঘুনন্দনের গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট দুরধিগম্য। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ অভিমানী পণ্ডিত মনে করেন যে রঘুনন্দনের স্মৃতি নূতন কিছুই দান করে নাই। কেবল নবমীতে লাউ খাইবে না, ত্রয়োদশীতে বেগুন খাইবে না, এটা করিবে না, সেটা করিবে না—এইরূপ নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া তিনি অতি কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাঁহারাই ঐ শাস্ত্র না পড়িয়া বা না বুঝিয়া উন্নাসিকতা অবলম্বনপূর্বক "রঘুনন্দন সমাজকে নানা নিষেধের দ্বারা অতি কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছেন" এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্মৃতিনিবন্ধের ক্রমবিকাশের ধারা এবং সমাজ-সংস্কারে স্মৃতিনিবন্ধের দান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ তাঁহারাই রঘুনন্দনের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়া তাঁহাদের সর্বশাস্ত্রজ্ঞত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। বস্তুতঃ রঘুনন্দন তৎকালে সমাজের বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া উদার মত স্থাপন করিয়াছেন তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের নিকট বিস্ময়ের বিষয়।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী এম্. এ. স্মৃতিতীর্থের "সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন" নামক গ্রন্থখানি অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। স্মৃতিশাস্ত্র বা স্মৃতিনিবন্ধ অবলম্বনে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা

প্রায় সকলেই তৎ তৎ স্মৃতির বা নিবন্ধের পৌর্বাপর্যের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে সমালোচনাপূর্বক পূর্বসূরীদের সহিত রঘুনন্দনের পার্থক্য, রঘুনন্দনের বৈশিষ্ট্য, রঘুনন্দনের সমাজসংস্কারকতা, রঘুনন্দনের উদারতা, সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বিষয়বিশেষে কঠোরতা, এই স্বীয় মত স্থাপনে তাঁহার যুক্তির দৃঢ়তা প্রভৃতি কেহই আলোচনা করেন নাই। বিশেষতঃ বাংলাভাষায় এইরূপ আলোচনা গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী প্রভৃতি গ্রন্থেও রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলির বৈশিষ্ট্য বা তাঁহার রচনার সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ এই যে রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলি গুরুর নিকট অধ্যয়ন না করিলে উহার তত্ত্বার্থ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

শ্রীমতীর গ্রন্থখানি এদিক্ হইতে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং বাংলাভাষায় স্মৃতিনিবন্ধ সমালোচনার অদ্বিতীয় গ্রন্থ। নিবন্ধখানি পড়িলে বুঝা যায় শ্রীমতী কত যত্ন সহকারে তত্ত্বগুলি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া উহার গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীমতী তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই গবেষণা গ্রন্থখানিতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে রঘুনন্দন একজন সমাজসংস্কারক বা সমাজরক্ষক ছিলেন। তৎকালীন ইতিহাসের পটভূমিকা জানা থাকিলে এবং এই তথ্যপূর্ণ মূল্যবান্ নিবন্ধখানি মনোযোগ সহকারে পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে রঘুনন্দন কিরূপ উদার ছিলেন এবং কিভাবে তিনি তৎকালীন সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের কালনিরূপণে গ্রন্থকর্ত্রী যেরূপ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় এবং এইদিকে পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের পৌর্বাপর্য অতি সুন্দরভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। নানা বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়া গ্রন্থকর্ত্রী অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছে। সাপিণ্ড্যবিচার, মৎস্যভোজন, সিদ্ধচাউল ভক্ষণ, বলপূর্বক নারী অবমাননার বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তের হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীমতীর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবিকই প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীমতী যে তত্ত্বগুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছে তাহার প্রমাণ প্রত্যেকটি অধ্যায়ে সুস্পষ্ট। উহার পুনরুল্লেখ করিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া আমি প্রবন্ধ দীর্ঘতর করিতে চাহি না। আশা করি স্মৃতিশাস্ত্র-অধ্যয়নকারী এবং সমালোচনাকারীরা এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হইবেন। আশীর্বাদ করি শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী ভবিষ্যতে স্মৃতিশাস্ত্রের আরও গভীর আলোচনা করিয়া দেশবাসীর জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সহায় হইবে এবং অন্যান্য পাণ্ডিত্যাভিমানীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হইবে।

ভাটপাড়া, ১৬ই অগ্রহায়ণ
সন ১৩৭২

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ দেবশর্মা

না করিয়াছেন।
দনের পার্থক্য,
রতা, সমাজের
তাঁহার যুক্তির
াভাষায় এইরূপ
ত্বও রঘুনন্দনের
ওয়া যায় না।
কট অধ্যয়ন না

: বাংলাভাষায়
বুঝা যায় শ্রীমতী
গূঢ়ার্থ অনুধাবন
যণা গ্রন্থখানিতে
াজসংস্কারক বা
াকিলে এবং এই
পারা যায় যে
সমাজের প্রকৃত

শুত্যের পরিচয়
জের দৃষ্টি আকৃষ্ট
াতি সুন্দরভাবে
দিয়া গ্রন্থকর্ত্রী
াজন, সিদ্ধচাউল
বিষয়ে শ্রীমতীর
গুলি গভীরভাবে
উহার পুনরুল্লেখ
া। আশা করি
উপকৃত হইবেন।
আরও গভীর
হবে এবং অন্যান্য

ত্তীর্থ দেবশর্মা

সমাজসংস্কারক রঘুনন্দনের ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসামান্য। বেদকে বলা হয় শ্রুতি এবং মনু প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতি। বেদমূলক বিধিই স্মৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহার নাম স্মৃতি। "শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ" (মনু ২।১০)। বেদপ্রতিষ্ঠ হিন্দুসমাজে ধর্মের আদর্শ ও প্রেরণাই তাহাকে এক অখণ্ড তাৎপর্য দিয়াছে। শ্রুতিস্মৃতির অনুশাসন মানিয়াই ভারতীয় সংস্কৃতি সুপ্রাচীনকাল হইতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুপর্যন্ত বহুতর কর্তব্য অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং মন্ত্রের মঙ্গলমাধুর্যের মধ্য দিয়াই উহা অনুষ্ঠিত হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"নিষেকাদিশ্মশানান্তা যেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ"।

হিন্দুর ধর্ম যে কেবল উপাসনাগত কয়েকটি মূল সূত্র বা অনুশাসন তাহা নহে। জীবনযাত্রার গতিপথে নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কল্যাণের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। হ্যাভেল বলেন—"Religion in India is hardly a dogma but a working hypothesis of human conduct adapted to different stages of spiritual developments and different conditions of life." (Aryan Rule in India, page 170). দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই কারণেই হিন্দুধর্মের প্রবাহ কখনও প্রাণহীণ বা শুষ্ক হইয়া যায় নাই।

শ্রুতিস্মৃতি নির্দিষ্ট ধর্মের পথে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। উহার বহুতর কর্তব্যের মধ্যে চরিত্রমহিমা গড়িয়া তোলাই উদ্দেশ্য। পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহাতে আছে শাস্ত্রের নিষ্করুণ শাসন। তাই এত ত্যাগ, এত আত্মসংবরণ, এত নিয়ম-সংযম। কিন্তু সেই সকল কঠিন কর্মসাধনার মধ্যে মনুষ্যত্ব উদ্বোধের একটা চরম তাৎপর্য আছে। তাই কর্তব্যের শাসন আমাদের পক্ষে শৃঙ্খল নহে, উহা আমাদের অলঙ্কার। জীবনধর্মের উপরেও কর্তব্যের যে একটা বড় ধর্ম আছে, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাহাকেই অগ্রাধিকার দিয়াছে এবং এই কারণেই শ্রুতিস্মৃতির অনুশাসনকে ভারতের চিরাগত সংস্কৃতি নিত্য শিরোধার্য করিয়াছে।

সমাজ ও জীবনের ধর্মানুগ কর্তব্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ঋষিপ্রণীত স্মৃতির অনুশাসন। স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে ধর্মসূত্র, স্মৃতিসংহিতা ও সর্বশেষে স্মৃতিনিবন্ধের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ধর্মসূত্রের উদ্ভব হয় বৈদিক সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কিত বেদাঙ্গসাহিত্যের যুগে। বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের পরিপাটি কল্পিত হইয়াছে 'কল্পসূত্রে'। 'কল্পসূত্র' অন্যতম বেদাঙ্গসূত্র। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র—এই তিন শ্রেণীতে উহা বিভক্ত। সমাজ ও জীবনের আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের অনুশাসন প্রথম সূত্রাকারে রচিত হয় ধর্মসূত্রে। ধর্মসূত্রে 'সাময়াচারিক ধর্ম' বলিয়া পৌরুষেয়ী ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত আচারব্যবহারের কথাও বলা হইয়াছে। শিষ্টজন সমাদৃত আচারও ধর্মের অন্যতম প্রমাণ। স্মৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা পরম্পরাক্রমে শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। সদাচার স্মৃতির উপর নির্ভর করে বা কাহারও মতে উহা বেদের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় চিন্তাধারায় বেদ কোন পুরুষবিশেষের রচিত নহে। উহা অপৌরুষেয় ও নিত্য। বিদ্‌ধাতুর ত্রিবিধ অর্থ—জানা, লাভ করা ও বিচার করা। বেদ সেই জ্ঞানের কথা বলে, যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর। উহা সেই শ্রেয়ের সন্ধান দেয়, যাহা সকলেরই কাম্য, উহা বিচারলভ্য ব্রহ্মরূপ সেই সত্যের উপদেশ করে, যাহার উপরে আর কোন শ্রেয়ঃ নাই।

ভারতবর্ষের এই বিশ্বাস হইতেই বেদের অলৌকিকত্বের প্রতিষ্ঠা। এই বিশ্বাসের আরও একটি কারণ আছে। 'শ্রেয়োরূপ ধর্ম'—যাহার উপরে শ্রেষ্ঠ বা শক্তিশালী আর কিছু নাই,—যাহা শাশ্বত নিয়ামক শক্তি (enternal ordering principle) তাহার মূল উৎসকে মানুষের ভ্রম প্রমাদ বা মানুষের খেয়ালখুসীর সঙ্গে যুক্ত করিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবোধ করিয়াছে। মানুষের ঊর্ধ্বে যদি কোন শক্তি থাকে, মাত্র তাহারই শাসন নিখিল চরাচরে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিতে বাধ্য। তাই অপৌরুষেয় বেদই ধর্মের মূল বলিয়া স্বীকৃত। ধর্মের আদর্শ উচ্চ বলিয়াই ধর্মের মূলটিকে শাশ্বত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে একটা বিশেষ যুক্তি আছে। স্বভাব মর্যাদা পালন ও কল্যাণের ধ্রুবস্থিতি রক্ষার মৌলিক প্রয়োজনেই উহা স্বীকৃত।

তাই বলিয়া জীবনধর্মের সঙ্গে হিন্দুর ধর্মের সম্পর্ক কখনই দূরবর্তী নহে। জীবনের নানা কর্তব্যের সঙ্গে উহা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সব কিছুই আমাদের জীবনে একটা অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সংযোগসূত্রে আবদ্ধ। প্রাণপ্রবাহের গতিবেগের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জগৎ ও জীবনের

বাস্তবতার মধ্যে না
সে ধর্ম কখনই চল
প্রয়োজনের তাগিদে
আচার স্থান পাইয়া
কালের পরিবর্তিত
বাধা নাই। সদাচা
হইয়াছে যে—"সময়শ্চা
স্মৃতিনিবন্ধের উৎপ
প্রেক্ষিতে সমাজসংস্কা
বলা দরকার যে সম
বিধানে ভারতবর্ষ কোন
'অপরিবর্তনশীল প্রাচ্য'
মর্ম না জানিয়াই বিদ্বেষ
মনু দ্বিধাহীন ভাষা
ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে প
ভিন্ন ভিন্ন কালের উপয
পাই যথা,—"কলৌ প
বিহিত ব্যবস্থা সমাজ
বলিয়াছেন—"অস্বর্গ্যং
একদিকে যেমন স্মৃ
অন্যদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের
বিধির নানা পরিবর্তনে
রহিয়াছে। কিন্তু পরিব
প্রভৃতি শাস্ত্রযুক্তির অবত
পরীক্ষায় উহাকে যাচাই
কারণ—"যুক্তিহীনে বিচা
একটিমাত্র স্মৃতির ব
মতের পোষকতা করিতে
করি উহা অপ্রাসঙ্গিক হ
বলা হয়—'ন স্ত্রী দদ্যাৎ

য়াছে ঋষিপ্রণীত স্মৃতির
মৃতিসংহিতা ও সর্বশেষে
হব হয় বৈদিক সংস্কৃতির
ক্রিয়াকলাপের পরিপাটি
সূত্র। শ্রৌত, গৃহ্য ও
বনের আচার ব্যবহার ও
হয় ধর্মসূত্রে। ধর্মসূত্রে
উদ্ভূত আচারব্যবহারের
অন্যতম প্রমাণ। স্মৃতি
র নির্ভরশীল। সদাচার
ার নির্ভরশীল। ভারতীয়
অপৌরুষেয় ও নিত্য।
ন্য। বেদ সেই জ্ঞানের
সেই শ্রেয়ের সন্ধান দেয়,
ার উপদেশ করে, যাহার

কত্বের প্রতিষ্ঠা। এই
—যাহার উপরে শ্রেষ্ঠ বা
(enternal ordering
া মানুষের খেয়ালখুসীর
ষের ঊর্ধ্বে যদি কোন
ষ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিতে
র্মের আদর্শ উচ্চ বলিয়াই
ক্ষে একটা বিশেষ যুক্তি
ার মৌলিক প্রয়োজনেই

কখনই দূরবর্তী নহে।
। ধর্ম, অর্থ, কাম,
অবিচ্ছিন্ন সংযোগসূত্রে
র্ক। জগৎ ও জীবনের

বাস্তবতার মধ্যে না যাইতেই যদি ধর্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে সে ধর্ম কখনই চলার পথের পাথেয় হইতে পারে না। সম্ভবতঃ এই বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই ধর্মের অন্যতম আরও দুইটি মূল প্রমাণ হিসাবে স্মৃতি ও আচার স্থান পাইয়াছে। স্মৃতির পক্ষে সুবিধা এই যে স্মৃতির অনুশাসনে দেশ ও কালের পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিধান দিতে কোন বাধা নাই। সদাচারের প্রামাণ্যও বহুসমর্থিত। এমনকি কালক্রমে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে—"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ"।

স্মৃতিনিবন্ধের উৎপত্তির কারণ আলোচনা করিতে গেলে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজসংস্কারক রঘুনন্দনের ভূমিকার সূচনা করিতে হইলে প্রথমেই বলা দরকার যে সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার সহিত জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য বিধানে ভারতবর্ষ কোনদিন পশ্চাৎপদ হয় নাই। যাঁহারা Unchanging East বা 'অপরিবর্তনশীল প্রাচ্য' বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করেন, তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মর্ম না জানিয়াই বিদ্বেষপ্রসূত নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন।

মনু দ্বিধাহীন ভাষায় যুগোপযোগী ধর্মের কথা বলিয়াছেন—"অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। অন্যে কলিযুগে ধর্মা যুগরূপানুসারতঃ॥" এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কালের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারের প্রামাণ্য সম্বন্ধেও উল্লেখ দেখিতে পাই যথা,—"কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" (পরাশর, ১।২৩)। আবার, ধর্মশাস্ত্রে বিহিত ব্যবস্থা সমাজবিরোধী হইলে যে গ্রহণযোগ্য নহে, যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট উহা বলিয়াছেন—"অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্যমপ্যাচরেন্ন তু" (১।১৫৬)।

একদিকে যেমন স্মৃতিকারের সংখ্যা কুড়ি হইতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের নানা ভাষ্য ও টীকায় দেশ ও কালভেদে শাস্ত্রীয় আচার-বিধির নানা পরিবর্তনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তনের অনুকূলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রযুক্তির অবতারণায় এবং ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি বিচারের কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় উহাকে যাচাই করিয়া লওয়া হয়। বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ—"যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।"

একটিমাত্র স্মৃতির বচন কি করিয়া ব্যাখ্যার সাহায্যে চার চারটি বিভিন্ন মতের পোষকতা করিতে পারে তাহার এক সার্থক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে আশা করি উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বশিষ্ঠস্মৃতিতে স্ত্রীলোকের দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে বলা হয়—'ন স্ত্রী দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বান্যত্রাভ্যজ্ঞানাদ্ভর্তুঃ'—অর্থাৎ পতির অনুমতি

ব্যতীত স্ত্রী পুত্রদান বা পুত্র প্রতিগ্রহ করিবে না। চারিটি বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। বাংলাদেশে পতির নিকট হইতে অনুমতির সাহায্যে অথবা নিষেধ না থাকায় অনুমতির কল্পনা করিয়া বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। অতএব সেখানকার ব্যাখ্যায় বলা হইল—স্বামী যখন জীবিত থাকেন, তখন তিনিই দত্তক গ্রহণ করিবেন। এই বচনটিতে স্ত্রীলোকের যে অধিকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা বিধবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মিথিলায় বিধবার এই অধিকার স্বীকৃত হয় না। কাজেই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইল—অনুজ্ঞা তখনই হইতে পারে, যখন মুখ্য অধিকারী জীবিত। এই বিধিতে সধবারই অধিকার স্বীকৃত। বিধবার কোনমতেই অধিকার হইতে পারে না—কারণ তৎকালে অনুজ্ঞা দিবার জন্য পতি জীবিত নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে দেখা যায় সধবা স্ত্রী পতির অনুমতি লয় এবং বিধবা স্ত্রী পতির স্থলাভিষিক্ত সপিণ্ড অভিভাবকের অনুমতি লয়। অতএব দ্বিতীয় স্থলে ভর্তৃপদে সপিণ্ডের উপলক্ষণ করা হইল। বোম্বাই অঞ্চলের কথা হইল পতি জীবিত থাকিলেই স্ত্রী তাহার অনুমতি লইয়া দত্তক গ্রহণ করিবে। পতির মৃত্যু হইলে অনুজ্ঞার কোন অপেক্ষাই নাই। বিধবা নিজের ক্ষমতাবলেই দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। ইহার প্রসঙ্গাধীন নানাবিধ ব্যাখ্যা বা বিচারশৈলীর খুঁটিনাটি উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু যতটুকু বলা হইল তাহা হইতেই বোঝা যাইবে প্রাচীন-স্মৃতিবচনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াও ব্যাখ্যার সুকৌশলে দেশ ও কালের অবস্থাভেদে পরিবর্তনকে কিভাবে সমাজপ্রয়োজনে কাজে লাগান হইতেছে।

যাহা হউক, কালক্রমে স্মৃতিসংহিতার পরবর্তীযুগে ভাষ্য, ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা অনুসরণে পৃথক্ একপ্রকার নিবন্ধজাতীয় গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে। উহাতে স্মৃতিপ্রতিপাদিত নানা বিষয়ের উপর আলোচনা নিবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাচীন স্মৃতি হইতে এক একটি বিষয়ে নানা প্রমাণবচন উদ্ধৃত করিয়া সেই সব বচনগুলির মধ্যে একবাক্যতা স্থাপন করার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। ফলে ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি যুক্তিজালের প্রয়োজন অনিবার্য হইয়া উঠিল। আবার তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা যোজনার আবশ্যকতাও দেখা দিল। এইভাবে নিবন্ধকারগণ নানা ব্যাখ্যাযোজনায় কালোপযোগী ধর্মব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন।

বাংলার স্মৃতিনিবন্ধের ইতিহাসে রঘুনন্দন এমনই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন যে নব্যস্মৃতি বলিলে রঘুনন্দনের স্মৃতি ছাড়া সাধারণতঃ আর কাহারও

চারিটি বিভিন্ন অঞ্চলে
কট হইতে অনুমতির
রিয়া বিধবা দত্তক গ্রহণ
—স্বামী যখন জীবিত
নটিতে স্ত্রীলোকের যে
য। মিথিলায় বিধবার
হইল—অনুজ্ঞা তখনই
তে সধবারই অধিকার
না—কারণ তৎকালে
দেখা যায় সধবা স্ত্রী
সপিণ্ড অভিভাবকের
পলক্ষণ করা হইল।
তাহার অনুমতি লইয়া
ন অপেক্ষাই নাই।
। ইহার প্রসঙ্গাধীন
য় না। কিন্তু যতটুকু
র প্রতি শ্রদ্ধা বজায়
পরিবর্তনকে কিভাবে

ষ্য, ব্যাখ্যা প্রভৃতির
বির্ভাব ঘটে। উহাতে
তে লাগিল। প্রাচীন
করিয়া সেই সব বচন-
গ্রহ দেখা দিল। ফলে
ইয়া উঠিল। আবার
ষ্টিভঙ্গী লইয়া যুক্তিপূর্ণ
নিবন্ধকারগণ নানা
রেন।
সাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ
রণতঃ আর কাহারও

কথা মনে পড়ে না। 'স্মার্ত' বলিতে তিনিই কেবলান্বয়ী। কিন্তু নব্যস্মৃতির প্রাঙ্গনে প্রাগ্-রঘুনন্দন যুগের স্মৃতি নিবন্ধের প্রবাহ পথ ধরিয়াই তাঁহার আবির্ভাব। কাব্যলোকে কালিদাস সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন আদিহীন পরমাশ্চর্য নন, রঘুনন্দনও তেমনি পূর্বসূরীদের সাধনার পথ ধরিয়াই তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা ও সমাজ-সচেতন মনের প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণায় যুগপ্রবর্ত্তক রূপে চিহ্নিত হইয়াছেন।

বাংলায় স্মৃতি নিবন্ধের ইতিহাসে ভবদেবভট্টই প্রাচীনতম নিবন্ধকার। তিনি একজন ধুরন্ধর মীংমাংসক, তাঁহার 'তৌতাতিতমততিলক' প্রসিদ্ধ মীমাংসা-গ্রন্থ। প্রধানতঃ জীমূতবাহন, শূলপাণি এবং রঘুনন্দন এই ত্রিবিধ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবেই নব্যস্মৃতির দিগন্ত উত্তরোত্তর ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। রঘুনন্দন তন্মধ্যে যেন প্রদীপ্ত ভাস্কর। জীমূতবাহনের গ্রন্থ বিশেষতঃ দায়ভাগ অপূর্ব মনীষার স্বাক্ষর দেয়। জন্মস্বত্ববাদ খণ্ডন করিয়া উপরমস্বত্বের বিজয়বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, উহা বাঙ্গালী মনীষার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়। বাংলার বাহিরে সর্বত্র জন্মস্বত্ববাদ স্বীকৃত। একমাত্র বাংলায় এই মত প্রতিষ্ঠিত। ইহার কার্যকারিতা ব্যাখ্যায় "বচনশতেনাপি বস্তুশক্তেরন্যথাকরণাভাবঃ" বলিয়া যে বস্তুশক্তি মতবাদ (doctrine of factum valet) স্থাপিত হইয়াছে, আইনের ক্ষেত্রে উহাবিশেষ উপযোগী। শূলপাণি বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের অন্যতম প্রখ্যাত লেখক। ইনি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বিচারশৈলী পাণ্ডিত্য পূর্ণ।

রঘুনন্দন বাংলার নব্যস্মৃতির যুগন্ধর নিবন্ধকার, তাঁহার সমকালে নবদ্বীপের সারস্বত ক্ষেত্রে নব্যন্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণি ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ছিলেন আর দুইটি দিক্‌পাল। বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের রাজদরবারে রঘুনন্দনই সার্বভৌম গৌরবের অধিকারী। তাঁহার নামেই নব্যস্মৃতির যুগ চিহ্নিত। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও মনীষা ছিল সে যুগের বিস্ময়, নইলে সমগ্র সমাজকে তাঁহার সর্বাতিশয়ী প্রভাবে প্রভাবিত করিবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিবে? ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁহার মধ্যে ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সমাজ-সচেতন উদার হৃদয়, নিষ্করুণ শাসনের সুতীব্র দৃঢ়তা, অপ্রমেয় বুদ্ধি, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অপূর্ব বিচারশৈলী। তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব তৎকালের বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজকে রক্ষাকবচের সম্পদ্ দান করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিবন্ধে পূর্বমীমাংসা ও ন্যায়ের অবতারণা করিয়া

তাঁহার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশেই তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ করেন নাই, সমাজরক্ষা ও সমাজসংস্কারের অদম্য আগ্রহ লইয়াই তিনি উহা করিয়াছিলেন।

আমাদের কৃতবিদ্য ছাত্রী ডক্টর শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী "সমাজসংস্কারক রঘুনন্দনের" আলেখ্যরচনায় যে নিষ্ঠা, শ্রম ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। স্মার্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সহজবোধ্য নহে। ন্যায় ও মীমাংসার বলিষ্ঠ যুক্তিজাল সমন্বিত সেই তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাও প্রযত্নসাধ্য। লেখিকা তাহার গ্রন্থটিতে তত্ত্বগুলির নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এবং যথাসম্ভব ঐতিহাসিক পটভূমির পর্যালোচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। রঘুনন্দন তৎকালীন সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিয়াই যে তাঁহার শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও সার্থক পরিচয় শ্রীমতী চক্রবর্তী দিয়াছে। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের মধ্যে কে পূর্ববর্তী নিবন্ধকার, এই রহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া লেখিকা কৃতিত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার সাক্ষ্য দিয়াছে। রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে উদ্ধৃত বচনগুলি গোবিন্দানন্দের ক্রিয়াকৌমুদী গ্রন্থ হইতে যে সংগৃহীত—তাহার এই আবিষ্কৃত তথ্যই উভয়ের আপেক্ষিক কাল-নির্ণয়ের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছে। রঘুনন্দন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অতি অল্পই গবেষণা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের গবেষণাক্ষেত্রে লেখিকার এই প্রথম প্রচেষ্টায় কিছু না কিছু ত্রুটি থাকা হয়তো স্বাভাবিক। আমি আশা করিব এই গ্রন্থটিতে রঘুনন্দনের যে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে, উত্তরসূরীর সাধনায় উহা আরও আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক
ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ

৩।২।১৯৭০

রঘুনন্দনের স্মৃতি
চলে। রঘুনন্দনের
পরিপূর্ণ। স্মৃতিনিবন্ধে
কিছু কিছু তথ্য পরিবে
তাঁহার তত্ত্বগুলির ভিত
স্মৃতিশাস্ত্রবিভাগে অধ্য
আমি অন্তরে অনুভব ক
তত্ত্বগুলির সম্যক
বোধ, সমাজরক্ষার প্রতি
জনগণের নিকট প্রকাশি
তাঁহাকে কঠোর শাস্ত্র
থাকেন। কিন্তু তাহা
তত্ত্বগুলির আলোচনাপূ
অবস্থাবিশেষে কতটা ক
রঘুনন্দন সম্পর্কে
তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে
ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতপ্রবর
মহোদয়। তিনি রঘুন
আমার অশেষ উপকার
কলেজের সংস্কৃতবিভাগের
কাব্যস্মৃতিতর্কতীর্থ মহাশ
করিয়াছেন এবং রঘুনন্দনে
জ্যেষ্ঠতাত সম্প্রতি স্বর্গত
বিভাগে, বিশেষ করিয়া স্মৃ
স্মৃতিবিষয়ে কলিকা
করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের
শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ শা

শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশেই
ও সমাজসংস্কারের অদম্য

চক্রবর্তী "সমাজসংস্কারক
বক্তার পরিচয় দিয়াছে,
স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দনের
র বলিষ্ঠ যুক্তিজাল সমন্বিত
লখিকা তাহার গ্রন্থটিতে
যথাসম্ভব ঐতিহাসিক
ছ। রঘুনন্দন তৎকালীন
করিয়াছিলেন, তাহারও
বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে
কার, এই রহস্যের জটিল
বেষণার সাক্ষ্য দিয়াছে।
নন্দের ক্রিয়াকৌমুদী গ্রন্থ
ভয়ের আপেক্ষিক কাল-
নন্দন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত
ণাক্ষেত্রে লেখিকার এই
স্বাভাবিক। আমি আশা
সত হইয়াছে, উত্তরসূরীর

। গোস্বামী
র আশুতোষ অধ্যাপক
ভাগের অধ্যক্ষ

মুখবন্ধ

রঘুনন্দনের স্মৃতি-তত্ত্বালোচনাপূর্বক গ্রন্থপ্রণয়ন একেবারে হয় নাই বলিলেই চলে। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নিবন্ধখানি মীমাংসাশাস্ত্রের দুরূহবিচারে পরিপূর্ণ। স্মৃতিনিবন্ধের ইতিহাস আলোচনাকালে কেহ কেহ রঘুনন্দন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন বটে, কিন্তু মীমাংসার বিচারজাল ছিন্ন করিয়া তাঁহার তত্ত্বগুলির ভিতরে প্রবেশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। এম্. এ. ক্লাসে স্মৃতিশাস্ত্রবিভাগে অধ্যয়নকাল হইতেই রঘুনন্দন-বিষয়ে গবেষণা করিবার প্রেরণা আমি অন্তরে অনুভব করিয়াছি।

তত্ত্বগুলির সম্যক্ আলোচনার অভাবে রঘুনন্দনের মহদ্ ব্যক্তিত্ব, সূক্ষ্ম বিচার-বোধ, সমাজরক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, তাঁহার উদার মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলী জনগণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। এইজন্য অনেকে রঘুনন্দনের গ্রন্থ না পড়িয়াই তাঁহাকে কঠোর শাস্ত্রব্যবস্থাপক এবং সংকীর্ণমনোভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। এই গ্রন্থে জনগণের পক্ষে বুঝিবার জন্য তত্ত্বগুলির আলোচনাপূর্বক সমাজব্যবস্থায় রঘুনন্দন যে কতখানি উদার, আবার অবস্থাবিশেষে কতটা কঠোর ছিলেন, তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

রঘুনন্দন সম্পর্কে গবেষণা করিতে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ভট্টপল্লী নিবাসী পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিবাচস্পতি মহোদয়। তিনি রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলির দুর্বোধ্যস্থান নির্দেশপূর্বক উপদেশদানে আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি চিরঋণী। কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ, কাব্যস্মৃতিতর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে সর্বদাই উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করিয়াছেন এবং রঘুনন্দনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। আমার পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাত সম্প্রতি স্বর্গত সতীনাথ বিদ্যাভূষণ পঞ্চতীর্থ মহাশয় সংস্কৃতের বিভিন্ন বিভাগে, বিশেষ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট উপদেশ দান করিয়াছেন।

স্মৃতিবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চস্কলাররূপে গবেষণা আরম্ভ করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যক্ষ ও আশুতোষ অধ্যাপক পরম-শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী এম.এ, পি.আর.এস্, পি.এইচ্. ডি, কাব্যব্যাকরণ-

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে। এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা আমার গবেষণাকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

সৌভাগ্যবশতঃ কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় প্রথমদিকে আমাকে নানা উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণাবিভাগের অধ্যাপক ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এম্.এ, ডি. লিট্. মহাশয় এই গবেষণার ব্যাপারে প্রথম হইতেই আমাকে বহুবিধ সাহায্যে উপকৃত করিয়াছেন।

এম্. এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে এবং পরেও আমাকে নানা উপদেশ দিয়া ধন্য করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী এম্. এ, পি. আর্. এস্, ডি. ফিল্, স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ এবং ডঃ হেরম্বনাথ শাস্ত্রী এম্. এ, পি. আর্. এস্, ডি. ফিল্. মহোদয়। ভট্টপল্লী নিবাসী অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ ভট্টাচার্য এম্. এ, বি. এল্, ডি. লিট্ কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাকে বহুভাবে সাহায্য করিয়া অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রধান শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ও আমাকে নব্যস্মৃতির আলোচনায় সর্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন।

প্রেসের অধিকর্তা শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় আমাকে গ্রন্থমুদ্রণ বিষয়ে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

প্রুফ্ দেখার ব্যাপারে এই আমার হাতে খড়ি, অতএব অনিচ্ছাবশতঃ মুদ্রাযন্ত্রের মারফৎ কিছু ভুলত্রুটি থাকিতে পারে। সুধীজনের নিকট এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রন্থখানি স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্‌দের আদর লাভ করিলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

প্রথম সংস্করণ,
১৯৬৪

গ্রন্থকর্ত্রী
শ্রীবাণী চক্রবর্তী

হায্য ও সক্রিয়

াক পূজ্যপাদ
নানা উপদেশ
ষণাবিভাগের
ার ব্যাপারে

দশ দিয়া ধন্য
াল গোস্বামী
াথনাথ শাস্ত্রী
ডঃ ভবতোষ
াবে সাহায্য
ির অধ্যাপক
আলোচনায়

দ্রেণ বিষয়ে

নিচ্ছাবশতঃ
ইজন্য ক্ষমা

তার্থ মনে

া
ক্রবর্তী

ভূমিকা

বহুকাল পূর্ব হইতে দেখা যায় যে শাস্ত্রকারগণ সর্বদা দেশ তথা সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের শাস্ত্র-আলোচনা নিছক পাণ্ডিত্য প্রকাশেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক রঘুনন্দনও সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রচলিত করতঃ সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় বঙ্গীয় নব্যস্মৃতিতে অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রঘুনন্দনের সমাজসংস্কার। এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে যে যে স্থানে সমাজের বিভিন্ন দিক্ পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাই এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। যেমন আচারমূলক তত্ত্ব—সংস্কার, উদ্বাহ, কৃত্য, তিথি, মলমাস, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি ইত্যাদি। ব্যবহারমূলক তত্ত্ব—ব্যবহার ও দায়। প্রায়শ্চিত্তমূলক তত্ত্ব—প্রায়শ্চিত্ত।

এখানে বক্তব্য এই যে নবস্মৃতির উল্লেখ থাকায় নব্যস্মৃতির উদ্ভব কখন হইল, আর প্রাচীনস্মৃতি বলিতে কি বুঝায়, ইহার মধ্যে বিভিন্ন যুগ, আবার স্মৃতি বলিতেই বা কি বুঝায় ইত্যাদি বিষয় জানিতে হয়। স্মৃতির সঙ্গে বেদের কি সম্পর্ক, স্মৃতির সৃষ্টিই বা হইল কেন এই সমস্ত প্রশ্নও প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া রঘুনন্দনকে জানিতে হইলে তাঁহার পূর্ববর্তী বঙ্গদেশীয় নিবন্ধগুলির সহিতও পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এইজন্য আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে স্মৃতির বিষয় ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিভিন্নযুগে বিভিন্ন শাস্ত্রকারের চেষ্টায় হিন্দুধর্ম রক্ষা পাইয়াছে, তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে ভারতে যখন প্রথম বৌদ্ধ ও অন্যান্য বেদবিরুদ্ধ ধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল, তখন এই ভিন্ন মতাবলম্বিগণ নানাপ্রকারে বেদের দোষত্রুটি উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট থাকেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মণগণ বেদের নানাপ্রকার ভ্রান্তমতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধাদি ধর্মে অনুরক্ত হন। ফলে হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ম্লান হইতে আরম্ভ করে।

আবার কাহারও কাহারও ধারণা যে তন্ত্রশাস্ত্র বেদের অনুশাসন মানে না। তাঁহারা মনে করেন তন্ত্রে কতকগুলি কথা আছে যাহার সহিত বেদের মিল

দেখা যায়। এখন ইহা স্মৃতির মধ্যে গণ্য হইবে কিনা তাহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এইগুলিকে স্মৃতির অন্তর্গত মনে করাও সমীচীন নয়। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ ম-কার প্রভৃতি সাধনাপদ্ধতি বৈদিক মতবিরুদ্ধ এবং তন্ত্রের সহিত বেদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠও নহে। অবশ্য পরবর্তী কালে নিগমশাস্ত্রের সহিত আগমের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়। তাহা হইলেও তান্ত্রিক আচারব্যবহারের সহিত বৈদিক আচার-ব্যবহারের কোন মিল দেখা যায় না, এইজন্য এই সমস্ত মনীষী তন্ত্রকে বেদোদ্ভূত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্মগুলির বিভিন্ন মতবাদে হিন্দুগণ নিজেদের ধর্মে সন্দেহাকুল হইয়া উঠিতেছিল। বিরুদ্ধ মতবাদিগণ স্মৃতির মূল সম্বন্ধেও নানাপ্রকার সন্দেহ প্রচার করিতেছিল। এখন বিচার্য, যে ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিরুদ্ধধর্মগুলিকে প্রতিহত করা হইবে, সেই শাস্ত্রের প্রতি নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে কেহই আর শাস্ত্র মানিবে না। এইজন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণ স্মৃতির মূলগত বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে কুমারিলভট্ট নূতন কথা প্রচার করিলেন যে বেদের কখনও বিনাশ নাই। কারণ সম্যগ্‌রূপে অনুসন্ধান করিলে স্মৃতিবচন-সমূহের মূলগত শ্রুতিবাক্যও অবশ্যই পাওয়া যাইবে। ভারতের গ্রামে বা জনপদে সেই সমস্তগুলি অনুসন্ধান করিলে স্মৃতির সব মূলও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু বর্তমানে সত্যকার অনুসন্ধানের অভাবে তাহা অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আর তান্ত্রিক আচার বেদবিরুদ্ধ, অতএব তন্ত্রের মধ্যে কিছু অংশে বেদের সহিত বাহ্যত: মিল থাকিলেও তাহা কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ কুকুরচর্মনির্মিত মশকের মধ্যে দুগ্ধ বা সুরাপাত্রে গঙ্গাজল রাখিলে তাহা যেমন অপেয় ও অগ্রাহ্য, সেইরূপ তন্ত্রের মধ্যে বেদের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। এই প্রকার প্রচার করিয়া সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট হিন্দুধর্মের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্মগুলির সংস্পর্শে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিরসনপূর্বক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন। এইভাবে স্মৃতিশাস্ত্রও রক্ষা পাইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে শ্রুতি-স্মৃতির পার্থক্য এবং স্মৃতিসদাচারের পার্থক্যও নিরূপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্মৃতির ক্রমোন্নতিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের স্থান কতখানি আছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তধর্মগুলির নূতন প্রচার ও প্রসারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ায় শাস্ত্রকারগণ

ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাভারত ও পুরাণগুলির মধ্যে স্মৃতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণের এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই পুরাণগুলি স্মৃতির বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মও রক্ষা পাইয়াছে। আবার তান্ত্রিকধর্মের প্রসার ও জনপ্রিয়তা হিন্দুধর্মের প্রতি নূতন উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছিল। পরে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক প্রসারে কিভাবে স্মৃতিনিবন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র ধর্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তান্ত্রিক-ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শূলপাণি ভিন্ন প্রাগ্-রঘুনন্দনযুগে কোন নিবন্ধকার কোন তন্ত্রগ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শূলপাণির পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে কিছু কিছু তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও কেহ তন্ত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন নাই। শূলপাণি তাঁহার কয়েকখানি মাত্র নিবন্ধে তন্ত্রের উল্লেখ করিলেও তাহার পরিমাণ অত্যন্ত কম। কিন্তু রঘুনন্দন সমাজের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে তন্ত্রকে পূর্ণভাবে স্বীকার না করিলে সমাজকে রক্ষা করা কঠিন। এইজন্য তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তন্ত্রকে ধর্মের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইলেন। আবার তান্ত্রিক দীক্ষাকে তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় রঘুনন্দন সমাজের অবস্থার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দিয়াই শাস্ত্রব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছেন।

রঘুনন্দন ও তাঁহার সমাজ ব্যবস্থা জানিতে হইলে দেশের তৎপূর্ব ও তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় থাকা প্রয়োজন, তাহা ব্যতীত রঘুনন্দনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তখনকার যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে রঘুনন্দনের নিবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় পালসাম্রাজ্যে রাজনৈতিক উৎসাহে বৌদ্ধধর্ম বহুল প্রচারিত হয়। কিন্তু পরে সেনরাজগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ম্লান হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বল্লালসেনের আমলে সম্ভবপর হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ-সেনের রাজত্বের শেষে তুর্কী যোদ্ধার নেতৃত্বে মুসলমানদের আক্রমণে বঙ্গদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। মুসলমানগণের ব্যাপক অত্যাচারে হিন্দুধর্ম শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। অনেকে তখন ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তখন ইলিয়াসশাহী বংশ, হুসেনশাহী বংশ ও মুঘলগণের একের পর এক অত্যাচারে

অনাচারে হিন্দুদের জীবন রক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মরক্ষা ব্যাপারে তো আরও শোচনীয় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল।

তখনকার সমাজের ও ধর্মের দুর্দশা বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বর্ণিত আছে। আবার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণ ও হিন্দুধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ আন্দোলন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট করিয়াছিল। সমাজের এই বিপর্যয়ে ব্রাহ্মণগণ তখন আবার ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্কে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে এই বিপর্যয় হইতে হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বর্ণাশ্রমধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা দেখা যায় বৃহদ্ধর্মপুরাণ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে। আর স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন সমাজের প্রয়োজনে প্রাচীন স্মৃতির মত বহুস্থানে খণ্ডনপূর্বক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিতে অগ্রণী হইয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব রচনা করেন। এইজন্য তাঁহাকে বহু নূতন ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইয়াছে, অনেকস্থানে আবার প্রাচীন মতকে খণ্ডন করিতে হইয়াছে। রঘুনন্দনের অতুলনীয় প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও যুগোপযোগী সমাজব্যবস্থায় দেশ ও ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার সমাজব্যবস্থার মধ্যে উদারতার সঙ্গে কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মহান্ ধর্মরক্ষকের নামে যদি কেহ সংকীর্ণ মনোভাবের দোষ দিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে। কারণ দেশের তখনকার অবস্থায় রঘুনন্দনের মতই একজন উদার অথচ কঠোর সমাজসংস্কারকের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। রঘুনন্দন দেশে সিদ্ধচাউল ও মসূর ডালের প্রভূত প্রচলন দেখিয়া এইগুলি খাওয়ার বিধি শাস্ত্রসম্মত ইহা প্রমাণ করিলেন। আবার দেখা যায় তিনি হিন্দুবিধবাদের আচারব্যবহারে কঠোরতাই প্রবর্তন করেন। কারণ পূর্বে এইসব বিধবাদের আচারাদি শাস্ত্রসম্মত না থাকায় সমাজে নানাপ্রকার ব্যভিচার প্রকাশ পাইতেছিল। তাহা নিরসনের জন্য তিনি একাদশীতে উপবাসাদি ও অন্যান্য আচারাদির কঠোরতা সমর্থন করেন। শয়ন, ভোজন, প্রসাধন—এইগুলির উপরেই বিধবাগণের পক্ষে কঠোর বিধির ব্যবস্থা তিনি দিয়াছেন। আবার তিনি ব্রাহ্মণগণের জাতিধর্ম রক্ষার জন্য কঠোর নীতিরও প্রবর্তন করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের শাস্ত্র-আলোচনা, তাঁহাদের সমাজব্যবস্থা, সমাজের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি, সমাজের সংস্কারকার্যে কোন্ নিবন্ধকার কতখানি সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন—এইগুলি আলোচনারও যে প্রয়োজন আছে

তাহা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। নিবন্ধযুগে দেখা যায় পাল ও বর্মনযুগে জিতেন্দ্রিয়, যোগ লোক, বালক, ভবদেবভট্ট ও জীমূতবাহন অন্যতম। সেনসাম্রাজ্যে নিবন্ধকারগণের মধ্যে অনিরুদ্ধভট্ট, বল্লালসেন ও হলায়ুধ প্রসিদ্ধ। তারপর মুসলমানযুগে শূলপাণি, বৃহস্পতিরায়মুকুট, শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন সুবিখ্যাত। ভবদেবভট্টের প্রভাব তদ্দেশীয় সামাজিক জীবনে অত্যন্ত বেশী বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাঁহার সেই প্রভাব অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ আমরা দেখি ভবদেবভট্ট-নির্দেশিত রীতি অনুসারে এখনও সামবেদিগণের দশসংস্কার যথা—অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরবর্তী নিবন্ধকার জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশ যুগে হিন্দু-ল' এর অনেকখানি অংশ প্রণীত হইয়াছে। দায়ভাগ গ্রন্থ রচিত হইবার পরই এই মত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। দায়ভাগের নূতন মত প্রচলিত হওয়ায় বাঙ্গালীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

সেনযুগে দেখা যায় সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন করিয়া রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। সেনরাজগণের আমলে সমাজরক্ষণমূলক গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল। কারণ অনিরুদ্ধভট্টের গ্রন্থ-আলোচনায় দেখা যায় সমাজরক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহারই শিক্ষায় ও আদর্শে শিক্ষিত হইয়া বল্লালসেন সমাজসংস্কারক হিসাবে খ্যাত হইয়াছেন। বল্লালসেন বেদবিরুদ্ধধর্মের প্রভাব হইতে সমাজরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়া জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ তখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতির বংশাবলী চারিদিকে এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজে সামাজিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। এইজন্যই বল্লালসেন সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। পরবর্তী নিবন্ধকার হলায়ুধ বেদরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি দেখিলেন পালসাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বল্লালসেনের চেষ্টায় তাহা নিষ্প্রভ হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ধর্ম তখনও জাগরূক; আবার একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষ প্রায়ই লাগিয়া থাকে। সুতরাং হলায়ুধ বুঝিলেন একমাত্র বেদ-অধ্যয়ন ও তাহার সম্যক্ অর্থবোধ করিতে পারিলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ধর্মীয়

প্রভাব হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে।

মুসলমানযুগে বৈদেশিক আক্রমণে ও অত্যাচারে বিধ্বস্ত সমাজে কোন্‌টি ব্রাহ্মণ্য আচার, কোন্‌টি বিরুদ্ধ আচার তাহা নির্ণয় করিতেও জনগণ অপারগ হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য-আচারকে জনসমাজে প্রকাশিত করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শূলপাণি, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন। এই নিবন্ধকারগণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ অপেক্ষা সমাজরক্ষার প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। শূলপাণি স্পষ্টভাবে গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন যে শাস্ত্রজগতে বিভিন্নমুনির বিভিন্নমত প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃত বিষয়সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিরসনের জন্যই তিনি এই নিবন্ধগুলি রচনা করেন। কিন্তু শূলপাণির নিবন্ধ সমাজে বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। পরে হিন্দুরাজা গণেশের পুত্র বঙ্গের অধিপতি জালালুদ্দিন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াও সংস্কৃত বিদ্যা ও ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বৃহস্পতিরায়মুকুট স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। তারপর আবির্ভূত হন স্মার্তভট্টাচার্যের গুরু শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁহার গ্রন্থগুলিতে কীর্তিত হইয়া আছে। তাঁহারই জ্ঞান, শিক্ষা ও উৎসাহে রঘুনন্দন শাস্ত্রজগতে বিখ্যাত হইয়া আছেন। শ্রীনাথ যে তৎকালীন সমাজের উপযোগী শাস্ত্র রচনায় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকীয় উক্তিতেই পাওয়া যায়। শাস্ত্রজগতের সন্দেহ, জড়তা, অন্ধকার ইত্যাদি নিরসনের জন্যই তিনি নিবন্ধরচনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আবার তাঁহার উক্তিতেই আছে—তিনি যে কেবল স্বয়ং সমাজের গড্ডরিকাপ্রবাহ বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাই নহে, অপর সকলকেও এই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব দেখা যায় শ্রীনাথের একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল সঠিক ব্রাহ্মণ্য আচার নির্ণয় করিয়া সমাজে ও ধর্মে শান্তি স্থাপন করা। এইজন্য তিনি বলেন যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণ্য আচার ও কোন্‌টি বিরুদ্ধ আচার তাহা প্রমাণ দ্বারাই গ্রহণীয় হইবে। তবে বৃহস্পতির বচন আলোচনাপূর্বক তিনি দেখাইয়াছেন যে কতকগুলি দেশজ আচার বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই। অবশ্য তিনি হিন্দুদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে নূতন ও পরিবর্তিত অনেক আচার সংযোজিত করিয়াছেন।

শ্রীনাথ সমাজরক্ষার গুরু দায়িত্ব পালনে অত্যধিক যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শ্রীনাথকে সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। এই বিস্মরণের প্রধানতম কারণ হইতেছে ধর্মশাস্ত্র-জগতে উজ্জ্বলতম রত্ন রঘুনন্দনের আবির্ভাব। শ্রীনাথেরই

দৃষ্টিভঙ্গীতে
শ্রীনাথের
তাঁহার কো
একমাত্র প্র
লইয়াছেন।
স্মৃতিশা
ছিল। মীম
পরিচয় পা
তিনি সমাজ
রঘুনন্দন
পণ্ডিতবর্গের
রঘুনন্দনের
আবার কেহ
কোন উদ্ধৃ
প্রমাণ পাই
স্বকীয় তত্ত্ব
এসিয়াটিক্‌
কৌমুদীগ্রন্থের
কৌমুদী গ্রন্থ
রঘুনন্দনের
অনেকে মনে
বিরচিত, গো
হইয়াছে। এই
আবার রঘুন
আলোচিত হই

রঘুনন্দনের
প্রায়শ্চিত্ত। আ
সংস্কারপ্রসঙ্গে

সমাজে কোন্‌টি
জনগণ অপারগ
প্রকাশিত করিতে
ই নিবন্ধকারগণ
ছেন। শূলপাণি
তে বিভিন্নমুনির
হইয়াছিল তাহা
র নিবন্ধ সমাজে
শের পুত্র বঙ্গের
ও ব্রাহ্মণগণের
মুকুট স্মৃতিনিবন্ধ
থাচার্যচূড়ামণি।
তাঁহারই জ্ঞান,
। শ্রীনাথ যে
তাঁহার স্বকীয়
গ্যাদি নিরসনের
হার উক্তিতেই
করিতে চেষ্টা
হইতে নির্দেশ
ব্রাহ্মণ্য আচার
লন যে কোন্‌টি
গ্রহণীয় হইবে।
তকগুলি দেশজ্ঞ
তিনি হিন্দুদের
র সংযোজিত

হইয়াছিলেন।
ণের প্রধানতম
। শ্রীনাথেরই

দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং শিক্ষাদীক্ষায় রঘুনন্দন শাস্ত্রজগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীনাথের পর গোবিন্দানন্দ অনেকগুলি নিবন্ধ রচনা করিলেও সমাজের প্রতি তাঁহার কোন দৃষ্টিই ছিল না। উপরন্তু গোবিন্দানন্দ শ্রীনাথকে শাস্ত্রজগতে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া শ্রীনাথের মতখণ্ডনের দিকেই অত্যধিক যত্ন লইয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। মীমাংসা, জ্যোতিষ, ন্যায়, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই অতুলনীয় প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য দ্বারা তিনি সমাজকে সার্থকভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তবে তাঁহার কালসম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বরাবরই একটা বিতর্ক রহিয়াছে যে গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দনের মধ্যে কে পূর্ববর্তী নিবন্ধকার। কেহ বলেন রঘুনন্দন পূর্ববর্তী, আবার কেহ বলেন গোবিন্দানন্দ পূর্ববর্তী হইলেও রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থ হইতে কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ পাইয়াছি যে গোবিন্দানন্দের ক্রিয়াকৌমুদী গ্রন্থ হইতে রঘুনন্দন স্বকীয় তত্ত্বগুলিতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ক্রিয়াকৌমুদী গ্রন্থ এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে এবং তাহার সহিত রঘুনন্দনধৃত ক্রিয়া-কৌমুদীগ্রন্থের বচনগুলির হুবহু মিল আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই ক্রিয়া-কৌমুদী গ্রন্থ যে গোবিন্দানন্দেরই রচিত তাহার প্রমাণও আছে। আবার রঘুনন্দনের উল্লিখিত বর্ষকৃত্য গ্রন্থই গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহাও ঠিক নহে। কারণ বর্ষকৃত্য গ্রন্থ বাচস্পতিমিশ্র-বিরচিত, গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী নহে, তাহাও এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। এই বিষয়গুলি পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে আবার রঘুনন্দনের ২৮ খানি তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌ তত্ত্বে কি বিষয় আছে, তাহা আলোচিত হইয়াছে এবং তত্ত্বগুলির পৌর্বাপর্যও নিরূপণ করা হইয়াছে।

রঘুনন্দন ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থা

রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। আচারমূলক তত্ত্বগুলি বিস্তারিতভাবে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

সংস্কারপ্রসঙ্গে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, ইহার সংখ্যা, বর্তমানে প্রচলিত

সংস্কার ইত্যাদি আলোচনা করার পর ভবদেবের সংস্কারকর্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে রঘুনন্দনের সংস্কারের পার্থক্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। ভবদেব-নির্দেশিত সংস্কারের পরিবর্তন না করিলেও রঘুনন্দন অঙ্গকর্মে কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন মাত্র। আবার বর্তমানকালে কতকগুলি আচার প্রচলিত না থাকার দরুণ রঘুনন্দনও তাহা উল্লেখ করেন নাই। যেমন—বর কর্তৃক বধূকে বস্ত্রান্তর পরিধাপন, কন্যাভিষেকরূপ জ্ঞাতিকর্ম প্রভৃতি। ইহার পর দশ সংস্কার আলোচিত হইয়াছে।

উদ্বাহসম্পর্কে রঘুনন্দন প্রথমে বিবাহের লক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্যান্য নিবন্ধকার অপেক্ষা রঘুনন্দনের মতই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। কারণ তিনি বাস্তব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়া দেখাইয়াছেন যে ভার্যাত্বসম্পাদনই বিবাহের প্রকৃত ব্যাপার। সুতরাং ইহার উপরই রঘুনন্দন জোর দিয়াছেন। আবার সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তিনি পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারগণের মতানুসরণে কতকগুলি রীতি প্রচলিত করিয়াছেন যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার সেইরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবে না, তবে এইরূপ কঠোরতাই যে কেবল তাঁহার রচনায় দেখা যায় তাহা নহে, বাস্তব বুদ্ধিদীপ্ত উদারমতও প্রচলিত আছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্ত, পতিত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ইত্যাদি হইলে পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহে দোষ হয় না। অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ তিনি অনুমোদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মতে নির্গুণ পাত্রের হস্তে কন্যাদান অপেক্ষা চিরকাল অবিবাহিতাবস্থায় তাঁহাকে পিতার গৃহে রাখিলেও দোষ হইবে না। কন্যার স্বয়ং পতি-নির্বাচনেও তিনি অনুমতি দিয়াছেন। কন্যা-শুল্ক গ্রহণের কথা বলিয়া কন্যার শ্বশুরের নিকট হইতে ধন-গ্রহণকে তিনি সাত্ত্বিকধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সপিণ্ডতা বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

আচার, ব্রত, পূজা কৃত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে রঘুনন্দন স্বকীয় প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যের গুণে কোন কোন স্থানে স্বীয় অধ্যাপকের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আবার কোথায়ও বা স্বসিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতে অধ্যাপকের মত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপকের মতখণ্ডন ব্যাপারে কখনও রঘুনন্দন 'গুরুচরণাঃ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করেন নাই। জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গেও রঘুনন্দন শ্রীনাথের মত ও মৈথিলনিবন্ধকারগণের মতের খণ্ডন অত্যন্ত যত্নসহকারে করিয়াছেন। আবার জীমূতবাহনের

অনুষ্ঠানের সঙ্গে
বদেব-নির্দেশিত
কিছু পরিবর্তন
লিত না থাকার
বধূকে বস্ত্রান্তর
্যায় আলোচিত

করিয়াছেন।
কারণ তিনি
বিবাহের প্রকৃত
াবার সমাজের
তকগুলি রীতি
বিবাহ নিষিদ্ধ।
বিবাহ হইবে
া যায় তাহা
উন্মত্ত, পতিত
য হয় না।
ু তাঁহার মতে
্যায় তাঁহাকে
তিনি অনুমতি
হইতে ধন-
ড়া সপিণ্ডতা

ঘুনন্দন স্বকীয়
কর মত খণ্ডন
র মত প্রমাণ
নও রঘুনন্দন
র অধ্যাপকের
মৈথিলনিবন্ধ-
জীমূতবাহনের

মতও তিনি স্থানে স্থানে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মত খণ্ডন পূর্বক প্রকৃত বিষয় নির্দেশ করিবার এই যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহা তখনকার বিশৃঙ্খল সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। নিবন্ধকারগণের মধ্যে একমাত্র রঘুনন্দনই সমাজব্যবস্থায় প্রকৃত শাস্ত্রীয় নির্দেশ জনগণের নিকট সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তখনকার সমাজের সেই অবস্থায় এইরূপ দিগ্‌দর্শনের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী ছিল। দুর্গা-পূজাপ্রসঙ্গে অষ্টমীতে উপবাস ও পারণ সম্পর্কে বিরুদ্ধমতখণ্ডনে রঘুনন্দনের মত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আবার দুর্গাপূজায় দক্ষিণাদান সম্পর্কে রঘুনন্দন বলেন যে ইহা নবমীতেই কর্তব্য। তবে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মতে দেবী বিসর্জনের পর যে দক্ষিণাপ্রদানের কথা বলা হইয়াছে তাহা রঘুনন্দনের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। রঘুনন্দন এই যে নবমীতে দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা এখনও সমাজে প্রচলিত আছে। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের গ্রন্থগুলিতে শাবরোৎসবের নামে অশ্লীল আচার আচরণের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু রঘুনন্দন সমাজের এইরূপ আচরণকে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহার আলোচনা করেন নাই। এইজন্য সমাজে এখন তাহা প্রচলিত নাই বলিলেও চলে।

আবার দেখা যায় বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন কৃত্যসম্বন্ধে রঘুনন্দন যে মত দিয়াছেন তাহাই সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ ভিন্নমত প্রচার করিলেও তাহা সমাজ গ্রহণ করে নাই, এমনকি রঘুনন্দনের অধ্যাপকের মতও সমাজে চলে নাই। যেমন দেখি দশহরায় গঙ্গায় স্নানই বিধেয়, অন্য নিবন্ধকারগণের মতে নদীমাত্রে স্নানই বিধেয়। আবার ভীষ্মতর্পণে রঘুনন্দন শূদ্রদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ইহাতে চারিবর্ণেরই অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ শুধুমাত্র দ্বিজাতির অধিকার স্বীকার করেন। ইহাতে রঘুনন্দন শূদ্রদের অধিকার স্বীকার করিলেও শ্রাদ্ধ, পঞ্চযজ্ঞ, স্নান প্রভৃতিতে শূদ্রদের মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনাথ শ্রাদ্ধে শূদ্রদের মন্ত্রপাঠে অধিকার স্বীকার করিলেও রঘুনন্দন তাহা স্বীকার করেন নাই বলিয়া সমাজেও তাহা প্রচলিত হয় নাই। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে অশৌচ থাকিলেও কেবলমাত্র স্নান বিধেয় বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়া রঘুনন্দন দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দানন্দ স্নান, দান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতেও অধিকার দিয়াছেন। অবশ্য সেই মত সমাজ গ্রহণ করে নাই।

ইহার পর তিথি সম্বন্ধে আলোচনাকালে মলমাসপ্রসঙ্গে রঘুনন্দন শূলপাণি ও

শ্রীনাথের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয়মত দৃঢ় করিয়াছেন। আবার চান্দ্রমাসেই শক্তি বলিয়া রঘুনন্দন প্রতিপাদন করেন। কিন্তু জীমূতবাহন যে সৌরমাসে শক্তি নিরূপণ করেন তাহা রঘুনন্দনের মতে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সংস্কারকর্ম ও অন্যান্য মঙ্গলজনক কর্মের পূর্বে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ, অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্ত শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে রঘুনন্দন যে কিভাবে মৈথিলমত ও পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন তাহা আলোচিত হইয়াছে। সর্বস্থানেই রঘুনন্দনের প্রাধান্য এবং এইরূপ প্রকৃতবিষয়ে দিগ্‌দর্শনের ফলে সমাজের বিভিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা পাইয়াছে।

অশৌচপ্রসঙ্গে প্রথমেই স্ত্রী-অশৌচ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কারণ সমাজের একটি প্রধান অঙ্গ নারী। নারীর পদস্খলন হইলে সামাজিক কাঠামোও দুর্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য পূর্বযুগে যেসব ব্যভিচারিতা সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা রোধ করিতে রঘুনন্দন সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত বিপথগামিনী নারীদের কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা শাস্তি বিধান তিনি করিয়াছেন। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের রচনা হইতে জানা যায় যে পূর্বে সমাজে স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ আচার ব্যবহারও ততটা নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন সমাজের সংস্কার করিতে আসিয়া বুঝিলেন স্ত্রীপুরুষের চরিত্রগত দোষ থাকিলে সমাজকে রক্ষা করা সুকঠিন। এইজন্য তিনি পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের আলোচিত এই সমস্ত ব্যভিচার সম্বন্ধে কোনও মতামত বা কোন আলোচনাই করেন নাই।

আবার রঘুনন্দন প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—পূর্বে যে সহমরণ প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা অনুসৃত না হইলেও দোষ হয় না। তাঁহার শাস্ত্র আলোচনায় সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্যই যেন মুখ্যকল্পরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তবে ব্রহ্মচর্য অনুমোদন করিলেও সমাজে যাহাতে কোন ব্যভিচারিতা প্রকাশ না পায় তাহার জন্য তিনি বিধবাগণের আহার-বিহার, চলা-ফেরা, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কঠোরতা প্রবর্তন করিয়াছেন। কারণ রঘুনন্দন বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার সমাজে মুসলমানগণের অত্যাচারে ও অনাচারে এবং দেশের ধর্মীয় প্রভাবে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছিল তাহাতে আবার তাঁহারই অনুমোদিত সহমরণ প্রথা রদ করায় বিধবাগণের সম্পর্কে নূতন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাহা প্রতিরোধ করিতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রঘুনন্দন এই কঠোরতার ব্যবস্থা দিয়াছেন। পূর্বাপর-জ্ঞানশূন্য কোন ব্যক্তি যদি এইজন্য রঘুনন্দনকে

কঠোর শাস্ত্রব্যবস্থাপক বলিয়া অভিযুক্ত করেন তবে তাহা সেই অদূরদর্শী ব্যক্তিরই বিচারশক্তিহীনতার পরিচয় প্রকাশ করিবে, সন্দেহ নাই।

রঘুনন্দনের শাস্ত্র-আলোচনায় নূতনত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ তৎপূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ সবাই গতানুগতিকভাবে শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ করেন নাই। যেমন—কলিযুগে ঔরসপুত্র ও দত্তকপুত্র ভিন্ন অপর প্রকার পুত্র সমাজে প্রচলিত নাই। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ সকলেই পুত্রিকাপুত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন এই বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই। অতএব বুঝা যায় সমাজরক্ষার প্রতিই তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি ছিল, এইজন্য অবান্তর বিষয় তাঁহার নিবন্ধে স্থান পায় নাই। প্রেতক্রিয়ায় অধিকারী নিরূপণেও রঘুনন্দন স্বীয় বিশেষ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবার পিণ্ডদান-কারীর মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম পূরকপিণ্ড দান করিবে, সেই পরবর্তী দশপিণ্ড দানের অধিকারী। ঐ পিণ্ডদানের প্রকৃত অধিকারী যদি উপস্থিত না থাকে এবং পরে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আর পরে পিণ্ডদান করিবে না। কিন্তু অন্যান্য নিবন্ধকারগণের মতে প্রকৃত অধিকারী পরে আগমন করিলেও সে পুনরায় পিণ্ডদান করিবে। ইহাদিগকে দোপিণ্ডা বলে। উহা ফরিদপুরস্থ কোটালীপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্যবহারপ্রসঙ্গে ব্যবহারের লক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবহার শব্দটি পারিভাষিক। এই ব্যবহার শব্দ দ্বারা বিচারপদ্ধতি, দায়, অধিকার, স্ত্রীধন, ঋণাদান প্রভৃতি বুঝাইয়াছে। তবে বিচারপদ্ধতিতে পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের সহিত রঘুনন্দনের মতের কোন বিরোধ নাই। রঘুনন্দন এই বিষয় কোন নূতন মত প্রচার করেন নাই। এইজন্য এই গ্রন্থে এ বিষয় বিশেষ আলোচিত হয় নাই। রঘুনন্দনের ব্যবহারবিষয় জীমূতবাহনের ব্যবহারমাতৃকার আলোচনারই অনুরূপ।

তবে দায় সম্বন্ধে রঘুনন্দনের মতের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি জীমূতবাহনের মতানুসারে উপরমস্বত্ববাদ স্বীকার করিলেও দায়ভাগ নির্দেশিত প্রাদেশিকস্বত্ব স্বীকার করেন নাই। জীমূতবাহনের দায়ভাগ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই উহা সমস্ত বঙ্গদেশে, আসামে ও নেপালের কিয়দংশে প্রচলিত হইয়াছে। এই মত অনুসারেই দায়, অধিকার ইত্যাদি এখনও নিরূপিত হইয়া আসিতেছে। রঘুনন্দন মিতাক্ষরার মতানুযায়ী জন্মস্বত্ববাদ স্বীকার করেন নাই। এই মতখণ্ডনে প্রয়াসী হইয়া তিনি বলেন—জন্ম স্বত্বের কারণ নহে, ইহা সম্বন্ধের হেতু। সেই সম্বন্ধই পূর্বস্বামীর মরণ প্রভৃতির জন্য স্বত্বের নাশকালে স্বত্বের হেতু হইয়া থাকে। আর প্রাদেশিকস্বত্বও

তিনি নিরসন করিয়াছেন। স্ত্রীধন প্রসঙ্গে দায়ভাগের মত তিনি গ্রহণ করিলেও তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেমন—সাধারণ স্ত্রীধনে দৌহিত্রের অধিকারের পরে মৃতা ধনস্বামিনীর পিণ্ডদানরূপ উপকার করে বলিয়া প্রপৌত্রের অধিকার তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু জীমূতবাহন তাহা স্বীকার করেন নাই। এইরূপ কিছু কিছু মতপার্থক্য রঘুনন্দনের দায়তত্ত্বেও জীমূতবাহনের দায়ভাগের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বঙ্গদেশে কেবলমাত্র জীমূতবাহনের দায়ভাগকৃত মতই নহে, রঘুনন্দনের দায়তত্ত্বোক্ত মত, টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মত ও দায়ভাগমত—এইগুলির সংমিশ্রণে অভিনব মত সমাজে প্রচলিত আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রঘুনন্দন জ্ঞানকৃত পাপী ব্যক্তির ব্যবহার্যতা সমাজে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কারণ তখন দেশে যবনদের অত্যাচারে ও তান্ত্রিক-ধর্মের ব্যাপক প্রসারে স্বেচ্ছাচারিতা চলিতেছিল। উচ্চ ও নীচবর্ণের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাদের প্রভাবে সমাজে ন্যায়নীতি কিছু ছিল না বলিলেই চলে। এইগুলির সম্যক্ প্রতিরোধ করিতেই রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন যে জ্ঞানকৃত ব্যভিচার করিলে সেই ব্যক্তির গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। শুধু তাহাই নহে সমাজে লোকেরা অত্যন্ত হীনচক্ষে দেখিয়া তাহাকে 'একঘরে' করিয়া রাখিবে এবং কেহ তাহার সহিত মেলামেশা করিবে না। সামাজিক এই কঠোর শাস্তির ভয়ে কেহ বিপথে যাইতে সাহসী হইবে না—এই অভিপ্রায় লইয়াই রঘুনন্দন ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তখনকার সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রঘুনন্দন এইজন্যই সমাজকে রক্ষা করিতে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। আবার যদি বলপূর্বক স্ত্রী বা পুরুষকে ব্যভিচার বা দাসত্বে পরিণত করান হয়, তাহার পক্ষে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই শুদ্ধির বিধান করিয়া তিনি সমাজে সকলের সঙ্গেই আচারব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ তখন যবনরা জোর করিয়া বহু স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া তাহাদের সহিত পুরুষসংসর্গ করাইতে বাধ্য করায় সেইসব স্ত্রীলোক হিন্দুধর্ম হইতে পতিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের উদ্ধার করিয়া অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে একমাত্র রঘুনন্দনই নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা তাঁহার উদারদৃষ্টির সম্যক্ পরিচয় বহন করে।

আবার দেখা যায় অন্য নিবন্ধকারগণ ব্রাহ্মণের চারিবর্ণ হইতে স্ত্রীগ্রহণ ও সেই বিবাহের বৈধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু রঘুনন্দন এই অসবর্ণ বিবাহ এখনকার দিনে অচল বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। আর জীমূতবাহন

শূদ্রা স্ত্রীকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া অপর কর্তৃক বিবাহিতা হইলে তাহার সহিত ব্রাহ্মণের ব্যভিচার পর্যন্ত অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু এই রীতি অত্যন্ত গর্হিত ও সভ্য সমাজে কিছুতেই চলিতে পারে না বলিয়া তাহাও রঘুনন্দন বর্জন করিয়াছেন।

তারপর বঙ্গদেশে তখন বৈদেশিক ও অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিদের অনাচারে ব্রাহ্মণ-জাতির ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এইজন্য রঘুনন্দন চণ্ডাল, অন্ত্যজ, শূদ্র প্রভৃতির সঙ্গে একত্র পানভোজন ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধের কঠোরতা প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুরাপান সম্বন্ধেও রঘুনন্দন ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখে প্রবেশ-মাত্রই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আবার এই সুরাপান মহাপাতক হইলেও রোগীর প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে সুরাযুক্ত ঔষধও রোগীর পক্ষে সেবনীয় এবং রোগ নিরাময়ের পর অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা রঘুনন্দন দিয়াছেন। রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য নিষিদ্ধ ভক্ষণ, নিষিদ্ধ দেশে গমন প্রভৃতিতেও তিনি অনুমতি দিয়াছেন। অসমর্থ রোগীর একাকী বিদেশে গমন সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহার সহিত পিতা, ভ্রাতা, পত্নী বা পুত্র প্রভৃতির নিষিদ্ধ দেশে গমন ও ম্লেচ্ছ দেশে অন্নগ্রহণের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থাও তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা রঘুনন্দন সমাজরক্ষার জন্যই অনুমোদন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে প্রভুত মৎস্যের প্রচলন দেখিয়া ও বিভিন্ন ধর্মীয়প্রভাবে মাংস ভক্ষণের ব্যবহার দেখিয়া রঘুনন্দন এইগুলি সকলের পক্ষেই ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে শাস্ত্রীয় বিধি প্রবর্তন করিয়াছেন। পূর্বেকার নিবন্ধকারগণের মধ্যে একমাত্র ভবদেবভট্ট ইচ্ছামত মৎস্যমাংস ভক্ষণে শাস্ত্রীয় বিধি দিলেও পরবর্তী নিবন্ধকার শূলপাণি ইহাতে দোষ দিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন সমাজের প্রয়োজনে ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

অতএব দেখা যায় রঘুনন্দন যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা সব সময় সমাজ রক্ষার জন্যই করিয়াছেন। এইরূপ সমাজের সংস্কার করিয়া সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই রঘুনন্দন সমাজসংস্কারকরূপে শাস্ত্রজগতে বিখ্যাত হইয়া আছেন। তাঁহার অমরকীর্তি অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের বিশদ আলোচনায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্. এ., পি. আর্. এস্., পি-এইচ্. ডি. মহাশয়ের সস্নেহ উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থ আমি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

—বাণী চক্রবর্তী

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেদ ও স্মৃতি

সমস্ত বেদ ধর্মের মূল। পূর্বযুগে ঋষিগণ সম্যগ্‌রূপে বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং বেদের সমগ্র অনুশাসনগুলি সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তখন বেদ-পাঠ দ্বিজাতিগণেরও অবশ্য কর্তব্যকর্মরূপে নির্ধারিত ছিল। অকরণে প্রত্যবায় হইত অর্থাৎ কেহ এই বিষয়ে অবহেলা করিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। বেদ অপৌরুষেয়[১], অতএব ইহা মনুষ্যজনোচিত ভ্রমপ্রমাদ ইত্যাদি হইতে মুক্ত। গুরু-শিষ্যের অধ্যয়ন-পরম্পরায় ইহা বর্তমান ছিল। গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শিষ্য ইহা

---

(১) 'তথাচ সর্গাদ্যকালে পরমেশ্বরঃ পূর্বসর্গসিদ্ধবেদানুপূর্বিকবেদং বিরচিতবান্, ন তু তদ্বিজাতীয়ং বেদমিতি ন সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণবিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্বং বেদস্য।' [বেদান্তপরিভাষা, পৃঃ ১০২]

অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পের প্রারম্ভে পরমেশ্বর বেদ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব পূর্ব কল্পেও যে বেদ যেভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, পরকল্পেও সেইভাবে সেই বেদ উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্বতন্ত্র কোন পুরুষের কর্তৃত্ব নাই। সৃষ্টির আদিতে বেদ যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, মহাপ্রলয়ে তাহা ধ্বংস হইয়া গেলেও পরসৃষ্টিতে আবার সেইরূপেই বেদপ্রবাহ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়া একই ছন্দে প্রবাহিত হইয়া আছে এবং অনন্তকাল তাহা চলিবে. কিন্তু মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সাধারণ পুরুষের রচিত বলিয়া রচয়িতার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহাতে আছে। রচয়িতা ইচ্ছা করিলে ইহার অদলবদল করিয়া বাক্য সংগঠন করিতে পারেন। আবার এইগুলি স্বজাতীয় কোন উচ্চারণের অপেক্ষা না করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা পৌরুষেয়। এইগুলি স্বতন্ত্র পুরুষের কর্তৃত্বে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বেদে একটি মন্ত্র বা একটি অক্ষরের পরিবর্তন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বৈদিক সম্প্রদায়ের যাহাতে উচ্ছেদ না হয় সেইজন্য ইহার পরিবর্তন হয় না। সৃষ্টি ও প্রলয়ের আবর্তন ও বিবর্তনেও বেদের নিত্য অপরিবর্তনীয়তা বিরাজ করে। এইজন্যই পরমেশ্বরকে বেদরচনায় অস্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। পুরুষের স্বতন্ত্রকর্তৃত্বের অভাবই 'অপৌরুষেয়' শব্দ দ্বারা সূচিত হয়।

যথা—'পুরুষাস্বতন্ত্র্যমাত্রং চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি।' [ভামতী ১।১।৩, পৃঃ ৯৯]

মীমাংসকগণও এইজন্যই বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলেন। মীমাংসকদিগের মতে বৈদিকবর্ণ নিত্য, তাহার অর্থও নিত্য; সুতরাং বর্ণময় বেদও নিত্য। কোনও বক্তা স্বতন্ত্রভাবে ক্রমবিন্যাস করিয়া কোনও বৈদিক শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন না। ঋষিগণ গুরুশিষ্য পরম্পরায় যেভাবে বেদ পড়িয়াছেন, সেই ভাবেই শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন। একটি মন্ত্রের বা একটি অক্ষরেরও পরিবর্তন তাঁহারা করিতে পারেন না। এই স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই বলিয়াই বেদ অপৌরুষেয়। আবার বৈদিক পদগুলিতে

অধিগত করিতেন। তখন গুরু-শিষ্যের এই শ্রবণ-পরম্পরায়[২] বেদ সর্বদা জাগরূক ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনে শিষ্যগণের শ্রবণ ও মননশক্তির ব্যতিক্রম দেখা দিতে লাগিল। ইহাতে বেদের বহু শাখা-উপশাখা স্বাভাবিক ভাবেই নষ্ট হইতে থাকায় বেদের অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তখনই হইল স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তি[৩], বেদের অনুশাসনাবলী সম্যগ্‌রূপে রক্ষা করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া স্মরণে রাখিবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলেই বিশাল স্মৃতিশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদের অসংখ্য শাখা-উপশাখা আছে। এক ঋগ্‌বেদেরই অনেক শাখা আছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা বেদশাখা হইতে আমাদের অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি আমরা জানিতে পারি। যে সকল বিধিব্যবস্থা বেদের বহু শাখায় ছড়াইয়া আছে, তাহাদের সঙ্কলনেই স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তি।

স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তি

স্মৃতি শব্দের অর্থ স্মরণ—স্মরণ পূর্বজ্ঞানসাপেক্ষ। স্মরণ অনুভব ব্যতীত জন্মিতে পারে না। সুতরাং স্মরণের মূলে থাকে অনুভবাত্মক আর একটি জ্ঞান কারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে বিষয়টি পূর্বে অনুভূত

বর্ণসকলের যে ক্রম পরিলক্ষিত হয় তাহাতে কাহারও স্বতন্ত্রতা নাই বলিয়া কেহ তাহার কর্তা নহে, কিন্তু সকলেই ব্যবহর্তা মাত্র। এইজন্যই বার্তিককার কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন—

'যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা।'

[শ্লোকবার্তিক, ৬ষ্ঠ অধিকরণ, শ্লোকসংখ্যা ২৯০, পৃঃ ৮০২]

মীমাংসকগণ সৃষ্টি ও প্রলয় মানেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। গুরুশিষ্য পরম্পরায় অধ্যয়নকে মীমাংসকগণ অনাদি ও নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন। বেদপ্রবাহ এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া বেদের প্রবাহনিত্যতা মীমাংসামতে বর্তমান থাকে।

(২) 'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ঃ।' [মনু ২। ১০]

গুরুশিষ্যের শ্রবণ পরম্পরায় বেদ সর্বদা অবস্থান করিত বলিয়া বেদকে 'শ্রুতি' নামেও অভিহিত করা হয়।

(৩) স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন বৃহস্পতির বচন উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ছয় মাসের মধ্যেই লোকের পূর্বকথা মনে থাকে না বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা অতি পূর্বকালে লেখার রীতি প্রচলিত হইবার জন্য পত্রমধ্যে প্রত্যেক বর্ণের আকৃতি কল্পনা করিয়াছিলেন। যথা বৃহস্পতি—

"ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে নৃণাম্।

ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।"

[আহ্নিকতত্ত্ব, পৃঃ ১২৮, জ্যোতিস্তত্ত্ব, পৃঃ ২৩২]

হইয়াছে তাহার স্মরণ হয় বলিয়া স্মরণ ঐ পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলা হইয়া থাকে।

যখন কোন জ্ঞান জন্মে, তখন ঐ জ্ঞান সংস্কাররূপে[৪] আত্মায় বর্তমান থাকে। স্মরণ হইতেই হয় স্মৃতি। বেদও আর্য ঋষিগণের অন্তরে সংস্কাররূপে বিরাজিত ছিল। স্মরণ দ্বারা বেদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষিগণ বেদের মূল পাঠ লিপিবদ্ধ না করিলেও বেদার্থ নিবদ্ধ করিয়াই স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

এই স্মৃতিশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যের কোন আশঙ্কা নাই। কারণ স্মৃতি অর্থাৎ বেদার্থবিষয়ক স্মরণের[৫] মূলে আছে বেদ।[৬] বেদ ভ্রম বা প্রতারণাবুদ্ধিরহিত—ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। স্মৃতি বা বেদার্থস্মরণের মূলে বৈদিক অনুভূতি থাকায় সমস্ত স্মৃতিবচনের মূলেই বেদ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

বেদ ও স্মৃতির সম্পর্ক

স্মৃতি হইতেছে শ্রুতিমূলক। কিন্তু যে স্থলে স্মৃতির মূল আপাতঃ দৃষ্টিতে বেদবচনে পাওয়া যায় না, সেস্থলে বেদবচনের অনস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রসঙ্গ ওঠে না। বেদ যে চিরসত্য সনাতন—ইহা কুমারিলভট্ট[৭] প্রভৃতি আচার্যগণ নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া সুপ্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—বেদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; এইরূপ বলা উচিত নহে। কারণ সম্যক্ অনুসন্ধান করিলে স্মৃতিবচনসমূহের মূলগত শ্রুতিবাক্যসমূহও দুর্লভ নহে। আবার

(৪) 'সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ'। [তর্কসংগ্রহ, পৃঃ ৩২]

(৫) 'বেদার্থস্মরণজন্যং ধর্মশাস্ত্রম্।' [শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকৃত বিবেকার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৪ (ক)]

(৬) তত্রাপি পূর্বজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ স্মরণস্য ভ্রান্তিবিপ্রলম্ভাদীনাং মহাজনপরিগ্রহাদিনা নিরস্তত্বা-দতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনস্যাশক্যভাবাচ্চ পুরুষস্য চ স্বানুভবসিদ্ধে বেদার্থস্মরণস্য বেদমূলতা প্রবাবশিষ্যতে।

[মেধাতিথিভাষ্য (মনু ২।১০), পৃঃ ৫৩]

(৭) শিষ্টত্রৈবর্ণিকদৃঢ়স্মরণান্যথানুপপত্তিলভ্যত্বাচ্চ্ তানুমানস্য।

যদ্বা বিদ্যমানশাখাগতশ্রুতিমূলত্বমেবাস্তু। কথমনুপলব্ধিরিতি চেদুচ্যতে—

শাখানাং বিপ্রকীর্ণত্বাৎ পুরুষাণাং প্রমাদতঃ।
নানাপ্রকরণস্থত্বাৎ স্মৃতে মূ'লং ন দৃশ্যতে ॥

যত্তু কিমর্থং বেদবাক্যান্যেব নোপসংগৃহীতানীতি, সম্প্রদায়বিনাশভীতেঃ।

বিশিষ্টানুপূর্বাব্যবস্থিতো হি স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ শ্রূয়তে।
স্মার্তাশ্চাচারাঃ কেচিৎ কচিৎ কস্যাংশ্চিচ্ছাখায়াম্ ॥

[তন্ত্রবার্তিক ১।৩, (জৈঃ সূঃ ২), পৃঃ ৭৫-৭৬]

শ্রুতিবাক্য থাকিলে স্মৃতিবচন নিরর্থক—ইহা বলাও সমীচীন নহে। কারণ বেদের এক-একটি শাখা এক-একটি গুরু-শিষ্যের সম্প্রদায় মধ্যে আবদ্ধ। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় সেই সেই সম্প্রদায়ে সেই সেই শাখা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করে। আবার এক বেদ-শাখার সহিত অপর বেদশাখার অনেক পার্থক্য আছে। এইজন্য নিজের শাখার ন্যায় অন্য শাখায় যদি আস্থা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সেই গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়েরও বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইজন্য এক সম্প্রদায় মধ্যে অনেক বেদশাখা গ্রহণের রীতি নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে অন্য শাখাস্থিত সর্বসাধারণের অবশ্য অনুষ্ঠানযোগ্য কর্মগুলি কখনই উপেক্ষার যোগ্য নহে। এইজন্যই মন্বাদি মহর্ষিগণ বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিপ্রকীর্ণ সর্বসাধারণের অবশ্য পালনীয় কর্মগুলি সমস্ত বেদের শাখা হইতে সঙ্কলিত করিয়া স্মৃতি-আকারে স্বতন্ত্রভাবে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ইহার ফলে সাধারণের অনুষ্ঠানযোগ্য বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উপদিষ্ট বিষয়সকলও জানিতে পারা যায়; অথচ শাখার সাঙ্কর্য বা মিশ্রণ হইয়া বিভিন্ন গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়েরও উচ্ছেদ হয় না। কারণ স্মৃতির ভাষা শ্রুতি-অধ্যয়নের মত বিশেষরূপে স্বর, ছন্দ ইত্যাদির দ্বারা নিয়মবদ্ধ নহে। এইজন্য তাহার সহিত শ্রুতির মিশ্রণ হইতে পারে না, এবং এক-একটি বেদের শাখার অন্তর্গত শিষ্য-সম্প্রদায় সাধারণতঃ বেদের অন্য শাখা গ্রহণ করেন না। এই কারণে স্মৃতির মূলগত সেই সেই বেদের অনুশাসনাবলীও তাঁহাদের অধ্যয়ন করিতে হয় না। ফলে ভিন্ন ভিন্ন গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়েরও বিনাশ হয় না।

মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করেন নাই সত্য[৮], কিন্তু তাঁহারা বহু শিষ্য, উপাধ্যায় এবং বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনালোচিত বেদশাখা শ্রবণ করিয়া ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ে অনুষ্ঠানযোগ্য কর্মগুলি স্মৃতিরূপে স্ব স্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মন্বাদিঋষিগণের বাক্যসমূহ হইতেই নিরূপিত হয় যে, অষ্টকা প্রভৃতি কর্ম আমাদের অনুষ্ঠেয়। তাঁহাদের ঐ বাক্যরাশিও স্মরণ-পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট আসিয়াছে। ঐ স্মরণ হইতেই আবার আমরা অনুমান দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রমাণের দ্বারা এই সকল বিষয় অনুভব করিয়াছিলেন বা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কারণ পূর্বের অনুভববিষয়ই পরে স্মরণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

(৮) "ন চাবশ্যং মন্বাদয়ঃ সর্বশাখাধ্যায়িনঃ। তে হি প্রযত্নেন শাখান্তরাধ্যায়িভ্যঃ শ্রুত্বার্থমাত্রং স্ববাক্যৈরবিস্মরণার্থং নিবধ্নীয়ুঃ।" [তন্ত্রবার্তিক ১৷৩ (জৈঃ সূঃ ২), পৃঃ ৭৬]

ন নহে। কারণ বেদের
দ্ধ। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায়
। আবার এক বেদ-
এইজন্য নিজের শাখার
হইলে সেই গুরু-শিষ্য-
য় এক সম্প্রদায় মধ্যে
যাগ্য যে অন্য শাখাস্থিত
যোগ্য নহে। এইজন্যই
ধারণের অবশ্য পালনীয়
কারে স্বতন্ত্রভাবে নিবদ্ধ

ভিন্ন শাখায় উপদিষ্ট
মিশ্রণ হইয়া বিভিন্ন
া শ্রুতি-অধ্যয়নের মত
ইজন্য তাহার সহিত
শাখার অন্তর্গত শিষ্ট-
কারণে স্মৃতির মূলগত
হয় না। ফলে ভিন্ন

নাই সত্য[৮], কিন্তু
ই হইতে অনালোচিত
কর্মগুলি স্মৃতিরূপে
মূহ হইতেই নিরূপিত
দের ঐ বাক্যরাশিও
ণ হইতেই আবার
মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ
জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

রাধ্যায়িভ্যঃ শ্রুতার্থমাত্রং

পূর্বকালে বিভিন্ন শাখা-উপশাখার সহিত সম্যক্ বেদাভ্যাসের ফলে বেদোক্ত কর্মগুলি সর্বদা ঋষিগণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি ব্যবহারজীবনেও প্রকাশ পাইত। অতএব ঋষিগণ প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সংসার জীবন যাপন করিতেন, তাহা কোনদিকেই বেদবিহিত নিয়মাবলীর বহির্ভূত ছিল না। পরবর্তী কালে স্মৃতিপদটি[৯] ঈদৃশ সাধুগণের আচার-ব্যবহার বুঝাইতেও প্রযুক্ত হইয়াছে। শিষ্টাচার[১০] বা সদাচারই স্মৃতি।

অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে—সাধারণতঃ ধর্মশাস্ত্র-সাহিত্যে ধর্ম-কর্মের উপর ভিত্তি করিয়া উপদিষ্ট ও বেদের বিভিন্ন শাখায় বিপ্রকীর্ণ অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি সমস্ত শাখা হইতে স্মরণের ভিত্তিতে সঙ্কলন করিয়া যে শাস্ত্র নিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাকেই স্মৃতি বলা হয়। আবার বেদের উপর নির্ভরশীল শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি-গণের বিভিন্ন ধর্মীয়কর্ম সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ শিষ্টাচারগুলিও স্মৃতিমূলক বলিয়া ধর্মে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে।

---

(৯) Dharma—Its early meaning and scope.

[Dr. R. C. Hazra, Our Heritage, Part II, 1960.]

(১০) শিষ্টাচার অর্থাৎ সদাচার, সাধুগণের আচার। যথা—

যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ [মনু ২। ১৮]

অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্তদেশে বর্ণচতুষ্টয়ের ও সঙ্কীর্ণ জাতিগণের মধ্যে যে আচার পরম্পরাক্রমে আবহমান-কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে।

আবার শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি তাঁহার বিবেকার্ণব পুঁথিতে (ফোলিও ৫ ক) বিষ্ণুপুরাণের বচন উল্লেখ করিয়াছেন—"সাধবঃ ক্ষীণদোষাঃ স্যু র্যচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু স সদাচার উচ্যতে ॥

স্মৃতি ও আচারের মধ্যে পার্থক্য মেধাতিথিভাষ্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—

"শিষ্টসমাচারাদপি ধর্মস্য কর্তব্যতাবগতিঃ। সোঽপি স্মৃতিরেব। ততশ্চ যত্র কস্মৈচিৎ কার্যায় স্মৃতেরুপাদানং তত্র সদাচারোঽপি গ্রহীতব্যঃ। তচ্চ সমাচারেঽপ্যস্তীত্যতঃ সোঽপি স্মৃতিরেব। ন হি তত্রাপ্যস্মৃতবৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যম্। এষোঽপি হি স্বভাবভেদেন পুরুষাণাং মনঃস্বাস্থ্যদোঃস্থ্যাদি-ভেদেনানেকরূপঃ প্রতিবিশেষমানন্ত্যাদশক্যো গ্রন্থেনোপনিবদ্ধুম্। যদেব বহুশঃ প্রিয়মস্যেত্যুপলক্ষিতং তদেবাবসরান্তরে বিপরীতং সম্পদ্যতে। ন তত্র সামান্যতঃ শক্যং বেদানুমানং ন বিশেষতঃ। অষ্টকাদীনং তু নিয়তৈকরূপসমস্তপ্রয়োগস্মরণমিত্যেব স্মৃত্যাচারাণাং ভেদঃ।" [মেধাতিথিভাষ্য (মনু ২।১০) পৃঃ ৬৮]

অর্থাৎ শিষ্টগণের যে সদনুষ্ঠান তাহা হইতেও ধর্মের কর্তব্যতা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সেই শিষ্টাচারও স্মৃতিমূলক বলিয়া গ্রাহ্য। অতএব কোন কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যেখানে স্মৃতির

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। কারণ স্মৃতির প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির উপর নির্ভর করে। এইহেতু শ্রুতিই প্রবল হইয়া থাকে[১১]।

বেদের প্রাধান্য

স্মৃতিশব্দ দুইটি[১২] বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে—ইহা সমস্ত প্রাচীন বেদমূলক বাক্যকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন—পাণিনির ব্যাকরণ[১৩]; শ্রৌত,

---

অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেখানে শিষ্টাচারও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ঐ স্মরণ সদাচারস্থলেও বর্তমান অর্থাৎ সদাচার হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে সেই স্মরণের মূলগত বেদবচনও অনুমিত হয়।

কিন্তু তথাপি ধর্মের প্রমাণ যে, 'সদাচার' তাহার সহিত স্মৃতির পার্থক্য আছে। বেদের বিভিন্ন শাখা হইতে একত্র নিবদ্ধ বিষয়ই স্মৃতি, কিন্তু সদাচার একত্র গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ নহে, নিবদ্ধ করা সম্ভব-পরও নহে। কারণ জনগণের স্বভাবের বিভিন্নতা ও মনের স্বস্তি ও বিরক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহা অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন বিষয় একজনের নিকট প্রিয় বলিয়া গণ্য হইলেও অপরের নিকট তাহা বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন, কোন কোন গৃহস্থের গৃহে অতিথি আগত হইলে গৃহস্থের পরিচর্যায় কোন অতিথি সন্তুষ্ট হয়, আবার কেহ বা গৃহস্থের সর্বদা ভৃত্যের মত উপস্থিতিতে স্বস্তি লাভ করিতে পারে না, বরং বিশ্রামের ব্যাঘাত বলিয়াই মনে করে। সেইরূপ এই সব বিষয়ের কর্তব্যতা সম্বন্ধে সামান্যভাবে কিংবা বিশেষভাবে কোনপ্রকার বেদবিধিই অনুমান করা সম্ভবপর হয় না। বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ না হইলেই সর্বপ্রকার সদাচার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। দেশভেদে ইহার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু অষ্টকা প্রভৃতি স্মৃতিবিহিত কর্মকলাপে যে কর্তব্যতা উপদিষ্ট আছে তাহার স্মৃতির সকল দেশে সকল সময়ে একই প্রকার অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহাই স্মৃতি ও সদাচারের মধ্যে প্রভেদ।

(১১) শ্রুতি স্বতঃ প্রমাণ, স্মৃতি স্বতঃ প্রমাণ নহে।

যথা—জ্যোতিঃষ্টোমযাগে 'সদো' নামক মণ্ডপের মধ্যে উডুম্বর কাষ্ঠের শাখাকে যূপরূপে প্রোথিত করিতে হয়। সেই শাখাটিকে স্মৃতির বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতিতে আছে উডুম্বর শাখাকে স্পর্শ করিয়া গান করিতে হয়। বস্ত্র দিয়া সমস্ত শাখাকে আচ্ছাদন করিলে স্পর্শ কিরূপে হইবে? এখন বিচার্য স্মৃতিবচনটি অষ্টকাশ্রাদ্ধের ন্যায় বেদমূলক বলিয়া প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইবে কিনা। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়, যে স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বেদবিরুদ্ধ বিধান করা হয়, সেই স্মৃতি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

(১২) **Hist of Dharma Sastra. [Vol I. Mm. P. V. Kane, P.—131]**

(১৩) বৈয়াকরণ পাণিনিরচিত সূত্রগুলি কি প্রকারে স্মৃতি হইতে পারে? ইহার উত্তর আমরা পাই রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 'স্মৃতিসিদ্ধান্ত' নামক টীকায় (পৃঃ ১৬২)—

"বেদানাং স্মরণং স্মৃতিঃ, তদ্‌যোগাদ্ বাক্যমপি স্মৃতিপদেন ব্যবহ্রিয়তে। তথাচ বেদমূলক-মহর্ষিবাক্যং স্মৃতিঃ।

গৃহ্য ও ধর্মসূত্র; মহাভারত প্রভৃতি। সাধারণভাবে মন্বাদিধর্মশাস্ত্র ও নিবন্ধ গ্রন্থসমূহ। সংক্ষেপে স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র সমার্থক[১৪]। স্মৃতির মধ্যে অনুষ্ঠেয় ধর্ম অনুশাসন করার বিষয় নিবদ্ধ আছে বলিয়া ইহা ধর্মশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়[১৫]।

স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র

এই স্মৃতি আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হইতে পারে। ঋষিগণের স্মরণ হইতে প্রত্যক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাহা রচিত হয় তাহা প্রত্যক্ষস্মৃতি। আবার কখনও কখনও দেখা যায়, পিতৃপিতামহ কাল হইতে কোন আচার-ব্যবহার পালিত হইতেছে, কিন্তু তাহার মূল বেদে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইদানীং প্রচলিত ঐ আচারাদির মূল বেদে প্রাপ্ত না হইলেও পিতৃপিতামহগণ যে বেদের বিশেষ শাখা পাঠ করিয়া এই আচার পালন করেন, সেই বেদ হয়ত তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি পাঠ করেন নাই। কারণ পূর্বযুগে ঋষিগণ অত্যন্ত যত্নের সহিত যেমন সমস্ত বেদই শাখা-উপশাখা সহকারে অধ্যয়ন করিতেন, বর্তমানে কেহ এইরূপ অধ্যয়ন করেন না বলিয়া সেইসব আচারাদির মূল অনুসন্ধান করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। কিন্তু তখনকার যুগে পিতৃপিতামহগণের আয়ত্ত ছিল সেইসব আচারাদির মূল। এইজন্যই তাঁহাদের আচরিত স্মৃতি পুত্র-পৌত্রাদির নিকট পরোক্ষ স্মৃতি অর্থাৎ এক স্মৃতিকে অনুসরণ করিয়া পরে যে স্মৃতি প্রণীত হয় তাহাই পরোক্ষ স্মৃতি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্মৃতি

স্মৃতি পাঁচভাগে বিভক্ত[১৬]—দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, দৃষ্টাদৃষ্টার্থ, ন্যায়মূল ও অনুবাদ।

বিভিন্ন বিভাগ

দৃষ্টার্থ স্মৃতি—মনুবচনে পাওয়া যায় যে, পিতা এবং মাতার মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃগণ সকলে মিলিয়া পৈতৃকধন ভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু পিতা এবং

(১৪) ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ'। [মনু ২। ১০]

(১৫) "স্মৃতিস্তু ধর্মসংহিতা" ইত্যমরঃ। [জ্যোতিস্তত্ত্ব, পৃঃ ২৬২]

(১৬) "দৃষ্টার্থা তু স্মৃতিঃ কাচিদদৃষ্টার্থা তথাপরা।
দৃষ্টাদৃষ্টা তু রূপান্যা ন্যায়মূলা তথাপরা ॥
অনুবাদস্মৃতিস্ত্বন্যা শিষ্টৈ দৃষ্টা তু পঞ্চমী।
সর্ব এতা বেদমূলা দৃষ্টার্থাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"

[শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণির বিবেকার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৭ (ক)
এবং মলমাসতত্ত্বের টীকা, কৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চানন, পৃঃ ১৬২]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন স্মৃতির এই পাঁচ প্রকার বিভাগ করিলেও তাঁহার রচনার পদ্ধতি শ্রীনাথের বিবেকার্ণবের মত হওয়াতে শ্রীনাথের অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

মাতা জীবিত থাকিলে পুত্রগণ ধনের অধিকারী হইতে পারে না। এই বিভাগ-বচনে পিতার স্বত্ব হইতে যে পুত্রদের স্বত্ব হয় তাহাই দৃষ্টার্থ স্মৃতি।

অদৃষ্টার্থ স্মৃতি—যাবতীয় ধর্মকৃত্যই অদৃষ্টার্থ। যেমন—শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহন করিবে—এইরূপ বিধি আছে। এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে কিছু দৃষ্ট প্রয়োজনসিদ্ধ না হইলেও অদৃষ্ট বা অপূর্ব সিদ্ধ হয়।

দৃষ্টাদৃষ্টার্থ স্মৃতি—ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিবে। এখানে ব্রাহ্মণগণকে ধন দিলে তাঁহার প্রতিপালনরূপ দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ দুইই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মূল স্মৃতি—কোন ব্যক্তির একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে যদি বিঘ্নবশতঃ সেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে পরমাসীয় মৃততিথিতে কর্তব্য শ্রাদ্ধের অনুরোধে সেই তিথিতেই পূর্বমাসীয় শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পরমাসীয় শ্রাদ্ধ যত্নসহকারে করিবে। এখানে পতিতপূর্ব-শ্রাদ্ধের মৃততিথি যে একাদশী তাহাতে যদি বিঘ্নবশতঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা না হয়, তবে পরমাসীয় মৃততিথিতে কর্তব্য পরবর্তী শ্রাদ্ধের মুখ্যকালের অনুরোধে পরমাসীয় শ্রাদ্ধ করিবে—এই যে ন্যায় বা যুক্তি দেখান হয় তাহার জন্যই পূর্ববর্তী শ্রাদ্ধ সেই মৃততিথিতেই অনুষ্ঠিত হয়—ইহাই ন্যায়মূল স্মৃতি।

অনুবাদ স্মৃতি—পিতার ধন পুত্র পাইবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি যে স্মৃতিবচন পাওয়া যায়—পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রগণ সকলে ধন ভাগ করিয়া লইবে। ইহা পূর্বকথারই অনুবাদ করা হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ স্মৃতি বলা হয়।

ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই বেদ চতুষ্টয়কে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন স্মৃতি রচিত হইয়াছে। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখাধ্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন সূত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বেদের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন স্মৃতির উৎপত্তি

সূত্রযুগেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংহিতাযুগে নানা বেদশাখার বিষয়গুলি একত্র সঙ্কলিত দেখা যায়। বেদের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থ দেখা যায় না। সমস্ত বেদের বিষয়ই সমস্ত সংহিতার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সূত্রযুগে পৃথক্ বেদশাখায় পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রতীয়মান হয়। যেমন—ঋগ্বেদের অনুশাসনাবলী নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে বশিষ্ঠসূত্র, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি। সামবেদে গৌতমধর্মসূত্র, গোভিলগৃহ্যসূত্র, কৃষ্ণযজুর্বেদে আপস্তম্বধর্মসূত্র ও বৌধায়নধর্মসূত্র, শুক্লযজুর্বেদে শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র প্রভৃতি রচিত হইয়াছে।

ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে তিনটি প্রধান যুগ[১৭] আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম হইতেছে

(১৭) Hist. of D. S. Vol I, P.—246

সূত্রের যুগ, তারপর সংহিতার যুগ ও সর্বশেষে নিবন্ধসাহিত্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সূত্রযুগ শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা সংহিতাযুগের অস্তিত্বের নিদর্শন দেখিতে পাই। সুতরাং সূত্রযুগের পরে যে সংহিতাযুগ আরম্ভ হইয়াছে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না।

এই সূত্রযুগ ও সংহিতাযুগের পৌর্বাপর্য লইয়া বহু মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। ম্যাক্‌স্‌মূলার সাহেবের মতে সূত্রগ্রন্থগুলি পূর্বে রচিত এবং শ্লোকাকারে নিবদ্ধ গ্রন্থগুলি পরে রচিত[১৮]।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর পি. ভি. কাণে ম্যাক্‌স্‌মূলারের এই মতকে সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে এই পৌর্বাপর্য নিরূপণ অসম্ভব। তাঁহার মতে শ্লোকাকারে রচিত গ্রন্থই প্রাচীনতর[১৯]।

আমরা কাণে মহাশয়ের মতকে সমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ গৌতমধর্মসূত্রের[২০] মধ্যে মনুর নাম পাওয়া যায়। ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে গৌতমধর্মসূত্রই প্রাচীনতম। অতএব সূত্রযুগের পূর্বে হয়ত শ্লোকাকারে গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। অবশ্য বেদের মধ্যেও মনুর নাম আছে[২১]। রামায়ণেও মনুর নাম উল্লিখিত আছে[২২]।

অতএব মনু নামে যে কতজন মহর্ষি বর্তমান ছিলেন তাহার স্থিরতা নাই। কারণ মনুসংহিতার মনু, বেদোক্ত মনু ও গৌতমধর্মসূত্রের মনু যে একই ব্যক্তি তাহারও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। আবার বৃহন্মনু ও বৃদ্ধমনুর নামেও শ্লোক পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমান মনুসংহিতায় এই শ্লোকগুলি দেখা যায় না। গৌতমধর্মসূত্রে সত্যই মনুর নাম ছিল কিনা তাহাও বিচার্য। তথাপি ইহা সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়াই মনে হয় যে সূত্রগ্রন্থের পূর্বেও শ্লোকাকারে গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল।

---

(১৮) **Hist. of Ancient Sans. lit., Max Muller, P—70.**

(১৯) **Hist. of D. S, Vol I, P—10.**

(২০) এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে প্রকাশিত সমস্ত গৌতমধর্মসূত্রে মনুর নাম নাই, তৎস্থানে 'অনু' এই পদটি দেখা যায়। যথা—'ত্রীণি প্রথমান্যনির্দেশ্যান্যনুঃ'

[গৌতমধর্মসূত্র ৩৷৩৷৭, আনন্দাশ্রমমুদ্রণালয়ে প্রকাশিত, পৃঃ ১৬৬]

আবার—'ত্রীণি প্রথমান্যনির্দেশ্যানি মনুঃ।'

[গৌতমধর্মসূত্র ২৭৷৭, পৃঃ ৩২৭, মস্করিভাষ্যসহিত, সং শ্রী নিবাসাচার্য]

(২১) 'যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্।' [তৈত্তিরীয়সংহিতা II. 2. 10. 2.]

(২২) শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চরিত্রবৎসলৌ।' [রামায়ণ ৩০৷৪৷১৮]

স্মৃতি বেদের ষড়্অঙ্গের অন্তর্গত 'কল্প' ভাগের অধীন। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রথমেই আমরা পাই সূত্রসাহিত্য। বেদের অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি উপদেশ করিয়া বিশাল 'ব্রাহ্মণ গ্রন্থ' কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছিল। এই কর্মকাণ্ডের সহিত স্মৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। এই ব্রাহ্মণগুলি স্মরণে রাখিয়া ধর্মীয়কৃত্যে প্রয়োগ করা যজমানগণের ও পুরোহিতগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাকে সুবিন্যস্ত করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রের আকারে সৃষ্ট হইল 'সূত্র'-সাহিত্য। এইভাবে যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত পুরোহিতগণের যজ্ঞীয় কার্যে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত এবং প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনেও অনুসরণের জন্য স্বল্পভাষায় অধিকতর সংযতভাবে 'কল্পসূত্রের' উদ্ভব হইয়াছিল। যে গ্রন্থে যজ্ঞাদির প্রণালী এবং প্রয়োগ-পরিপাটী প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, তাহাকেই কল্প বলে। রঘুনন্দন[২৩] কল্পতরুকারের মত উত্থাপন করিয়া 'কল্প' শব্দটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিভিন্ন শাখার অন্তর্গত লিঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা কল্পিত প্রত্যক্ষ বেদমূলক আচারের প্রতিপাদক গ্রন্থই হইতেছে কল্প। কল্পের প্রকাশক সূত্রগ্রন্থই কল্পসূত্র। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র এই ত্রিবিধ সূত্রগ্রন্থকেই কল্পসূত্র বলা হয়।

বেদ ও কর্মকাণ্ডের সহিত স্মৃতির সম্বন্ধ

সূত্রসাহিত্য

শ্রৌতসূত্রগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রয়োগপদ্ধতি, গৃহ্যসূত্রগুলিতে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার এবং ধর্মসূত্রগুলিতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ব্যক্তিগত ও সমাজগত আচার-আচরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সূত্রগ্রন্থ ব্যতীত ধর্মশাস্ত্রের অপর একটি অংশ সংহিতাগ্রন্থ। সংহিতাগুলি শ্লোকাকারে রচিত। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু সংহিতার মধ্যে সেইগুলিই শ্লোকাকারে জনসাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সংহিতার উৎপত্তি

স্মৃতি সংহিতাগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে মনুসংহিতা। এই মনুসংহিতার নির্দেশে শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সমাজ জীবন যাপন করেন। ইহার বিধিনিষেধ অনুসারেই সমগ্র সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি ব্যবহারক্ষেত্রে, কি ধর্মীয়কর্মানুষ্ঠানে—এই মনুসংহিতার নির্দেশ সর্বথা মান্য।

---

(২৩) "কল্পশ্চ নানাশাখাগতলিঙ্গাদিকল্পিতঃ প্রত্যক্ষবেদমূলকঃ স্বসংজ্ঞাভিরনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো গ্রন্থ ইতি কল্পতরুঃ।" [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৬৩]

মনুসংহিতাই সর্ববেদের সারসংগ্রহ। বেদমূলক ধর্মসংহিতাগুলির মধ্যে ইহার প্রামাণ্য সর্বাধিক। প্রত্যক্ষ বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি যেমন অনুসরণীয় নহে, সেইরূপ মনুস্মৃতির সহিত যাহার বিরোধ হয় তাদৃশ অন্য কোন স্মৃতিও আদরণীয় নহে[২৪]।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সামাজিক রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়। দেশভেদে ও কালভেদে এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখা দিতে লাগিল। ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্নরূপ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমশঃ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর বিভিন্নতায় এবং বিশেষ কোন ঐতিহ্য পালন করিবার বাধ্যবাধকতায় ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতির প্রচলন দেখা দিতে লাগিল। এই জন্য মনুসংহিতার নির্দেশে ব্যতিক্রম দেখা দিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মনুসংহিতায় সমুদ্রযাত্রা বর্জনীয়। সমুদ্র যাত্রা করিলে মনুর নির্দেশে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু সমুদ্রোপকূলস্থ দেশবাসিগণের সমুদ্রযাত্রা ব্যতীত জীবন-ধারণ ক্লেশসাধ্য। এইসব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের রীতিও ব্যবহারিক প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিসংহিতাতে নিবদ্ধ হইল। অতএব মনুসংহিতার প্রাধান্য সমাজে

বিভিন্ন সংহিতার প্রয়োজনীয়তা

প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, পরাশরসংহিতা, নারদসংহিতা, কাত্যায়নসংহিতা প্রভৃতি সংহিতাগ্রন্থগুলির সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক্ পৃথক্ রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এই প্রকারে ধর্মশাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। বিভিন্নকালেও এইজন্য পৃথক্ পৃথক্ সংহিতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটি—আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু এই বিষয় তিনটিই পরে বহুভাগে বিভক্ত হইয়া স্মৃতির বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্মৃতির প্রতিপাদ্য

যেমন—সংস্কার, ব্রত, আহ্নিক, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দায়, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি।

স্মৃতির সর্বশেষ যুগ হইতেছে নিবন্ধ ও ভাষ্যের যুগ। নিবন্ধ শব্দের অর্থ সঙ্কলিত গ্রন্থ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন—"নিবন্ধান্ বহূনালোক্য নিবধ্যন্তে সতাং মুদে"—[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬০] অর্থাৎ অনেক প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অবলোকনপূর্বক সাধুদিগের সন্তোষের জন্য নানা স্মৃতির মত একত্র সংগৃহীত করা হইয়াছে। সুতরাং নানা স্মৃতির মত একত্র সংগ্রহ করিয়াই নিবন্ধসাহিত্য রচিত হইয়াছে[২৫]।

---

(২৪) বৃহস্পতিঃ—"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে ॥" [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩১৬]

(২৫) কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মলমাসতত্ত্বের টীকায় (পৃঃ ২) নিবন্ধের বিষয় বলিয়াছেন—
"নিবধ্যন্তে নানাস্থানস্থা এতে পদার্থা একত্রগতাঃ ক্রিয়ন্তে।"

ভাষ্য গ্রন্থবিশেষের মূলের ব্যাখ্যা, কিন্তু মাত্র মূলের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে বিরুদ্ধমতের সমালোচনাপূর্বক পক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া ভাষ্যকার স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। আর টীকায় কেবল মূলের ব্যাখ্যাই পরিদৃষ্ট হয়। সূত্রযুগে স্মৃতির বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তাকারে অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সংহিতাযুগে এইগুলি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিপ্রকীর্ণভাবে অবস্থিত ছিল বলিয়া আমরা লক্ষ্য করি। এই বিপ্রকীর্ণ বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্তাকারে অথচ ধারাবাহিকভাবে সন্নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তাহা ছাড়া কালভেদে সমাজের যে পরিবর্তন দেখা দিতেছিল, সেই সমাজের রীতিনীতির উপযোগী নূতন করিয়া স্মার্তব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল বলিয়াই নিবন্ধসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। অঞ্চলভেদেও এইসব স্মার্তব্যবস্থার ভেদ হওয়াতে সেইসব বিধিনিষেধগুলি নিবন্ধসাহিত্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নিবন্ধের উৎপত্তি

আবার ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষের পশ্চিমদিক্ দিয়া আক্রমণ করিতেছিল, তখন স্মৃতিসংহিতাগুলি বর্তমান থাকিলেও তাহাদের প্রভাব অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। সংহিতাগুলির মধ্যে মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির বিষয়বস্তু ঢুকিয়া মূল গ্রন্থগুলিকে অনেক পরিমাণে বিপর্যস্ত করিয়াছিল। ধর্মীয় আইনকানুন, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতিও সংহিতাগুলির মধ্যে প্রবেশ করার ফলে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তখন আর্যসমাজের প্রথম ও প্রধান কার্যই হইল এই বিপর্যয় ও অবস্থার পরিবর্তন করিয়া নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করা। মীমাংসাশাস্ত্রে এই জন্যই শবরস্বামী, কুমারিলভট্ট, প্রভাকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের হস্তে মীমাংসাগ্রন্থগুলি পরিবর্তিত ও উন্নত হইয়াছিল। অনেক নূতন বিষয় ও নূতন যুক্তির অবতারণা এইগুলির মধ্যে তখন হইতেই পরিলক্ষিত হয়[২৬]। স্মৃতিশাস্ত্রেও তখন অনেক প্রয়োজনীন বিষয়বস্তু, সমাজের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, হিন্দু আইনের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি ব্যাপকভাবে শাস্ত্রকারগণের হস্তে সন্নিবিষ্ট হইয়া নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাই নিবন্ধ সাহিত্য। কিন্তু বিভিন্নপ্রদেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর মতপার্থক্য অত্যন্ত প্রকট হইবার ফলে প্রতিযোগিতা এত বৃদ্ধি

---

(২৬) The Digest, Dinesh Ch. Bhattacharya,
[Cultural Heritage of India, Vol II, 1962, P—364,]

খ্যাতেই সীমাবদ্ধ
নানাবিধ যুক্তির
কায় কেবল মূলের
রে অথচ ইতস্ততঃ
পক ও বিপ্রকীর্ণ-
য়বস্তুকে সংক্ষিপ্তা-
খা দিল। তাহা
জের রীতিনীতির
প্রয়োজন দেখা
ইয়াছে। অঞ্চল-
লি নিবন্ধসাহিত্যে

গণ যখন প্রথম
ইতাগুলি বর্তমান
ইতাগুলির মধ্যে
নেক পরিমাণে
নীতি প্রভৃতিও
অনেক পরিমাণে
ইল এই বিপর্যয়
শাস্ত্রে এই জন্যই
মীমাংসাগ্রন্থগুলি
ক্তির অবতারণা
ও তখন অনেক
াইনের বিশেষ
নূতন সাহিত্য
র পণ্ডিতগণের
গতা এত বৃদ্ধি

1962, P—364,]

পাইয়াছিল যে বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয়তা ও দেশীয় অনুমোদন লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারগণের বিরুদ্ধ মতগুলিকে কঠোর সমালোচনা দ্বারা হেয় প্রতিপন্ন করিয়া স্বমত স্থাপনের আগ্রহ ও ব্যগ্রতা নিবন্ধ-সাহিত্যেই দেখা যায়। প্রাচীন স্মৃতি হইতে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মত আলোচনা করিয়া সামঞ্জস্যবিধান করিয়া স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এই নিবন্ধকারগণ। কালের পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি সবই নিবন্ধসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ধর্মশাস্ত্রানুমোদন লাভ করিয়াছে। নিবন্ধকারগণের স্ব স্ব প্রতিভা অনুসারে নূতন নূতন ব্যাখ্যাকৌশল ইহার মধ্যে স্থান পাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। যেমন আমরা পাই—গৌড়ীয়স্মৃতি, মৈথিলস্মৃতি, আসামস্মৃতি, উড়িষ্যাস্মৃতি প্রভৃতি।

নিবন্ধের প্রয়োজনীয়তা

স্মৃতিশাস্ত্রের তিনটি যুগের মধ্যে সূত্রযুগ ও সংহিতাযুগকে প্রাচীনস্মৃতির যুগ নামে অভিহিত করা হয়—সূত্র ও সংহিতাই প্রাচীন স্মৃতি। আর টীকা ও নিবন্ধযুগে ভবদেবভট্ট, জীমূতবাহন প্রভৃতি প্রণীত নিবন্ধগুলিও প্রাচীনস্মৃতির অন্তর্গত। প্রাচীনস্মৃতিতে নিবন্ধকারগণ পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারগণের বচন হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া স্বসিদ্ধান্তস্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। কোন স্থলে বচন ব্যাখ্যানাবসরে মীমাংসা সিদ্ধান্ত দেখান আছে মাত্র, কিন্তু পরমতখণ্ডন নাই। এইজন্য ভবদেবভট্ট, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থ প্রাচীনস্মৃতি। যে সময় হইতে কোনও মত বিরুদ্ধরূপে তুলিয়া যুক্তি, প্রমাণ ও মীমাংসাদর্শনাভিহিত বচনাদি দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে, তখন হইতে প্রাচীন-স্মৃতি ও নব্যস্মৃতির বিভাগ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। জীমূতবাহন কেবল ধনাধিকারবিষয়ে প্রাচীনযুক্তির গ্রহণ বা অগ্রহণে নব্যস্মৃতিকারের ন্যায় কিছু বিচার দেখাইয়াছেন মাত্র, ঈদৃশ বিচারও তাঁহার অন্য গ্রন্থে নাই। এইজন্য তাঁহার কোন গ্রন্থ নব্যস্মৃতিপদবাচ্য নহে। পূর্বনিবন্ধে লিখিত ব্যবস্থা প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে মীমাংসাবাক্য বা অধিকরণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা এখন নব্যস্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ মীমাংসাদি ঘটিত ব্যাখ্যানাদি শূলপাণি হইতেই নিবন্ধে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং উহা প্রাচীন স্মৃতির রীতিবহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া শূলপাণি হইতে বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতির প্রবর্তন হইয়াছে[২৭], ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শূলপাণি হইতে নিবন্ধ রচনার

(২৭) শূলপাণিই যে প্রথম নব্যস্মৃতির প্রবর্তক তাহা স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিবন্ধে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে, যথা—"পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শূলপাণি হইতেই বঙ্গদেশে নব্য স্মৃতির প্রবর্তন হইয়াছে।"
[শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় (২), ভারতবর্ষ (মাঘ, ১৩৪৮) পৃঃ ১৯০]

রীতি নূতনভাবে প্রবর্তিত হওয়ার জন্যই এতাদৃশ স্মৃতিনিবন্ধের নাম হইয়াছে নব্যস্মৃতি।

শূলপাণির পরে রঘুনন্দনই নব্যস্মৃতিতে প্রধান নিবন্ধ রচয়িতা। শূলপাণির হস্তে যাহার প্রথম সূত্রপাত, রঘুনন্দনের হস্তেই তাহা পূর্ণতা লাভ করে। নব্যস্মৃতি রচনায় রঘুনন্দন তাঁহার অসামান্য দক্ষতার ফলে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই এখন পর্যন্ত 'নব্যস্মৃতি' বলিতে রঘুনন্দনের রচনাকেই বুঝাইয়া থাকে। এখনও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করিয়া সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি পালন করিয়া আসিতেছেন।

নিবন্ধকার হিসাবে রঘুনন্দনের স্থান

বঙ্গীয়নিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘুনন্দনের নামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দন যুগপ্রবর্তক নিবন্ধকার। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি হিসাবে তিনি বঙ্গীয়-স্মৃতিশাস্ত্রে প্রদীপ্ত ভাস্কররূপেই বিরাজমান। হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিয়া তৎকালীন বেদবহির্ভূত ধর্মীয় আন্দোলন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় নিবন্ধ রচনা করিয়া কঠোর নিয়মের গণ্ডী বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অদ্যাপি তাঁহার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় হিন্দুদের পূজাপার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি সকলপ্রকার ধর্মকর্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখনকার সমাজব্যবস্থায় তাঁহার ধর্মকর্মের প্রতি কঠোর নির্দেশের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। তাঁহার বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি স্বীয়গ্রন্থে যেভাবে পূর্বমীমাংসা ও ন্যায়ের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অভূতপূর্ব যশের অধিকারী করিয়াছে। বিরুদ্ধপক্ষের মতকে স্বীয় প্রতিভাবলে খণ্ডন করিয়া যেরূপে তিনি স্বকীয়মত স্থাপন করিয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অপূর্ব নিদর্শন। এইজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে শুধুমাত্র 'স্মার্ত' বা 'স্মার্তভট্টাচার্য' বলিতে তাঁহাকেই সকলে অবনত মস্তকে মান্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অতুলনীয় শাস্ত্র-আলোচনার নিকট অন্য সকল নিবন্ধকারগণের প্রভা ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রালোচনা কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে তিনি যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ববাদিসম্মতভাবে সফলতা লাভ করেন বলিয়াই তিনি অদ্বিতীয় 'সমাজসংস্কারক' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নাম হইয়াছে

।। শূলপাণির
ব্রে। নব্যস্মৃতি
লাভ করিয়াছেন
ঝাইয়া থাকে।
াদ্বিক আচার-

দ্ধ। রঘুনন্দন
তিনি বঙ্গীয়-
। হিন্দুসমাজ
নীয় আন্দোলন
ক রক্ষা করিতে
ঠোর নিয়মের
তাঁহার বিধিবদ্ধ
প্রকার ধর্মকর্মই
প্রতি কঠোর
পাণ্ডিত্যপূর্ণ।
া করিয়াছেন,
ন্দর মতকে স্বীয়
র তাহা তাঁহার
াত্র 'স্মার্ত' বা
আসিতেছেন।
ণের প্রভা ম্লান
াত্য প্রকাশেই
রুদায়িত্ব গ্রহণ
বলিয়াই তিনি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমোন্নতিতে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য বহু বিষয় মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর ও ধর্মগ্রন্থরূপে মহাভারত প্রসিদ্ধ[১]। সেইজন্য প্রবাদবাক্য আছে—যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে। এই মহাভারত পরবর্তী স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে প্রমাণ গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি, বিবাহ, আচার, ব্রত, দান, তীর্থ, প্রায়শ্চিত্ত, রাজনীতি প্রভৃতি স্মৃতির বিভিন্ন বিষয় পরিদৃষ্ট হয়। আবার রামায়ণ প্রধানতঃ কাব্য হইলেও স্বকীয় মহান্ আদর্শের জন্য ধর্মগ্রন্থরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং স্মৃতিনিবন্ধগুলির মধ্যে ধর্মের প্রমাণরূপে নিরূপিত হইয়াছে। রামায়ণের অযোধ্যা এবং অরণ্যকাণ্ডে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিনিবন্ধগুলির মধ্যে আমরা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। দেবণভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা[২], অনিরুদ্ধভট্টের হারলতা[৩], রঘুনন্দনের 'তত্ত্ব[৪] প্রভৃতি রামায়ণ মহাভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ।

রামায়ণ ও মহাভারতের সহিত স্মৃতির সম্পর্ক

পণ্ডিতসমাজে পুরাণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং

---

(১) মার্কণ্ডেয়পুরাণে মহাভারত ধর্মশাস্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে—

ধর্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
কামশাস্ত্রমিদঞ্চাগ্র্যং মোক্ষশাস্ত্রং তথোত্তমম্॥
চতুরাশ্রমধর্মাণামাচারস্থিতিসাধনম্॥ [মার্কঃ পুরাণ ১।৭-৮]

(২) অনধ্যায় প্রসঙ্গে স্মৃতিচন্দ্রিকায় (সংস্কার কাণ্ড, পৃঃ ১৫২) রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) হারলতায়ও (পৃঃ ৬৪) রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) মহাভারতস্য বনপর্বণি—

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥ [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬৮]

রামায়ণে—ভরতপিণ্ডানন্তরং...

ইদং ভুঙ্ক্ষ, মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো রাজংস্তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ।
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৫

বংশানুচরিত—সর্বজনবিদিত। বর্তমানে পুরাণগুলি স্মৃতিবিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ এইগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। স্মৃতির প্রধান তিনটি বিষয় আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত—ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি, দান, পূজা, আচার, ব্রত, তীর্থ, দীক্ষা, উৎসর্গ, প্রতিষ্ঠা, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি বিষয় পুরাণগুলির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। কেবল ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিই নহে, পুরাণের মধ্যে রাজনীতি, আইনকানুন, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ও স্থান লাভ করিয়াছে।

পুরাণে স্মৃতির বিষয়

পুরাণ গুলির[৫] এই নূতন রূপ ধারণ খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে হয় নাই, আবার খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরেও হয় নাই[৬]। সুতরাং পুরাণগুলি প্রাচীনরূপ ত্যাগ করিয়া নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছে স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইবার বহু পূর্বেই। ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের উপর ধর্মীয় আন্দোলন এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও দেশাধিকার প্রভৃতিই পুরাণের এই সংস্কার ঘটাইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই পুরাণের এই নূতনরূপ-ধারণ সম্ভব হইয়াছে, কারণ আপস্তম্বধর্মসূত্রে পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধর্মসূত্রে[৭] পুরাণ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা আছে এবং ভবিষ্যপুরাণের বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে[৮]।

কিন্তু পুরাণতত্ত্ববিদ্ ডঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরার মতে আপস্তম্বধর্মসূত্র উল্লিখিত বিষয়গুলি গাথা বা তাহার সংক্ষিপ্তসার। এইগুলি পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ করিয়া কুলপতি বা ধর্মাধ্যক্ষদিগের মাধ্যমে পুরাণগুলির মধ্যে এই গাথাসমূহ প্রবেশ লাভ করে। কেবল পুরাণ ও মহাভারতের সহিতই গাথাগুলি সংযুক্ত ছিল না, মনুসংহিতার[৯] মধ্যেও আমরা এইগুলি পাই। অতএব খ্রীষ্টের

---

(৫) পুরাণ সম্বন্ধে প্রামাণ্য ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার গ্রন্থ—

Puranic Records on Hindu Rites and Customs.

(৬) ঐ, পৃঃ ৫—৬।

(৭) যো হিংসার্থমভিক্রান্তং হন্তি মন্যুরেব মন্যুং স্পৃশতি ন তস্মিন্ দোষ ইতি পুরাণে।

[আপস্তম্বধর্মসূত্র ১।১০।২৯।৭]

(৮) পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তীতি ভবিষ্যৎপুরাণে। [ঐ, ২।৯।২৪।৬]

(৯) অথ গাথা বায়ুগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ। [মনু, ৯।৪২]

জন্মের পূর্বে পুরাণগুলি নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে—এই মত ঠিক নহে। মনুর যুগ পর্যন্ত পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র অসংস্পৃষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগেই পুরাণ স্মৃতিবিষয়ীভূত হইয়া ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়[১০]।

পুরাণগুলির মধ্যে বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রতিষ্ঠিত। পুরাণগুলি বেদমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন প্রমাণ করিয়াছে। পরমপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। অন্যান্য ধর্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্থান অতি উচ্চে নিহিত ছিল। বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি

বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি নূতন ধর্মগুলির প্রচারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থা

নূতন প্রচারিত ধর্মগুলির মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং বেদের সর্বনায়কত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে। এই নূতন ধর্মগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার বর্ণাশ্রমধর্মের পক্ষপাতী নহে। এই প্রকার বিরুদ্ধ বিশ্বাসের উৎপত্তি এবং বিস্তার ক্রমশঃ যজ্ঞীয় আচার-ব্যবহারকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঘাত করিয়াছে।

নূতন প্রচারিত ধর্মগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ। কারণ তাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। ইহারা বেদের বিরুদ্ধ মতবাদই প্রচার করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম প্রভৃতি আধা-বৈদিক। ইহারা বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করে না, আবার বেদের সমস্ত বিষয়কে প্রাধান্যও দেয় না।

মনুর সময়ের বহু পূর্বে শ্রৌত আচারগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ বৈদিক ধার্মিকগণ স্মার্তরূপে পরিগণিত হইতেছিলেন। সম্ভবতঃ বুদ্ধের সময়ের বহু পূর্বেই বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি ধর্মগুলির প্রসার হওয়ার ফলে বেদের প্রামাণ্য প্রায়ই স্বীকার করা হইত না, বর্ণাশ্রমধর্ম অবজ্ঞাত হইতেছিল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খুব নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল।

---

(১০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার (১।৩)—পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥
পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি ১৪টি ধর্মের স্থান কথিত আছে। ধর্মের প্রমাণ বেদ, স্মৃতি ও সদাচার। স্মৃতি বলিতে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ—উভয়কেই বুঝায়। ধর্মশাস্ত্র বেদানুমোদিত এবং এই ধর্মশাস্ত্রের বিষয়গুলি পুরাণের মধ্যে ঢুকিয়া পুরাণের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি পুরাণের সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের সাহিত্য পৃথক্ বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র পৃথগ্‌রূপে ধর্মের চতুর্দশ স্থানের অংশীভূত হইয়াছে।

দেশের এই ধর্মীয় প্লাবনে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ স্বধর্মবিরুদ্ধ ভাবধারা এবং রীতিনীতিতে প্রভাবিত হইতেছিলেন। তখন নিম্নজাতীয় শূদ্রগণ অত্যন্ত গর্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ-ধর্মগুলিকে আশ্রয় করিতেছিল। জনসাধারণ নীতিবহির্ভূত পথ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অব্দে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে, বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে, বর্ণাশ্রমধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং শূদ্র ও জনসাধারণের মধ্যে নীতিগত আইনের কঠোরতা প্রবর্তন করিতে প্রয়োজন বোধ করিলেন। তখন শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্মৃতিবিষয়ক রচনার মধ্য দিয়া গৃহ্য আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ইত্যাদি স্মৃতিসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি মহাভারত ও পুরাণাদির অন্তর্গত করিয়া সেইগুলি উপদেশ দিয়া জনগণকে বিপথ হইতে রক্ষা করিতে তাঁহারা তৎপর হইলেন। স্মার্তগণের এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলেই পুরাণগুলি স্মৃতির বিষয়ীভূত হইয়াছে এবং বেদের প্রামাণ্যও রক্ষিত হইয়াছে।

এই সময় বৈদেশিক বহু আক্রমণও স্মার্তপণ্ডিতগণের নিকট হিন্দুধর্ম রক্ষা করার বিরুদ্ধে নূতন উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছিল। তখন বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটিতে থাকে, গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীয় জাতির আক্রমণ চলিতে থাকে, দাক্ষিণাত্যে শাতবাহন রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আর্যাবর্তে বহু খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়।

এই সমস্ত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া এবং বিভিন্ন নীতিবহির্ভূত বৈদেশিক ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া জনগণ স্মার্তধর্মের প্রতি বিরূপ হইয়া পড়িতেছিল।

তান্ত্রিক ধর্মের প্রসার

আর একটি বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তান্ত্রিকধর্মের প্রসার এবং জনপ্রিয়তার ফলে। তান্ত্রিকধর্ম[১১] বেদের অনুশাসন স্বীকার করে না এবং বর্ণাশ্রমধর্মকেও গ্রহণ করে না। মূলতঃ তান্ত্রিক বীরাচার সর্বপ্রকারে অবৈদিক আচার-ব্যবহার প্রচার করে।

---

(১১) এখানে বিবেচ্য যে মনুস্মৃতির টীকাকার কুল্লুকভট্ট হারীতের সূত্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা—বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" [কুল্লুকটীকা, (মনু ২।১) পৃঃ ১৯]
এই উক্তি হইতে যদি কেহ মনে করেন যে বেদ বলিতে বেদ ও তন্ত্র এই দুইটিকেই বুঝায়—তাহা

ন্ধ ভাবধারা এবং
ঢ়গণ অত্যন্ত গর্বিত
ধর্মগুলিকে আশ্রয়
বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি
য় ও তৃতীয় অধে

করিতে, বেদের
রতে এবং শূদ্র ও
করিতে প্রয়োজন
নার মধ্য দিয়া গৃহ
আরম্ভ করিলেন।
রত ও পুরাণাদির
ইতে রক্ষা করিতে
ফলেই পুরাণগুলি
।
কট হিন্দুধর্ম রক্ষা
ন মৌর্য সাম্রাজ্যের
বিদেশীয় জাতির
য় এবং আর্যাবর্তে

চন্ন নীতিবহির্ভূত
ইয়া পড়িতেছিল।
ছিল তান্ত্রিকধর্মের
ান্ত্রিকধর্ম[১১] বেদের
মূলতঃ তান্ত্রিক

সূত্র উল্লেখ করিয়া
) পৃঃ ১৯]
ইটিকেই বুঝায়—তাহা

তথাপি পঞ্চম শতাব্দী হইতেই ভারতীয় সমাজের উপর তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়িতে থাকে।

গুপ্তযুগ ও তাহার পর হইতে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার হইতে থাকে। পালযুগে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য পাইলেও বৈষ্ণবধর্ম যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল, তাহা নহে। তখনকার শিলালিপিতে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুমন্দিরের উল্লেখ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ। বঙ্গের নরপতি বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন পূর্বপুরুষগণের শৈবধর্ম

কখনই সম্ভবপর নহে, ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার প্রবন্ধ তাহার প্রমাণ।

["Did Harita know the Tantra ?" Dr. Hazra. P-141-150, Indian Historical Quarterly, Vol. XXXVI, 1960]

তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে ঋষি হারীত বৈদিকীশ্রুতি ও তান্ত্রিকীশ্রুতি দ্বারা বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডকে বুঝাইয়াছেন। কারণ বহুকাল পূর্ব হইতেই বেদ এবং তন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে জ্ঞান এবং অনুষ্ঠানপদ্ধতিরূপে।

পাঞ্চরাত্র সংহিতা, শৈব আগম এবং এই প্রকার তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি স্মৃতি, পুরাণ ও মীমাংসাশাস্ত্রে পাষণ্ডশাস্ত্ররূপে অভিহিত করা আছে। কারণ মনুসংহিতায় আছে—

"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥" [মনু ১২।৯৫]

মনুর এই শ্লোকের ভাষ্য দিতে গিয়া মেধাতিথি বলেন যে শাক্য, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া অবৈদিক ; সুতরাং তাহারা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

[মেধাতিথিভাষ্য, পৃঃ ৪৮১]

বার্তিককার কুমারিলভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্তিকে প্রচার করিয়াছেন যে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, শাক্য, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি ধর্মাধর্মরূপ নিবন্ধগুলি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না জন্য ইহারা গ্রহণযোগ্য নহে। [তন্ত্রবার্তিক ১।৩ (জৈঃ সূঃ ৪) পৃঃ ১১৪-১১৫]

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকাকার অপরাদিত্য একটি শ্লোকের ভাষ্য দিতে গিয়া ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি ধর্মবিলম্বিগণ পতিত।

তিনি আরও বলেন—কাপালিক, পাশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই সূর্যদর্শন করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে। [যাজ্ঞঃ সংহিতা অপরার্কভাষ্যসহিত, পৃঃ ১৮]

দেবণভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকায় উল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও কূর্মপুরাণে আছে যে অবৈদিক পাঞ্চরাত্রিক ব্যক্তিগণের সংস্পর্শ ঘটিলে স্নান করিতে হয় এবং ইহাদের সহিত বাক্যালাপ করাও নিষিদ্ধ।

[স্মৃতিচন্দ্রিকা, আহ্নিককাণ্ড, পৃঃ ৩১০-৩১১]

এইসব প্রমাণ হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে বেদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রকে স্বীকার করেন নাই।

কিন্তু কালের গতিতে এই কঠিন বন্ধনও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। সমাজে হিন্দুগণের মধ্যে তান্ত্রিকতার প্রসার ও প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবশ্য স্মৃতিকারগণের তন্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে

ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন[১২]। তাঁহার রাজসভায় কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন।

এই সঙ্গে তান্ত্রিকধর্মও প্রসার লাভ করিতে থাকে। তান্ত্রিকধর্মের মূল উৎস ঘনতমসাচ্ছন্ন। কিন্তু ইহা ক্রমশঃ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখায় ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র ও কাশ্মীরীয়ান শৈব-আগম স্পষ্টতঃ তান্ত্রিকধর্ম সম্বন্ধীয়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় হইতে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইতে থাকে, পরবর্তীকালে সেই বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে, ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ নামে ধর্ম প্রচারিত হয়[১৩]।

পুরাণের মধ্যে বহু উদার এবং সহজ সরল মত প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য পুরাণে বলা হয় যে পতিসেবা স্ত্রীলোকের পক্ষে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ এবং দ্বিজাতিগণের সেবা দ্বারা শূদ্রগণ মোক্ষলাভ করেন। পুরাণ স্বধর্ম পালন করিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

স্মার্ত ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধ ধর্মগুলিকে প্রতিরোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উদার মতগুলি ব্যাপক প্রচার করিবার ফলে পুরাণগুলি এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং পরবর্তী নিবন্ধসমূহে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কখনই স্মৃতির সহিত পুরাণগুলিকে

পুরাণগুলি স্মৃতিশাস্ত্রে প্রামাণ্যরূপে গৃহীত

স্বীকৃতি বহু পরবর্তী যুগে সম্ভব হইয়াছিল। পূর্বকালের ধর্মসূত্রকার হারীত কেবল বৈদিক ধর্মের প্রামাণ্য স্বীকার করেন যেমন নাকি পূর্বকালের শাস্ত্রজ্ঞ বৈদিক সূত্রকার বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ এবং অন্য সকলে বেদকে স্বীকৃতি দেন। হারীত কখনও তন্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ হারীতের সময়ে পুরাণগুলিতে পর্যন্ত তন্ত্র পাষণ্ডশাস্ত্ররূপে অভিহিত হইয়াছে। আর কুল্লুকভট্টও যদি 'তান্ত্রিকী' শ্রুতি দ্বারা তন্ত্রকে মনে করিতেন, তাহা হইলে তিনি মনুসংহিতার ভাষ্যে তন্ত্রগুলিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিতেন। কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে তিনি সমস্তবেদকেই ধর্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কখনও কোথায়ও তিনি তন্ত্র হইতে কোন উদ্ধৃতি দেন নাই। কুল্লুকভট্টের তন্ত্র সম্বন্ধে এই সম্পূর্ণ নীরবতা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে তিনি তন্ত্রকে কখনই স্বীকার করেন নাই। তান্ত্রিকীশ্রুতি দ্বারা হারীত কখনও তন্ত্রকে বুঝান নাই এই কুল্লুকভট্টও এই অর্থে উল্লেখ করেন নাই।

(১২) 'Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal.' Dr. S. K. De. P—6.

(১৩) Obscure Religious cults, Dr. Sasi Bhusana Das Gupta, P—9.

সম মূল্য দান করেন নাই। তাঁহারা বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষা স্বল্পমূল্য দিয়া ইহাদিগকে 'অবর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্মাধিকারী ও স্মার্ত হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—বেদ হইতে যে ধর্ম অবগত হওয়া যায় তাহাই পরম ধর্ম। কিন্তু পুরাণাদির মধ্যে যে ধর্ম বিদ্যমান তাহা অধম ধর্ম[১৪]। এখানে দেখা যায় হলায়ুধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে একমাত্র বেদকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পুরাণকে অধমধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু কালের পরিবর্তনে ক্রমশঃ পুরাণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্মৃতি-নিবন্ধকার ও ভাষ্যকারগণের মধ্যে কয়েকজন ইচ্ছাপূর্বক পুরাণের উদ্ধৃতি পরিহার করিয়াছেন। কারণ ইহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা বলিতে পারি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিশ্বরূপ পুরাণ হইতে কোন উদ্ধৃতি তাঁহার রচনায় গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন মতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে বিশ্বরূপের পূর্বে পুরাণের মধ্যে স্মৃতি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বিশ্বরূপ বেদ অপেক্ষা পুরাণকে কম মূল্য দিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ পুরাণ হইতে কোন উদ্ধৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বর বিশ্বরূপের মতকে অনুসরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি মিতাক্ষরায় পুরাণের উক্তি একেবারে অবহেলা করেন নাই। যে কয়েকটি পুরাণের উদ্ধৃতি মিতাক্ষরায় পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে বিজ্ঞানেশ্বর সম্পূর্ণভাবে পুরাণের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। ভবদেবভট্ট তাঁহার কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিতে পুরাণের কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে মৎস্যপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি পরিদৃষ্ট হয়। আবার কয়েকজন নিবন্ধকার ছিলেন তাঁহারা পুরাণকে ধর্মের প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। যদিও তাঁহাদের রচনায় প্রথমে পুরাণের প্রভাব কম ছিল, তথাপি কালের পরিবর্তনে এই প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ সময়ের পরিবর্তনে ক্রমশঃ স্মৃতিকারগণ ও জনগণ পুরাণকে মর্যাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পুরাণের জনপ্রিয়তা ও প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য[১৫] পুরাণের এই ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তার ফলেই উদারপন্থী মীমাংসা-

(১৪) "অতঃপরং পরমো ধর্মো যো বেদাদবগম্যতে।
অধমঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যঃ পুরাণাদিষু স্থিতঃ॥" [ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পৃঃ ১২]

(১৫) পুরাণমানবেতিহাসব্যতিরিক্তগৌতমবশিষ্ঠশঙ্খলিখিতহারীতাপস্তম্ববোধায়নাদিপ্রণীতধর্ম-শাস্ত্রাণাম্.........।
[তন্ত্রবার্তিক ১।৩ (জৈঃ সূঃ ১১) পৃঃ ১৭৯]

চার্য কুমারিলভট্ট পুরাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্মশাস্ত্রের সহিত সমানমূল্য দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রচারে ও প্রসারে পুরাণগুলি অনন্যোপায় হইয়া তান্ত্রিকধর্মকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথমে তন্ত্রশাস্ত্র পুরাণগুলির মধ্যে প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে[১৬]। পূজা, সন্ধ্যা, ধ্যান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই তান্ত্রিকতার নিদর্শন।

শুধু পুরাণগুলিতেই তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে নাই, বৈদিক আচার-ব্যবহারেও এই তান্ত্রিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরাণতত্ত্ববিদ্ ডঃ হাজরার মতে পুরাণের মাধ্যমেই তন্ত্রগুলি স্মৃতিনিবন্ধসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে[১৭]। কারণ

স্মৃতি-নিবন্ধে তান্ত্রিক প্রভাব

নিবন্ধ লেখকগণ স্মৃতিসংহিতা এবং পুরাণগুলিকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াই তান্ত্রিক আচার-ব্যবহার এবং শাক্তগণের পূজাপদ্ধতি তাঁহাদের নিবন্ধগুলিতে স্বীকার করিয়াছেন। তন্ত্রগুলির প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা থাকিলেও পুরাণগুলি তান্ত্রিক আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিক প্রসার পুরাণগুলিকে এই তন্ত্রগ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। পুরাণগুলির মধ্যে তান্ত্রিক আচার-ব্যবহার স্বীকৃত হওয়ায় নিবন্ধকারগণও তান্ত্রিক রীতিনীতি ক্রমশঃ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিবন্ধকারগণ পুরাণের মতগুলি গ্রহণ করিতে থাকায়

---

(১৬) Puranic Records.. ......, Dr. Hazra, P—260.

(১৭) Puranic Records......, P—260.

কিন্তু ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর (স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ১৯৯) মতে বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে তন্ত্রের প্রভাবের জন্য দায়ী পুরাণ নহে, তদানীন্তন বঙ্গসমাজ। যেহেতু খ্রীঃ অষ্টম শতকের শেষে পুরাণ তান্ত্রিকধর্মকে স্বীকার করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং খ্রীঃ একাদশ হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বঙ্গীয় নিবন্ধগুলি পুরাণের মাধ্যমে তন্ত্রদ্বারা অনায়াসেই প্রভাবিত হইতে পারিত।

এখানে বক্তব্য এই যে তখনকার সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় সমাজ স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা শাসিত ছিল এবং স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পুরাণগুলি ধর্মের প্রামাণ্য পাইয়াছে বহু পূর্বেই। তন্ত্র যদিও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ হইতে পুরাণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু স্মৃতিনিবন্ধে স্থান পায় আরও অনেক পরে। কারণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট বেদবিরুদ্ধ বলিয়া পাঞ্চরাত্র, পাশুপত প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

মনুর বচনে পাওয়া যায়, যে সকল স্মৃতি বেদমূলক নহে, আর যে সকল স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ ও অসৎতর্কমূলক, সেই সকল স্মৃতি পরলোকে ফলদায়ক হয় না, পরন্তু তদ্দ্বারা নরকফল লাভ হইয়া থাকে—সেই সকল শাস্ত্র তমঃকল্পিত মাত্র। [মনু ২।৯৫]

তান্ত্রিকধর্মকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই তান্ত্রিক প্রভাব পূর্ববর্তী নিবন্ধ অপেক্ষা পরবর্তী নিবন্ধগুলিতে অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর নিবন্ধকার শূলপাণি ভিন্ন প্রাগ্-রঘুনন্দনযুগে কোন নিবন্ধকার একখানি তন্ত্রগ্রন্থকেও প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া তাহা হইতে কোন উদ্ধৃতি স্বরচনায় প্রকাশ করেন নাই। যদিও শূলপাণির পূর্ববর্তী নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়, তথাপি স্বীয় সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য বা যুক্তির অবতারণায় কেহই কোন তন্ত্রগ্রন্থ হইতে কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ করেন নাই। শূলপাণি তাঁহার কয়েকখানি মাত্র নিবন্ধে তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলিতে তান্ত্রিকপ্রভাব অধিক পরিমাণে দেখা যায়। রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থসমূহে বহু তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। এমনকি তান্ত্রিকী দীক্ষাকে মানিয়া লইতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ তিনি সময়ের পরিবর্তনে ও সমাজের চাহিদায় তন্ত্রকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তান্ত্রিকধর্মের প্রচার ও প্রসার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবও

আবার কুমারিলভট্ট তন্ত্রবার্তিকে বলিয়াছেন যে তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ, অতএব তন্ত্রের মধ্যে যে অংশ বেদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ কুক্কুরচর্ম নির্মিত মশকের মধ্যে দুগ্ধ বা সুরাভাণ্ডে গঙ্গাজল রাখিলে, তাহা যেমন অপেয় ও অগ্রাহ্য, সেইরূপ তন্ত্রের মধ্যে বেদের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য। কারণ তন্ত্রের সহিত সেই সাদৃশ্য হয়ত হঠাৎ হইয়া গিয়াছে, সেই স্বল্প সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তন্ত্র ধর্মের প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে।

'তেন কর্মানুরূপ্যসামান্যতো দৃষ্টার্থাপত্তিবলাত্তদভিপ্রায়কল্পিতধর্মাভাসমধ্যপতিতং সন্মূলমপ্যহিংসাদিশ্বদৃতিনিক্ষিপ্তক্ষীরবদ্ অনুপযোগ্যবিস্রম্ভণীয়ঞ্চ তন্মাত্রোপলব্ধং ভবতীত্যবশ্যং যাবৎ পরিগণিতধর্মশাস্ত্রেভ্যো নোপলভ্যতে তাবদগ্রাহ্যং ভবতি।' [তন্ত্রবার্তিক ১।৩ (জৈঃ সূঃ ৭) পৃঃ ১২৪—১২৫, ১২৭]

আবার নবম শতাব্দীতে মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি, দ্বাদশ শতাব্দীতে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকাকার অপরাদিত্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেবণভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ ও পুরাণগুলিতে প্রচারিত হইয়াছে যে পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি ধর্ম বেদবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। [এই সম্বন্ধে গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি পূর্বে দেওয়া আছে, পৃঃ ১৯]

সুতরাং এই সময়ে তন্ত্রগুলি স্মৃতিনিবন্ধে গৃহীত হয় নাই।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়। অতএব স্মৃতি, পুরাণ ও মীমাংসকগণের এই দৃঢ় বন্ধনও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পুরাণের মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয় হইতেছিল। বহু পূর্বেই পুরাণ ধর্মের প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে ও স্মৃতিবিষয়ীভূত হইয়া ধর্মের প্রামাণ্যরূপে পরিচিত হইয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব পুরাণের মধ্যে পড়াতে পুরাণও স্মৃতির মধ্যে ধর্মের প্রামাণ্য হিসাবে স্থান

বৈষ্ণবোক্ত প্রেমধর্মের প্লাবনে জনগণকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের প্লাবনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিপর্যস্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত এই ধর্মদ্বয়ের প্রচণ্ড সঙ্ঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকার ধর্মের সঙ্ঘাত হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব রঘুনন্দন নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মকে,

রঘুনন্দনের তন্ত্রকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ

তথা সমাজকে রক্ষা করিতে স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া 'সমাজসংস্কারক' রূপে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে সমাজে তান্ত্রিকধর্ম ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাকে অস্বীকার করিতে গেলে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করা সুকঠিন হইবে। তখন তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তন্ত্রকে ধর্মের প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করতঃ স্বনিবন্ধে স্পষ্টতঃ ইহার উল্লেখ ও উদ্ধৃতি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শূলপাণির নিবন্ধে যাহা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ, রঘুনন্দনের নিবন্ধে তাহাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের এই উদার মতবাদ ও বহুদর্শিতার ফলেই তান্ত্রিকতার প্রবল চাপেও বৈদিকধর্ম রক্ষা পাইয়াছে।

পাওয়াতে পুরাণের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তন্ত্রও স্মৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তন্ত্রগুলি তখন ধর্মের প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে থাকিল। এইজন্য স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে তন্ত্রের প্রচুর বচন উল্লিখিত দেখা যায়। নূতন প্রচারিত তন্ত্রগুলি বৈদিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই ভাবেই স্মৃতিনিবন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র প্রাধান্য পাইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধ যে রাজনৈতিক[১] ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে রচিত হইয়াছে তাহার প্রভাব যে কতখানি ইহাতে পড়িয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন আছে। বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ শুধুমাত্র স্বপ্রতিভাপ্রসূত গ্রন্থ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, সমাজ ও ধর্ম রক্ষার দায়িত্বও তাঁহারা স্বস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাগ্-রঘুনন্দনযুগে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা

এইজন্য সমাজব্যবস্থা কালোপযোগী করিবার নিমিত্ত পূর্বব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে হইয়াছে। একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ, দেশের বিরুদ্ধবাদিগণের আন্দোলন, সমাজের বিপর্যয় প্রভৃতির পটভূমিকায় শাস্ত্র আলোচনা করিয়া হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহারা সপ্রশংস চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্মৃতিনিবন্ধসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অদ্যাবধি বঙ্গদেশে সকলে মান্য করিয়া চলিতেছে। সমাজের এই বিপর্যয়ের মুখে পড়িয়া রঘুনন্দন প্রাচীনস্মৃতিসম্মত ব্যবস্থাগুলি কালোপযোগী ও সমাজোপযোগী করিবার জন্য বহুক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের সাহায্যে সংস্কার করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। যে রাজনৈতিক পটভূমিকায় স্মৃতিনিবন্ধসমূহ বিশেষ করিয়া রঘুনন্দনের নিবন্ধসমূহ প্রণীত হইয়াছে তাহারই এখন আলোচনা করা হইতেছে।

বাংলাদেশ মূলতঃ আর্যেতর জাতির দেশ। এই বাংলা বা প্রাচ্যদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত কেহ আগমন করিলে আর্যগণের নির্দেশে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। স্মার্ত রঘুনন্দন এই বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়াছেন।—

"সিন্ধুসৌবীরসৌরাষ্ট্রাংস্তথা প্রত্যন্তবাসিনঃ।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গৌড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি ॥
তীর্থযাত্রাব্যতিরেকেণেতি দ্রষ্টব্যমিতি মিতাক্ষরা।"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব পৃঃ ১৪১)

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব হইতেই দলে দলে আর্যগণ ক্রমশঃ এইদেশে বসবাস করিতে

---

(১) এই বিষয়ে প্রামাণ্যগ্রন্থ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের **'History of Bengal', Vol I&II.**

আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে মৌর্যসম্রাট্‌গণের আমলে তাঁহারা বঙ্গদেশের অধিবাসিরূপে গণ্য হইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইতে থাকেন। কিন্তু হিন্দু গুপ্তরাজগণের আমলে আর্যগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন অবস্থা হইতে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আর্যজাতীয় ব্রাহ্মণগণ বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকেন। তাঁহারা বৈদিক, সারস্বত ও সপ্তশতী নামে পরিচিত। কিন্তু পরে পালরাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গোপাল ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও ধর্মপাল প্রজাগণের ধর্মানুষ্ঠানবিষয়ে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র দেবপাল রাজা হন। বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলে আর্য ব্রাহ্মণগণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা হারাইয়া বসিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পাল-রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন পূর্ববঙ্গে বর্মন্ উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের রাজা বা রাজত্বকালের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। শোনা যায় যে এই বংশের অধিপতি বজ্রবর্মা জ্ঞানী, কবি ও বীর হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তারপর তৎপুত্র জাতবর্মা রাজা হইয়া সার্বভৌমত্ব লাভ করেন। জাতবর্মার পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন তৎপুত্র সামলবর্মা। তাঁহার পর হরিবর্মা রাজা হন। হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধকার ভবদেবভট্ট। তাঁহার পাণ্ডিত্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। হরিবর্মার পর তৎপুত্র ভোজবর্মা রাজা হন। ভোজবর্মার পর এই বংশের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সেনরাজগণের হস্তে এই বংশের উচ্ছেদ হইয়াছিল।

এই বংশের পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক সেনরাজগণ বঙ্গদেশের রাজত্বভার গ্রহণ করেন। শৈবধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধ পালবংশীয়-গণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেশমধ্যে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ফলে উহা ক্রমে হীন হইতে হীনবল হইতেছিল। এক্ষণে রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া আর্যধর্ম বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রসারিত হইয়া পড়িল।

বাংলায় হিন্দু শূরবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূর ও তৎপরবর্তী সেনরাজগণের

সময়ে কান্যকুব্জ হইতে আগত নূতন ব্রাহ্মণদল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়া এইদেশে বাস করিতে থাকেন এবং নূতনভাবে বাংলার হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিতে থাকেন। সেনরাজগণ একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ অবধি রাজত্ব করেন। সেনরাজগণের মধ্যে সামন্তসেনের নামই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তারপর হেমন্তসেন এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিজয়সেন সমগ্র বাংলাদেশে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয়সেনের পর তৎপর বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শুধু রাজা হিসাবেই প্রসিদ্ধ নহেন, তিনি যে যাগযজ্ঞাদি-ধর্মানুষ্ঠানে রত প্রবীণ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার রচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুইখানি গ্রন্থ। বঙ্গদেশে বল্লালসেন সমাজসংস্কারক হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কতিপয় জাতির মধ্যে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। তিনি শাস্ত্রচর্চা ও শস্ত্র-চালনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করতঃ বানপ্রস্থ অবলম্বন-পূর্বক শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

বল্লালসেনেরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বাংলায় মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত হইয়া ওঠে। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকলে মিলিয়া স্ব-স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনায় নিরত হইয়া বৌদ্ধধর্মের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট থাকেন। স্মৃতিকারগণ বৌদ্ধ মন্দির বা বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিধান দেন। কিন্তু বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে ধর্মবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্যই শৈবরাজা লক্ষ্মণসেন শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণসেন শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। রাজধানী গৌড়ের 'লক্ষ্মণাবতী' নাম সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের নাম অনুসারেই হইয়াছিল এবং সর্বপ্রথম তাঁহার তাম্রশাসনেই সেনরাজগণের নামের পূর্বে গৌড়েশ্বর এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি নিজে সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন এবং উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম স্তম্ভরূপে পরিচিত। প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব তাঁহার রাজসভার উজ্জ্বলতম রত্ন।

লক্ষ্মণসেনের শেষ বয়সে রাজ্যে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সূচনা দেখা দেয়। আঞ্চলিক বিদ্রোহে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে তুর্কী যোদ্ধা বখ্‌তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে একদল মুসলমান বাংলাদেশ আক্রমণ করে। এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে

প্রতিহত করিবার ক্ষমতা তখন লক্ষ্মণসেনের ছিল না। অনন্যোপায় লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহাতে তাঁহার শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই মুসলমান রাজত্ব এতদ্দেশে স্থাপিত হওয়ার ফলে সামাজিক বিপ্লব উৎকটরূপে প্রকট হয়। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দুরাজত্ব বঙ্গদেশ হইতে নির্মূল হইয়া যায়।

সেনরাজগণের সুশাসনে একদিকে যেমন দেশে শান্তি ও সুখই মাত্র বিরাজিত ছিল না, পালরাজত্বকালে যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল, তাহার হাত হইতে হিন্দু ব্রাহ্মণগণের সমাজ ও ধর্ম রক্ষা পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথার্থ পরিপোষক ছিলেন এই সেনরাজগণ। তাঁহাদেরই অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা পাইয়াছিল।

অতঃপর মুসলমানেরা নবদ্বীপ জয় করিয়া গৌড় ও বরেন্দ্র ভূমিকেও স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। অচিরেই সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজত্বকালে হিন্দুদের মঠ মন্দির প্রভৃতি কলুষিত হইয়া মসৃজিদে পরিণত হইয়াছিল এবং বহু হিন্দুকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।

১২২৭-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই ষাট বৎসরের মধ্যে পনরজন শাসনকর্তা ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই পনরজনের মধ্যে দশজন দিল্লীর মামলুক ছিলেন। এই মামলুকগণ ক্ষমতা অধিকার করিবার লোভে নানাপ্রকার বিদ্রোহ হত্যা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি দ্বারা বঙ্গদেশ জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট ঘিয়াসুদ্দিন বলবনের কালে তুঘ্রল খাঁ নামক একজন মামলুক বঙ্গদেশের স্বাধীন শাসক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন। বাল্যজীবনে তিনি ছিলেন একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন তৎপুত্র নাসিরুদ্দিন মহম্মদ বুঘরা খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা-রূপে প্রেরণ করেন। বুঘরা খাঁ তুঘ্রলখাঁকে যুদ্ধেপরাজিত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসন-কার্য গ্রহণ করেন। এই বলবন্‌গণ নিরতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে বহু মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দুও ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

ইহার পর নূতন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুত্থান দ্বারা। চতুর্দশ শতকে এই বংশের শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও পরে তৎপুত্র সিকন্দার শাহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। এই বংশের রাজত্ব কালের শেষে পুনরায় কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশ হিন্দুরাজগণের অধীন হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতকে রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব বঙ্গদেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর
জালালুদ্দিন নামে
দেশে সংস্কৃত বিদ্যা
বিখ্যাত স্মৃতিনিব
ইহার পর
রাজত্ব করে। তা
অধিকার করিয়া
রাজত্ব করেন।
হয়। তাহার পর
দেশের ধর্ম
হইয়াছিল, তাহার
স্পষ্টভাবে বর্ণিত
এই বিষয়ের যথেষ্ট
সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হ
বাংলা সাহিত্যে
যে এই দেশে সম্
আমরা দেখি নারা
প্রভৃতিতেও এই যু
আগমনজনিত বিপ
প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতা
বর্ণিত আছে।
রঘুনন্দনের
বৈদেশিক আক্রমণ
পালরাজগণের সম
জাতিভেদ প্রথা প্র
সমধিক অবনতি ঘ
প্রসার অনেক কমি
দেয়।

(২) বৃহদ্ধর্মপুরাণ
(৩) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়মল বা যদুসেন মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন নামে সিংহাসন অধিকার করেন। এই জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে দেশে সংস্কৃত বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়া বিখ্যাত স্মৃতিনিবন্ধকার বৃহস্পতিরায়মুকুট অনেক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলিয়াসশাহী বংশ রাজত্ব করে। তারপর ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হুসেন শাহীবংশ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। ইহারপর এইবংশের হুসেন শাহ ও তৎপুত্র নুসরৎ শাহ রাজত্ব করেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বঙ্গের সিংহাসন আফগানদের অধিগত হয়। তাহার পর মুঘলগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন।

দেশের ধর্মীয় আন্দোলন ও বৈদেশিক আক্রমণে যে বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় সমসাময়িক সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে[২] কলিযুগের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতে এই বিষয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও[৩] এই বিষয়ের সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম ও নানারূপ লৌকিক ধর্মের পরিপুষ্টি-লাভ যে এই দেশে সম্ভব হইয়াছিল তাহার পরিচয় মেলে। প্রাগ্-রঘুনন্দন যুগে আমরা দেখি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতিতেও এই যুগের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই গ্রন্থসমূহে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনজনিত বিপর্যয়, তদানীন্তন দেশজ দেবদেবী মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, বাঁশলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাগণের জনপ্রিয়তা এবং তান্ত্রিকধর্মের প্রসার প্রতিপত্তির কথা বর্ণিত আছে।

রঘুনন্দনের পূর্বে এই প্রকার দেশের ধর্মীয় বিপর্যয় ও একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। পালরাজগণের সময়ে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য দেখা দেয়; বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রায় তিরোহিত হয়। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রকথিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমধিক অবনতি ঘটে। আবার শৈবধর্মাবলম্বী সেনরাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার অনেক কমিয়া আসিলেও বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

---

(২) বৃহদ্ধর্মপুরাণ ১।১৯।১২-৩৮।

(৩) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পৃঃ ২৮।

কিন্তু এই সব ভারতীয় ধর্মগুলির প্রচারে যত না বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহার অনেক বেশী বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছিল নবাগত মুসলমানদের আক্রমণে। মুসলমানগণের মধ্যে প্রথম বখ্‌তিয়ার খিলজি নবদ্বীপ জয় করেন। নবাগত মুসলিম ধর্মীয়গণের অত্যাচারে হিন্দুমাত্রেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি—সমস্তই এই বিজেতা মুসলমানগণের অত্যাচারে ও অনাচারে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, ধর্মগুলি হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মাচরণের কঠোর বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। আবার তান্ত্রিক ধর্মের নামে দেশে ব্যভিচার ও সুরাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে দেশের অবস্থা

তন্ত্রের সত্যধর্ম ত্যাগ করিয়া লোকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। মৎস্য, মদ্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা—এই পঞ্চ মকারের বশবর্তী হইয়া জনগণ যথেচ্ছাচার প্রচার করিতেছিল। জনগণ কার্যে সিদ্ধিলাভের জন্য মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্টসাধক ষট্‌কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তান্ত্রিক ধর্মের চক্র বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। আবার ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্র পানভোজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। জনগণ অহরহ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে নৈতিক চরিত্র বিসর্জন দিয়াছিল। মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া লোকে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সামান্য জীবহিংসা হইতে আরম্ভ করিয়া নরহত্যা পর্যন্ত অবাধে চলিতেছিল। মুসলমানগণের অমানুষিক বর্বরোচিত অত্যাচারে ও তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুগণ বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুগণের নিষ্ক্রিয়তাও দেশ এবং ধর্মের আরও অবনতি ঘটাইয়াছিল। মুসলমানদের সংস্রবে হিন্দুগণ বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বহুবিবাহ প্রথা এই সময়ে দেশমধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিলাসিতার স্রোতে হিন্দুদের সত্য, ধর্ম, ভক্তি, ভাব প্রভৃতি নষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানদের অযথা পীড়নে কত হিন্দু যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু সমাজ ও ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় পরিণতি, তখন সমাজ ও ধর্মরক্ষাকর্তা ব্রাহ্মণগণ ভক্তিশূন্য ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্কে আত্মনিয়োগ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং তখনকার সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এমন একটি সমাজব্যবস্থার, যাহা জনগণকে এই অসহায় অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইজন্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্ণাশ্রমধর্মকে

জনপ্রিয় করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সঙ্গে হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি বিষয়ে নূতন স্মৃতিনিবন্ধ রচনারও প্রয়োজন ছিল এবং পুরাণ ও স্মৃতি-নিবন্ধের মধ্যে যে সব মতপার্থক্য ছিল তাহার অবসান ঘটাইয়া সমাজ-ব্যবস্থায় উদারনীতি প্রবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল।

সুখের বিষয় এই যে সমাজ রক্ষার প্রচেষ্টা হিন্দুগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই—রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা জনপ্রিয় করিবার আগ্রহ দেখা দিয়াছিল।

বেদোক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিন্তু অবনতির পথেই নামিতে লাগিল। কারণ তন্ত্রোক্ত ধর্ম আস্তিকধর্ম হইলেও বেদবাহ্য বলিয়া বৈদিক পণ্ডিতগণের ধারণা, অন্যদিকে আমরা দেখি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম খুব বড় ধর্ম হইলেও জাতিভেদ প্রথার পরিপোষক নহে বলিয়া প্রকারান্তরে শাস্ত্রোক্তধর্মের প্রতিকূল, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। রঘুনন্দন এই দুই বিরাট্ প্লাবনে বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে রক্ষা করিবার সকল দায়িত্ব স্বয়ং মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সুবিখ্যাত 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' রচনা করিয়া হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সমাজের তাৎকালিক অবস্থায় পূর্বযুগের ঋষিগণ প্রবর্তিত সমস্ত বিধিনিষেধের অনুবর্তী হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, তাই তিনি পূর্বপ্রচারিত কঠোর বিধিসমূহ শিথিল করিয়া এবং দেশকালপাত্রের উপযোগী করিয়া সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনন্দন যে কেবল বিধিনিষেধের শিথিলতাই প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা নহে, স্থলবিশেষে আবশ্যকবোধে তিনি শাস্ত্রীয় আচারে কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কোন আচারবিশেষের প্রবর্তনে তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বাক্যের উপরই নির্ভর করেন নাই, শাস্ত্রীয় যুক্তিরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বগ্রন্থে তিনি—

> "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥" (পৃঃ ১৯৪)

এই বচন উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম নির্ণয়ে যুক্তিরও যে সারবত্তা আছে ইহা প্রকটিত করিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রঘুনন্দন সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়াই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং যুগোপযোগী সমাজব্যবস্থায় দেশ ও ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে।

সমাজসংস্কারকের অমূল্য জয়মালা তাঁহারই প্রাপ্য এবং বঙ্গদেশবাসিগণের নিকট হইতে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উদারতার সঙ্গে কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মহামানব সংকীর্ণতা দোষ-গ্রস্ত বলিয়া যদি কেহ মনে করেন তাহা তাহার অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করিবে। কারণ তখনকার রাজনৈতিক বিপ্লব, ধর্মীয় বিপর্যয় ও সমাজের অধঃপতনে রঘুনন্দনের ন্যায় একজন উদার অথচ কঠোর সমাজসংস্কারকের অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। রঘুনন্দন এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

রঘুনন্দন অবস্থাভেদে স্মৃতির অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার তিথিতত্ত্বে প্রত্যেক তিথিতে আচরণীয় কার্যাবলীর নির্দেশ দেন। আহারাদির বিষয়েও তিনি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রবর্তিত বিধিব্যবস্থা হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সিদ্ধচাউল ও মসূর ডাল ভক্ষণ সাধারণতঃ তিনি নিষিদ্ধ করেন নাই। কারণ সমাজমধ্যে বহুলোকই সিদ্ধচাউল ও মসূর ডাল ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল।

আর এতৎকালেই শূলপাণি, বৃহস্পতিরায়মুকুট, শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি প্রভৃতি স্মার্তগণ জনগণকে তখনকার সমাজের বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের নিবন্ধগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রন্থারম্ভে ও সমাপ্তিতে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার যে সকল সন্দেহ ও ভ্রান্তি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা নিরসনের জন্যই তাঁহারা নিবন্ধ রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

তখন ধর্মের নামে যে যথেচ্ছাচার চলিতেছিল তাহা নিবারণ করিতে ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের নবদ্বীপে তান্ত্রিক আচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবনের সাধক শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সমাজ ও ধর্ম রক্ষা করিতে, ধর্মে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমসাময়িকভাবেই স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দনের আবির্ভাব।

কৃষ্ণানন্দই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তির পূজার প্রবর্তন করেন। তন্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি আগমবাগীশ নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রচারে প্রেমভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার হরিভক্তি প্রচার বিভিন্ন হিন্দুসমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করিল। তাঁহার মতে—'চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ'[৪] অর্থাৎ হরির প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে। তখন আর জাতিভেদের কথা থাকে না।

(৪) গোপালভট্টের হরিভক্তিবিলাস, দশমবিলাস, শ্লোক ১০৬।

কিন্তু রঘুনন্দন
কারণ পূর্বে এইসব
ব্যভিচার সমাজে প্রক
উপবাসাদি ও অন্য
প্রসাধন—এই তিনটি
দিয়া গিয়াছেন।
আবার রঘুনন্দন
চণ্ডালাদির সহিত ব্র
করিলে তাহাদিগকে
হয় তাহা হইলে প্রায়
কিন্তু যদি জ্ঞানকৃত
হইলেও সমাজে তাহার
না, অর্থাৎ তাহার ব্যব
রঘুনন্দনের ব্যবস্থা
অন্ন গলাধঃকরণ না
এমনকি ঐ অন্নভক্ষণে
চণ্ডালস্পৃষ্ট অন্ন এবং
চণ্ডালদের অন্নপাক ক
বলিয়াছেন[৫]।
এই সব ব্যবস্থা
সমাজে যবনদের অনাচা
করিয়া সমাজে শান্তি,
অতএব তখনকার সময়ে

(৫) এই বিষয়গুলি অষ্টম
৩

কিন্তু রঘুনন্দন হিন্দু বিধবাদের আচার-ব্যবহারের কঠোরতা প্রবর্তন করেন। কারণ পূর্বে এইসব বিধবাদের আচারাদি শাস্ত্রসম্মত না থাকায় নানাপ্রকার ব্যভিচার সমাজে প্রকাশ পাইতেছিল। তাহা নিবারণের জন্য তিনি একাদশীতে উপবাসাদি ও অন্যান্য আচারাদির কঠোরতা সমর্থন করেন। শয়ন, ভোজন, প্রসাধন—এই তিনটি বিষয়েই বিধবাগণের পক্ষে কঠোরতা পালনে তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

আবার রঘুনন্দন ব্রাহ্মণদের জাতিধর্ম রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন—চণ্ডালাদির সহিত ব্রাহ্মণগণের একত্র পান ভোজন নিষিদ্ধ। এইরূপ পান ভোজন করিলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই ভোজন যদি অজ্ঞানকৃত হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই শুদ্ধি ও সমাজে তাহাকে গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু যদি জ্ঞানকৃত হয় এবং পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইলেও সমাজে তাহার সহিত কেহ মেলা-মেশা, আদান-প্রদান ইত্যাদি করিবে না, অর্থাৎ তাহার ব্যবহারিতা সমাজে নিষিদ্ধ হইবে।

রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় চণ্ডালাদির অন্নভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ঐ অন্ন গলাধঃকরণ না করিয়া শুধুমাত্র মুখে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। আবার এমনকি ঐ অন্নভক্ষণে কেহ উদ্যম করিলেই তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চণ্ডালস্পৃষ্ট অন্ন এবং উদক-পানেও তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং চণ্ডালদের অন্নপাক করিবার পাত্রে পর্যন্ত অন্ন পাক করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন[৫]।

এই সব ব্যবস্থা যদিও কঠোরতারই নামান্তর, তথাপি রঘুনন্দনের সময়ে সমাজে যবনদের অনাচারে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্যই রঘুনন্দনের এই প্রয়াস। অতএব তখনকার সময়ে এই কঠোরতারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

---

(৫) এই বিষয়গুলি অষ্টম পরিচ্ছেদে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাগ্‌-রঘুনন্দন সমাজ-ব্যবস্থায় বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের অবদান

স্মৃতিনিবন্ধসাহিত্যে অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার আছেন। এই নিবন্ধকারগণ মাত্র গ্রন্থরচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, দেশ ও সমাজ-রক্ষা বিষয়েও তাঁহারা সম্যক্‌ অবহিত ছিলেন। বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে একের পর এক সনাতনধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বৈদেশিক আক্রমণ চলিয়াছে। একদিকে বেদবিরুদ্ধ জৈন বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি, অপর-দিকে মুসলমানদের আক্রমণ ও অত্যাচার বঙ্গদেশকে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাগ্‌-রঘুনন্দন নিবন্ধকারগণের মধ্যে আমরা দেখি কেহ বা ধর্ম ও সমাজরক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছেন, আবার কাহারও বা শাস্ত্রচর্চা শুধু বিদ্যাপ্রচারেই পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিষয়ই এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। পাল ও বর্মনযুগে বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয়, যোগ্‌লোক, বালক, ভবদেবভট্ট ও জীমূতবাহন অন্যতম। আবার সেনযুগে অনিরুদ্ধভট্ট, বল্লালসেন ও হলায়ুধ প্রসিদ্ধ। তৎপরে মুসলমানগণের আমলে নিবন্ধকারগণের মধ্যে শূলপাণি, বৃহস্পতিরায়মুকুট, শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন শ্রেষ্ঠ।

১। পাল ও বর্মনযুগে নিবন্ধ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে নিবন্ধকারগণের মধ্যে অনেকের গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী নিবন্ধকারগণের উদ্ধৃতিতে তাঁহারা এখনও সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কত যে নূতন বিষয় ও ভাবধারা আমরা অবগত হইতে পারিতাম তাহার সীমা নাই। তাঁহাদের সময়কার সামাজিক অবস্থা, সমাজ ও ধর্মের প্রতি তাঁহাদের সুকঠিন দায়িত্ব, ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের গ্রন্থ-গুলির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এইসব পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয়, বালক ও যোগ্‌লোকের নাম আমরা স্মরণ করিতে পারি।

(ক) জিতেন্দ্রিয়

সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে[১] জিতেন্দ্রিয় বর্তমান ছিলেন। জীমূত-

(১) Hist. of Dharma Sastra, Vol. I, P—283.

বাহন তাঁহার কালবিবেকগ্রন্থে অন্যতম নিবন্ধকাররূপে জিতেন্দ্রিয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দায়ভাগে এবং ব্যবহারমাতৃকায় জিতেন্দ্রিয়ের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের দায়তত্ত্বেও ইহার উদ্ধৃতি পরিদৃষ্ট হয়।

(খ) বালক

একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী[২] নিবন্ধকার বালকের নাম জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। বালক ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আবার বালকের উক্তিকে জীমূতবাহন 'বালবচন' বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন[৩]।

(গ) যোগ্‌লোক

দশম শতাব্দীর শেষভাগে বা একাদশ শতাব্দীর[৪] প্রারম্ভে যোগ্‌লোক বর্তমান ছিলেন বলিয়া জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি ব্যবহার ও কাল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অনুমিত হয় যে জিতেন্দ্রিয় ও বালক অপেক্ষা যোগ্‌লোক পূর্ববর্তী নিবন্ধকার।

(ঘ) ভবদেবভট্ট

ভবদেবভট্ট সামবেদের কৌথুমশাখার অন্তর্গত সাবর্ণগোত্রজাত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী রাজা হরিবর্মদেবের 'সান্ধিবিগ্রহিক' মন্ত্রী।

উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে ভবদেবভট্টের গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ভবদেবভট্ট ছিলেন পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, গ্রন্থরচয়িতা, জলাশয় ও মন্দির স্থাপনে এবং প্রতিমূর্তি নির্মাণে উৎসাহদাতা। সেই যুগের অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হিসাবে তিনি খ্যাত। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ, অদ্বৈতবেদান্তে নিরতিশয় অভিজ্ঞ। আবার অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতিতেও তাঁহার জ্ঞানের সীমা পরিসীমা ছিল না। কুমারিলভট্টের গ্রন্থ তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। 'বালবলভীভুজঙ্গ' বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিতে তিনি অত্যন্ত সম্মান বোধ করিতেন।

---

(২) Hist. of D. S. Vol. I, P—284.

(৩) যচ্চ বালকেনোক্তমসবর্ণাবিষয়ং বা যুবত্যভিপ্রায়ং বা......অব্যবস্থিতশাস্ত্রার্থকথনেনাত্মনো বালরূপত্বমেব প্রকটীকৃতম্। [দায়ভাগ ১১।১]

(৪) Hist. of D. S. Vol. I, P—287.

তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি', 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ', 'শবসূতকাশৌচ-প্রকরণ', 'সম্বন্ধবিবেক', 'তৌতাতিতমততিলক' এবং 'ব্যবহারতিলক' উল্লেখযোগ্য। তবে ব্যবহারতিলক গ্রন্থখানি এখন দুর্লভ।

ভবদেবভট্ট ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক। সেইজন্য তিনি বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য বিরোধী ধর্মগুলির বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সমাজে বৈদিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে মীমাংসকপ্রধান কুমারিলভট্টের যুক্তি সমর্থনে ভবদেব তন্ত্রবার্তিক আলোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা গ্রন্থ তৌতাতিতমততিলক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থে বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধাদিগ্রন্থের অপ্রামাণ্য তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন[৫]। তাঁহার গ্রন্থসমূহ ভারতের স্মৃতিকারগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করেন।

স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে ভবদেব এমন একজন নিবন্ধকার ছিলেন যাঁহার প্রভাব সামাজিক জীবনে সবিশেষ বিস্তারলাভ করিয়াছিল। অদ্যাবধি তাঁহার সেই প্রভাব সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কারণ ভবদেব রচিত কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিতে নির্দেশিত বিধি অনুসারেই এখনও সামবেদিগণের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি দশ সংস্কার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ—এই তিনটি সংস্কারই প্রচলিত আছে। রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্ব ভবদেবের মত অনুসারে লিখিত হইলেও কোনও কোনও স্থলে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাহা সমাজে প্রচলিত হয় নাই। এবিষয়ে ভবদেবের কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতির প্রামাণ্য অত্যন্ত বেশী। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে ভবদেব বঙ্গদেশে মৎস্যের বহুল প্রচলন দেখিয়া সকলের পক্ষেই ইহা ভক্ষণীয় বলিয়া সর্বপ্রথম শাস্ত্রীয় বিধির প্রবর্তন করেন। মাংসভক্ষণেও তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন[৬]।

শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রাচীন অস্পষ্ট ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিয়া ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় সেই সময়ের উপযোগী নূতন বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন এবং স্মৃতির যে সকল আচার সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিত তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের প্রভায় অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন নিবন্ধ রচনা করতঃ

---

(৫) বুদ্ধাদিস্মৃতিবচনন্তু ঘুণাক্ষরন্যায়েন বেদাবিরুদ্ধমপীদানীন্তননিরূপিতাপ্তবচনমিবাপ্রমাণমিতি। [তৌতাতিতমততিলক, পৃঃ ৮১]

(৬) অনিষিদ্ধমৎস্যমাংসভক্ষণে তু দোষাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তাভাবঃ।......
অতো মৎস্যমাংসভক্ষণে দোষাভাব এব ইত্যবগম্যতে। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৬৭-৬৮

রণ*, "শবসূতকাশৌচ-
তিলক' উল্লেখযোগ্য ।

ইজন্য তিনি বৌদ্ধধর্ম ও
রিয়া ছিলেন। সমাজে
ভট্টের যুক্তি সমর্থনে
তৌতাতিতমততিলক
ন্থের অপ্রামাণ্য তিনি
কারগণ পরম শ্রদ্ধার

ন্ধকার ছিলেন যাঁহার
। অদ্যাবধি তাঁহার
ত কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিতে
ন, উপনয়ন, বিবাহ
ন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও
সংস্কারতত্ত্ব ভবদেবের
রীত্য লক্ষ্য করা যায়।
বর কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতির
মৎস্যের বহুল প্রচলন
বিধির প্রবর্তন করেন।

ন অস্পষ্ট ব্যবস্থাকে
উপযোগী নূতন বিধি-
ক সন্দেহ দেখা দিত
ন অন্ধকার বিদূরিত
নিবন্ধ রচনা করত:

থবচনমিবাপ্রমাণমিতি।
তাতিতমততিলক, পৃঃ ৮১]

য়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৬৭-৬৮

গ্রন্থগুলির গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছেন এবং মুনিগণের ধর্মগাথাগুলিকে বিশদ্‌ভাবে আলোচনাপূর্বক স্মার্তক্রিয়াকাণ্ডের সংশয়গুলিকে সর্বপ্রকারে দূরীভূত করিয়াছেন[৭]।

ইহাতে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ভবদেব ছিলেন বৌদ্ধধর্মের ঘোরতরবিরোধী। এইজন্য তাঁহাকে বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগস্ত্যমুনি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার তিনি 'পাষণ্ডবৈতণ্ডিক' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, অর্থাৎ পাষণ্ড শাস্ত্রগুলির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল[৮]। নবীন হোরাশাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা বলিয়াও তিনি প্রসিদ্ধ এবং স্বয়ং অপর বরাহমিহিররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেন। সূর্যের সহস্র রশ্মির মত মীমাংসা গ্রন্থে তিনি সহস্র সহস্র যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

তখনকার সমাজে যে বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণও সময়ে সময়ে স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার পালন করিতেছিলেন তাহা আমরা ভবদেবের উক্তি হইতেই জানিতে পারি। এখানে সহমরণ ও অনুমরণ প্রথা তিনি স্বীকার করেন[৯]।

ভবদেবভট্ট একাদশ শতাব্দীর নিবন্ধ-রচয়িতা। সেই সময় চতুর্দিক হইতে সমাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য অদম্য প্রচেষ্টা চলিতেছিল। অবশ্য এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্যের আমল হইতে। কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্যের সময় হইতে এই আন্দোলন আরম্ভ হইলেও ভবদেবের সময় ইহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। পাল সাম্রাজ্যে রাজকীয় ধর্মও বৌদ্ধধর্মে পর্যবসিত হইয়াছিল। এই বেদবিরুদ্ধ ধর্ম হিন্দুসমাজের মূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং সেই যুগে আমরা মাত্র নিবন্ধকার ভবদেবভট্টকেই পাই, যিনি বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য বিরোধী ধর্মগুলির বিপক্ষে ব্রাহ্মণ্য-আচারবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভবদেবভট্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মকে

---

(৭) যো ধর্মশাস্ত্রপদবীষু জরন্নিবন্ধান্
অন্ধীচকার রচিতোচিতসংপ্রবন্ধঃ।
স্বব্যাখ্যয়া বিশদয়ন্ মুনিধর্মগাথাঃ
স্মার্তক্রিয়াবিষয়সংশয়মুন্মমার্জ ॥ [শবসূতকাশৌচপ্রকরণের ভূমিকা, পৃঃ ৪]

(৮) বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোয়মবনৌ সর্বজ্ঞ-লীলায়তে ॥ [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের ভূমিকা, পৃঃ ১]

(৯) দৃশ্যন্তে চাদ্যত্বেঽপি বেদব্যবহারিণামেব ধর্মবোধেহনাচারাঃ স্মৃতিবিরুদ্ধাঃ। যথা দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণীনামনুমরণম্। [তৌতাতিতমততিলক, পৃঃ ১০০]

রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়া ধর্মের প্রামাণ্য হিসাবে পুরাণের প্রামাণ্য ঠিক সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই দেখা যায় যে তিনি তাঁহার কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতিতে কোন পুরাণ হইতে কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে মৎস্যপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আবার তাঁহার সম্বন্ধবিবেক গ্রন্থে তিনি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তিন পংক্তি ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শবসূতকাশৌচপ্রকরণে তিনি কেবল মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি পুরাণের প্রামাণ্য সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। এইজন্য আমরা পুরাণের উদ্ধৃতি কোন গ্রন্থে একেবারেই দেখিতে পাই না, আবার কোন কোন গ্রন্থে অল্প পরিমাণে দেখিতে পাই। ইহা পরিস্ফুট যে তিনি পুরাণকে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের সহিত সমমূল্য দান করেন নাই।

ভবদেবভট্ট কি নূতন স্মৃতি রচনা দ্বারা হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিংবা সমাজকে নূতনভাবে গঠন করার প্রয়াসী হইয়াছিলেন—ইহা বিবেচ্য। ভবদেবভট্টের গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি যে ভাবে শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তিনি গ্রন্থগুলির আলোচনায় কেবল নিজের পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য ইতিহাসে সমাজসংস্কারকরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হয় নাই। তবে সমাজের কোন স্থায়ী উন্নতি করিতে না পারিলেও তদানীন্তন সমাজ তাঁহার নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতিগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং উহা আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে।

(৬) জীমূতবাহন

ধর্মশাস্ত্রে বঙ্গীয় তিন জন শ্রেষ্ঠ নিবন্ধকারদের মধ্যে জীমূতবাহন অন্যতম। এই তিন জনের মধ্যে জীমূতবাহনই সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হন এবং অপর দুইজন হইলেন শূলপাণি ও রঘুনন্দন[১০]।

জীমূতবাহন গ্রন্থশেষে স্বকীয় উক্তিতে পারিভদ্রীয় মহামহোপাধ্যায় বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দায়ভাগ ও ব্যবহারমাতৃকার সমাপ্তিতে

(১০) "Jimutavahana is the first triumvirate of Bengal writers of Dharmasastra, the other two being Sulapani and Raghunandana."

[Hist. of Dharma Sastra, Vol I, P—318]

জানাইয়াছেন যে তিনি পারিভদ্র বংশীয়। এই পারিভদ্রকুল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। এখনও পারিহাল বা পারিগাঁই নামে এই বংশ বর্তমান আছে। কালবিবেক গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে জীমূতবাহন রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তী জীমূতবাহন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে করেন[১১]। মহামহোপাধ্যায় কাণে মহাশয় ১০৯০ খ্রীঃ হইতে ১১৩০ খ্রীঃ মধ্যে জীমূতবাহনের কাল বলিয়া উল্লেখ করেন[১২]।

জীমূতবাহনের তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দায়ভাগ'। বাংলাদেশে উত্তরাধিকার, বিভাগ, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে হিন্দু ল'-এর মূল ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে দায়ভাগ বিখ্যাত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ, পিতামহের সম্পত্তি ও তাহার বিভাগ এবং দায় বা অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভৃতি দায়ভাগে আলোচিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকানিবন্ধ মিতাক্ষরার সহিত দায়ভাগের মূলগত কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান আছে। যেমন—দায়ভাগে উপরমস্বত্ববাদ এবং প্রাদেশিকস্বত্ববাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মিতাক্ষরায় গৃহীত হইয়াছে জন্মস্বত্ববাদ ও সামুদায়িকস্বত্ববাদ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দায়ভাগ রচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সমগ্র বঙ্গদেশে, আসামে ও নেপালের কিয়দংশে দায়ভাগের অভিমত প্রচলিত হয়। এই তিনটি স্থান ব্যতীত ভারতের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সর্বত্র এবং দক্ষিণ বিহার, কাশী ও উড়িষ্যায় প্রধানভাবে মিতাক্ষরার মতই গৃহীত। কিন্তু বঙ্গদেশ বরাবরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান্। সেইজন্য এখনও জীমূতবাহনের দায়ভাগমতই বঙ্গে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য সূচিত করে ইহার টীকাগ্রন্থের বাহুল্য। এই টীকাসমূহের মধ্যে ভরতশিরোমণি মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত ছয়টি টীকা সমাজে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। এইগুলির মধ্যে রঘুনন্দন প্রণীত একখানি টীকাগ্রন্থ আছে। দায়ভাগ গ্রন্থ জীমূতবাহনের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় বহন করে।

জীমূতবাহনের অপর গ্রন্থ 'ব্যবহারমাতৃকা'। এই গ্রন্থে ব্যবহার অর্থাৎ বিচার-বিভাগীয় রীতিনীতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যবহারের চারিটি অংশের আলোচনা দেখা যায়। এই চারিটি অংশ হইতেছে—ভাষাপাদ, উত্তরপাদ,

(১১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1915, P—326.
(১২) Hist. of D. S., Vol. I, P—326.

প্রামাণ্য ঠিক সর্বান্তঃ-
যে তিনি তাঁহার
করেন নাই। কিন্তু
ভবিষ্যপুরাণ হইতে
র সম্বন্ধবিবেক গ্রন্থে
এক পংক্তি উদ্ধৃত
ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে
যে তিনি পুরাণের
জন্য আমরা পুরাণের
কান কোন গ্রন্থে অল্প
প্রায় ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের

রিতে চাহিয়াছিলেন,
লন—ইহা বিবেচ্য।
নি যে ভাবে শাস্ত্র
হার পক্ষে সম্ভবপর
জন্যই প্রকাশ করিয়া
খ্যাতি প্রচারিত হয়
লও তদানীন্তন সমাজ
ছে এবং উহা আজ

বাহন অন্যতম। এই
অপর দুইজন হইলেন

মহোপাধ্যায় বলিয়া
মাতৃকার সমাপ্তিতে

rs of Dharmasastra,

astra, Vol I, P—318

ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়পাদ। এই গ্রন্থও জীমূতবাহনের গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় বহন করে।

তাঁহার 'কালবিবেক' গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইতেছে বিভিন্ন আচারবিষয়ক কাল। এই গ্রন্থে নির্দিষ্ট ঋতু, মাস, দিন, মুহূর্ত প্রভৃতি কাল ধর্মীয় আচারাদি অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হয়। সৌরমাস, চান্দ্রমাস, বিভিন্ন উৎসবের অশুভ সময়, কোজাগর, দুর্গোৎসব প্রভৃতিও ইহাতে অলোচিত হইয়াছে। কালবিবেকের দ্বিতীয় শ্লোকেই জীমূতবাহন তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন কোনও কোনও নিবন্ধকার কালসম্বন্ধে অবহেলা প্রদর্শন করেন, অপর নিবন্ধকারগণ কালসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাল বিষয়ে পূর্বে বিশেষ কোন নিবন্ধ-গ্রন্থ রচিত হয় নাই; সুতরাং সহজভাবে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে[১৩]। তাঁহার দাবি এই যে, তিনি এই বিষয়বিশেষকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি একটি শ্লোকে ইহাও দেখাইয়াছেন যে সাতজন পূর্ববর্তী নিবন্ধকর্তা তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থগুলিতে কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন[১৪]। কিন্তু যেহেতু তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ খুব কালোপযোগী নহে, সেইজন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহাতে বালক পর্যন্ত হস্তস্থিত আমলকফলের ন্যায় কাল-বিষয়ক তথ্য জানিতে সমর্থ হয়, এইজন্যই কালবিবেক গ্রন্থের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীমূতবাহন এই কালবিবেক গ্রন্থে সৌরমাসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন ও তাহাতেই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি চান্দ্রমাসে শক্তি স্বীকার করেন। বর্তমানে যে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি মাস দেওয়ালপঞ্জী (calendar) হইতে জানা যায় এবং সকলে সর্বদা মাস, বৎসর ইত্যাদি গণনা করেন, তাহা জীমূতবাহন নির্দেশিত সৌরমাস অনুসারেই গৃহীত হইয়া থাকে। আর পূজা, পার্বণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান চান্দ্রমাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

---

(১৩) কালঃ কৈশ্চিদবুদ্ধঃ কৈশ্চিৎ সঙ্ক্ষিপ্তশ্চ বচননিবদ্ধঃ।
ইতি মন্দমতীনামপি সুবোধকরণী ময়া ক্রিয়তে॥ [কালবিবেক, পৃঃ ২]

(১৪) জিতেন্দ্রিয়শঙ্খধরান্ধুকসন্ন্রমহরিবংশধবলযোগ্লোকৈঃ।
কৃতমপি কালনিরূপণমধুনা নিঃসারতাং যাতি॥
করতলগতামলকমিব কালং বালোঽপি বীক্ষতে যেন।
জীমূতবাহনকৃতঃ কালবিবেকঃ পরং জয়তি॥ [কালবিবেক, পৃঃ ৩৮০]

কালবিবেকে জীমূতবাহন যেভাবে পূর্বমীমাংসার যুক্তি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে পূর্বমীমাংসায় তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁহার গ্রন্থগুলি ধর্মরত্ন নামক বৃহৎ গ্রন্থের অংশ বলিয়া মনে করা হয়। কারণ তিনি স্বয়ংই তাঁহার দায়ভাগ[১৫] ও কালবিবেক[১৬] গ্রন্থের শেষে এইগুলিকে ধর্মরত্নের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জীমূতবাহনের গ্রন্থগুলিতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কি সত্যই সমাজকে রক্ষা করিতে কোন প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন? দায়ভাগের নূতন মত প্রচলিত করাতে বাঙ্গালীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে এবং সমাজেও তাহা সম্যক্ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজকে বিভিন্ন আন্দোলন হইতে রক্ষা করিতে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে কোন প্রয়াসই জীমূতবাহনের মধ্যে দেখা যায় না।

২। সেনযুগে নিবন্ধ

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময়ে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই যুগে আবার বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিও অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। কারণ আমরা দেখি এই সময়ে মহাযানের স্থানে সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাদের অবৈদিক ভাবধারায় দেশে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। জনগণ বৌদ্ধধর্মে প্রভাবিত হইয়া ঐ ধর্ম বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিতে থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং দৃঢ়হস্তে এই বিশৃঙ্খল সমাজকে রক্ষা করিয়া দেশে ও ধর্মে শান্তি আনয়নের প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হইল। কিন্তু কি ভবদেবভট্ট ও কি জীমূতবাহন এবিষয়ে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

এই পালযুগে রাজকীয় উৎসাহে শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম যে অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাই নহে, তন্ত্রসাহিত্যেরও বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু সেনরাজগণের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতি অতলে ডুবিয়া যায়। অবশ্য সেনরাজগণের রাজত্বে বেদবিরুদ্ধ ধর্মগুলির বিপক্ষে কোনপ্রকার নির্যাতন বা সর্বজনপ্রকাশ্য শত্রুতার কথা আমরা জানি না। সম্ভবতঃ পালরাজগণের বৌদ্ধ মনোভাবের বিরুদ্ধে সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ সেনরাজগণ ছিলেন

(১৫) ধর্মরত্নে কালবিবেকঃ সমাপ্তঃ। [কালবিবেক, পৃঃ ৫৪৪]

(১৬) ধর্মরত্নে দায়ভাগঃ সমাপ্তঃ। [দায়ভাগ, পৃঃ ২৩৩]

শৈবধর্মাবলম্বী। অবশ্য পরে লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেন-রাজগণের শাসনে সমাজ রক্ষার উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি তাঁহাদের নূতন উদ্যম, সন্দেহ নাই। এই নূতন প্রচেষ্টাই বেদবিরুদ্ধ ধর্মগুলির প্রভাব হইতে সেই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিয়াছিল। এই যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন অনিরুদ্ধভট্ট। তারপর আগমন করেন বল্লালসেন ও হলায়ুধ।

(ক) অনিরুদ্ধভট্ট

অনিরুদ্ধভট্ট পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন চাম্পাহট্টীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বরেন্দ্র ভূমির একটি অংশ চম্পাহট্ট। এখনও বরেন্দ্রভূমিতে চাম্পাহট্টীয় ব্রাহ্মণ বিরল নহে।

অনিরুদ্ধভট্ট গ্রন্থশেষে নিজেকে মহামহোপাধ্যায় ও ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবার হারলতা গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোকে[১৭] দেখা যায় যে তিনি গঙ্গাতীরে বিহারপট্টকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মীমাংসক প্রবর কুমারিলভট্টের গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন।

অনিরুদ্ধ ছিলেন বঙ্গাধিপতি বল্লালসেনের ধর্মাধ্যক্ষ এবং তাঁহার শিক্ষাগুরু। বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থের প্রারম্ভে[১৮] গুরু অনিরুদ্ধভট্ট সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —বৃহস্পতি যেমন বৃত্রারি অর্থাৎ ইন্দ্রের গুরু, সেইরূপ অনিরুদ্ধ ছিলেন নরপতি বল্লালসেনের গুরু। অনিরুদ্ধ বেদ ও স্মৃতির প্রধান পুরুষরূপে বরেন্দ্রভূমিতে পূজ্য ছিলেন এবং তিনি বেদে ছিলেন সারস্বত পুরুষ অর্থাৎ বেদে তাঁহার এত অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল যে তিনি সরস্বতীর পুত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার

---

(১৭) স্বরাপগাতীরবিহারপাটকে
নিবাসিনা ভট্টনয়ার্থবেদিনা।
কৃতানিরুদ্ধেন সতামুরঃস্থলে
বিরাজতাং হারলতেয়মর্পিতা ॥ [হারলতা, পৃঃ ২১৪]

(১৮) বেদার্থস্মৃতিসংকথাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলধীবিলাসনয়নঃ সারস্বতো ব্রহ্মণি।
ষট্-কর্মাভবদার্যশীলনিলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতি র্নরপতে র্যস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥ [দানসাগর, পৃঃ ২]

[এই শ্লোকে ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা নির্দেশিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।
'Critical Examination of some Readings of the Danasagara,' P—97.
Our Heritage, Vol. VIII, Part II, 1960.]

চক্ষুর্দ্বয় বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল ছিল, তিনি ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট ষট্‌কর্ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তিনি উত্তম ব্যবহারসম্পন্ন ও সত্যব্রতরূপে খ্যাত অর্থাৎ সত্যবাদী ব্যক্তিরূপে বিজ্ঞাত ছিলেন।

অনিরুদ্ধের গ্রন্থগুলির মধ্যে দুইখানি প্রসিদ্ধ—'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িতা'।

তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নিবন্ধ-রচয়িতা। তিনি ছিলেন সামবেদীয়। এইজন্য তিনি তাঁহার পিতৃদয়িতা-গ্রন্থে প্রধানতঃ সামবেদীয় আচারাদির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার হারলতাগ্রন্থ অশৌচবিষয়ক নিবন্ধ। ইহাতে জন্ম ও মৃত্যুর জন্য অশৌচ, আবার অশৌচকালে বিধিনিষেধ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। হারলতাগ্রন্থের অভিমত স্থানে স্থানে রঘুনন্দন কর্তৃক খণ্ডিত হইলেও তিনি শুদ্ধিতত্ত্বে স্থানবিশেষে ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

আর পিতৃদয়িতা গোভিল নির্দেশিত সামবেদীয় আচারবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিভিন্ন আচার, রীতিনীতি, শ্রাদ্ধ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাতঃকৃত্য, আচমন, দন্তধাবন, সন্ধ্যা, স্নান, তর্পণ, বৈশ্বদেববিধি, শ্রাদ্ধ, দান ইত্যাদি বিষয়বস্তু আছে।

বাংলাদেশে ভবদেবভট্টের নির্দেশ অনুসারে লোকের দশকর্ম এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রাদ্ধপদ্ধতিবিষয়ে ভবদেবের কোন প্রামাণিক গ্রন্থ নাই। এই দেশে ভবদেবের মত অনুসারে দশকর্মের অনুষ্ঠান চলিলেও সন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধ বিষয়ে অনিরুদ্ধভট্টের নির্দেশই পালিত হয়।

অনিরুদ্ধের পক্ষে বলা যায় যে, তিনি সমাজরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিয়াই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইজন্য সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির প্রতিই তিনি সমধিকদৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাকিলেও সমাজের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র আচারাদির প্রতি দৃষ্টি দিয়া প্রণীত হইয়াছে। সমাজসংস্কারের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহারই আদর্শে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বল্লাল-সেন সমাজসংস্কারকের জয়মাল্য লাভ করতঃ জগতে খ্যাত হইয়াছেন।

(খ) বল্লালসেন

সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়া যাঁহারা সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইতেছেন দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের অধীশ্বর বল্লালসেন এবং তৎপুত্র বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ। ১০৮৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেন যে অদ্ভুতসাগর রচনা করিতে আরম্ভ করেন তাহা তিনি নিজেই

উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন তাহা তাঁহার 'শাকে নবাষ্টিখেন্দ্বাখ্য আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্' অদ্ভুতসাগর নামক গ্রন্থের এই প্রারম্ভোক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়।

বল্লালসেন বঙ্গদেশের একজন প্রখ্যাত নরপতি। প্রশস্তিকারের উক্তিতে পাওয়া যায় যে তিনি 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অদ্ভুতসাগরে আছে যে তিনি নিজেকে 'গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহু র্মহীপতিঃ' (পৃঃ ৪) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লালসেন সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তিনি যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কার্যে সর্বদা রত থাকিতেন। তিনি চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন— 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর' ও 'আচারসাগর'। আবার 'ব্রতসাগর' নামে অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ তাঁহার দানসাগরের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর ব্যতীত বল্লালসেনের অপর গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বল্লালসেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধভট্টের নিকট হইতে শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং কলিযুগের স্তূপীকৃত পাপ দূর করিবার জন্য তিনি দানের উপরে নিবন্ধ রচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে ধর্ম নির্ণয় করা দুরধিগম্য জানিয়া সেই প্রচেষ্টায় সংশয়াপন্ন হইয়া তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপদ্মের পরিচর্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার স্বকীয় উক্তিতেই পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন—গুরুদেবের শিক্ষা এবং স্বীয় জ্ঞান অনুসারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য দানসাগর গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন[১৯]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দন এই দানসাগর গ্রন্থ অনিরুদ্ধভট্টের রচনা বলিয়া স্বকীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন[২০]।

---

(১৯) অধিগতসকলপুরাণস্মৃতিসারঃ শ্রদ্ধয়া গুরোরস্মাৎ
কলিকল্মষাবদানং দাননিবন্ধং বিধাতুকামোঽপি।
দুরধিগমধর্মনির্ণয়বিষমাধ্যবসায়সংশয়স্তিমিতঃ
নরপতিরয়মারেভে ব্রাহ্মণচরণারবিন্দপরিচর্যাম্ ॥......
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিরচয়ত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানসাগরময়ং শ্রদ্ধাবতাং শ্রেয়সে ॥ [দানসাগর, শ্লোক ৭-৯, পৃঃ ২]

(২০) 'দানসাগরে অনিরুদ্ধভট্টেনাভিহিতত্বাচ্চ।' [একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪৪০]
আমাদের মনে হয় যে অনিরুদ্ধভট্টের শিক্ষা ও নির্দেশ অনুসারেই বল্লালসেন দানসাগর রচনা

ন তাহা তাঁহার 'শাকে
স্থের এই প্রারম্ভোক্তি

প্রশস্তিকারের উক্তিতে
রিয়াছিলেন। তাঁহার
লানস্তম্ভবাহু মহীপতিঃ'

যজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা, সমাজ-
নি গ্রন্থ রচনা করেন—
আবার 'ব্রতসাগর'
পাওয়া যায়। কিন্তু
সনের অপর গ্রন্থ এখন

শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতি,
ত পাপ দূর করিবার
লেন এবং সেই সময়ে
হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ-
-ইহা তাঁহার স্বকীয়
ক্ষা এবং স্বীয় জ্ঞান
গ্রন্থ তিনি রচনা

অনিরুদ্ধভট্টের রচনা

ক ৭-৯, পৃঃ ২]
]
লসেন দানসাগর রচনা

বল্লালসেন তাঁহার রাজত্বকালে স্বয়ং বিপন্ন হিন্দুধর্মকে বেদবিরুদ্ধ ধর্মগুলির প্রভাব হইতে রক্ষা করা সুকঠিন দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বিপদাপন্ন ধর্মকে একমাত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির সাহায্যেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে। এইজন্য তিনি গুরু অনিরুদ্ধভট্টের নিকট হইতে এইগুলি শিক্ষা করিয়া গুরুর প্রসাদেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভস্বরূপ দানসাগর প্রণীত করিয়াছেন। আবার ভণ্ড, পাষণ্ড প্রভৃতি বিরোধী ধর্মাবলম্বিগণের প্রভাব হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্যই যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বকীয় উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে[২১]। তিনি পুরাণকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও পাষণ্ডশাস্ত্রের অনুমোদনকারী পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আগমনের পূর্বেই হিন্দুসমাজ তান্ত্রিকপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। কারণ মীনকেতন[২২] (মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ) প্রভৃতি মূল পুরাণগুলির নামে স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাদের নিজেদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমাজে জনগণের নিকট প্রচার করিতেছিলেন। এইজন্য তিনি তান্ত্রিক আচার ব্যবহার সমন্বিত দেবীপুরাণকে ধর্মের প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, বরং এই দেবীপুরাণকে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতেই পাওয়া যায় যে[২৩], পুরাণ ও উপপুরাণের সংখ্যা হইতে বহির্গত পাপকর্মযুক্ত পাষণ্ডশাস্ত্রানুমত দেবীপুরাণ এখানে নিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তিনি বেদের প্রামাণ্যবাদী ভবিষ্যপুরাণকে অত্যন্ত যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন। পাষণ্ডদের গৃহীত গ্রন্থও তিনি ত্যাগ করেন।

করিয়াছেন এবং ইহার রচনায় অনিরুদ্ধভট্টের অংশও অনেকখানি ছিল বলিয়া হয়তো রঘুনন্দন অনিরুদ্ধভট্টকেই ইহার প্রকৃত রচনাকারী বলিয়া মনে করিয়াছেন।

অথবা যেমন মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত হইলেও উহাতে মনুর মতই সর্বাংশে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহা মনুসংহিতা নামে পরিচিত, সেইরূপ দানসাগর বল্লালসেনের লিখিত হইলেও উহাতে অনিরুদ্ধ-ভট্টের মতই সর্বাংশে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া রঘুনন্দনের মতে উহা অনিরুদ্ধভট্ট লিখিত—এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে।

(২১) মৃষাবংশানুচরিতৈঃ কোষব্যাকরণাদিভিঃ।
অসঙ্গতকথাবন্ধপরস্পরবিরোধতঃ॥
তন্মীনকেতনাদীনাং ভণ্ডপাষণ্ডলিঙ্গিনাম্।
লোকবঞ্চনমালোক্য সর্বমেবাবধীরিতম্॥ [দানসাগর, শ্লোক ৬৫-৬৬ পৃঃ ৭]

(২২) Srinathacharya Cudamani, A Smrti-writer of Bengal, Dr. Hazra.
[B. O. R. I. Vol. XXXII, 1952, P—38]

(২৩) তত্তৎপুরাণোপপুরাণসংখ্যাবহিষ্কৃতং কল্মশকর্মযোগাৎ।
পাষণ্ডশাস্ত্রানুমতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন নিবদ্ধমত্র॥ [দানসাগর, শ্লোক ৬৭, পৃঃ ৭]

বল্লালসেন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রন্থপ্রণয়নে উদ্যোগী হইয়া প্রথমে ব্রাহ্মণজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি মনুর মত উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন যে[২৪] ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ব্রাহ্মণই ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য সর্বজীবের প্রভু বলিয়া নির্দিষ্ট হন। অন্যধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং তাহা তিনি ব্রাহ্মণপ্রশংসা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। আবার ত্রিলোকে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ—ইহাও তিনি বলিয়াছেন। জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা ব্রাহ্মণ, আর পরোক্ষ দেবতা হইতেছেন দেবগণ। ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলেই সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হন। সর্ব অবস্থায়ই ব্রাহ্মণ পূজ্য ও ব্রাহ্মণই মহান্ দেবতাস্বরূপ[২৫]।

বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডিগণের সঙ্গে যাহাতে কোনও প্রকার সংস্পর্শ না ঘটে এইজন্য তিনি পাষণ্ডিগণের সঙ্গে আলাপাদি করিতেও নিষেধ করিয়াছেন[২৬]। কারণ পাষণ্ডিগণ বেদের বিপরীতধর্ম উপদেশ দিয়া থাকেন। এই বিকর্মস্থ ব্যক্তিগণ বৈদিককর্মের অনুষ্ঠান করেন না এবং নাস্তিকগণ ধর্মবিরুদ্ধ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। এইজন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে[২৭] পাষণ্ডিগণের সঙ্গে ভাষণাদি করিলে উপবাস করিয়া জপ করা উচিত।

ইহা ছাড়াও গ্রন্থশেষে বল্লালসেন লিখিয়াছেন যে, ধর্মের অভ্যুদয় ও কলিযুগে নাস্তিকদের উচ্ছেদের জন্যই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন[২৮]।

বেদবিরুদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে সমাজরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বল্লালসেন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা আনিতে হইলে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বৈদিকধর্ম সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি নিজে ব্রাহ্মণ না হইয়াও ব্রাহ্মণ্যধর্ম দ্বারা দেশ তথা সমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে যথার্থ ধর্ম কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া

---

(২৪) ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥ [দানসাগর, পৃঃ ৯]

(২৫) সর্বথা ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ। [ঐ, পৃঃ ৯]

(২৬) পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ নালপেচ্চৈব নাস্তিকান্। পাষণ্ডিনো বেদবিপরীতধর্মোপদেষ্টারঃ বিকর্মস্থা দত্তেন বৈদিককর্মানুষ্ঠাতারঃ। নাস্তিকা ধর্মাসত্ত্ববক্তারঃ। [ঐ, পৃঃ ৫৭]

(২৭) এতৎ সম্ভাষ্য জপ্তব্যং পাষণ্ডাদীনুপোষিতৈঃ। [ঐ, পৃঃ ৫৭]

(২৮) ধর্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ। [ঐ, পৃঃ ১২০]

নে উদ্যোগী হইয়া
তিনি মনুর মত
াবামাত্রই পৃথিবীতে
প্রভু বলিয়া নির্দিষ্ট
ংসা দ্বারা প্রমাণিত
তিনি বলিয়াছেন।
দবগণ। ব্রাহ্মণগণ
হ্মণ পূজ্য ও ব্রাহ্মণই

স্পর্শ না ঘটে এইজন্য
য়াছেন[২০]। কারণ
বিকর্মস্থ ব্যক্তিগণ
কথা প্রচার করিয়া
গর সঙ্গে ভাষণাদি

অভ্যুদয় ও কলিযুগে

ায়িত্ব গ্রহণ করিয়া
ইয়াছিলেন। তিনি
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব
। সেইজন্যই বোধ
াজকে রক্ষা করিতে
করিতে না পারিয়া

বিপরীতধর্মোপদেষ্টারঃ
৭]

সংশয়াপন্ন অবস্থায় গ্রন্থারম্ভে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্যা করেন এবং পরে গুরু অনিরুদ্ধ-ভট্টের নিকট হইতে স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সর্বথা ফলবতী হইয়াছে বলিয়াই তিনি সমাজ-সংস্কারক হিসাবে সমাজে খ্যাত হইয়াছেন। সমাজরক্ষার সুমহান্ দায়িত্ব পালনে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মাত্র প্রজাশাসনই করিতেন না, সমাজের সংস্কারেও তাঁহার গভীর দৃষ্টি ছিল।

বল্লালসেনের অপর এক মহতী কীর্তি—সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সমাজে জাতিভেদপ্রথা প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরও সমধিক অবনতি ঘটিয়াছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ধর্ম প্রবর্তন করিবার জন্যই আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এই দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। আবার সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তিও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ। এই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী চারিদিকে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে অনেকের আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজে সামাজিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। সেইজন্যই বল্লালসেন বিদ্বান্‌মণ্ডলীর সহায়তায় জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান—এই নবসংখ্যক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে তিনি 'কুলীন' বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন[২১]। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি অদ্যাবধি যে সকল শ্রেণীতে বিভক্ত আছেন তাহা বল্লালসেন কর্তৃকই প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বল্লালসেনের সময়ে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বঙ্গদেশে মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

(২১) 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥' [কুলীনকুলসর্বস্ব, পৃঃ ১৪]

এখানে উল্লেখযোগ্য, কৌলীন্যপ্রথা যে বল্লালসেনকৃত তাহাতে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ তাঁহার তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ নাই।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৮৯) এই সম্বন্ধে বলেন—"বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থে কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তির সহিত বল্লালসেনের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।"

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের (বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ৪৭৯) মতে—"বল্লালপ্রবর্তিত কৌলীন্য বল্লালের বহু পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বল্লালের সময়ে এই কৌলীন্যের বহু শত্রু ছিলেন, তাঁহারা উহা মানিতেন না—এবংবিধ বিষয় তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নহে।......ইহার উল্লেখ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত একখানিমাত্র তাম্রশাসনে নাই দেখিয়া তাহার সত্যতায় সন্দিহান হওয়া উচিত নহে।"

(গ) হলায়ুধ

হলায়ুধ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার। তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্য এই ব্যাপারে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিয়াছে। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রে বিশারদ এবং তাঁহার জ্ঞান বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত ছিল। বৈদিক আচার-সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদ-অধ্যয়নের রীতিনীতির সংস্কার করতঃ তাহা সকলের মধ্যে প্রচার করেন।

হলায়ুধের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' পণ্ডিতসমাজে সবিশেষ পরিচিত। ইহা ছাড়া তিনি রচনা করিয়াছেন 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব', ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব'। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এক ব্রাহ্মণসর্বস্ব ছাড়া হলায়ুধের অন্য কোন গ্রন্থই এখন আর পাওয়া যায় না। তখনকার বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে হলায়ুধ প্রভূত সম্মান ও অর্থসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের দুই পুরুষ রাজকীয় প্রিয়পাত্রতা লাভ করিয়া বৈদিক আচার ব্যবহার যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁহার স্বকীয় উক্তিতে পাওয়া যায় যে তিনি অল্প বয়সেই রাজপণ্ডিতের সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে যৌবনে মহামাত্য এবং প্রৌঢ়বয়সে ধর্মাধিকার পদে নিযুক্ত করেন[৩০]। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বের বিভিন্ন স্থানে এবং পরিশেষে ধর্মাধ্যক্ষ, মহাধর্মাধ্যক্ষ, গৌড়বসুধাধীশ ধর্মাধ্যক্ষ, গৌড়েন্দ্রধর্মকোষাধিকারী, ধর্মাধিকৃত, গৌড়েন্দ্র-মহাধর্মাধিকারী বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

হলায়ুধের পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান শ্রাদ্ধ, আহ্নিক ইত্যাদি বিষয়ে দুইখানি মূল্যবান্ 'পদ্ধতি' রচনা করিয়াছেন। পশুপতি 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি' ব্যতীত পাকযজ্ঞ সম্বন্ধে এমন একখানি বিরাট এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন যে হলায়ুধ এই বিষয়ে কোন পদ্ধতি লিখিতে আর চেষ্টা করেন নাই।

হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থের প্রারম্ভে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদগ্রন্থ অর্থসহকারে অধ্যয়ন করা

---

(৩০) বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তকপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষ-যোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমাল্লক্ষ্মণসেনদেব-নৃপতি ধর্মাধিকারং দদৌ॥ [ব্রাহ্মণসর্বস্ব, শ্লোক ১২, পৃঃ ২-৩]

উচিত। বেদাধ্যয়ন
অধিকার জন্মে না।
কাহারও অধিকার
না করিয়া অন্য শাস্ত্রে
সন্ততিসমেত শূদ্রত্ব
অর্থজ্ঞানে পরাঙ্মুখ ব্রা
হলায়ুধ বলেন[৩২]
ইচ্ছা করেন না। ধ
হইতে যাহা জানিতে
বিদ্যমান তাহা 'অবর'
তাঁহার মতে দ্বাদশ
পরিদৃষ্ট হয়। এক
এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্ম
সেইগুলি ব্যবহার
ও সামাজিক চিত্র অ
অবলম্বন করেন নাই।
চারিটি বিভিন্ন অধিক
দিয়াছেন যে এই সমস্ত
বর্তমানকালে দাক্ষিণাত্য
গণ্য উৎকল ও পাশ্চাত্য
করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।
প্রয়োগপ্রণালীর প্রতি
প্রতি বিশেষ নজর দি
মন্ত্রের অর্থজ্ঞানেই শুভ
না হইলে দোষ ঘটে।
অতএব হলায়ুধের ম

(৩১) যোঽনধীত্য দ্বিজো
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমা
(৩২) ব্যাসঃ—অতঃ স প
অবরঃ স

; শাস্ত্রকার। তাঁহার
। করিয়াছে। তাঁহার
য়াছে। তিনি ছিলেন
বিস্তৃত ছিল। বৈদিক
ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদ-
চার করেন।
; সবিশেষ পরিচিত।
র্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব', ও
ণসর্বস্ব ছাড়া হলায়ুধের
াধিপতি লক্ষ্মণসেনের
রিয়াছিলেন। তাঁহার
ক আচার ব্যবহার
াওয়া যায় যে তিনি
লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে
ক্ত করেন৩০। তিনি
াধ্যক্ষ, মহাধর্মাধ্যক্ষ,
াধিকৃত, গৌড়েন্দ্র-

হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ
ানি মূল্যবান্ 'পদ্ধতি'
সম্বন্ধে এমন একখানি
কোন পদ্ধতি লিখিতে

াজনীয়তা আলোচনা
হকারে অধ্যয়ন করা

শ্লোক ১২, পৃঃ ২০৩]

উচিত। বেদাধ্যয়ন ও বেদের অর্থজ্ঞান ব্যতীত গার্হস্থ্যাশ্রমে কোন ব্যক্তির অধিকার জন্মে না। আবার গার্হস্থ্যাশ্রমে অনধিকার হওয়ায় কোন কর্মেই কাহারও অধিকার থাকে না। এইজন্যই মনু বলেন[৩১]—যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে, সে অতিশীঘ্র জীবিত অবস্থাতেই সন্তান-সন্ততিসমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে বেদ-অধ্যয়ন ও বেদের অর্থজ্ঞানে পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ শূদ্ররূপে পরিগণিত হন।

হলায়ুধ বলেন[৩২]—বিশুদ্ধ ধর্ম অর্জনে প্রয়াসী ব্যক্তি বেদ অপেক্ষা অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না। ধর্মের উৎস হইতেছে পবিত্র, অন্য সবই মিশ্র। অতএব বেদ হইতে যাহা জানিতে পারা যায় তাহাই পরম ধর্ম, আর পুরাণাদির মধ্যে যে ধর্ম বিদ্যমান তাহা 'অবর' বলিয়া কথিত হয়।

তাঁহার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুইটি পৃথক্ শ্রেণী পরিদৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেবল মাত্র বেদগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেবল বেদের অর্থগুলি আলোচনা করিয়া যাগযজ্ঞে সেইগুলি ব্যবহার করিতেন। বেদ-অধ্যয়নের এইরূপ দুই শ্রেণীর অবস্থা ও সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া হলায়ুধ দেখাইয়াছেন যে, কেহই যথার্থপথ অবলম্বন করেন নাই। বঙ্গদেশে উৎকল, পাশ্চাত্য, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র—এই চারিটি বিভিন্ন অধিবাসিগণের সামাজিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে এই সমস্ত বিভাগীয় কোন ব্রাহ্মণেরই বেদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ছিল না। বর্তমানকালে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্বপুরুষরূপে গণ্য উৎকল ও পাশ্চাত্যগণ বেদের যথাযথ অর্থ না জানিয়াই কেবলমাত্র অধ্যয়ন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। অপরপক্ষে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ যজ্ঞে বেদের মন্ত্রগুলির প্রয়োগপ্রণালীর প্রতি অধিক মনঃসংযোগ করিতেন। তাঁহারা কিন্তু অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ নজর দিতেন না। ইহাতে মন্ত্রাত্মক বেদের অর্থজ্ঞান হইত না। মন্ত্রের অর্থজ্ঞানেই শুভফল হয় এবং তাহারই প্রয়োজন অত্যধিক। অর্থজ্ঞান না হইলে দোষ ঘটে।

অতএব হলায়ুধের মতে বেদ-অধ্যয়নের পর বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞানই বেদাধ্যয়ন-

---

(৩১) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ (মনু ২।১৬৮) [ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পৃঃ ৮]

(৩২) ব্যাসঃ—অতঃ স পরমো ধর্মো যো বেদাদবগম্যতে।
অবরঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যঃ পুরাণাদিষু স্থিতঃ ॥ [ঐ, পৃঃ ১২]

বিধির তাৎপর্য। কিন্তু বাংলাদেশে উৎকল ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কেবল বেদ-গ্রন্থমাত্র পাঠ করেন, আর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কেবল বেদের অর্থবিচারমাত্র করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি বলেন—ইহা অপেক্ষা বরং বেদের এক অংশেরও যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া অর্থবিচার করা শ্রেয়:[৩৩]। বেদ-অধ্যয়নের উদ্দেশ্য বেদমন্ত্রের উচ্চারণ ও তাহাদিগের অর্থবোধ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। এই বিষয়ে তিনি ব্যাসের বচন উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের নিকট হইতে চারিবেদেরই একদেশ যথাযথ অধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ করা উচিত। সুতরাং বেদের এই একদেশ অধ্যয়নহেতু লোকের গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকার জন্মে।

আবার শাস্ত্রকার যমের বচন উল্লেখ করিয়া বেদের এই আংশিক অধ্যয়ন তিনি সমর্থন করিয়াছেন। যম বলেন[৩৪] যদি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ না হয়, তাহা হইলে বেদের এক অংশও সম্যক্ অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু এখানে আবার সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইচ্ছা অনুসারে বেদের যে কোন একটি ভাগ বা কোন বিশেষ ভাগ অধ্যয়ন করা উচিত, অথবা বেদের তৃতীয় ভাগ বা চতুর্থ ভাগ বা বৈদিক ক্রিয়াপ্রণালীর উপযুক্ত কোন্ অংশ অধ্যয়ন করা উচিত? হলায়ুধ বলেন যদি পাঠক্রমের অনুরোধে প্রথম ভাগ অধ্যয়ন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেইভাগে সন্ধ্যা, স্নান-আহ্নিক, গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযুক্ত সমস্ত মন্ত্রগুলি বর্তমান থাকে না বলিয়া সেই অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত করা সম্ভবপর হয় না। তাহা অপেক্ষা বরং সন্ধ্যা, স্নানাদি, আহ্নিক, গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযুক্ত মন্ত্রভাগই অধ্যয়ন করা উচিত। এইগুলির অধ্যয়ন দ্বারা বেদের একদেশের অধ্যয়ন পর্যবসিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৈদিক পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত ছিলেন না। ব্রাহ্মণসর্বস্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে হলায়ুধের সময়ে দেশে বেদ-অধ্যয়নের প্রচলন থাকিলেও তাহার মধ্যে দোষ দেখা যায়। এই অবস্থা বাংলাদেশের পক্ষে আদৌ গৌরব প্রকাশ করে না। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানেও বৈদিক জ্ঞান অনেক কমিয়া গিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে

---

(৩৩) অতো বেদাধ্যয়নবিধে র্বেদাধ্যয়নানন্তরং বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্যম্। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকৈরর্থবিচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে। এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। তদ্বরং বেদৈকদেশস্যাপি যথাবিধ্যধ্যয়নং কৃত্বার্থবিচারঃ ক্রিয়ত ইত্যুচিতং ভবতি। [ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পৃঃ ৯]

(৩৪) তথা চ যমঃ—'একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্বো ন শক্যতে।' [ঐ, পৃঃ ৯]

কৃষ্ণমিশ্রের
অধিবাসিগণ
জীবিকা মাত্র
আবার
আদিত্যদর্শন
বৈদিক অধ্যয়
পুরোহিতগণ
গভীরে প্রবে
বুঝিতেন না।
দাক্ষিণাত্যে
করিয়াছেন
একটিমাত্র পং
অর্থ জানিতেন
হইতেন। অ
হলায়ুধ মতপ্র
হ্রাস ঘটায় দে
পরিবর্তন ক
দাঁড়াইয়াছিল
উপযোগী বৈদি
অধিকাংশ ব্রাহ্ম
ছাত্রদের জন্য
এখানে উ
সমস্ত আচারা
কিন্তু এখা
তাহা কতখানি
মধ্যবর্তী কো
পালযুগ শেষ হ

(৩৫) শ্রীযুক্ত
প্রকাশ করিয়াছেন
(৩৬) ঐ।
(৩৭) ঐ।

কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে[৩৫] উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসিগণ বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্য স্থানগুলিতেও বেদ পাঠ কেবল জীবিকা মাত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

আবার দেখা যায় কাশ্মীরী ইতিহাসের মুসলমান রাজত্বের মধ্যভাগে আদিত্যদর্শন হলায়ুধের মত শোকপ্রকাশ করিয়াছেন যে[৩৬] তাঁহার রাজত্বেও বৈদিক অধ্যয়ন অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছেন যে বৈদিক পুরোহিতগণ প্রায়ই বেদ পাঠ করিতেন অত্যন্ত হাল্কাভাবে, তাঁহারা কখনই গভীরে প্রবেশ করিতেন না। এইজন্য তাঁহারা বেদের একবর্ণেরও তাৎপর্য বুঝিতেন না। কেবলমাত্র বেদগ্রন্থের আবৃত্তি দ্বারাই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন।

দাক্ষিণাত্যের মীমাংসক বাঞ্ছেশ্বর যজন্ তাঁহার ভাট্টচিন্তামণি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে[৩৭] বেদের যথাযথ রক্ষণ কেবলমাত্র অধ্যেতৃপরম্পরায় প্রচলিত একটিমাত্র পংক্তি দ্বারা সম্ভবপর নহে। কারণ অধ্যাপকগণ বহুক্ষেত্রে বেদের যথাযথ অর্থ জানিতেন না এবং অজ্ঞানতাবশতঃ মন্ত্রগুলির পরিবর্তন করিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেন। অতএব তাঁহাদের কৃত পাঠগুলি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। এইজন্য হলায়ুধ মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে জনগণের আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ এবং বিশ্বাসের হ্রাস ঘটায় দেশে এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। তখন বৈদিক অধ্যয়নের রীতি পরিবর্তন করিয়া তাহাতে উন্নতিবিধান করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইসব কারণেই হলায়ুধ দৈনন্দিন রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সঠিকরূপে বেদ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ না হওয়ায় অল্প মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের জন্য তিনি বেদের স্বল্প অংশ পাঠ্য করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে যজুর্বেদীয়গণ এখনও হলায়ুধের নির্দেশ অনুসারে প্রায় সমস্ত আচারাদিই অনুষ্ঠিত করিয়া থাকেন।

কিন্তু এখানে বিবেচ্য, বেদরক্ষার প্রতি হলায়ুধের এই যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা তাহা কতখানি সফলতা লাভ করিয়াছিল? দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে হলায়ুধ এই ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তখন দেশে পালযুগ শেষ হইয়া সেনযুগ চলিতেছে। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ, সুতরাং রাজকীয়

(৩৫) শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃঃ ১২-১৩) উপরিউক্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন।
(৩৬) ঐ।
(৩৭) ঐ।

সমর্থনে দেশ যে বৌদ্ধভাবাপন্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু পরে সেনরাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নির্মূল হইয়া গিয়াছিল। পূর্বে আমরা দেখি বঙ্গের অধিপতি বল্লালসেন স্বকীয় সার্থক প্রচেষ্টায় দেশের ধর্মীয় প্লাবন হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধভট্টও স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। হলায়ুধ দেখিলেন—বৌদ্ধধর্ম নিষ্প্রভ হইলেও বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ধর্ম তখনও জাগরূক ও একের মধ্যে অন্যের সংঘর্ষ প্রায়ই লাগিয়া থাকে। ইহার পরিণতিতে দেখা যায় পিতা বল্লালসেন শৈব হইলেও পুত্র লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। আবার তখন তান্ত্রিকধর্মও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল।

হলায়ুধ মনে করেন বেদই ধর্মের মূল। সুতরাং একমাত্র যথাবিধি বেদ-অধ্যয়ন ও তাহার অর্থবোধ করিতে পারিলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আক্রমণের প্রভাব হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ ধর্মের প্রভাবে ধর্মসাঙ্কর্য উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া তাহা হইতে আর্যধর্ম রক্ষা করিবার জন্যই তিনি বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থবোধরূপ নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। এই রীতি অনুসরণ করিলেই ধর্মের মূল উৎস অবগত হওয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, তাঁহার ধারণা ছিল বেদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত তাহা বেদের অর্থবোধ হইলেই বিদ্যার্থিগণ সম্যক্ জ্ঞাত হইবেন। সুতরাং এই ধর্ম সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলে কি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, কি বাহ্য বিপ্লব কিছুই এই ধর্মকে আঘাত করিতে পারিবে না।

হলায়ুধের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এই প্রচেষ্টা স্থায়ী ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ পরবর্তিকালে বেদাধ্যয়নের প্রতি ব্রাহ্মণগণের উৎসাহের স্বল্পতা আমরা লক্ষ্য করি। সেই বেদাধ্যয়নও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া 'বেদের অধ্যয়ন ও অর্থবোধ' হলায়ুধের এই নূতন সংশোধিত বিধি প্রচারিত হওয়ার জন্যই যে পরবর্তিযুগে বেদপাঠ দেশে কমিয়া গিয়াছিল তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। পরে যবনদের অত্যাচারে ও অনাচারে দেশ উপদ্রুত, জনগণ প্রাণ বাঁচাইতে সদা তৎপর। সুতরাং তখন আর তাঁহারা বেদপাঠের দিকে মনোযোগ স্থাপন করিতে অবসর পান নাই। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নিত্য পরিবর্তনে ধর্ম ও শিক্ষার মধ্যেও বহু পরিবর্তন পরবর্তী কালে লক্ষ্য করা যায়।

৩। মুসলমানযুগে নিবন্ধ

সেনরাজত্বকালে বল্লালসেনের অদম্য প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। লক্ষ্মণসেনও পিতার পথ অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্ম রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা না করিলেও বল্লালসেনের অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' তিনিই সমাপ্ত করেন। ইহা বল্লালসেনের উক্তিতেই পাওয়া যায়[৩৮]। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলায়ুধ। রাজার উৎসাহ পাইয়া হলায়ুধ তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করেন। সেনরাজগণের ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষার জন্য অদম্য প্রচেষ্টা বঙ্গদেশে সুবিদিত।

কিন্তু লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষে নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মুসলমান আক্রমণ—দুইই বঙ্গদেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এইপ্রকার বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণকে বাধা দিবার শক্তি তখন বঙ্গদেশের ছিল না। সুতরাং বঙ্গদেশ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানগণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াই হিন্দুগণের উপর যথেচ্ছাচার চালাইতে লাগিল। তখন হিন্দুধর্মের অবস্থা এবং হিন্দুর সামাজিক পরিস্থিতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে তান্ত্রিকধর্মের প্রসারও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং তান্ত্রিকধর্ম ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম, বিশেষ করিয়া মুসলমানদিগের অত্যাচার হিন্দুসমাজের মূল পর্যন্ত উৎখাত প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। অব্রাহ্মণ্য আচার-ব্যবহার এত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছিল যে কোনটি ব্রাহ্মণ্য আচার এবং কোনটি অনাচার তাহা নির্ণয় করা জনগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য আচারবিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা দিয়াছিল।

এই অসহায় অবস্থা হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে এবং জনগণের মধ্যে হিন্দুর আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি শিক্ষা দিতে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলাভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ বৃহদ্ধর্মপুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা জনপ্রিয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং বর্ণাশ্রমধর্ম জনগণের মধ্যে প্রচার

---

(৩৮) গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ে সাম্রাজ্যলক্ষ্মীং মুদা।......
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতো
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমীভুজঃ। [অদ্ভুতসাগর, পৃঃ ৪]

করিয়াছে। আমরা দেখি মঙ্গলকাব্যও এইজন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন[৩৯]—"এই মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির আদর্শগত বিরোধ এত অধিক ছিল যে তাহা ক্রমে পরস্পর দুই সমাজের মধ্যে এক বিপুল ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রপোষিত এই মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের তদানীন্তন আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। তখনই মঙ্গলকাব্যের মৌলিকধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ কাহিনীগুলির মধ্যে এক অলৌকিক দৈবশক্তির পরিকল্পনা করিয়া ঐহিক জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশা তাহারই ইচ্ছাধীন বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস দেখা দিল।..............এই অবস্থায় পরপীড়িত জাতি অল্পকাল মধ্যেই জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া সকলরকমের দৈব সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল।"

এই সময়ে স্মৃতিনিবন্ধরচনায় আমরা দেখি শূলপাণি, বৃহস্পতিরায়মুকুট, শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দনকে। এই নিবন্ধকারগণ সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাদের নিবন্ধগুলি রচনা করেন।

(ক) শূলপাণি

শূলপাণি একজন প্রখ্যাত বঙ্গীয় নিবন্ধকার। তিনি ছিলেন রাঢ়ীয়শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। গ্রন্থসমাপ্তিতে মহামহোপাধ্যায় ও সাহুড়িয়ান বলিয়া তিনি স্বকীয় পরিচয় দিয়াছেন। সাহুড়িয়ানগণ শ্রোত্রিয় ও ভরদ্বাজগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখনও রাঢ়ীয়শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সাহুড়িয়ান কুলোপাধি পরিদৃষ্ট হয়। অভিনব পাণ্ডিত্যপ্রভাবে শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শাস্ত্রজগতে সবিশেষ খ্যাত।

কথিত আছে যে শূলপাণি নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ ছিলেন[৪০]।

আবার প্রবাদ আছে যে শূলপাণির বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের যশোরে। অনুসন্ধান করিলে হয়তো এখনও যশোর অঞ্চলে শূলপাণির বংশ পাওয়া যাইতে পারে। অনেকে বলেন যে শূলপাণি নবদ্বীপে বিবাহ করিয়া সেখানেই অবস্থিত থাকিয়া

(৩৯) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। [ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮]

(৪০) রঘুনন্দন হরিহরজ গঙ্গাদাসপৌত্র।
কাণাভট্ট, সাহরী শূলপাণিদৌহিত্র। [ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৮, পৃঃ ১৮৯]

ছিল। ডঃ আশুতোষ
স্থানীয় লৌকিক ধর্মমত-
পরস্পর দুই সমাজের
এই মুসলমান ধর্মমতের
আপনাদিগকে অত্যন্ত
র্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ
করিয়া ঐহিক জীবনের
ত করিবার প্রয়াস দেখা
কাল মধ্যেই জীবনের
মধ্যে নিজের পরিত্রাণের
আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল।
দের জন্ম হইয়াছিল।"
পি, বৃহস্পতিরায়মুকুট,
নিবন্ধকারগণ সামাজিক
ন।

ছিলেন রাঢ়ীয়শ্রেণীর
ছড়িয়ান বলিয়া তিনি
নগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।
নান কুলোপাধি পরিদৃষ্ট
য় বলিয়া শাস্ত্রজগতে

চ রঘুনাথ শিরোমণির

া যশোরে। অনুসন্ধান
পাওয়া যাইতে পারে।
নই অবস্থিত থাকিয়া

পৃঃ ৯৩]

অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করেন। আরও জনশ্রুতি আছে যে তিনি কোন মহাপাপ করিয়া শেষ বয়সে ৺কাশীধামে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন[৪১]।

তবে শূলপাণির জীবনী সম্বন্ধে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি সত্য কিনা জোর দিয়া বলিবার উপায় নাই।

প্রখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণবলে এই মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে শূলপাণি ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ও ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন[৪২]। অধ্যাপক মহাশয় অপর একটি মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে[৪৩] মিথিলার বিখ্যাত স্মার্ত বাচস্পতিমিশ্র যেরূপ তাঁহার গ্রন্থে শূলপাণির নাম ও মত উল্লেখ করিয়াছেন, আবার সেইরূপই শূলপাণিও তাঁহার 'রাসযাত্রাবিবেক' গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্রের নাম উল্লেখপূর্বক তীর্থচিন্তামণি গ্রন্থের অংশবিশেষ খণ্ডন করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্রও তাঁহার শ্রাদ্ধচিন্তামণি ও দ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থে একাধিক-বার শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক গ্রন্থের মত উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের শূলপাণি ও মিথিলার বাচস্পতিমিশ্র যে পরস্পর এইরূপ গ্রন্থ স্ব স্ব নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে মিথিলার স্মার্ত বাচস্পতিমিশ্রের যৌবনকালে শূলপাণি ছিলেন বৃদ্ধ। আমাদের মনে হয় বৃদ্ধাবস্থায় শূলপাণি তাঁহার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ রাসযাত্রাবিবেক রচনা করেন। বাচস্পতিমিশ্রও শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গ্রন্থগুলিতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন ও মতখণ্ডন করিয়াছেন[৪৪]।

(৪১) ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৮, পৃঃ ১৮৯।

(৪২) বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ৬।

(৪৩) ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪৮, পৃঃ ১৩-১৪।

(৪৪) ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী মনে করেন যে শূলপাণির একমাত্র রাসযাত্রাবিবেকে উদ্ধৃত বাচস্পতিমিশ্রের উক্তি দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে যে শূলপাণি বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন। [New Indian Antiquary, Vol. V, 1942, P—175]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাসযাত্রাবিবেকে যে শ্লোকটি বাচস্পতিমিশ্রের তীর্থচিন্তামণি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বর্তমানে এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে মুদ্রিত তীর্থচিন্তামণিতে উল্লিখিত আছে। [পৃঃ১৬১]।

শূলপাণি 'তীর্থচিন্তামণৌ বাচস্পতিমিশ্রেণাভিহিতং তদ্ধেয়মেব' (রাসযাত্রাবিবেক, পৃঃ ১১৫) এইরূপে বাচস্পতিমিশ্রের নাম উল্লেখপূর্বক তীর্থচিন্তামণি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'রাসযাত্রাবিবেক' পুঁথিতেও ইহা উল্লিখিত আছে (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, নং উ৩৪০, ফোলিও ২ক)।

আর শূলপাণির শুধুমাত্র রাসযাত্রাবিবেক গ্রন্থেই নহে, দুর্গোৎসববিবেকেও বাচস্পতিমিশ্রের বর্ষকৃত্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যেমন—

(পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শূলপাণি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শূলপাণি হইতেই বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতির প্রবর্তন হইয়াছে। তিনি বহু নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন[৪৫]। নিবন্ধ ব্যতীত কয়েকখানি টীকাগ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থাবলী হইতেছে—

(১) অনুমরণবিবেক[৪৬]
(২) একাদশীবিবেক[৪৭]
(৩) কালবিবেক[৪৮]
(৪) চতুরঙ্গদীপিকা[৪৯]
(৫) তিথিবিবেক[৫০]
(৬) তিথিদ্বৈতপ্রকরণ[৫১]
(৭) দত্তকপুত্রবিধি[৫২]
(৮) দত্তকবিবেক[৫৩]
(৯) দুর্গোৎসববিবেক[৫৪]
(১০) দুর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেক[৫৫]

'দিগ্ বিশেষে ফলবিশেষমাহ বর্ষকৃত্যে—

বিত্তং ব্রহ্মণি কার্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং
যাম্যে চাগ্নিভয়ং সুরদ্বিষি কলির্বিভঃ সমুদ্রালয়ে।" ইত্যাদি [দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ২৬]

এই শ্লোকটি বাচস্পতিমিশ্রের বর্ষকৃত্য পুঁথিতে উল্লিখিত আছে।

[এসিয়াটিক্ সোসাইটি, পুঁথি নং জি ৮৬৮২, ফোলিও ৩৮খ]

ইহা দ্বারা বুঝা যায় স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত পরিত্যাজ্য নহে।

(৪৫) এখানে জ্ঞাতব্য যে শূলপাণি ও তৎপরবর্তী নিবন্ধকারগণের নিবন্ধসংখ্যা অনেক বেশী এবং তাহাও ঠিকমত পাওয়া যায় না বলিয়া এখানে নিবন্ধগুলির সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৪৬) ইহা ক্ষুদ্র গ্রন্থ (৪ পত্র মাত্র), নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে ইহার প্রতিলিপি আছে।

(৪৭) ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ১৪) নির্দেশিত সংস্কৃত কলেজের পুঁথি (সংখ্যা II, 563R), কিন্তু এই পুঁথি ঐ কলেজের গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না।

(৪৮) ইহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় না।

(৪৯) ইহা দাবাখেলা সম্বন্ধে লিখিত বলিয়া এখানে আলোচ্য নহে।

(৫০) (ক) **Poona Orientalist, Oct. 1941 and January 1942.** সং ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী।
(খ) সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত টেক্সট্ সিরিজ, সংখ্যা ৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪।

(৫১) স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ১৫।

(৫২) Aufrecht এর Catalogus Catalogorum, পৃঃ ২৪৩।

(৫৩) Notices of Sans. MSS. R. L. Mitra, Vol. VI. No. 2065, P-129.

(৫৪) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ৭, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

(৫৫) পাওয়া যায় না।

হইয়াছিলেন। শূলপাণি
চনি বহু নিবন্ধ রচনা
তিনি প্রণয়ন করেন।

থদ্বৈতপ্রকরণম্[51]
কপুত্রবিধি[52]
কবিবেক[53]
াংসববিবেক[54]
াংসবপ্রয়োগবিবেক[55]

দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ২৬]

জি ৮৬৮২, ফোলিও ৩৮খ]

কসংখ্যা অনেক বেশী এবং
ান উল্লেখ করা হইয়াছে।
। প্রতিলিপি আছে।
নির্দেশিত সংস্কৃত কলেজের
। যায় না।

2.

সংখ্যা ৫,

065, P-129.
ষণ।

(১১) দোলযাত্রাবিবেক[56]
(১২) পর্ণনরদাহবিবেক[57]
(১৩) প্রতিষ্ঠাবিবেক[58]
(১৪) প্রায়শ্চিত্তবিবেক[59]
(১৫) রাসযাত্রাবিবেক[60]
(১৬) বাসন্তীবিবেক[61]
(১৭) ব্রতকালবিবেক[62]
(১৮) শুদ্ধিবিবেক[63]
(১৯) শ্রাদ্ধবিবেক[64]
(২০) সময়বিধান[65]

---

(৫৬) (ক) 'A Volume of Studies in Indology' presented to Kane, Poona, 1941. By Dr. S. C. Banerjee.
(খ) কাশীর সংগ্রহগ্রন্থে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৮১৪।
[ইহা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে]

(৫৭) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি নং উ ৩৩৯।

(৫৮) এসিয়াটিক্ সোসাইটি পুঁথি নং জি ১১৪—ইহার শেষে (ফোলিও ১৪খ) 'প্রতিষ্ঠাবিবেকঃ সমাপ্তঃ' এই কথা লিখিত থাকায় পুঁথির তালিকায় প্রতিষ্ঠাবিবেক নাম দেওয়া হইয়াছে এবং কেহ কেহ ইহাকে প্রতিষ্ঠাবিবেক বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহা 'ব্রতকালবিবেক' পুঁথি। কারণ এই পুঁথিরই প্রারম্ভে ব্রতকালবিবেক বলিয়া ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার দেখা যায় এই পুঁথির শেষ পংক্তির পূর্বপংক্তিতে লেখা আছে—'প্রতিষ্ঠাবিধানঞ্চ প্রতিষ্ঠাবিবেকেহনুসন্ধেয়ম্' (ফোলিও ১৪খ)।
আর ইহার সহিত মুদ্রিত ব্রতকালবিবেকের হুবহু মিল আছে। অতএব বুঝা যায় গ্রন্থসমাপ্তিতে ভুলবশতই প্রতিষ্ঠাবিবেক বলা আছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠাবিবেক সম্বন্ধে কোন পুঁথিই পাওয়া যায় না।

(৫৯) (ক) সং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ১৮৯৫।
(খ) সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা ১৮৯৩।

(৬০) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা অক্টোবর, ১৯৪১। সং ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

(৬১) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ৭, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

(৬২) (ক) Indian Historical Quarterly, vol. XVII, 1941, Ed. Dr. S. C. Banerjee.
(খ) কাশীর সংগ্রহগ্রন্থে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৮১৪ (ইহা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে)।

(৬৩) অনাবিষ্কৃত।

(৬৪) (ক) সং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।
(খ) সং চারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য, কলিকাতা ১৮৬১ শকাব্দ (পর্যুদাসপ্রকরণ পর্যন্ত)।

(৬৫) Catalogue of Sans. MSS. in the Private Libraries of the N. W. Provinces, Part I, P—94, MS. No 66, Benares, 1874.

(২১) সংক্রান্তিবিবেক[৬৬]

(২২) সম্বন্ধবিবেক[৬৭]

(২৩) সংবৎসরপ্রদীপ[৬৮]

এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও শূলপাণি ৩ খানি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন—

(১) দীপকলিকা[৬৯]—ইহা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা।

(২) গোভিলটীকা[৭০]

(৩) ছন্দোগপরিশিষ্টটীকা[৭১]

আবার রঘুনন্দন 'পরিশিষ্টদীপকলিকা' নামক শূলপাণিকৃত অপর একটি টীকা-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন[৭২]।

শূলপাণির অনাবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির নাম তাঁহার অপর আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থরচনায় শূলপাণির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁহার নিবন্ধ সমূহ রচিত হওয়ার পর উহাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন প্রণীত নিবন্ধ প্রসার লাভ করিলে শূলপাণির নিবন্ধের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অনেক কমিয়া যায়। তথাপি এখন পর্যন্ত শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক নামক গ্রন্থ দুইটির পঠন-পাঠন প্রচলিত আছে। কার্তিকেয়ব্রতের অনুষ্ঠান সমাজে এখনও শূলপাণি নির্দেশিত মত অনুসারে চলিত আছে। তাঁহার মতে সংক্রান্তিনিমিত্তক ব্রত সেই সেই সংক্রান্তি জন্য পুণ্যকালে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির অর্থ রাশ্যন্তরসংযোগ। তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাতে স্নান, দান ইত্যাদি হইতে পারে না। এইকারণে সংক্রান্তিজন্য পুণ্যকালে লক্ষণা। ইহা নিরূঢ়লক্ষণা, অভিধা শক্তির ন্যায় হইয়াছে। কার্তিকেয়ব্রতে সংক্রান্তিজন্য পুণ্যকালোপলক্ষিত দিনে লক্ষণা করায় এখানে লক্ষিতলক্ষণা হইয়াছে। তুলা-

---

(৬৬) কাশীর সংগ্রহগ্রন্থে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৮১৪। [ইহা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে]

(৬৭) সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৪২।

(৬৮) Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal I, No. 1475 (kba), P—60.

(৬৯) Ed. J. R. Gharpure, Bombay 1939.

(৭০) অনাবিষ্কৃত।

(৭১) ঐ।

(৭২) অতএব পিতৃদয়িতাপরিশিষ্টপ্রকাশশূলপাণিকৃতপরিশিষ্টদীপকলিকাপ্রভৃতিষু মন্ত্রাভিধান-পূর্বকবাক্যেন বৃষোৎসর্গ ইত্যুক্তম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৯৫]

অপর একটি টীকা-

ত গ্রন্থগুলির মধ্যে
। তাঁহার নিবন্ধ
চলিত হইয়াছিল।
করিলে শূলপাণির
পর্যন্ত শূলপাণির
ন প্রচলিত আছে।
অনুসারে চলিত
ন্তি জন্য পুণ্যকালে
ল্প বলিয়া তাহাতে
পুণ্যকালে লক্ষণা।
ব্রতে সংক্রান্তিজন্য
হইয়াছে। তুলা-

ত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে

belonging to the

প্রভৃতির মন্ত্রাভিধান-

রাশির পর সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে গমনকালে অর্থাৎ বৃশ্চিক সংক্রান্তিতে কার্তিকেয়ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং শূলপাণির মতে[৭৩] প্রথম সম্পূর্ণ অর্ধরাত্রির পর বৃশ্চিক সংক্রান্তি হইলে পরদিনে প্রহর দ্বয়ের পুণ্যকাল হইয়া থাকে এবং তদ্‌যুক্ত অহোরাত্রে কার্তিকেয় ব্রতের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। কারণ ব্রতের অঙ্গীয় স্নানাদি দিবাতে করা কর্তব্য। ব্রত প্রাতঃকালে আরম্ভ করিতে হয় এবং তদঙ্গীয় উপবাস অহোরাত্রসাধ্য। কিন্তু নবীনমতে[৭৪] সম্পূর্ণ অর্ধরাত্রির পর বৃশ্চিক সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তিজন্য পুণ্যকালে ব্রতানুষ্ঠান পরদিন হইবে না, পূর্বদিন ঐ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দুই মতই বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। কেহ হয়ত নবীনমতে পূর্বদিন ব্রত উদ্‌যাপন করেন, আবার কেহ হয়ত পরদিন শূলপাণির মতে এই ব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৩৭০ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬৩ সালে) কার্তিকেয়ব্রত নবীনমতে ২৯শে কার্তিক (ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর) শনিবার উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আবার শূলপাণির মতে ৩০শে কার্তিক (ইংরাজী ১৭ই নভেম্বর) রবিবার এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ পূর্বোক্ত বৎসর বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যসংক্রমণ রাত্রিশেষার্ধে হইয়াছে বলিয়া পরদিবসের পূর্বার্ধ পুণ্যকাল হইলেও নবীনমতে পূর্বদিন এই ব্রতানুষ্ঠান শাস্ত্র অনুসারে বিধেয়। কিন্তু শূলপাণি পরদিন এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন। দুই মতই পঞ্জিকায় লিখিত আছে[৭৫]। রঘুনন্দন এই ব্রত সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

---

(৭৩) ততশ্চ সংপূর্ণার্দ্ধরাত্রাৎ পরং বৃশ্চিকসংক্রান্তৌ পরদিনে পূর্বযামদ্বয়স্য পুণ্যকালত্বেন তদ্‌যুক্তাহোরাত্র এব কার্তিকেয়ব্রতং কর্তব্যং দিবা তদঙ্গস্নানাদেঃ কর্তব্যত্বাৎ, ব্রতত্বেন প্রাতরারম্ভার্হত্বাৎ তদঙ্গোপবাসস্য প্রাতরারম্ভার্হত্বাচ্চ। [ব্রতকালবিবেক, পৃঃ ২৩]

(৭৪) অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু সংক্রান্তির্যদি ভবেৎ।
পূর্বে ব্রতাদিকং কুর্য্যুঃ পরেদ্যুঃ স্নানদানয়োঃ॥ ইতি ভীমপরাক্রমবচনাৎ
রাশিতো রাশিতো যাতি যস্মিন্নহনি ভাস্করঃ।
তদ্দিনে তদ্দিনে কার্যং কার্তিকেয়ব্রতাদিকম্॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাচ্চ পূর্বদিনে কার্তিকেয়ব্রতমিত্যাহুঃ।
[তিথিতত্ত্বে কাশীরাম বাচস্পতিকৃত টীকা, পৃঃ ২৮০ ও স্মৃতিচিন্তামণি, পৃঃ ৯৬]

(৭৫) গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৮৯।

২৯শে কার্তিক, ইং ১৬ই নভেম্বর শনিবার—শ্রীশ্রীকার্তিকেয়ব্রত—'বিষ্ণুপদীসংক্রান্তিঃ—অদ্য দণ্ডদ্বয়াত্মকমধ্যরাত্রীয়শেষদণ্ডোত্তররাত্রিশেষার্দ্ধে সূর্যসংক্রমণাৎ পরদিবাপূর্বার্দ্ধং পুণ্যম্।'

আবার (পৃঃ ১৯১)—৩০শে কার্তিক, ইং ১৭ই নভেম্বর রবিবার—'শূলপাণ্যাদিনিবন্ধকারমতে শ্রীশ্রীকার্তিকেয়ব্রতম্।'

শূলপাণি সমাজের প্রয়োজনে নূতন ধরনে স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া শাস্ত্রজগতে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। পূর্বে মাত্র আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধ রচনার প্রবর্তন সর্ব প্রথমে শূলপাণিই করেন। যেমন আমরা দেখিতে পাই এক আচারের উপরই বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন নিবন্ধের প্রণয়ন তিনি করেন। আর রঘুনন্দন হয়ত শূলপাণির এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াই ২৮ খানি তত্ত্ব স্মৃতির বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে বিরচিত করিয়াছেন।

তখনকার সমাজব্যবস্থায় এই নিবন্ধগুলি রচনার যে একান্ত প্রয়োজন ছিল তাহা শূলপাণি নিবন্ধরচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন যে, বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত প্রকাশিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে ধর্মবিষয়ে যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল, তাহাতে প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার ব্রতকালবিবেক রচনা করেন[৭৬]।

তিথিবিবেক গ্রন্থ রচনার পূর্বেও শূলপাণি তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সদ্ব্যক্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন বচন দ্বারা যে সংশয় উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার জন্যই তিনি এই তিথিনির্ণয়বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন[৭৭]।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে শূলপাণি সেই সময়কার সমাজে যে সকল বেদনিষিদ্ধ কর্ম প্রচলিত ছিল তাহার বিরুদ্ধে যাহাতে জনগণ সত্যপথে চলিতে পারে সেইজন্য বেদ ও স্মৃতি নির্দেশিত কর্ম জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। আর যাঁহারা বিপথে চালিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা দিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিনির্দিষ্ট আচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—সর্বদা বেদোক্ত স্বধর্মনির্দিষ্ট আচারাদি পালন করিতে পরাঙ্মুখ ও সেই সেই বেদনিষিদ্ধ কর্মসমূহ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের কলিকালে স্তূপীকৃত কলুষ ধ্বংসের জন্য এক্ষণে শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন[৭৮]।

---

(৭৬) নানামুনিমতদ্বৈধজাতসংশয়কৃন্তনঃ।
ব্রতকালবিবেকোঽয়ং ক্রিয়তে শূলপাণিনা॥ [ব্রতকালবিবেক, পৃঃ ৬]

(৭৭) বচনদ্বৈধসঞ্জাতসংশয়চ্ছিদুরঃ সতাম্।
তনোতু মুদমত্যুচ্চৈ দ্বিধশুতিথিনির্ণয়ঃ॥ [তিথিবিবেক, পৃঃ ১]

(৭৮) নিত্যশ্রুত্যাদিতস্বধর্মচরণানুধ্যানহীনাত্মনাং
তত্তদ্বেদনিষিদ্ধকর্মনিচয়ানুষ্ঠাননিষ্ঠাবতাম্।
লোকানাং কলিকালরূঢ়কলুষধ্বংসার্থমেষোঽধুনা
প্রায়শ্চিত্তবিবেকমত্র বিদধে শ্রীশূলপাণিঃ সুধীঃ॥ [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ১]

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা দীপকলিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে শূলপাণি বলেন— অজ্ঞানতা হেতু আচ্ছন্ন হইয়াছে যে শাস্ত্রার্থ সেই শাস্ত্রার্থের প্রকৃত প্রতিপত্তির জন্যই কলিকাল-জনিত দোষত্রুটি ধ্বংসকারী এই দীপকলিকা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে[৭৯]।

বঙ্গদেশের অপর খ্যাতনামা নিবন্ধকার শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি শূলপাণিকে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য গুরু বলিয়া মনে করিতেন। কারণ আমরা দেখি শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা করিতে গিয়া শ্রীনাথ শূলপাণিকে প্রণাম জানাইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীনাথ বলেন সামাজিক ব্যবস্থাদ্বৈধে যে ভ্রান্তি উপস্থিত হয় তাহা নিরসনের হেতুস্বরূপ পণ্ডিতবর্গের পূজ্য শূলপাণিকে আমি নমস্কার করি[৮০]।

আবার শ্রীনাথ শ্রাদ্ধবিবেকের টীকার প্রারম্ভেও শূলপাণির পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—কোথায় শূলপাণির দুরূহ বচন, আর কোথায় আমার কুবুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধি? সেই গ্রন্থের তাৎপর্য আমি বলিতেছি; এইজন্য সুধীবর্গ আমাকে ক্ষমা করুন[৮১]।

শ্রীনাথ শূলপাণির নাম উল্লেখ করিবার সময়ে 'শূলপাণিপাদ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন[৮২]। কিন্তু জীমূতবাহন প্রভৃতি নিবন্ধকারের নামের শেষে এই সম্মান তিনি প্রদর্শন করেন নাই। 'পাদ'শব্দ ব্যবহার দ্বারা শূলপাণির প্রতি শ্রীনাথের সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় যে শ্রীনাথ তাঁহার অপূর্ব বিদ্যাবত্তার জন্য শূলপাণিকে গুরুর সম্মানজনক আসনে বসাইয়াছেন।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে শ্রীনাথ শূলপাণির পাণ্ডিত্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যার সমাপ্তিতে সগৌরবে লিখিয়াছেন যে[৮৩]—চিন্তামণি, কামধেনু, হেমাদ্রি, রত্নাকর ও কল্পতরু গ্রন্থগুলি

---

(৭৯) অজ্ঞানতিমিরগ্রস্তশাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তয়ে।
ক্রিয়তেয়ং দীপকলিকা কলিকালমলাপহা॥ [দীপকলিকা, পৃঃ ১]

(৮০) ব্যবস্থাদ্বৈধসম্ভ্রান্তিসন্তানচ্ছেদহেতবে।
বিবুধশ্রেণিবন্দ্যায় নমঃ শ্রীশূলপাণয়ে॥

[শ্রীনাথের শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা পুঁথি, ফোলিও ১ খ]

(৮১) ক্ব শূলপাণের্বচনং দুরূহং ক্ব ধী র্মদীয়াল্পতমা তথাপি।
ব্রবীমি তাৎপর্যলবং তদীয়ং যদত্র তন্মে সুধিয়ঃ ক্ষমধ্বম্॥ [ঐ, ফোলিও ১খ]

(৮২) যদপি তিথিবিবেকে শূলপাণিপাদৈঃ......। [শ্রীনাথের দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ৪৬]

(৮৩) সন্ত্যেব চিন্তামণিকামধেনুহেমাদ্রিরত্নাকরকল্পবৃক্ষাঃ।
তুষ্টৈরলং তৎপ্রতিপাদিতার্থৈস্তত্ত্বাববোধায় তু শূলপাণিঃ॥

[শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা, ফোলিও ৮৪ খ]

থাকিলেও এইগুলিতে প্রতিপাদিত অর্থ দ্বারা তুষ্টিলাভ হয় না, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ববোধ করাইতে শূলপাণি শ্রেষ্ঠ।

এই যুগে স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে শূলপাণিকেই আমরা সর্বপ্রথমে দেখি সমাজের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার মধ্যে পার্থক্য উদ্ভূত হওয়ার দরুণ যে ভ্রান্তি বা সংশয় ঘটিত, তিনি স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্য দ্বারা উক্ত সংশয় বা বিরোধ অপনোদন করিতেন। চারিদিকে সন্দেহ ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতেই শূলপাণি তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। এইজন্য শূলপাণিকে পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ অপেক্ষা অনেক বেশী উদারনীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেমন আমরা দেখি, বল্লালসেন যে দেবীপুরাণকে পাষণ্ডশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, সেই দেবীপুরাণকেই শূলপাণি তাঁহার দুর্গোৎসববিবেকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহা হইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। শূলপাণিই সর্বপ্রথমে স্বমত সমর্থন করিবার জন্য বিভিন্ন তন্ত্রের বচন কোনও কোনও গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া তন্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত সমস্ত গ্রন্থে এইরূপ উদ্ধৃতি দেখা যায় না বটে, কিন্তু দুর্গোৎসববিবেকে ও ব্রতকালবিবেকে এইরূপ উদ্ধৃতির বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। দুর্গোৎসববিবেকে গবাক্ষতন্ত্র, বৈষ্ণবীতন্ত্র, মহাকপিলপঞ্চরাত্র[৮৪] প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ হইতে তিনি বচন উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রতকালবিবেকে[৮৫] ঈশানসংহিতা, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ হইতে তিনি বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়া শূলপাণি তান্ত্রিক আচার-ব্যবহার কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি জনপ্রিয় কতকগুলি আচার-ব্যবহারকে স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু এই আচার-ব্যবহারগুলি তাঁহার পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ স্বীকার করেন নাই।

অনেকের ধারণা যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারগণের সরল ও উদার মত নিবন্ধকারগণের যুগে কঠোরতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা ভুল ধারণা। কারণ আমরা দেখি, শূলপাণি এই ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য বেদবিরুদ্ধ ম্লেচ্ছ, যবন, পাষণ্ড প্রভৃতির কোন প্রভাব যাহাতে হিন্দুদের আচার-ব্যবহারের উপর না পড়ে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি উপবাস বা ব্রতদিনে পতিত, পাষণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ পরিত্যাগ

(৮৪) দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ১২, ১৫, ২৩।

(৮৫) ব্রতকালবিবেক, পৃঃ ২২, ২৩।

করিতে নির্দেশ দিয়াছেন[৮৬]। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বল্লালসেন সর্বদাই ম্লেচ্ছ, যবন, পাষণ্ডীদের সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু শূলপাণি কালের পরিবর্তনে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া শুধু ব্রত বা উপবাসদিনেই এই নিষেধ প্রবর্তন করেন, ইহা ব্যতীত অন্যসময়ে ম্লেচ্ছ প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণে দোষ নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু কালের পরিবর্তনে ধর্মীয় আচার, ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যেও কিছু কিছু উদার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

শূলপাণি বঙ্গীয় স্মৃতিতে এই যে নূতন বিষয়ের সংযোজনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি দেশকে তথা সমাজকে বিভিন্ন উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে সর্বদা প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তখনকার সমাজব্যবস্থায় শূলপাণির মত উদার মতবাদী নিবন্ধকারের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ অপেক্ষা সমাজ রক্ষার প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি শূলপাণির গ্রন্থগুলি সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়াছিল। সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা ইহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এইজন্য শ্রীনাথ তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যার শেষে বলেন যে[৮৭] শূলপাণির পরবর্তী গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহ কেহ কুতর্কের বশবর্তী হইয়া, অপর কেহ শূলপাণির প্রতি দ্বেষহেতু, আবার কেহ গড্ডলিকাপ্রবাহে বর্তমান থাকার দরুণ অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূলপাণির গ্রন্থ বুঝিতে সমর্থ হয় না বলিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শূলপাণির পরেও ধর্মের যথার্থ পথ নির্দেশের জন্য দৃঢ় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রয়োজন ছিল। অতএব পরবর্তী শাস্ত্রকারগণের চেষ্টা হইল যাহাতে তাহারা সমুদ্ভূত সমস্ত সন্দেহের নিরসনপূর্বক সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে পারেন।

(খ) বৃহস্পতিরায়মুকুট

বৃহস্পতিরায়মুকুট ছিলেন রাঢ়দেশের অধিবাসী। তিনি মহিন্তা-গাঁই-এর রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিজের 'কুলীনাগ্রণী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

(৮৬) ব্রতদিনে বর্জ্যান্যাহ হারীতঃ—
পতিতপাষণ্ডিনাস্তিকসম্ভাষানৃতাশ্লীলাদিকমুপবাসদিনে বর্জয়েৎ।
[ব্রতকালবিবেক পৃঃ ১০]

(৮৭) কেচিৎ কুতর্কাধ্যবসায়......ন্যে দ্বেষাৎ পরে গড্ডলিকাপ্রবাহাৎ।
অজ্ঞানতঃ কেচন শূলপাণে র্ভ্রান্তি সিদ্ধাবপথাদপেতাঃ।
[শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা পুঁথি, ফোলিও ৮৪ খ]

বৃহস্পতির স্বকীয় উক্তিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার পিতার নাম ছিল গোবিন্দ এবং মাতা ছিলেন নীলসুখায়ী দেবী। গোবিন্দ ছিলেন পরম বৈষ্ণব, ধার্মিক ও জ্ঞানী। প্রতিদিন তিনি ভাগীরথীতে স্নান করিতেন, আবার নীলসুখায়ী দেবীও সর্বগুণান্বিতা ছিলেন। বৃহস্পতির সহধর্মিণীর নাম ছিল নির্বৃ্তী বা নির্বৃ্তা।

বৃহস্পতির পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস কোথায় ছিল এবং কিভাবে বৃহস্পতি বঙ্গদেশে আগমন করেন তাহার সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বৃহস্পতি গৌড়দেশে আগমন করেন রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন বঙ্গদেশের শাসক হিসাবে ক্ষমতালাভ করিবার পূর্বেই। বৃহস্পতি যখন প্রথম গৌড়দেশে আসেন, তখন রাজা গণেশের রাজসভায় তিনি প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। রাজা গণেশের রাজত্বকালে বৃহস্পতি গৌড়দেশে আগমন করিলেও তৎপুত্র জালালুদ্দিনের রাজত্বকালেই তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করেন। বৃহস্পতির গ্রন্থগুলিতে এইজন্যই রাজা গণেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা ও জালালুদ্দিন সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী প্রশংসা দেখা যায়।

বঙ্গাধিপতি জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে বৃহস্পতি পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার 'রায়মুকুট' উপাধি প্রমাণিত করে যে—রায়মুকুট অর্থাৎ রাজা জালালুদ্দিনের মুকুটস্বরূপ ছিলেন এই বৃহস্পতি। জালালুদ্দিনের প্রভাবেই সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে বৃহস্পতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন[৮৮]। আবার জালালুদ্দিন বৃহস্পতিকে 'আচার্য' 'কবিচক্রবর্তী', 'পণ্ডিতসার্বভৌম' প্রভৃতি উপাধি দান করেন[৮৯]। বৃহস্পতি তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও কর্মদক্ষতায়ই বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপরন্তু পার্থিব ধন-সম্পত্তিও তিনি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বৃহস্পতি বঙ্গাধিপতির সৈন্যাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতির পুত্রগণও মন্ত্রিত্বের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৯০]।

বৃহস্পতি পরিণত বয়সেই গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার পদচন্দ্রিকায় বলা আছে যে তাঁহার 'বিশ্বাসরায়' নামে পুত্রগণ জালালুদ্দিনের

---

(৮৮) গৌড়াধিপাত্বপচিতপ্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ......। [পদচন্দ্রিকা, পৃঃ ৪৪২, Indian Historical Quarterly, 1941. By Dr. Hazra.]

(৮৯) ইতি মহিস্তাপনীয়কবিচক্রবর্তিরাজপণ্ডিতসার্বভৌমকবিপণ্ডিতচূড়ামণিমহাচার্যরায়মুকুটমণি-শ্রীমদ্বৃহস্পতি·········। [পদচন্দ্রিকা, পৃঃ ৪৪২]

(৯০) যৎপুত্রা নৃপমন্ত্রিমৌলিমণয়ো......ইত্যাদি। [ঐ, পৃঃ ৪৪৪]

শাস্ত্রগণের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্নরূপে প্রতিভাত ছিলেন। আবার তাঁহারা ছিলেন সুপণ্ডিত। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহারা মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জালালুদ্দিন অত্যন্ত পরিণত বয়সে বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সময়ে সংস্কৃতবিদ্যা ও ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রচর্চার বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি সর্বদা হিন্দুসংস্কৃতি ও শিক্ষাকে উৎসাহ দান করিয়াছেন। রাজ্যশাসনব্যাপারে তিনি হিন্দুগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেন এবং তাঁহার শাসনকে হিন্দুরাজার শাসনরূপে অভিহিত করা হইত। তিনি হিন্দুগণের প্রতি দয়াশীল ও তাঁহাদের মঙ্গলবিধানে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। জনগণের দারিদ্র্য দূর করিতেও তিনি মনোযোগ দিয়াছেন। এইজন্য তিনি ব্রহ্মাণ্ডদান, স্বর্ণনির্মিত অশ্ব ও রথদান, বিশ্বচক্রদান, পৃথিবীদান, কৃষ্ণাজিনদান প্রভৃতি মহাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাঁহারই প্রদত্ত সম্মান ও প্রতিপত্তিতে বলীয়ান্ হইয়া বৃহস্পতি তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে কাব্য ও স্মৃতি দুইই পাওয়া যায়। যথা—

(১) সুবোধা বা ব্যাখ্যাবৃহস্পতি (কুমারসম্ভবের টীকা)
(২) রঘুবংশবিবেক বা ব্যাখ্যাবৃহস্পতি (রঘুবংশের টীকা)
(৩) বোধবতী (মেঘদূতের টীকা)
(৪) নির্ণয়বৃহস্পতি (শিশুপালবধের টীকা)
(৫) পদচন্দ্রিকা (অমরকোষের টীকা)

এইগুলি কাব্যগ্রন্থ। এখানে স্মৃতিবিষয় আলোচ্য বলিয়া তাহাই আলোচিত হইতেছে। স্মৃতিগ্রন্থ দুইখানি—

(১) রায়মুকুটপদ্ধতি
(২) স্মৃতিরত্নহার[৯১]

রায়মুকুটপদ্ধতির কোন পুঁথিই এখন আর পাওয়া যায় না। স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থে হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার ও তাহাদিগের অনুষ্ঠানের যথাযথ কাল নির্ধারণ করা আছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে[৯২]—বৃহস্পতি বহু

(৯১) H. P. Sastri Cat. III, Asiatic Society of Bengal, No. 2138, P—226-230.
(৯২) আচার্য ইত্যভিমতং কবিচক্রবর্তী
......দ্বিতীয়মধ্যগমত্তো যঃ।

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংগ্রহগ্রন্থের সাহায্যে এই স্মৃতিরত্নহার নিবন্ধ রচনা করিতেছেন। উত্তম বিধি-সমন্বিত বহু প্রাচীন গ্রন্থ আছে সত্য, কিন্তু এই আচার অশেষ, তাহাদের সম্যক্ বোধ করিবার জন্যই এখানে ইহা আলোচিত হইতেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৃহস্পতি গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কারণ আমরা দেখি তিনি তাঁহার পদচন্দ্রিকায়[৯৩] উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার এই গ্রন্থ ১৩৫৩ শকে অর্থাৎ ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা তাঁহার নিবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন যে বাংলা রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস বার বৎসর বয়সে গৌড়দেশে আগমন করেন ও বৃহস্পতি-রায়মুকুটের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরে রাজা গণেশের সভায় কৃত্তিবাস আসিলে রাজা গণেশ কর্তৃক তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হন এবং তাঁহার বিখ্যাত রামায়ণগ্রন্থ রচিত হয়[৯৪]। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বৃহস্পতির পাণ্ডিত্য চারিদিকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বৃহস্পতির গ্রন্থগুলিও জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য আচার-ব্যবহার যাহাতে সকলে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, এইজন্যই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে প্রাচীন গ্রন্থ বহু থাকিলেও জনসমাজে তাহা সম্যক্ বোধ করাইবার জন্যই তাঁহার গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা।

মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের পর খুব সম্ভবতঃ বৃহস্পতিই প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানগণ বঙ্গদেশ কেবল আক্রমণ করিতেছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিজিত হয় নাই, তখনই শূলপাণি শাস্ত্রজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতির সময়ে বঙ্গদেশের সিংহাসনে মুসলমান নরপতি অধিষ্ঠিত থাকিলেও এই নরপতি সংস্কৃত চর্চায় বরাবর উৎসাহদান করিয়াছেন। বৃহস্পতিও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গুণে নিবন্ধ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশেই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তখনকার সমাজব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়াই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈ
নির্মাতি নির্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্॥
প্রাচীনাঃ সংগ্রহাঃ সন্তি সত্যং সদ্বিধিবোধকাঃ।
কিন্তশেষা......হোয়ং বিবিচ্যতে॥ [স্মৃতিরত্নহার, পৃঃ ৪৪৮,
Indian Hist. Quarterly, 1941]

(৯৩) Indian Hist. Quarterly, 1941, P—451.
(৯৪) ঐ, পৃঃ ৪৫৫।

বঙ্গদেশের
নাম স্মৃতিনিবন্ধে
উজ্জ্বল হইয়া আ
জিত, সেই আধা
শ্রীনাথের পাণ্ডিত
হইয়া অমর হইয়া
ইত্যাদি দ্বারা শ্রীন
পুত্র বলিয়া নিজে
স্মৃতিগ্রন্থ রচনা
বংশগত। তবে
গ্রন্থ রচনা করিয়া
তাঁহার গ্রন্থগুলি
গ্রন্থগুলির মধ্যে
(১) সারমঞ্জরী
(২) শ্রাদ্ধবিবেক
(৩) তাৎপর্যদীপি
(৪) দায়ভাগটিপ্প
(৫) গূঢ়ার্থদীপিক
(৬) শ্রাদ্ধদীপিকা
(৭) বিবেকার্ণব
(৮) কৃত্যতত্ত্বার্ণব

(৯৫) বঙ্গীয় সাহিত
(৯৬) কলিকাতা স
(৯৭) সং ডঃ যতীন
(৯৮) সং পণ্ডিত ভ
(৯৯) কোন পুঁথি
(১০০) কলিকাতা স
(১০১) বঙ্গীয় সাহিত
(১০২) (ক) Asiat
(খ) বঙ্গীয়

(গ) শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি

বঙ্গদেশের গৌরব স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের অধ্যাপক শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণির নাম স্মৃতিনিবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীনাথের অপূর্ব জ্ঞান মহিমায় রঘুনন্দন শাস্ত্রজগতে চির উজ্জ্বল হইয়া আছেন। কিন্তু যে জ্ঞানরূপ তৈলে রঘুনন্দনপ্রদীপ ভাস্কররূপে বিরাজিত, সেই আধারস্বরূপ শ্রীনাথ অবহেলার ঘন অন্ধকারের মধ্যে লীন হইয়া আছেন। শ্রীনাথের পাণ্ডিত্যরূপ জল সেচনেই রঘুনন্দনরূপ জ্ঞানবৃক্ষ অদ্যাবধি ফলফুলশোভিত হইয়া অমর হইয়া আছে। রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থাবলীতে 'গুরুপাদাঃ' 'গুরুচরণাঃ' ইত্যাদি দ্বারা শ্রীনাথের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীনাথ তাঁহার গ্রন্থসমাপ্তিতে শ্রীকরের পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। আবার শ্রীনাথের পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারও স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং দেখা যায় যে স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহাদের বংশগত। তবে সকলের মধ্যে শ্রীনাথই উজ্জ্বলতম রত্নরূপে প্রতিভাত। শ্রীনাথ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থগুলির মধ্যে খুব কমই মুদ্রিত হইয়াছে। তবে তাঁহার গ্রন্থগুলি পুঁথি আকারে এখনও বিভিন্নস্থানে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থগুলির মধ্যে নিবন্ধ ও টীকাগ্রন্থ দুইই আছে। যথা—

(১) সারমঞ্জরী[৯৫]—নারায়ণকৃত 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে'র টীকা।

(২) শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা বা শ্রাদ্ধবিবেকটিপ্পনী[৯৬]—শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা।

(৩) তাৎপর্যদীপিকা[৯৭]—শূলপাণির 'তিথিবিবেকে'র টীকা।

(৪) দায়ভাগটিপ্পনী[৯৮]—জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা।

(৫) গূঢ়ার্থদীপিকা[৯৯]

(৬) শ্রাদ্ধদীপিকা[১০০]

(৭) বিবেকার্ণব[১০১]

(৮) কৃত্যতত্ত্বার্ণব[১০২]

---

(৯৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, নং ১৫০৮।

(৯৬) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুঁথি, নং স্মৃ ৪০৩।

(৯৭) সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৪, প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত টেক্সট্, সংখ্যা ৫।

(৯৮) সং পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, কলিকাতা, ১৮৬৩ সাল।

(৯৯) কোন পুঁথি পাওয়া যায় না।

(১০০) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথি, নং স্মৃ ৩৯৬।

(১০১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, নং ১৫৩৬।

(১০২) (ক) Asiatic Society of Bengal, Ms. No. G. 3690.
(খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, নং ১৫৩৫।

(৯) শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব[১০৩]
(১০) বিবাহতত্ত্বার্ণব[১০৪]
(১১) আচারচন্দ্রিকা[১০৫]
(১২) শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা[১০৬]
(১৩) দানচন্দ্রিকা[১০৭]
(১৪) দুর্গোৎসববিবেক[১০৮]
(১৫) প্রায়শ্চিত্তবিবেক[১০৯]
(১৬) শুদ্ধিবিবেক[১১০]

শ্রীনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে।

শ্রীনাথের বাস্তব অবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। তখনকার সমাজের যে অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি সেই কালোপযোগী ও সমাজোপযোগী শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকীয় উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীনাথ নিজেই গ্রন্থসমূহের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে জনগণের মধ্যে সমুদ্ভূত সমস্ত সন্দেহ ও জড়তা দূর করিতে পারিবেন—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার মনে ছিল। এইজন্য তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধদীপিকার শেষে লিখিয়াছেন[১১১]—সন্দেহরূপ তিমিরের দ্বারা আচ্ছন্ন যে শ্রাদ্ধ-বিষয়, তাহার প্রকাশক ও জগতের জড়তা দূর করিতে সমর্থ এই শ্রাদ্ধদীপিকা গ্রন্থ সস্নেহে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা গ্রন্থের সমাপ্তিতে তিনি বলেন[১১২]—আচারগুলির মধ্যে পার্থক্য

(১০৩) Asiatic Society of Bengal, Ms. No. G. 3689.

(১০৪) Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951.
সং ডঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী।

(১০৫) Sanskrit College Library, Varanasi, No. 13407 &12436

(১০৬) (ক) Asiatic Society of Bengal, Ms. No. 3683.
(ইহা তালপাতার পুঁথি, অত্যন্ত প্রাচীন, ভগ্ন ও কীটদষ্ট ; এখন ব্যবহারের অযোগ্য)
(খ) Eggeling, Cat. of Skt. Mss. in India Office Library III, No. 1734 (Ms. No. 1611.)

(১০৭) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথি, নং স্মৃ ৮১১।

(১০৮) সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা-৭।

(১০৯) Mitra Notices, VIII pp. 272-273, No. 2830.

(১১০) ঐ, pp. 273-274, No. 2831.

(১১১) সন্দেহতিমিরাচ্ছন্নশ্রাদ্ধকল্পপ্রকাশিকা।
জগজ্জাড্যাপহা কৢপ্তা সস্নেহং শ্রাদ্ধদীপিকা॥ [শ্রাদ্ধদীপিকা পুঁথি, ফোলিও ৬৭ খ]

(১১২) আচারদ্বৈধসংজাতসন্দেহতিমিরাপহা।
বিবুধানন্দজননী কৃতেয়ং শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা॥ [শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা পুঁথি, ফোলিও ৫৪ খ]

থাকার দরুণ সন্দেহরূপ অন্ধকারের অপহারক, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের আনন্দদায়ক শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছে।

শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন[১১৩]—সূতকশুদ্ধিবিষয়ে বহুপ্রকার নিবন্ধ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে মতবৈষম্যহেতু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক নিবন্ধকারগণের প্রবোধের জন্য ও বিভিন্ন মুনিবাক্যের সমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের অভিমত খণ্ডন করিবার যুক্তিসমন্বিত বিচার করা কর্তব্য। সেইজন্য শ্রীনাথ এই গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কৃত্যতত্ত্বার্ণবের প্রারম্ভে শ্রীনাথ বলেন[১১৪]—কালবিষয়ক শ্রৌতবিধিতে সর্বদাই পণ্ডিতগণের মধ্যে বিরোধ প্রথিত ছিল। সুতরাং এই বিরোধের মীমাংসা করিতে মুনিগণের বাক্যসকল বিচার করিয়া ইহার তাৎপর্য বলা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া ইহার উপযুক্ত বিষয়গুলি লিখিয়া সমর্পণ করা হইতেছে। বিপথ ও গড্ডরিকাপ্রবাহ দূরে ত্যাগ করিয়া পণ্ডিতব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাসহকারে এইবিষয়ে আন্তরিকভাবে আদর প্রদর্শন করুন।

শ্রীনাথের এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি যে কেবল স্বয়ং সমাজের এই গড্ডরিকাপ্রবাহ বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাই নহে; অপর সকল পণ্ডিতকেও এই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনাথের একমাত্র চেষ্টা ছিল সমাজে ও ধর্মে শান্তি স্থাপন করা।

বিবেকার্ণব গ্রন্থারম্ভে শ্রীনাথ লিখিয়াছেন—"তত্রাসতাং গড্ডরিকাপ্রবাহ-ভ্রমাপনোদায় মম শ্রমোঽয়ম্"॥ [বিবেকার্ণব পুঁথি, ফোলিও ১ ক] জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বেদোক্ত অর্থসমন্বিত ন্যায়শাস্ত্রে পক্ষপাত দেখা যায়। সেখানে নৈয়ায়িকগণ ব্যতীত অপর ব্যক্তিগণের গড্ডরিকাপ্রবাহের ভ্রম অপনোদন করিবার জন্য তাঁহার এই প্রয়াস।

শ্রীনাথ তাঁহার স্বকীয় কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই শাস্ত্র-আলোচনায় যাহাতে শিষ্যগণেরও হিতসাধন হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। আবার কেবল অধ্যাপক হিসাবেই নহে, স্মৃতিগ্রন্থ অধ্যয়নে

---

(১১৩)...আধুনিকানামিতি মসৃণবুদ্ধীনাং প্রবোধায় নানামুনিবাক্যৈকবাক্যতয়া নিরূঢ়প্রৌঢ়যুক্তিক-ক্রমসমন্বিতবিচারঃ কর্তুমুচিত এব।

[শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৪১খ]

(১১৪) শ্রদ্ধাং বুধা বিপথগড্ডরিকাপ্রবাহে
দূরাদ্বিহায় কুরুতাদরমত্র গাঢ়ম্॥ [কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ১ক]

যাঁহারা কোনপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই এইপ্রকার শিষ্যদের অসুবিধা বুঝিয়া তাহা দূর করিতেও শ্রীনাথ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি তিথিবিবেকের টীকা তাৎপর্যদীপিকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"পদপদার্থবিচারজড়াঃ পরে তদিহ শিষ্যহিতায় মম শ্রমঃ" ॥ [তাৎপর্যদীপিকা, পৃঃ ১] দর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শিষ্যগণের বোধের জন্য তাঁহাদের মনোযোগ দেন নাই এবং অন্যেরা স্মৃতিগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির যথাযথ অর্থ নির্ধারণ করিতে অসমর্থ ছিলেন। সুতরাং শিষ্যগণের মঙ্গলের জন্যই তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।

আবার তাৎপর্যদীপিকার শেষে শ্রীনাথ বলেন যে[১১৫] উত্তম শিষ্যের বুদ্ধির বৈশদ্যপ্রাপ্তি করাইতেই তিনি তাৎপর্যদীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

দুর্গোৎসববিবেকের প্রারম্ভে শ্রীনাথ লিখিয়াছেন যে[১১৬] শিষ্যের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সারমঞ্জরী পুঁথির প্রারম্ভে শ্রীনাথ বলেন—"আচারানুমিতশ্রুতিবোধিত-কর্তব্যতাকং মঙ্গলমিষ্টদেবতাকীর্তনরূপং শিষ্যশিক্ষার্থং জগদাশীর্বাদব্যাজেন নিবধ্নাতি" [ফোলিও ১ বি]। ইহাতেও প্রতীয়মান হয় যে শিষ্যশিক্ষার জন্যই তাঁহার এই গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা।

এই সমস্ত উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে সমাজব্যবস্থার প্রতি এবং শিষ্যগণের সন্দেহ দূর করিবার প্রতি দৃষ্টি দিয়াই শ্রীনাথ গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনাথ শাস্ত্রজগতে আবির্ভূত হইয়া দেখিলেন যে মুসলমানগণ ও তান্ত্রিকদের ব্যাপক প্রচারে এবং প্রসারে ব্রাহ্মণ্য আচার-ব্যবহার বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জনগণ সঠিক আচার নির্ণয় করিতেও অসমর্থ হইয়াছে। কারণ কোন্‌টি ব্রাহ্মণ্য আচার, আর কোন্‌টি বিরুদ্ধ আচার—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বের যে সমস্ত নিবন্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি লাগিয়াই ছিল। দেশবাসীর মধ্যে সঠিক ব্রাহ্মণ্য আচার সম্যক্‌ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তখনকার সমাজে উদারমতাবলম্বী ও সহানুভূতিশীল শাস্ত্রকারের প্রয়োজন ছিল, যিনি সর্বদিকে দৃষ্টি দিয়া এই অসহনীয় অবস্থা হইতে দেশকে তথা সমাজকে রক্ষা করিতে পারেন। শ্রীনাথ সমাজের এই বিপর্যয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে তৎকালীন প্রচলিত

---

(১১৫) সুশিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যহেতোঃ শ্রীনাথশর্মণা।
কৃতা তিথিবিবেকস্য টীকা তাৎপর্যদীপিকা ॥ [তাৎপর্যদীপিকা, পৃঃ ৪৯]

(১১৬) স শিষ্যসন্দেহনিরাসহেতোঃ।
শ্রীনাথশর্মা কুরুতে বিবেকম্ ॥ [দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ৪৩]

বহু নূতন আচার সংযোজিত করিতে হইয়াছে। তাঁহার শ্রাদ্ধচন্দ্রিকার শেষে উল্লিখিত আছে যে[১১৭]—পূর্বাপরকৃততত্ত্বাদি অর্থাৎ ঐতিহ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য আচারাদির মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি অসত্য তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং প্রমাণ দ্বারাই সেইসব আচার-ব্যবহার গ্রহণ করা হইবে। প্রমাণ ব্যতিরেকে কিছুই গ্রাহ্য হইবে না। প্রমাণ দ্বারাই যে আচারাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হইবে, ইহা কেবল ব্রাহ্মণ্য আচার-ব্যবহার বিষয়েই গণ্য হইবে। কিন্তু শ্রীনাথ তাঁহার বিবেকার্ণব পুঁথিতে বৃহস্পতির বচন উল্লেখ করতঃ এমন কতকগুলি দেশজ আচারের কথা বলেন, তাহা বৈদিক অনুশাসনের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ নহে[১১৮]।

শ্রীনাথ তন্ত্রগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দেন নাই। তিনি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণকেই ধর্মের প্রামাণও বলিয়া স্বীকার করেন। তন্ত্রকে কেবল আচারগুলির প্রয়োগপ্রণালী হিসাবেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য কোন আচার যাহা মূলতঃ তন্ত্রসম্ভূত, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া ধরেন নাই। তবে সমাজের পরিবর্তনে ও প্রয়োজনে তন্ত্রকে একেবারে অবহেলাও করিতে পারেন নাই। এইজন্য আমরা দেখি, শ্রীনাথ দানচন্দ্রিকার প্রারম্ভে স্পষ্টই উল্লেখ করেন যে, মৎস্যতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তিনি দানচন্দ্রিকা রচনা করিয়াছেন[১১৯]।

শ্রীনাথ উদারতা ও সহানুভূতি লইয়া তাঁহার নিবন্ধগুলি রচনা করেন। তখনকার সমাজের বিপর্যয়ে শ্রীনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল সমাজকে এই বিপর্যয় হইতে রক্ষা করা। তাঁহার বিদ্যাবত্তার গুণে ও দূরদর্শিতায় তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই উদার, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী শ্রীনাথকে আজ সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ শাস্ত্রজগতে শ্রীনাথেরই সুযোগ্য শিষ্য রঘুনন্দনের আবির্ভাব। শ্রীনাথ তাঁহার জ্ঞান, দূরদর্শিতা,

---

(১১৭) পূর্বাপরকৃততত্ত্বাদি সর্বমেবাপ্রযোজকম্।
সপ্রমাণমুপাদেয়ং ন গ্রাহ্যং তদ্ বিনা কৃতম্॥ [শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা পুঁথি, ফোলিও ৫৪ খ]

(১১৮) অত্র কশ্চিদ্ দেশান্তরে বেদবিরুদ্ধস্ত্রীব্যভিচারাদ্যাচারবিশেষোঽপি প্রমাণং বৃহস্পতিবচনাৎ ......ইত্যাহ তন্নমন্দম্। (বিবেকার্ণব পুঁথি, ফো ৬ খ)

(১১৯) শ্রীকরাচার্যপুত্রেণ শ্রীমৎশ্রীনাথশর্মণা।
বিচার্য মৎস্যতন্ত্রাদি ক্রিয়তে দানচন্দ্রিকা॥ [দানচন্দ্রিকা পুঁথি, ফোলিও ১ খ]

সূক্ষ্মদৃষ্টি, সমাজরক্ষার দায়িত্ব ইত্যাদি মনোভাব লইয়া রঘুনন্দনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। রঘুনন্দনও তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার গুণে তখনকার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-চর্চার ক্ষেত্র নবদ্বীপে থাকিয়া গুরুদেবের সুশিক্ষায় ও সেই ভাবধারায় শাস্ত্রজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীনাথের আদর্শে ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া রঘুনন্দন সমাজের সকল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। দেশের প্রয়োজনে শক্ত হাল ধরিতে রঘুনন্দন সফলকাম হইয়াছেন। রঘুনন্দন আরও বেশী উদারতা ও সহানুভূতি লইয়া শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। এই উদারতার জন্যই তিনি তন্ত্রকে ধর্মের প্রামাণ্য হিসাবে অবাধে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তান্ত্রিকী দীক্ষাকেও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার এই অত্যুজ্জ্বল শাস্ত্র-আলোচনায় ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের প্রভায় শ্রীনাথ এবং আরও অনেক নিবন্ধ-কারের নাম নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

(ঘ) গোবিন্দানন্দ

গোবিন্দানন্দের উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণাচার্য'। তাঁহার আত্মপরিচয়ে জানা যায় যে তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী গ্রাম নিবাসী। তাঁহার পিতা গণপতিভট্ট ছিলেন সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি 'জ্যোতিষ্মতী' নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ ও তাঁহার পিতা দুইজনেই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ।

গোবিন্দানন্দ রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকার। তাঁহার গ্রন্থাবলী রচিত হইয়াছিল ১৫২০ খ্রীঃ হইতে ১৫৬০ খ্রীঃ মধ্যে। তিনি রঘুনন্দন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন[১২০]।

গোবিন্দানন্দ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে নিবন্ধ ও টীকা-গ্রন্থ দুইই পাওয়া যায়। যথা—

(১) দানক্রিয়াকৌমুদী (২) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী
(৩) শুদ্ধিকৌমুদী (৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী
(৫) ক্রিয়াকৌমুদী[১২১]

---

(১২০) এ সম্বন্ধে বিস্তৃতবিবরণ পঞ্চম পরিচ্ছেদে রঘুনন্দনের কাল আলোচনার সময় পাওয়া যাইবে।

(১২১) গোবিন্দানন্দের গ্রন্থগুলির মধ্যে সবই প্রায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'ক্রিয়াকৌমুদী' তাঁহার স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ, ইহার পুঁথি এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়—নং ১ বি ৫৭।

ানন্দনকে শিক্ষিত করিয়া
তখনকার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-
ই ভাবধারায় শাস্ত্রজগতে
র্য ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত
ন। দেশের প্রয়োজনে
আরও বেশী উদারতা ও
তার জন্যই তিনি তন্ত্রকে
হন নাই। তান্ত্রিকী
তাঁহার এই অত্যুজ্জ্বল
এবং আরও অনেক

ার আত্মপরিচয়ে জানা
াম নিবাসী। তাঁহার
ণের মধ্যে অগ্রগণ্য।
য়াছেন। গোবিন্দানন্দ
বদিক ব্রাহ্মণ।
হার গ্রন্থাবলী রচিত
ন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ

র মধ্যে নিবন্ধ ও টীকা-

ক্রিয়াকৌমুদী
ক্রয়াকৌমুদী

আলোচনার সময় পাওয়া

ক্রিয়াকৌমুদী' তাঁহার স্বতন্ত্র
া যায়—নং ১ বি ৫৭।

(৬) তত্ত্বার্থকৌমুদী[১২২] (শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে'র টীকা)

(৭) অর্থকৌমুদী[১২৩] (শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা'র টীকা)

(৮) তত্ত্বার্থকৌমুদী বা শ্রাদ্ধবিবেককৌমুদী বা অর্থকৌমুদী[১২৪]—

(শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা)

গোবিন্দানন্দ স্মৃতিসংহিতা, নিবন্ধ, পুরাণ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রগ্রন্থ হইতেও তিনি কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন—অগস্ত্যসংহিতা, তন্ত্রসার, সারদাতিলক, কপিলপঞ্চরাত্র প্রভৃতি।

তিনি শূলপাণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন[১২৫]—কোথায় শূলপাণির বচনগৌরব, আর কোথায় সূক্ষ্মবিচারভীরু আমার বচন ইত্যাদি।

তখনকার সমাজে শ্রীনাথের প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী ছিল তাহা গোবিন্দানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি স্বকীয়মত স্থাপন করিতে শ্রীনাথকে শাস্ত্র-জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং নানাভাবে শ্রীনাথকে হেয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বকীয়মতের প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া শ্রীনাথকে 'আধুনিক' বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহার মত অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ শ্রীনাথের অভিমত 'তদ্ধেয়ম্', 'তদুপহসনীয়ম্', 'তন্মন্দম্' ইত্যাদিরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। আবার শ্রীনাথকে 'খ্যাতিকামী'[১২৬] 'প্রাচীনাচারদূষণে

(১২২) সং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ১৮৯৫।

(১২৩) এসিয়াটিক্ সোসাইটি পুঁথি, নং ১এ ৬৪।

(১২৪) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুঁথি, নং স্মৃ ২১৬২।

ইহা অসমাপ্ত (১৮ ফোলিও মাত্র), ইহার আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে। ইহাতে কেবলমাত্র সপিণ্ডীকরণ হইতে নিত্যশ্রাদ্ধ পর্যন্ত অংশ আছে। তবে ইহা যে গোবিন্দানন্দেরই রচিত তাহার প্রমাণ আছে। কারণ তিনি নিত্যশ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে লিখিয়াছেন (ফোলিও ১৭ খ)—

'শ্রীশূলপাণিবিহিতেহনুপদং দুরূহে বৃদ্ধ্যঙ্গভূতপিতৃকৃত্যবিবেচনেঽস্মিন্ গোবিন্দনামকৃতিনা কৃতিনাম্বরেণ প্রীতিপ্রদামতিমতাং বিবৃতি র্নিবদ্ধা।'

আবার ইহার ঠিক পূর্বেই 'এতৎ সর্বং শ্রাদ্ধকৌমুদ্যাং বিবৃতমস্তীতি' (ফোলিও ১৭ খ) লিখিত আছে। গ্রন্থশেষে—শ্রীমৎশ্রাদ্ধবিবেকস্য টীকা বিঘনমনোরমা।

গোবিন্দানন্দকৃতিনা কৃতা তত্ত্বার্থকৌমুদী॥ [ফোলিও ১৮ খ]

(১২৫) ক্ব শূলপাণে র্বচনং গরীয়ঃ ক্ব নতিঃ সূক্ষ্মবিচারভীরুঃ।
তথাপি গোবিন্দপদারবিন্দধ্যানাৎ পরাং শক্তিমিহ ব্যতানীৎ॥

[শ্রাদ্ধবিবেকটীকা পুঁথি, ফোলিও ১৮খ]

(১২৬) কেচিৎ খ্যাতিগ্রহিলাঃ প্রাচীনাচারদূষণে পটবঃ।
মম মতং তিষ্ঠাপয়িষো র্বাচং সন্তোঽনুগৃহ্নন্তু॥ [ঐ, ঐ]

পটু'[১২৭] 'লোভাধ্যাপিতকুতর্ক'[১২৮] ইত্যাদিরূপে হেয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এইভাবে গোবিন্দানন্দ শ্রীনাথের মত-খণ্ডনেই অধিকতর যত্নবান্ হইয়াছেন। কিন্তু সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে তাঁহার কোন দৃষ্টিই ছিল না। তিনি যে সব নূতন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। রঘুনন্দনের আবির্ভাবে গোবিন্দানন্দের নামও অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

---

(১২৭) যচ্চ শ্রীদত্তমতানুসারিণা প্রাচীনাচারদূষণগ্রহিলেন……আধুনিকেন কল্পিতম্।

[শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ১৭৯]

(১২৮) অত্রাধুনিকাঃ……ইতি লোভাধ্যাপিতকুতর্কাঃ শিষ্টাচারং বিলোপয়ন্তি।

[বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২১৬]

বঙ্গদেশের গৌরব স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দন ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম ছিল হরিহর ভট্টাচার্য। স্মার্ত রঘুনন্দন স্বীয় গ্রন্থগুলির শেষে বন্দ্যঘটীয় হরিহরভট্টাচার্যাত্মজ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বংশগত উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সম্ভবতঃ সামাজিক মর্যাদায় অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের জন্য 'ভট্টাচার্য' উপাধি তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন ছিলেন শাণ্ডিল্য-গোত্রিয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ধামে। নবদ্বীপেই তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

রঘুনন্দনের পরিচয়

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তৎপ্রণীত 'উদ্বাহচন্দ্রালোকে'র ভূমিকায়[1] রঘুনন্দনের নিবাস পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে (অধুনা পাকিস্তান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে রঘুনন্দনের বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে এখনও বর্তমান আছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে নবদ্বীপেই রঘুনন্দনের নিবাস ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে—তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বসতি ছিল নবদ্বীপে।

সমাজে রঘুনন্দনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাঁহার প্রচারিত সমাজব্যবস্থা অদ্যাবধি অধিকাংশ বঙ্গীয় জনগণ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে। বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তিনি সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে এবং দেশ ও সমাজকে বিভিন্ন উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছে। দেশের নিদারুণ সঙ্কটকালে তাঁহার শাস্ত্রীয়ব্যবস্থা ধর্মকে তথা দেশকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তিনি বঙ্গদেশে উজ্জলতম রত্নরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন।

সমাজে রঘুনন্দনের প্রভাব

রঘুনন্দন সমাজে যে অতি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

কথিত আছে[2]—একদিন প্রভাতে নবদ্বীপের গঙ্গায় দণ্ডায়মান হইয়া রঘুনন্দন

(১) পূজ্যপাদমহামহোপাধ্যায়রঘুনন্দনভট্টাচার্যবন্দ্যঘটীয়বংশং পূর্ববঙ্গপ্রদেশঞ্চ জন্মনালঙ্কৃতবন্তঃ। অদ্যাপি পূর্ববঙ্গপ্রদেশে তেষাং বংশ্যাঃ সন্তি। [উদ্বাহচন্দ্রালোকের ভূমিকা, পৃঃ /০]

(২) নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ১৩২।

তর্পণাদি করিতেছিলেন ; তখন জলের স্রোতে অজ্ঞাতসারে তাঁহার কাপড়ের কাছা খুলিয়া যায়, কিন্তু তিনি অনন্যমনা হইয়া সন্ধ্যা-তর্পণাদিতে রত ছিলেন। বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকার দরুণ তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। কিন্তু স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দনের কচ্ছদেশ মুক্ত দেখিয়া গঙ্গায় স্নান-তর্পণ ইত্যাদিতে রত অপর ব্যক্তিগণ ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি মনে করিয়া স্ব স্ব বস্ত্রের কচ্ছভাগ খুলিয়া আহ্নিকাদি করিতে থাকেন। এদিকে রঘুনন্দন আহ্নিকাদিশেষে সকলেরই ঐ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং তখন তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে রঘুনন্দনের জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছিল।

বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি সমধিক প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে[৩]— রঘুনন্দন পিতৃমাতৃকৃত্য করিতে একবার গয়াক্ষেত্রে গিয়াছেন। তথায় পাণ্ডাদের অত্যাচার চিরকালই সুবিদিত। পাণ্ডাগণ যাত্রিসাধারণের নিকট হইতে অধিক অর্থের বিনিময়ে বিষ্ণুর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে দিত। রঘুনন্দনের নিকট অধিক অর্থ পাণ্ডাগণ দাবি করিলে তিনি ক্রোশব্যাপী স্থানই গয়াক্ষেত্র[৪]—এইরূপ বচন উল্লেখ করিয়া ফল্গুনদীর তীরে পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পাণ্ডাগণ তাঁহার মুখে বিষ্ণুর পাদপদ্মের ক্রোশব্যাপী স্থানই গয়াক্ষেত্র ইত্যাদি প্রমাণ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইনিই সেই নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন। পাণ্ডাগণ পূর্বেই রঘুনন্দনের অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সংবাদ অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা চিন্তা করিলেন যে আজ যদি রঘুনন্দন মাঠে বা ফল্গুনদীর তীরে পিণ্ডদান করিয়া যান, তবে তো কেহই আর তাঁহাদের নির্দেশিত অধিক অর্থের বিনিময়ে বিষ্ণুর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবে না। তখন তাঁহারা স্মার্তপাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে শুধু বঙ্গদেশেই নহে, বঙ্গদেশের বাহিরেও রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবদ্দশায়ই অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং সমাজে তাঁহার স্থান অত্যন্ত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

(৩) নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ১৩২।

(৪) সার্দ্ধক্রোশদ্বয়ং মানং গয়েতি ব্রহ্মণেরিতম্।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ ॥ [গয়ামাহাত্ম্যে উদ্ধৃত বায়ুপুরাণবচন]

দক্ষিণস্থং দক্ষিণারণ্যম্ উত্তরস্থমুত্তরমানসং পূর্বস্থং ফল্গুতীর্থং পশ্চিমস্থং যোনিদ্বারম্। ইহ গয়ানামাসুরশিরঃপাতস্থানতয়া প্রসিদ্ধং ক্রোশমাত্রং ন তু প্রাকারবেষ্টিতং রুদ্রাদিপদাঙ্কিতমিতি।

[তীর্থযাত্রাতত্ত্ব, পৃঃ ২]

ারে তাঁহার কাপড়ের কাছা
দিতে রত ছিলেন। বাহ্য
রন নাই। কিন্তু স্মার্তপ্রবর
াদিতে রত অপর ব্যক্তিগণ
লিয়া আহ্নিকাদি করিতে
ঐ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা
নি হাস্য সংবরণ করিতে
নর জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার

ছিল। কথিত আছে[৩]—
াছেন। তথায় পাণ্ডাদের
ের নিকট হইতে অধিক
রঘুনন্দনের নিকট অধিক
গয়াক্ষেত্র[৪]—এইরূপ বচন
িলেন। তখন পাণ্ডাগণ
ক্ষত্র ইত্যাদি প্রমাণ শুনিয়া
স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন।
বগত ছিলেন। সুতরাং
। ফল্গুনদীর তীরে পিণ্ডদান
অধিক অর্থের বিনিময়ে
স্মার্তপাদের নিকট ক্ষমা
য শুধু বঙ্গদেশেই নহে,
য়ই অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ
প্রতিষ্ঠিত ছিল।

; উদ্ধৃত বায়ুপুরাণবচন]
পশ্চিমস্থং যোনিদ্বারম্। ইহ
রুদ্রাদিপদাঙ্কিতমিতি।
[তীর্থযাত্রাতত্ত্ব, পৃঃ ২]

পূর্বোক্ত ঘটনা দুইটির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য কতখানি আছে তাহা বলা কঠিন, তবে এই ঘটনা দুইটি নদীয়াতে অত্যন্ত প্রচলিত।

রঘুনন্দনের রচনাবলীর মধ্যে 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে রঘুনন্দন আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত—স্মৃতির এই তিন বিষয়ক তত্ত্বই অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে আচারবিষয়ক তত্ত্বই বেশী। ২৮ খানি তত্ত্ব ছাড়া রঘুনন্দন আরও কয়েকখানি নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জীমূতবাহন রচিত 'দায়ভাগ' গ্রন্থের টীকা পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়—

রঘুনন্দনের রচনাবলী

(১) দায়ভাগটীকা[৫]
(২) তীর্থযাত্রাতত্ত্ব[৬] (তীর্থতত্ত্ব বা তীর্থযাত্রাবিধিতত্ত্ব)
(৩) দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব[৭] (বা যাত্রাতত্ত্ব)
(৪) ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব[৮]
(৫) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি[৯]
(৬) রাসযাত্রাতত্ত্ব[১০]
(৭) দুর্গাপূজাতত্ত্ব[১১] (দুর্গাপূজাপ্রমাণতত্ত্ব ও দুর্গাপূজাপ্রয়োগতত্ত্ব)
(৮) গ্রহযাগতত্ত্ব[১২]
(৯) দশকর্মপদ্ধতি[১৩]

---

(৫) ভরতচন্দ্রশিরোমণির 'দায়ভাগ' গ্রন্থে প্রকাশিত।

(৬) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ১২, কলিকাতা, সং বামাচরণ কাব্যতীর্থ।

(৭) ঐ, সংখ্যা ১৬, সং দ্বারিকানাথ সাহিত্যশাস্ত্রী।

(৮) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সংখ্যা ২৪, নং ২-৩, জুন-জুলাই ১৯৪১। সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

(৯) Hist. of Dharma Sastra, Kane, Vol. I, P—417
(তীর্থযাত্রাতত্ত্বের একটি অংশ, ঐ গ্রন্থে মুদ্রিত আছে)

(১০) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, নং (দীনেশ) ৩৩০।
(কিন্তু অনেক খোঁজ করিয়াও এই পুঁথি ঐ গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় নাই।)
মঃ মঃ কাণে মহাশয় 'রাসযাত্রাপদ্ধতি নামে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (Hist. of D. S. Vol. I, P—41)।

(১১) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, সংখ্যা ৫, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

(১২) ঐ, সংখ্যা ১০, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

(১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি, নং ৬৬০। (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রঘুনন্দনের আরও কিছু কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া গেলেও তাহা সত্যই রঘুনন্দনের লিখিত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহা ছাড়া সেইসব গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই ও তাহার পুঁথি সংগ্রহ করাও সুকঠিন।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতে পাণ্ডিত্য

স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য অগাধ। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাকে যশের উচ্চতম শিখরে আরোপিত করিয়াছে। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, সূত্রগ্রন্থ, সংহিতা, প্রভৃতি সকল গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থকারকেই তিনি গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছেন। সেইজন্য অত্যন্ত সম্মানের সহিতই গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ করেন—যেমন, 'শূলপাণির্মহামহোপাধ্যায়াঃ', 'গুরুচরণাঃ' ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনে বা যুক্তির বিচারে যখন তিনি তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তিনি সজোরে 'অপাস্তম্', 'হেয়ম্', 'পরাস্তম্' ইত্যাদিরূপে পূর্বমতগুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বাভিমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের মতে যিনি উপদেশ দিয়া থাকেন ও যিনি অনুমতি দিয়া থাকেন তাঁহারা দুইজনেই তুল্যফলভাগী হন। অতএব গ্রন্থকর্তা যখন উপদেষ্টা তখন অবশ্যই গুরু হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ দ্রোণাচার্য একলব্যের উপদেষ্টা না হইয়াও গুরু হইয়াছিলেন[১৪]। আবার তিনি দেখাইয়াছেন—সংস্কৃতে,

---

ইহা অসমাপ্ত। মধ্যের পত্র নাই, শেষ অংশও কীটদষ্ট ও ছিন্ন। যদিও পুঁথির তালিকায় 'স্বশকর্মপদ্ধতি' বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু ইহা 'বিবাহদির প্রয়োগ' বলিয়া রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'প্রণম্য সচ্চিদানন্দং ছন্দোগানাং কৃশণ্ডিকাম্।
বিবাহাদেঃ প্রয়োগঞ্চ বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ॥'। [ফোলিও ১খ]

এই উদ্ধৃতি হইতে এই গ্রন্থ যে রঘুনন্দনেরই রচনা তাহাও প্রমাণিত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির তালিকায় রঘুনন্দন রচিত অপর একটি গ্রন্থের কথা উল্লিখিত আছে। যথা—

'A work of Raghunandana'—C. U. Sanskrit MS. No. 590.

এই পুঁথি আসলে রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বেরই অংশবিশেষ। ইহার আদি নাই, অন্তও নাই, কেবল ফোলিও ১৩—৭৫ আছে অর্থাৎ মলমাসতত্ত্বের (শ্যামাকান্তবিদ্যাভূষণ সংস্করণের) কর্মবিশেষে মাসবিশেষাদির (পৃঃ ২৬৪) 'মৈথিলাস্তু—বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো……' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ হইয়া সময়াশুদ্ধির (পৃঃ ২৯১) 'দ্বৈতনির্ণয়ে তু…' পর্যন্ত অংশ উহাতে আছে।

(১৪) বৃহস্পতিঃ—উপদেষ্টানুমন্তা চ লোকে তুল্যফলৌ স্মৃতৌ।
একলব্যেনানুদেষ্টাপি দ্রোণাচার্যো গুরুঃ স্মৃতঃ॥
অতো গ্রন্থকর্তুঃ সুতরাং গুরুত্বম্। [আহ্নিকতত্ত্ব, পৃঃ ১২৮, জ্যোতিস্তত্ত্ব, ২৩২]

প্রাকৃতে বা দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া শিষ্যের অবস্থা অনুসারে যে কোন উপায় দ্বারা যিনি শিষ্যের জ্ঞান জন্মাইতে পারেন তিনিই গুরু[১৫]।

রঘুনন্দন তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকে 'গুরুচরণাঃ', 'গুরুপাদাঃ' ইত্যাদিরূপে স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু সময়বিশেষে গুরুদেবের মত ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণের মত খণ্ডন করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই।

বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেক' এবং বাচস্পতিমিশ্রের 'শ্রাদ্ধচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থের মত খণ্ডন করিবার জন্যই যেন রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিচারনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এইজন্যই হয়ত মলমাসতত্ত্বে পর্যুদাসবিচার, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধের কালবিচার ইত্যাদি আলোচনা আছে। নতুবা মলমাসতত্ত্বগ্রন্থে এইগুলির অবতারণার বিশেষ সার্থকতা ছিল না।

আবার তিনি মলমাসতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বের শেষে সকলের নিকট এইজন্য নতি স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি বলেন[১৬] 'গুরুবাক্যের বিরুদ্ধকথা যাহা কিছু আমি বলিয়াছি, স্মৃতিতত্ত্ব বুঝিতে অভিলাষী পণ্ডিতগণ আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি প্রমাদবশতঃ এই স্মৃতিতত্ত্বে যাহা বিরুদ্ধ এবং অতিরিক্ত বলিয়াছি, ধর্মদর্শিগণ আমার এই বাক্যে যদি কিছু গুণ থাকে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার সেইসকল দোষ শোধন করিবেন।'

ইহাতে বুঝা যায় রঘুনন্দন তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণের মত যে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার জন্য সকলের নিকট অত্যন্ত বিনয়সহকারে ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দনের উদারতাও সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের প্রারম্ভে তিনি শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থকে অত্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের অনেক স্থানেই তিনি প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মত গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বীকৃতি দিয়াছেন। এইজন্য তিনি

(১৫) শিবধর্মে—সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥
[আহ্নিকতত্ত্ব, পৃঃ ১২৮, জ্যোতিস্তত্ত্ব, পৃঃ ২০২]

(১৬) বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাষিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ববুভুৎসয়া॥
স্মৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ্ যদ্বিরুদ্ধং বহুভাষিতম্।
গুণলেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্মদর্শিভিঃ॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৭৪, মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ৩০১]

অকপটে গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন[১৭]—'সদ্ব্যক্তিগণের আনন্দবর্ধনের অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্তের বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি এতদতিরিক্ত অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইবেন।

রঘুনন্দনের মতে শাস্ত্রীয়বচনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই বচন দ্বারাই আচারাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, আবার বিরুদ্ধ বচন থাকিলে তাহা দ্বারা আচারাদির অপ্রামাণ্য ঘটে। সেইজন্য তিনি মনে করেন, বচনের গুরুত্ব যে কতখানি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শাস্ত্রীয় বচন কি না করিতে পারে? বচনের পক্ষে ইহা অতিভার নহে, অর্থাৎ বচনের পক্ষে সবই সহজসাধ্য। ইহার তাৎপর্য এই যে শাস্ত্রীয় বচনকেই সকল স্থলে প্রবল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই বচন ব্যতীত কোন আচার-ব্যবহারই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে[১৮]—যদি কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছাপূর্বক অন্ত্যজ পুরুষ সংসর্গে যায় তবে সমাজে তাহার আর স্থান হইবে না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষালন হইতে পারে, তবুও সমাজে তাহাকে আর গ্রহণ করা হইবে না। অজ্ঞানকৃত এই পাপের অনুষ্ঠান হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি ও সমাজে গ্রহণীয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জ্ঞানকৃত এই প্রায়শ্চিত্তে পাপ দূরীভূত হইবে, কিন্তু সমাজে ব্যবহার্য হইবে না কেন? ইহার উত্তরে রঘুনন্দন বলিতেছেন বচন দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়।

মীমাংসায় পাণ্ডিত্য

মীমাংসাশাস্ত্রে রঘুনন্দনের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি সমস্ত তত্ত্বগুলিই মীমাংসার যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়াছেন। পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—উভয় মীমাংসাস্থিত ন্যায়েরই অবতারণা তিনি করিয়াছেন। আবার তাঁহার উত্তরমীমাংসার আলোচনা অত্যধিক বিজ্ঞাবত্তার পরিচয় বহন করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি,

---

(১৭) নিবধ্যন্তেঽত্র সংক্ষেপাৎ সতাং মুদমভীপ্সতা।
প্রায়শ্চিত্তবিবেকাদাবন্যজ্ জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৬৮]

(১৮) জ্ঞানে তু তত্তুল্যতয়া দ্বিগুণব্রতাচরণেঽপি ন ব্যবহার্যঃ।
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানং কৃতং ভবেৎ।
কামতোঽব্যবহার্যস্তু বচনাদেব জায়তে ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। পাপাভাবে কথমব্যবহার্য ইত্যাহ বচনাদেবেতি তথাচোক্তং কিমিদং বচনং ন কুর্যাৎ নাস্তি বচনস্যাতিভার ইতি। [ঐ, পৃঃ ১৯৪]

ধ্যনের অভিপ্রায়ে এই
ছে। যে সকল বিচক্ষণ
ভ করিতে ইচ্ছা করেন,
গেত হইবেন।
নী। এই বচন দ্বারাই
। থাকিলে তাহা দ্বারা
নের গুরুত্ব যে কতখানি
র? বচনের পক্ষে ইহা
ইহার তাৎপর্য এই যে
হবে। এই বচন ব্যতীত
া। উদাহরণস্বরূপ বলা
সাক ইচ্ছাপূর্বক অন্ত্যজ
না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত
গ্রহণ করা হইবে না।
দ্ধি ও সমাজে গ্রহণীয়।
ভূত হইবে, কিন্তু সমাজে
ছেন বচন দ্বারাই ইহা

তিনি সমস্ত তত্ত্বগুলিই
ও উত্তরমীমাংসা—উভয়
না তিনি করিয়াছেন।
আলোচনা অত্যধিক
মরা বলিতে পারি,

ত্ব, পৃঃ ১৬৮]

দবেতি তথা চোক্তং কিমিদং

...তত্ত্বে গ্রহসম্মার্জনন্যায়ের অবতারণায় রঘুনন্দনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এখানে গ্রহসম্মার্জনন্যায় আলোচিত হইতেছে—

'অভুক্ত্বা প্রাতরাহারং স্নাত্বাচম্য সমাহিতঃ।
সূর্যাদিদেবতাভ্যশ্চ নিবেদ্য ব্রতমাচরেৎ ॥
অভুক্ত্বা আহারমিত্যর্থাৎ পূর্বদিনে একভক্তত্বমায়াতি।'
[একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪২৮-৪২৯]

অর্থাৎ পূর্বদিন আহার না করিয়া (পরদিন) স্নান করিবার পর আচমন-পূর্বক সমাহিতচিত্তে সূর্য প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতঃ প্রাতঃকালে ব্রত আচরণ করিবে। এখানে আহার না করিয়া অর্থে পূর্বদিনে একভক্তত্ব (অর্থাৎ একবার খাওয়া) বুঝাইতেছে।

'আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ অন্নাদিঃ'—এখানে তদ্‌গত একত্ব ভোজনরূপ ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত। একত্ব লক্ষণাদি দ্বারা একবচনের বিবক্ষা হইতেছে।

এখন পূর্বপক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন—গ্রহসম্মার্জনন্যায়ে যেমন গ্রহের একত্ব অবিবক্ষিত, তেমনই পূর্বদিনের আহারগত একত্ব সংখ্যা অবিবক্ষিত হউক। প্রথমতঃ একটি গ্রহের সম্মার্জন হইবে, না বহুগ্রহের সম্মার্জন হইবে এই সংশয় উপস্থিত হয়। গ্রহ উদ্দেশ্য, তদ্‌গত সংখ্যা বিবক্ষিত কিনা—ইহাই সংশয়। যেমন 'পশুনা যজেত' স্থলে পশুগত একত্ব সংখ্যা বিবক্ষিত, তেমনই কিন্তু গ্রহের একত্ব বিবক্ষিত নয়। কারণ 'গ্রহৈর্জুহোতি', 'দশগ্রহান্ গৃহ্ণাতি'—এই প্রকার বাক্যান্তরে দশগ্রহপ্রাপ্তিহেতু গ্রহের একত্ব অবিবক্ষিত, গ্রহের একত্ব বিধেয় এবং সম্মার্জনত্ব বিধেয়—ইহাই পূর্বমীমাংসায় মাধবাচার্যের পূর্বপক্ষীয় মত। তাঁহার মতে সিদ্ধান্ত হইতেছে—একত্ব ও বিধেয়ত্ব এই উভয়বিধানে বাক্যভেদ হয় বলিয়া বাক্যান্তরপ্রাপ্ত গ্রহসামান্যমাত্র উদ্দেশ্যের সম্মার্জনমাত্র বিধেয়। ইহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও ফলতঃ তাহাই সিদ্ধ হইতেছে।

কিন্তু মাধবাচার্যের এই পূর্বমীমাংসার বিচারে দোষ থাকিয়া যায়। মাধবাচার্যের অধিকরণে যে অস্বরসতা আছে তাহা নিরসনের জন্যই রঘুনন্দন উত্তর-মীমাংসা হইতে কল্পতরুর মত উত্থাপন করিয়াছেন। কারণ এখানে একই পদে (অর্থাৎ গ্রহত্ব ও গ্রহের একত্ব-এর মধ্যে) উদ্দেশ্যত্ব ও বিধেয়ত্ব বিধানহেতু শাস্ত্রকারগণের মতে ত্রুটি প্রকাশ পায়। কারণ আমরা দেখি মীমাংসান্যায়প্রকাশে (পৃঃ ১৭৩-১৭৪) প্রয়োগবিধির শ্রৌতক্রমে 'বষট্‌কর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ' স্থলে উদ্দেশ্য-

বিধেয়ভাব ভিন্নপদনিষ্ঠধর্ম। ইহাতে বলা আছে যে একই পদে উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবের ভয়ে উদ্দেশ্য যে ভক্ষণ তাহাতে ক্রমমাত্র বিধান করা উচিত নয়। সুতরাং এখানে 'বষট্‌কর্তুঃ প্রথমভক্ষঃ' বাক্যে সমাস করায় সেই অনুরোধে বিশিষ্টার্থেরই শাব্দমর্যাদা দ্বারা বিধেয়ত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। অতএব উদ্দেশ্যবিধেয়ভাব ভিন্নপদনিষ্ঠ। উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব ভিন্নপদনিষ্ঠ ধর্ম ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে মাধবাচার্যের পূর্বপক্ষই হয় না। যেমন ন্যায়প্রকাশে (পৃঃ ৩২-৩৩) 'বিধানে বানুবাদে বা যাগঃ করণমিষ্যতে' এখানে এই ধাত্বর্থ যদি সর্বত্র করণত্ব-পুরস্কারে ক্রিয়াতে অন্বিত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠাধিকরণে পূর্বপক্ষ উঠিতে পারে না বলা আছে—সেইরূপ মাধবাচার্যের গ্রহসম্মার্জনন্যায়ের পূর্বপক্ষই উঠিতে পারে না বলিয়া অস্বরস হয়। সেইজন্যই রঘুনন্দন এখানে 'উত্তরমীমাংসায়াং কল্পতরুস্তু' এই বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে বলা হয় যে—গ্রহত্ব ও গ্রহের একত্ব উদ্দেশ্য, সম্মার্জনত্ব বিধেয়। যেমন একেকে উদ্দেশ্য করিয়া অনেকের বিধান করিলে সেই বিধীয়মানগুলি উভয়ের উদ্দেশ্যস্থলে উদ্দিশ্যমান পদার্থগুলির পরস্পর নিরপেক্ষ বলিয়া অন্বিত হয় না জন্য বাক্যভেদ দোষ হয়, সেইরূপ অনেকের উদ্দেশ্যে একের বিধান করিলেও বাক্যভেদ দোষ হয়। যথা—

> 'প্রাপ্তে কর্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ।
> অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহবোঽপ্যেকযত্নতঃ॥'

এখানে কর্মপদটি উপলক্ষণ। এইজন্য গ্রহ পাত্রস্থলেও এই বচন কার্যকর হইতেছে। 'সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ' এই ন্যায়বলে এখানে একত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

এখানে লক্ষণীয় যে রঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে কেবলমাত্র এই স্থলেই উত্তরমীমাংসার এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার পর্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি যে পূর্বমীমাংসায় মাধবাচার্যের মতের মধ্যে 'প্রাপ্তে কর্মণি' ইত্যাদি বিচার উত্থাপন করেন নাই তাহাও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ পূর্বমীমাংসায় গ্রহ উদ্দেশ্য, তাহার একত্ব ও সম্মার্জনত্ব বিধেয়। এখানে একের সঙ্গে বহুর বিধান তো প্রায়ই দৃষ্টান্ত দেখা যায়, কিন্তু উত্তরমীমাংসায় এই মতটি উত্থাপনে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গ্রহত্ব উদ্দেশ্য, গ্রহের একত্বও উদ্দেশ্য ও অবিবক্ষিত এবং সম্মার্জনত্ব বিধেয়। সুতরাং বহুর উদ্দেশ্যে একের বিধানেও যে বাক্যভেদ দোষ হয় তাহা দেখাইবার জন্য রঘুনন্দনের এই প্রচেষ্টা। অতএব উত্তরমীমাংসায় এই মতটি বেশী উপযোগী হইয়াছে এবং রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্যেরও বহুমুখিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু 'অভুক্তা আহারম্‌' স্থলে বিশেষরূপ আহার নির্দেশ না করায় মাত্র সামান্য

ভাবে আহারের নিবৃত্তি থাকায় এখানে পূর্বদিনে আহারের একত্ব বিবক্ষিত। অতএব এইস্থলে গ্রহসম্মার্জনন্যায় প্রযুক্ত হইতেছে না।

রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন মীমাংসার আলোচনা স্মৃতিগ্রন্থে অপরিহার্য। মীমাংসা ব্যতীত স্মৃতির স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। মীমাংসা দ্বারা স্মৃতির অর্থের বিচার করিলেই ধর্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। এইজন্য মনু বলেন—'আর্ষ ও ধর্মোপদেশগুলিকে যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রে অবিরোধী তর্কের সাহায্যে বুঝিয়া লয়, সেইই যথার্থ ধর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হয়; তদ্ভিন্ন অপর ব্যক্তি ধর্মের স্বরূপে অভিজ্ঞ হইতে পারে না।' রঘুনন্দন এখানে বলেন—মনুবচনোক্ত 'আর্ষ' শব্দের অর্থ বেদ এবং 'ধর্মোপদেশ' শব্দের অর্থ ধর্মমূলক স্মৃতি। অতএব যে ব্যক্তি অবিরুদ্ধ তর্ক অর্থাৎ মীমাংসাদি সহকারে ঐসকল বেদ ও স্মৃতির অর্থের বিচার করে, সেই ধর্মের স্বরূপ জানিতে পারে। মীমাংসায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই ধর্মশাস্ত্রের স্বরূপ জানিতে পারে না[১৯]।

বিশেষতঃ স্মৃতি হইতে শ্রুতি কল্পিত হয়। কর্মকাণ্ডীয় শ্রুতির বিচারশাস্ত্র পূর্বমীমাংসা, সেইরূপ কর্মকাণ্ডীয় স্মৃতি হইতে কল্পিত শ্রুতির বিচারশাস্ত্রও পূর্ব-মীমাংসাই হইবে। এইজন্য যেস্থলে তর্ক দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে—এইরূপ কথা আছে, সেখানে উহার অর্থ নিবন্ধকারগণ মীমাংসাশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্যোতিষে পাণ্ডিত্য

জ্যোতিষ শাস্ত্রেও রঘুনন্দনের জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি ২৮ খানি তত্ত্বের মধ্যে জ্যোতিস্তত্ত্ব নামক স্বতন্ত্র একখানি তত্ত্বও রচনা করিয়াছেন। তাহাতে জ্যোতিষের সমস্ত বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। যেমন—রাশ্যাদিনির্ণয়, পল ও দণ্ডের প্রমাণ, রবি-সংক্রান্তিগণনা, অষ্টবর্গ, গ্রহণ, চন্দ্রতারাদির শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রভৃতি বহুবিষয় প্রণীত হইয়াছে। মলমাসতত্ত্বে তিনি যেভাবে মলমাস নিরূপণ ও মাস তিথি প্রভৃতির গণনা করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অন্যতত্ত্বগুলিতেও তিনি প্রয়োজন অনুসারে জ্যোতিষের বিষয়গুলি আলোচনা করিতে দ্বিধা করেন নাই।

শুধু স্মৃতি-মীমাংসা-জ্যোতিষ শাস্ত্রই নহে—ন্যায়, ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্য শাস্ত্র-

(১৯) মনুরপি—আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥
ঋষিদৃষ্টত্বাদার্ষং বেদং ধর্মোপদেশং তন্মূলং স্মৃত্যাদিকম্। যস্তদবিরুদ্ধেন তর্কেণ মীমাংসাদিনা অনুসন্ধত্তে বিচারয়তি স ধর্মং বেদ জানাতি ন তু মীমাংসানভিজ্ঞঃ। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৮৩]

গুলিতেও রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য সমধিক প্রসিদ্ধ। লক্ষণীয় যে সেই পাণ্ডিত্য সর্বদা সমাজকে রক্ষা করিতেই সচেষ্ট থাকিয়াছে।

রঘুনন্দনের কাল

রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে বর্তমান থাকিয়া হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন করেন। সপ্ততি বৎসরের কিছু বেশী সময় তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার কাল নির্ধারণ করিতে গেলে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলি হইতে উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীর বীরমিত্রোদয়গ্রন্থকার[২০], নীলকণ্ঠ[২১] ও গদাধর[২২]। ইঁহারা যেহেতু রঘুনন্দনের গ্রন্থগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে রঘুনন্দন ১৬০০ শতাব্দীর পরবর্তী নহেন।

আবার রঘুনন্দন মাধবাচার্য, শূলপাণি, রায়মুকুট, রুদ্রধর এবং বাচস্পতি-মিশ্রের গ্রন্থগুলি উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে তিনি ১৫০০ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন।

রঘুনন্দনের 'ছন্দোগশ্রাদ্ধতত্ত্ব' গ্রন্থখানির ১৪৯৭ শকে (১৫৭৫ খ্রীঃ) প্রতিলিপি করা হয় বলিয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পুঁথির তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন[২৩]।

রঘুনন্দনের 'মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' গ্রন্থেরও ১৪৯৮ শকে (১৫৭৬ খ্রীঃ) প্রতিলিপি করা হয় বলিয়া মিত্র মহাশয় উল্লেখ করেন[২৪]।

---

(২০) বীরমিত্রোদয়ে (পৃঃ ৫৩)—(ক) "স্মৃতিতত্ত্বে তু চৌরচ্ছাসয়েদিত্যেব পঠিতম্।"
(খ) "ইদং তু বাচস্পতিমিশ্রোক্তং ব্যবহারতত্ত্বকারাভ্যুপেতং ...." ইত্যাদি। [পৃঃ ৬০]

(২১) নীলকণ্ঠের ব্যবহারময়ূখে (পৃঃ ২১)—
(ক) "স্বস্তিবাচনাদ্যপি কার্যমিতি স্মার্তভট্টাচার্য্যাঃ।"
(খ) "ঘোরমতিপীড়াকরং স্বলস্থ শরীরধর্মত্বাদিতি বাচাস্পতিমিশ্রস্মার্তভট্টাচার্যৌ।" (পৃঃ ৩০)

(২২) গদাধরের কালসারে (পৃঃ ৪২১, ৪৬৩)—"গৌড়েস্তিথিতত্ত্বকারৈঃ......।"
[এসিয়াটিক সোসাইটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুঁথির তালিকা ৩য় ভাগের ভূমিকাতে (পৃঃ ৩৭) সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া গদাধর নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু পি, ভি. কাণে 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে' (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৩০ এবং ৬৯২)—উল্লেখ করেন যে গদাধর ১৪৫০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং এই মত দুইটি বিবেচ্য।]

(২৩) R. L. Mitra, Notices of Skt. Mss. III, পৃঃ ৫০ নং ১০৮১।

(২৪) R. L. Mitra, Notices of Skt. Mas. III, পৃঃ ৫৩ নং ১০৮৩।

এই প্রমাণ দ্বারা আমরা বলিতে পারি যে রঘুনন্দনের উপরিউক্ত তত্ত্ব দুইটি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে।

এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলি পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে এই তত্ত্বগুলি অত্যন্ত পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। সুতরাং এইগুলি নিশ্চয়ই রঘুনন্দনের প্রথমজীবনের অপকবুদ্ধিতে রচিত নহে। পরিপূর্ণ বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকিলেই এই তত্ত্বগুলি রচনা করা সম্ভবপর।

জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় যে রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। এই সম্বন্ধে কিছু পরবর্তী নদীয়া অঞ্চলবাসী ঘটক নুলো পঞ্চাননের কারিকা প্রণিধানযোগ্য[২৫]—

"বাসুদেবে তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোদ্বয়।
নদের লোকে যাহাদের নামে জীয়ে রয়॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে (অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে)। আর রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বে (পৃঃ ২০০) পাওয়া যায়—

১৪২১ শকে (১৪৯৯ খ্রীঃ) ১৫ই চৈত্র ও ১৫ই আশ্বিন মহাবিষুব ও জলবিষুব সায়নসংক্রান্তি হইয়াছিল—

'বিষুবং মীনকন্যার্থে দ্বৈকাক্ষীন্দ্রশকাব্দকে।'

সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে জ্যোতিস্তত্ত্ব ১৪৯৯ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হয় নাই।

জ্যোতিস্তত্ত্বে আরও উল্লিখিত আছে (পৃঃ ২০২)—

'নবাষ্টশক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতাঃ'

---

(২৫) কিন্তু স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' (প্রথমভাগ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—

"নুলো পঞ্চাননের বাসুদেবের তিন শিষ্য......" ইত্যাদি নিতান্ত অপ্রামাণিক।

[পাদটীকা, পৃঃ ৯৩]

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া যুক্তি ও প্রমাণপক্ষপাতী বহু ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধকার পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিয়াছেন যে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না। বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপুর, জয়ানন্দ, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির প্রামাণিক উক্তি উপেক্ষা করিয়া অনেকে কিন্তু এখনও অদ্বৈতপ্রকাশের (বাসুদেবের তিন শিষ্য ইত্যাদি প্রবাদের একমাত্র তথাকথিত প্রমাণ কল্পিতলেখায় পরিপূর্ণ ঈশাননগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশ' পৃঃ ১১৮, দ্বাদশাধ্যায়) অমূলক উক্তিই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন।"

[বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ৯৪]

অর্থাৎ ১৪৮৯ শককে (১৫৬৭ খ্রীঃ) রঘুনন্দন রবিসংক্রান্তিগণনার ভিত্তি বলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও তিনি জ্যোতিস্তত্ত্ব লেখেন নাই। অতএব ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

আবার দেখা যায় রঘুনন্দনের পিতা শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য তাঁহার সময়প্রদীপ গ্রন্থের শেষে উল্লেখ করেন যে তিনি ১৪৮১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শিষ্যগণের অনুরোধে জ্যোতিষ গ্রন্থগুলি হইতে সারবস্তু আহরণ করিয়া সময়-প্রদীপ গ্রন্থ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন[২৬]। অতএব নিশ্চয়ই রঘুনন্দন ইহার পরবর্তী হইবেন।

গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দনের মধ্যে কে পূর্ববর্তী নিবন্ধকার তাহা লইয়া বহুকাল ধরিয়া পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। মঃ মঃ পি. ভি. কাণে[২৭] ও কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়[২৮] মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রঘুনন্দন তাঁহার মলমাসতত্ত্বে[২৯] ও আহ্নিকতত্ত্বে[৩০] গোবিন্দানন্দের উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী[৩১], ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা[৩২] এবং ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী[৩৩] উল্লেখ করেন যে রঘুনন্দন গোবিন্দানন্দের কোন গ্রন্থ দেখেন নাই বা কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতিও দেন নাই।

---

(২৬) শাকে মহীমঙ্গলবেদচন্দ্রসংখ্যাগতে শিষ্যগণানুরোধাৎ।
প্রজ্বালিতো জ্যোতিষপুস্তকানামাকৃষ্য সারং সময়প্রদীপঃ ॥
ইতি শ্রীহরিহরভট্টাচার্যসংগৃহীতঃ সময়প্রদীপঃ সমাপ্তঃ।
[Notices of Skt. MSS. Vol. III, R. L. Mitra, Ms. No. 1088, P—55]

(২৭) Hist. of D. S. Vol. I, P—415.

(২৮) বর্ষক্রিয়াকৌমুদীর ভূমিকা, পৃঃ (ii)।

(২৯) বর্ষকৃত্যে—(ক) মাসদ্বয়স্য মধ্যে তু সংক্রান্তির্ন যদা ভবেৎ।
প্রকৃতস্তত্র পূর্বঃ স্যাদুত্তরস্তু মলিম্লুচঃ ॥ [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৪]
(খ) নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ সুপ্তে দেবে জনার্দনে......
নিষ্পাবঃ শ্বেতশিম্বিরিতি বর্ষকৃত্যম্। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৯০]

(৩০) ক্রিয়াকৌমুদ্যাং বশিষ্ঠঃ—
গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী...... ॥ [আহ্নিকতত্ত্ব, পৃঃ ১২৬]

(৩১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1915.

(৩২) 'Works and period of literary activity of Govindananda,' Journal of Oriental Research, Madras, 1951.

(৩৩) স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ২০।

ন্তিগণনার ভিত্তি বলিয়া
াতিত্তত্ত্ব লেখেন নাই।
ন্ধা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।
চার্য তাঁহার সময়প্রদীপ
র্থাৎ ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে
াহরণ করিয়া সময়-
শ্যই রঘুনন্দন ইহার

র তাহা লইয়া বহুকাল
ঃ পি. ভি. কাণে[২৭] ও
যে, রঘুনন্দন তাঁহার
ণ করিয়াছেন।
দ্র হাজরা[৩২] এবং ডঃ
ন্দের কোন গ্রন্থ দেখেন

No. 1088, P—55]

াসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৪]

....

সতত্ত্ব, পৃঃ ২৯০]

, পৃঃ ১২৬]

dananda,' Journal of

মঃ মঃ পি. ভি. কাণে ও কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় মনে করেন যে রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে যে 'বর্ষকৃত্য' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাই গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' এবং আহ্নিকতত্ত্বে উল্লিখিত 'ক্রিয়াকৌমুদী' গোবিন্দানন্দেরই রচিত গ্রন্থ। কারণ গোবিন্দানন্দ স্বয়ং 'দানকৌমুদী'কে[৩৪] ক্রিয়াকৌমুদীর অন্তর্গত এবং 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী'তে[৩৫] ক্রিয়াকৌমুদীর উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্ষক্রিয়াকৌমুদীতে রঘুনন্দন-নির্দেশিত' উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না, দানকৌমুদীতেও ক্রিয়াকৌমুদী উল্লিখিত বচন পাওয়া যায় না। এইজন্য মনোমোহন চক্রবর্তী, ডঃ হাজরা ও ডঃ ব্যানার্জী প্রচার করিয়াছেন যে রঘুনন্দন গোবিন্দানন্দের কোন গ্রন্থই উল্লেখ করেন নাই বা দেখেন নাই।

কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে গোবিন্দানন্দের 'ক্রিয়াকৌমুদী' নামে একখানি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক্ সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। গোবিন্দানন্দের দানকৌমুদী বা অন্য কোন গ্রন্থ এই ক্রিয়াকৌমুদীর অন্তর্গত নহে। ইহা গোবিন্দানন্দের স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ।

রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে[৩৬] উল্লিখিত 'ক্রিয়াকৌমুদী'র বচনগুলি এসিয়াটিক্ সোসাইটির গ্রন্থাগারে গোবিন্দানন্দের 'ক্রিয়াকৌমুদী'[৩৭] নামক ঐ অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দন্তধাবন প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে।

আবার রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে (পৃঃ ১৩৮)—

'শূদ্রোদকৈ র্ন কুর্বীত তথা মেঘাদিবিনিঃসৃতৈরিতি দর্শনাদিতি কৌমুদী'—

এই উদ্ধৃতি গোবিন্দানন্দের কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না বলিয়া ডঃ হাজরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। কারণ ঐ অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির[৩৮] মধ্যে এই উদ্ধৃতিও বর্তমান রহিয়াছে।

---

(৩৪) ইতি গোবিন্দানন্দকবিকঙ্কণাচার্যবিরচিতায়াং ক্রিয়াকৌমুদ্যাং দানকৌমুদী নাম দ্বিতীয়ো যামঃ সমাপ্তঃ। [দানকৌমুদী, পৃঃ ২০৬]

(৩৫) প্রয়োগস্তু ক্রিয়াকৌমুদ্যাং দ্রষ্টব্যঃ। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৫৫৯]

(৩৬) আহ্নিকতত্ত্ব (পৃঃ ১২৬)—

ক্রিয়াকৌমুদ্যাং বশিষ্ঠঃ—গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ।
তৃণরাজশিরাপত্রৈ র্যঃ কুর্যাদ্ দন্তধাবনম্।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্ গাং নৈব পশ্যতি॥

(৩৭) এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, নং বি ৫৭, ফোলিও ৭।

(৩৮) ক্রিয়াকৌমুদী পুঁথি, ফোলিও ৩৪।

আবার আহ্নিকতত্ত্বে আরও একটি বচন আছে (পৃঃ ১২৭)—

'ক্রিয়াকৌমুদ্যাম্—জলৌকাগূঢ়পাদঞ্চ কৃমিগণ্ডুপদাদিকম্।
কামাদ্ধস্তেন সংস্পৃশ্য নিত্যকর্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥'

এই বচনটি উপরিউক্ত পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত আছে[৩৯]।

ক্রিয়াকৌমুদী নামে এই গ্রন্থখানি যে গোবিন্দানন্দেরই রচিত, তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থের প্রারম্ভে[৪০] গোবিন্দানন্দের নাম স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ গোবিন্দানন্দের ক্রিয়াকৌমুদী নামে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির বিষয় তাঁহার বর্ষক্রিয়াকৌমুদীর ভূমিকায় (পৃঃ ii) উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রঘুনন্দন গোবিন্দানন্দের গ্রন্থ দেখিয়াছেন এবং তাহা হইতে স্বগ্রন্থে উদ্ধৃতিও দিয়াছেন।

মঃ মঃ পি. ভি. কাণে যে গোবিন্দানন্দের সবগুলি গ্রন্থই ক্রিয়াকৌমুদীর অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কারণ এই ক্রিয়াকৌমুদী গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র। গোবিন্দানন্দ ১৫০০-১৫৪০ শতাব্দীতে গ্রন্থগুলি রচনা করেন[৪১]।

অতএব গোবিন্দানন্দ রঘুনন্দনের সমসাময়িক হইলেও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলির মধ্যে ক্রিয়াকৌমুদীর উল্লেখ ছাড়া গোবিন্দানন্দের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত রঘুনন্দনের নিকট গোবিন্দানন্দের অন্য কোন গ্রন্থ পৌঁছায় নাই।

গোবিন্দানন্দ যে রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকে 'আধুনিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি রঘুনন্দন জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত রঘুনন্দনের মত প্রতিভাবান্ নিবন্ধকার নিশ্চয়ই ইহার যথাযথ উত্তর দিতেন।

আবার এমনও হইতে পারে যে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও গোবিন্দানন্দকে রঘুনন্দন প্রাধান্য দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া একমাত্র ক্রিয়াকৌমুদী হইতে দুইটি উদ্ধৃতি ব্যতীত আর কোথায়ও গোবিন্দানন্দের উদ্ধৃতি রঘুনন্দন গ্রহণ করেন নাই।

---

(৩৯) ক্রিয়াকৌমুদী পুঁথি, ফোলিও ৮।

(৪০) 'শ্রীমত্তাতপদারবিন্দবিলসদ্ভূলীভরোদ্দেশতঃ। শ্রীগোবিন্দকবিঃ করোতি বিদুষাং কৃত্যাং ক্রিয়াকৌমুদীং কবিকঙ্কণপণ্ডিতঃ পিতুশ্চরণাম্ভোজযুগোপদেশতঃ।' [ক্রিয়াকৌমুদী পুঁথি, ফোলিও ১]
পুঁথির শেষে লেখা আছে—
'ইতোঽনন্তরমত্রাদর্শাভাব ইতি কিঞ্চিচ্ছেষরহিতা ক্রিয়াকৌমুদী সমাপ্তা।'

(৪১) Hist of D. S. Vol. I, P—415.

... বর্ষকৃত্য নামে যে গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কখনই গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী নহে। এই বর্ষকৃত্য বাচস্পতিমিশ্র কর্তৃক রচিত। কারণ এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে বাচস্পতিমিশ্রের বর্ষকৃত্য নামে একখানি অসমাপ্ত ও ছিন্ন পাণ্ডুলিপি আছে, তাহাতে রঘুনন্দন-উল্লিখিত বর্ষকৃত্যের বচনগুলি সবই পাওয়া যায়[৪২]।

রঘুনন্দন যে স্থলে বিদ্যাপতিকৃতবর্ষকৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাপতিরই রচিত। কিন্তু যেখানে শুধু বর্ষকৃত্য বলিয়া তিনি উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা বাচস্পতিমিশ্র-বিরচিত। ইহার সহিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদীর কোন সম্পর্ক নাই।

ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী উল্লেখ করিয়াছেন যে[৪৩] গোবিন্দানন্দ শ্রাদ্ধক্রিয়া-কৌমুদীতে ক্রিয়াকৌমুদীর নাম দিলেও তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

আমরা এখানে বলিতে পারি যে রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নিবন্ধকারগণ কোথায়ও স্বনিবন্ধের নাম দিয়া 'মৎকৃত' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। অতএব গোবিন্দানন্দের গ্রন্থেও তাহা সম্ভবপর নহে।

---

(৪২) (ক) রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বে (পৃঃ ২৭৪)—
"বর্ষকৃত্যে—মাসদ্বয়স্য মধ্যে তু সংক্রান্তি র্ন যদা ভবেৎ।
প্রকৃতস্তত্র পূর্বঃ স্যাত্তুত্তরস্তু মলিম্লুচঃ ॥"
[বাচস্পতিমিশ্রকৃত বর্ষকৃত্য, এসিয়াটিক্ সোসাইটির পাণ্ডুলিপি, নং জি ৮৬৮২, ফোলিও-১২]

(খ) তিথিতত্ত্ব (পৃঃ ৪১) ও দুর্গাপূজাতত্ত্ব (পৃঃ ৪৬)—
"বর্ষকৃত্যে—বিত্তং ব্রহ্মণি কার্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং যাম্যে বাগ্নিভয়ং সুরদ্বিষি কলি র্লাভঃ সমুদ্রালয়ে।.. ......ইত্যাদি।"
[বাচস্পতিমিশ্রের বর্ষকৃত্য, ফোলিও ৩৮]

(গ) একাদশীতত্ত্ব (পৃঃ ৪৬০)—
"সঙ্কটে বিষমে প্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ কথম্।
অদ্ভিস্তু পারণং কুর্যাৎ পুন র্ভুক্তং ন দোষকৃৎ ॥
পারণন্তু ভবেৎ কথমিতি বর্ষকৃত্যে পাঠঃ।"
[বাচস্পতিমিশ্রকৃত বর্ষকৃত্য, ফোলিও ৫৩]

(ঘ) মলমাসতত্ত্ব (পৃঃ ২৯০)—
"নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ সুপ্তে দেবে জনার্দনে.........
নিষ্পাবঃ শ্বেতশিম্বিরিতি বর্ষকৃত্যম্।"
[বাচস্পতিমিশ্রকৃত বর্ষকৃত্য, ফোলিও ৪৬]

(৪৩) স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ২০।

রঘুনন্দন 'নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ' স্থলে 'নিষ্পাব' শব্দের 'দেবধান্য'[৪৪] অর্থ ধরিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের বর্ষকৃত্যে 'শ্বেতশিম্বি' বলিয়া উল্লেখ করা আছে। রঘুনন্দন স্বপ্রতিভাবলে গ্রন্থ আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ শব্দের অর্থ পরিবর্তিত করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব রঘুনন্দন এখানে বর্ষকৃত্য গ্রন্থ নির্দেশিত অর্থই যে সর্বদা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে কোন নিশ্চয়তা নাই।

মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে[৪৫] রঘুনন্দন গোপালভট্টের 'হরিভক্তিবিলাস' হইতে প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দনের দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে এবং মঠপ্রতিষ্ঠা-তত্ত্বের কোথায়ও হরিভক্তিবিলাসের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না।

রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্ব এবং একাদশীতত্ত্বে 'হরিভক্তি' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেখা যায় (হরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ নহে), কিন্তু সেই উদ্ধৃতিও গোপালভট্টের হরিভক্তিবিলাসে পাওয়া যায় না।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দন তাঁহার রাসযাত্রাতত্ত্বে[৪৬] গোবিন্দানন্দের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে রঘুনন্দন ১৪৯০ বা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক হইলেও তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আবার তিনি গোবিন্দানন্দের গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুতরাং গোবিন্দানন্দের সমসাময়িক হইলেও রঘুনন্দন বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার রচনাবলী ১৫২০-১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রণীত হয়।

রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলির পৌর্বাপর্য

রঘুনন্দনের ২৮ খানি তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌খানি পূর্বে লিখিত ও কোন্‌খানি পরে লিখিত এবিষয়ে সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার মলমাসতত্ত্বের

---

(৪৪) মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৯০।

(৪৫) Cat. of Palm-leaf & selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Cal. 1905, H. P. Sastri, Preface, P—XVII.

(৪৬) The Nibandhas, Dinesh Ch. Bhattacharya [Cultural Heritage of India, Vol II, 1962, P-367]

রাসযাত্রাতত্ত্বের পুঁথি একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে (নং ৩৩০), এই পুঁথি স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পুঁথির তালিকার এই সংখ্যার 'রাসযাত্রাতত্ত্ব' নাম থাকিলেও বহু অনুসন্ধান করিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

প্রারম্ভে ২৮ খানি তত্ত্বের যে নামের তালিকা দিয়াছেন তাহাতে তত্ত্বের যে পৌর্বাপর্য লক্ষ্য করা যায়, তত্ত্বগুলি পাঠ করিলে কিন্তু তাহা উপলব্ধি করা যায় না। যেমন মলমাসতত্ত্বের প্রারম্ভে (পৃঃ ২৬০) বলা আছে—

মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গবৃষোৎসর্গত্রয়ে ব্রতে॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥

এই ২৮ খানি তত্ত্বের মধ্যে কোন্ তত্ত্বে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা কতকগুলির নাম শোনামাত্রই জানা যায়। যেমন—(১) মলমাসতত্ত্বে—কাল, মাস, তিথি, মলমাসবিষয়ক আলোচনা, (২) দায়তত্ত্বে—দায়সম্বন্ধে অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর তৎসম্বন্ধাধীনধনে কি প্রকারে পুত্রের অধিকার হইবে ও তাহার বিভাগ ইত্যাদি, (৩) সংস্কারতত্ত্বে—মানুষের দশবিধ সংস্কার (৪) শুদ্ধিতত্ত্বে—মৃত্যু ও জন্ম জন্য অশৌচ, শুদ্ধি ইত্যাদি, (৫) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে—প্রায়শ্চিত্তবিষয়, (৬) উদ্বাহতত্ত্বে—বিবাহ, কন্যা ও বরের গুণাগুণ, গোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি, (৭) তিথি-তত্ত্বে—বিভিন্নকৃত্যে গ্রহণীয় ইত্যাদি, (৮) জন্মাষ্টমীতত্ত্বে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি-নক্ষত্রে আচরণীয় ব্রত ইত্যাদি, (৯) দুর্গোৎসবতত্ত্বে—শারদীয়া দেবী দুর্গার পূজার অর্চনা প্রভৃতি, (১০) ব্যবহারতত্ত্বে—বিচারপদ্ধতি, আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাপার, (১১) একাদশীতত্ত্বে—একাদশীব্রত, তৎসংক্রান্ত বিধিনিষেধ ইত্যাদি, (১২) তড়া-গোৎসর্গতত্ত্বে—জলাশয়দানে ফল ও তড়াগ প্রতিষ্ঠাকাল ইত্যাদি, (১৩) মঠপ্রতিষ্ঠাদি তত্ত্বে—প্রাসাদ, মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার নিয়মবিশেষ ইত্যাদি, (১৪-১৬) ঋগ্‌বেদীয়, যজুর্বেদীয় ও সামবেদীয় বৃষোৎসর্গতত্ত্বে—এই সব বেদশাখান্তর্গত ব্যক্তিগণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ বিষয়, (১৭) ব্রততত্ত্বে—ব্রতের অনুষ্ঠান, ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি প্রভৃতি, (১৮) দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে—দেবপ্রতিষ্ঠা করিবার বিধিনিষেধ ইত্যাদি, (১৯) দিব্যতত্ত্বে—বিচারপদ্ধতিতে দৈবপ্রমাণ বা দিব্যসম্বন্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ, (২০) জ্যোতিস্তত্ত্বে—জ্যোতিষের নিয়মাবলী, (২১) বাস্তুযাগতত্ত্বে—বাস্তুশোধন প্রকার, বাস্তু পরীক্ষার পর বাস্তুদোষ উপশম প্রভৃতি আচারবিষয়, (২২) দীক্ষাতত্ত্বে—দীক্ষার কাল

প্রভৃতি, (২৩) আহ্নিকতত্ত্বে—প্রতিদিনকৃত্য, আচার, আহ্নিক ইত্যাদি, (২৪) কৃত্যতত্ত্বে—বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন কৃত্য প্রভৃতি (২৫) শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বে—পুরুষোত্তমদর্শনবিধান প্রভৃতি, (২৬) সামবেদীয়শ্রাদ্ধতত্ত্বে—সামবেদীয়দিগের শ্রাদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি, (২৭) যজুর্বেদীয়শ্রাদ্ধতত্ত্বে—শ্রাদ্ধ বিষয় ইত্যাদি, (২৮) শূদ্রকৃত্যবিচারণতত্ত্বে—শূদ্রের কৃত্য প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত শ্লোকে মলমাসতত্ত্বের নাম সর্বপ্রথমে থাকিলেও মলমাসতত্ত্বের মধ্যেই একাদশীতত্ত্ব, জ্যোতিসৃতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু নামই নহে জ্যোতিস্তত্ত্বে বহুপ্রকারে হইয়াছে[৪৭], তিথিতত্ত্বে বিবৃত হইয়াছে[৪৮]এবং একাদশীতত্ত্বে অনুসন্ধান করিতে[৪৯]নির্দেশ দেওয়া আছে।

এখানে বিবেচ্য যে মলমাসতত্ত্ব প্রথমে রচিত হইলে একাদশীতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বে অনুসন্ধান করা বা জ্যোতিস্তত্ত্বে ও তিথিতত্ত্বে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া অতীতকালবোধক ক্ত-প্রত্যয় কি প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে—ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়।

একাদশীতত্ত্ব যে প্রথমে লিখিত হইয়াছে তাহা নহে। কারণ একাদশীতত্ত্বের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব[৫০], তিথিতত্ত্ব[৫১],ও মলমাসতত্ত্বের[৫২] নাম উল্লেখ করা আছে। তিথিতত্ত্বের মধ্যে একাদশীতত্ত্ব[৫৩] শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও শুদ্ধিতত্ত্ব[৫৪], মলমাসতত্ত্ব[৫৫] এবং দুর্গাপূজাতত্ত্বের[৫৬] নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু জ্যোতিস্তত্ত্বে অপর কোন তত্ত্বের নাম উল্লিখিত নাই। তবে জ্যোতিস্তত্ত্বই যে প্রথমে রচিত হইয়াছে তাহাও স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় না।

এখানে এইরূপ সমাধান করা যাইতে পারে যে মলমাসতত্ত্বে তত্ত্বগুলির নাম

(৪৭) (ক) জ্যোতিস্তত্ত্বে বহুধা বিবৃতম্। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৪]
(খ) জ্যোতিস্তত্ত্বে জ্ঞেয়ম্। [ঐ, পৃঃ ২৯১]

(৪৮) এতদ্‌বচনং তিথিতত্ত্বে বিবৃতম্। [ঐ, পৃঃ ২৯৪]

(৪৯) বিকল্পে অষ্টৌ দোষা একাদশীতত্ত্বেঽনুসন্ধেয়াঃ। [ঐ, পৃঃ ২৮৫]

(৫০) বিবৃতমেতৎ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে। [একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪৪৪]

(৫১) তিথিতত্ত্বেঽনুসন্ধেয়ঃ। [ঐ, পৃঃ ৪৫৮]

(৫২) অত্র মলমাসাদিকৃতবিশেষো মলিম্লুচতত্ত্বেঽনুসন্ধেয়ঃ। [ঐ, পৃঃ ৪৬২]

(৫৩) বিবৃতমেকাদশীতত্ত্বে। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩]

(৫৪) ব্যাখ্যাতং শুদ্ধিতত্ত্বে শ্রাদ্ধতত্ত্বে চ। [ঐ, পৃঃ ৬]

(৫৫) প্রপঞ্চস্তু মলমাসতত্ত্বেঽনুসন্ধেয়ঃ। [ঐ পৃঃ ৬৬]

(৫৬) পূজায়াং বিশেষস্তু দুর্গাপূজাতত্ত্বেঽনুসন্ধেয়ঃ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭]

দিয়া পরে রঘুনন্দন
এখানে 'বক্ষ্যামি'—
রঘুনন্দন তত্ত্বগুলি রচ
বিষয়বস্তু থাকিবে—এ
তালিকাতে কোন্ বিষ
বিষয় দুইবার লিপিবদ্ধ
সময়ে তিনি সম্পূর্ণ
করিয়াছেন তখন একই
দেখিয়া কোন কোন নি
অন্য নিবন্ধে অনুসন্ধান
উল্লেখ বা মলমাসতত্ত্বে
তত্ত্বগুলির নামের তা
তিথিতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বে

মহামহোপাধ্যায়
প্রারম্ভে বর্ণিত তত্ত্বগুলি
অত্যাবশ্যক প্রয়োজন

আমাদের মনে হ
তিনি প্রথমে স্মৃতির
যখন যে বিষয়ের প্রয়ো
করিয়াছেন। এইজন্যই
যায়। কিন্তু পরে রঘু
কারণ তিথিতত্ত্বে স্পষ্ট
হরিকে প্রণাম করিয়া তাঁ

এই প্রকারে রঘুনন্দ
রঘুনন্দনভট্টাচার্যবিরচিত
জন্মাষ্টমীতত্ত্ব শেষ করিয়া

(৫৭) Hist. of D. S. V
(৫৮) 'প্রণম্য জগতামীশং

(৫৯) 'ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীর

দিয়া পরে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—'ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ'। এখানে 'বক্ষ্যামি'—এই ভবিষ্যৎকাল দেওয়ার দরুণ আমাদের অনুমান হয় যে রঘুনন্দন তত্ত্বগুলি রচনা করিবার পূর্বে কি কি তত্ত্ব লিখিবেন ও তাহাতে কি কি বিষয়বস্তু থাকিবে—এইরূপ একটি সুনিশ্চিত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই তালিকাতে কোন্ বিষয় কোন্ তত্ত্বে থাকিবে তাহা নির্ধারিত করিবার ফলে কোন বিষয় দুইবার লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং পুনরুক্তিও ঘটে নাই। অথবা লিখিবার সময়ে তিনি সম্পূর্ণ লিখিয়া গেলেও পরে যখন সমগ্র পুঁথিগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছেন তখন একই কথা নানা নিবন্ধে উল্লেখ করায় পুস্তকের বিস্তৃতি ঘটিতেছে দেখিয়া কোন কোন নিবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ বাদ দিয়াছেন এবং সেই অংশ অন্য নিবন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। অন্যথা একাদশীতত্ত্বে মলমাসতত্ত্বের উল্লেখ বা মলমাসতত্ত্বে একাদশীতত্ত্বের উল্লেখ থাকিতে পারে না। সেইজন্যই তত্ত্বগুলির নামের তালিকাতে মলমাসতত্ত্ব পূর্বে লিখিত হইলেও একাদশীতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বের নাম মলমাসতত্ত্বে অনায়াসে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে মহাশয় এই সম্বন্ধে বলেন যে[৫৭] মলমাসতত্ত্বের প্রারম্ভে বর্ণিত তত্ত্বগুলি সময়ানুক্রম হিসাবে সাজানো হয় নাই, শ্লোকের ছন্দের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন অনুসারে ইহা বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

আমাদের মনে হয়—এই তত্ত্বগুলির নামকরণ রঘুনন্দন প্রথমে করেন নাই। তিনি প্রথমে স্মৃতির বিষয়গুলি স্মৃতিতত্ত্ব নামে সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করেন। যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া পরে নামকরণ করিয়া বিষয়গুলি পৃথক্ করিয়াছেন। এইজন্যই তিথিতত্ত্বের মধ্যে 'জন্মাষ্টমীতত্ত্ব' ও 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ঢুকিয়া যায়। কিন্তু পরে রঘুনন্দন তাহারও নামকরণ করিয়া পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। কারণ তিথিতত্ত্বে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে[৫৮]—শ্রীরঘুনন্দন জগতের ঈশ্বর বসুদেবপুত্র হরিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার জন্মতিথিতত্ত্ব বলিতেছেন।

এই প্রকারে রঘুনন্দন জন্মাষ্টমীতত্ত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দনভট্টাচার্যবিরচিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতত্ত্ব সমাপ্ত হইল[৫৯]—এইরূপ বলিয়া জন্মাষ্টমীতত্ত্ব শেষ করিয়াছেন।

---

(৫৭) Hist. of D. S. Vol I, P—416.

(৫৮) 'প্রণম্য জগতামীশং বসুদেবসুতং হরিং তজ্জন্মতিথিতত্ত্বানি বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।' [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৬]

(৫৯) 'ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্যবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতত্ত্বং সমাপ্তম্'। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ২১]

তিথিতত্ত্বের মধ্যেই জন্মাষ্টমীতত্ত্ব সমাপ্ত হইবার পর রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বের বিষয়গুলি যেমন—দূর্বাষ্টমী, অষ্টকা, নবোদকশ্রাদ্ধ, ভীষ্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, দশহরা ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পর তিথিতত্ত্বের মধ্যেই দুর্গোৎসবতত্ত্ব আরম্ভ করা হইয়াছে। আবার দুর্গোৎসবতত্ত্বের প্রারম্ভে নমস্কারসূচক শ্লোক রহিয়াছে[৬০]। যথা—সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারিণী মহাদেবীকে নমস্কার করিয়া শ্রীরঘুনন্দন স্মৃতিতত্ত্বে তাঁহার পূজাকাল বর্ণনা করিতেছেন।

পরে আবার দুর্গোৎসবতত্ত্বের শেষে সমাপ্তিসূচক বাক্য রহিয়াছে[৬১]।

এই দুর্গোৎসবতত্ত্বের শেষে পুনরায় তিথিতত্ত্বের বিষয়গুলি যেমন একাদশীকৃত্য দ্বাদশীকৃত্য ইত্যাদি আলোচিত হইবার পর তিথিতত্ত্ব সমাপ্ত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিথিতত্ত্বের প্রারম্ভে নমস্কারসূচক শ্লোক ও শেষে সমাপ্তিবাক্য রহিয়াছে।

রঘুনন্দন তিথিতত্ত্ব প্রণয়নের সময়েই প্রসঙ্গক্রমে দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও জন্মাষ্টমীতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই তত্ত্বের প্রারম্ভে নমস্কারবাক্য ও শেষে সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য এই দুই তত্ত্বের পূর্বে, মধ্যে ও পরে তিথিতত্ত্বের বিষয় রহিয়াই গিয়াছে। দুর্গোৎসবতত্ত্ব যে তিথিতত্ত্বেরই অন্তর্গত তাহা রঘুনন্দনের দুর্গাপূজাতত্ত্বের প্রারম্ভে সমর্থিত হইয়াছে[৬২]। ইহা দ্বারা দুর্গোৎসবতত্ত্ব পৃথক্ হইলেও তিথিতত্ত্বেরই অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইতেছে।

রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বের প্রারম্ভে সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে দুইপ্রকারে মঙ্গলাচরণ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় রঘুনন্দন সাধারণভাবে মঙ্গলাচরণ করিয়াই স্মৃতিতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু পরে তিনি বিশেষ মঙ্গলাচরণ দ্বারা এক একটি তত্ত্ব পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই এক মলমাসতত্ত্বের প্রারম্ভে দুইবার মঙ্গলাচরণ আমরা দেখি। প্রথম মঙ্গলাচরণে 'স্মৃতিতত্ত্ব' উল্লিখিত আছে। যেমন, সাধারণ নমস্কারশ্লোকে আছে[৬৩] সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া রঘুনন্দন মহর্ষিগণপ্রণীত স্মৃতিতত্ত্ব অর্থাৎ স্মৃতির তাৎপর্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।

---

(৬০) স্মৃতিতত্ত্বে মহাদেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
নত্বা বদতি তৎপূজাকালং শ্রীরঘুনন্দনঃ॥ [ঐ, পৃঃ ২৫]

(৬১) 'বন্দ্যঘটীয়শ্রীহরিহরভট্টাচার্যাত্মজশ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্যবিরচিতং দুর্গোৎসবতত্ত্বং সমাপ্তম্'। [ঐ, পৃঃ ৪১]

(৬২) ব্যবস্থায়াঃ প্রপঞ্চস্তু বিজ্ঞেয়স্তিথিতত্ত্বতঃ।
পূজাবিধেশ্চ সম্যক্ত্বং জ্ঞাতব্যং কোবিদৈরিহ॥ [দুর্গাপূজাতত্ত্ব, পৃঃ ১]

(৬৩) প্রণম্য সচ্চিদানন্দং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
মুনীন্দ্রাণাং স্মৃতেস্তত্ত্বং বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ॥ [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭০]

কিন্তু দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণে মলমাসতত্ত্বের নাম উল্লিখিত আছে[৬৪]। যথা, অজ্ঞানান্ধকারের ভাস্করস্বরূপ ভারতীর পতি শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া সাধুদিগের সন্তোষের জন্য স্মৃতিতত্ত্বের মধ্যে মলমাসবিষয়কতত্ত্ব বলা হইতেছে। সুতরাং দেখা যায় প্রথমে স্মৃতিতত্ত্ব গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে সাধারণ নমস্কারশ্লোকে এবং পরে মলমাস-তত্ত্ব উল্লেখ করিয়া ভিন্ন নমস্কারবাক্য রহিয়াছে।

অতএব মনে হয় রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়গুলি সুপরিকল্পিত তালিকা অনুসারে প্রয়োজন অনুযায়ী পর পর লিপিবদ্ধ করিয়া পরে হয়ত সকলের সুবিধার্থে নামকরণ করিয়া তত্ত্বগুলি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও জন্মাষ্টমীতত্ত্ব—তিথিতত্ত্বের অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্ হইয়াছে। সেইরূপ মলমাসতত্ত্বের মধ্যে একাদশীতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বের নাম পাওয়া যায়। মলমাসতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি তাঁহার তালিকায় মলমাসতত্ত্বের নাম সকলের প্রারম্ভে দিয়াছেন। তাঁহার তালিকাটি একটু নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিলেই জানা যায় যে প্রয়োজনীয়তত্ত্বগুলিই ক্রম অনুসারে তালিকাভুক্ত হইয়াছে। অতএব রঘুনন্দন প্রয়োজন অনুসারে স্মৃতির বিষয়গুলি একই সঙ্গে প্রণীত করিয়া পরে নামকরণ করিয়া পৃথক্ করিবার সময়ে 'এই বিষয় অমুক তত্ত্বে অনুসন্ধান কর' ইত্যাদি প্রকারে সমতা রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রঘুনন্দন তাঁহার এই বিস্তৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব দ্বারা স্মৃতির বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব গ্রন্থ রচনাপূর্বক স্মৃতিশাস্ত্রে বিখ্যাত হইয়া আছেন। তবে তাঁহার নিবন্ধ রচনা শুধু বিদ্যা প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইহা সমাজের বিভিন্ন বিপ্লবে দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দুধর্মরক্ষণে সদা তৎপর থাকিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে, আর রঘুনন্দনের নূতন কালোপযোগী ব্যবস্থায় সমাজও রক্ষা পাইয়াছে।

---

(৬৪) প্রণম্য ভারতীকান্তমজ্ঞানধ্বান্তভাস্করম্।
সতাং মুদে স্মৃতেস্তত্ত্বে তত্ত্বং ভাষে মলিম্ল চে॥ [মলমাসতত্ত্ব পৃঃ ২৬০]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। আচারমূলক তত্ত্বগুলির মধ্যে সংস্কার, বিবাহ, ব্রত, আহ্নিক, পূজা, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। আচারমূলক তত্ত্বগুলি প্রথমে আলোচিত হইতেছে।

১। সংস্কার

সম্ পূর্বক কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া সংস্কারপদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে মনুষ্য শুদ্ধ হয় এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্মে যোগ্যতা অর্জন করে তাহাকে বলে সংস্কার। শরীর ও মনের শুদ্ধি বা উন্নতিসাধনের জন্যই সংস্কারসকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

জন্ম হইতে মানুষ বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্কার দ্বারা অবশ্য বিশুদ্ধতা লাভ করিবে। ইহা দ্বারা দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃকর্মে মানুষের অধিকার জন্মে। অতএব সংস্কার-কর্ম প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

গৌতমধর্মসূত্রগ্রন্থে কথিত আছে যে[১]—উপনয়নের পূর্বে বালক যথেচ্ছ আচার, যথেচ্ছ কথন ও যথেচ্ছ ভোজন করিতে পারে। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ-হনন, সুরাপান ইত্যাদি অত্যন্ত গর্হিত কার্যগুলি বালক ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষেও নিষিদ্ধ। উপনয়ন সংস্কারের পূর্বে ব্রাহ্মণসন্তানের কোন অধিকার থাকে না। এইজন্য বলা হয় যে জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইলেও সংস্কার দ্বারাই ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উপনয়ন দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পর দ্বিজপদবাচ্য হইয়া থাকে।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের দেহ শুক্রশোণিতসম্ভূত। সুতরাং গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারের অনুষ্ঠান দ্বারা শুক্রশোণিতসম্বন্ধজনিত যে পাপ তাহা বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক ব্যাধি-সঞ্চারের কারণীভূত পাপসকলও নাশপ্রাপ্ত হয়। এই সকল সংস্কার নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্যকর্মরূপে নিরূপিত হইলেও উহাতে পাপনাশরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় এবং ঐ ফল আনুষঙ্গিকমাত্র বলিয়া সংস্কার কাম্যকর্ম নহে[২]। বৈদিকমন্ত্র দ্বারাই দ্বিজাতিগণের গর্ভাধান প্রভৃতি

(১) প্রাগুপনয়নাৎ কামচারঃ কামবাদঃ কামভক্ষঃ। [গৌতমধর্মসূত্র ১।২।১]

(২) এবমুক্তপ্রকারগর্ভাধানাদিভিরেনঃ পাপং বীজগর্ভসমুদ্ভবং শুক্রশোণিতসম্বন্ধং গাত্রব্যাধি-সংক্রান্তিনিমিত্তং নাশং যাতি নিত্যত্বেঽপ্যানুষঙ্গিকমেতৎ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬৪]

...কার্য করা কর্তব্য—ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকাল ও পরকালের উপকার সাধন করে। ইহাদের দ্বারা মানবের বীজজনিত ও গর্ভবাসজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। ঋষি অঙ্গিরা এই বিষয়ে ছোট্ট একটি উপমার সাহায্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সংস্কারসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন একটি চিত্র বহুবিধ রেখা দ্বারা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যথাবিধি অনুষ্ঠিত সংস্কারসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যও পরিস্ফুট হয়[৩]।

বহুবিধ সংস্কারের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। তবে সংস্কার ঠিক কতগুলি আছে সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতের পার্থক্যও বিদ্যমান। যেমন আমরা দেখি গৌতমধর্মসূত্রে চল্লিশটি সংস্কার উল্লিখিত আছে। কিন্তু অপর শাস্ত্রকারগণের মতে গৌতমোক্ত চল্লিশটি সংস্কার সমর্থিত হয় নাই। এই চল্লিশটি সংস্কার ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া এখন দশবিধ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। এই মতভেদ ও সংখ্যাভেদের প্রধান কারণ বোধ হয় দেশভেদে ও কালভেদে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। কারণ গৌতম যে পঞ্চমহাযজ্ঞ, সপ্তপাকযজ্ঞ, সপ্ত হবির্যজ্ঞ, সপ্ত হোমযজ্ঞ ইত্যাদি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সমাজে বহুকাল প্রচলিত নাই। এইজন্য সময়ের পরিবর্তনে সূত্রকারগণের মধ্যে ও সংহিতাকারগণের মধ্যেও মতভেদ প্রচলিত হইয়াছে। পরবর্তী নিবন্ধকারগণের যুগে ঈদৃশ মতপার্থক্য আরও প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন বৈখানসসূত্রগ্রন্থে ১৮ প্রকার সংস্কার বলা আছে[৪]। কিন্তু স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থে[৫] ষোড়শ প্রকার সংস্কার আলোচিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন যে দশবিধ সংস্কারের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্তমানে আর পূর্ণাঙ্গরূপে প্রচলিত নাই। এখন কোনও কোনও স্থানে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কারই অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক চাপে এইগুলির মধ্যেও অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা কমিয়া আসিতেছে। এইজন্য বর্তমানে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন অফিসে চুক্তি দ্বারাও বিবাহ সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। তথাপি এখনও অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও সর্বসমক্ষে আনুষ্ঠানিক বিবাহকে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। সর্বজনসমক্ষে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়ায় পরবর্তী কালে বিশেষ কোন কারণে বর বা

সংস্কারের সংখ্যা

---

(৩) অত্র দৃষ্টান্তমাহাঙ্গিরাঃ—

চিত্রং কর্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্বকৈঃ॥ [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩০১]

(৪) Hist. of D. S. Vol II, Part I, P—194.

(৫) স্মৃত্যর্থসার, পৃঃ ৩।

কন্যার পক্ষে ঐ বিবাহ অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কাজেই সমাজের শৃঙ্খলার উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আবার অন্নপ্রাশন এবং উপনয়ন কালীঘাটে বা কোন দেবপীঠে কোন মতে সম্পাদিত হইলেও শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে গৃহে অনুষ্ঠান অত্যন্ত পবিত্রতাজ্ঞাপক বলিয়া এখনও তাহা নিষ্ঠাবান্ ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপকতা না থাকিলেও মূলকর্ম ঠিকই সম্পাদিত হয়। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে অন্নপ্রাশন সময়েই পূর্ববর্তী সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপূর্বক পরে অন্নপ্রাশন সংস্কার অনুষ্ঠিত করা হইয়া থাকে এবং উপনয়নের দিনে চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ভবদেবপদ্ধতির ভূমিকায় শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে[৬], 'ইদানীংকালে পুংসবন প্রভৃতি অনেক কর্ম প্রচলিত নাই। কতকাল লুপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না, তবে বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের বহুপূর্ব হইতেই যে লোপ পাইয়াছে তাহা তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে অনেকটা বুঝা যায়। বঙ্গদেশে বালকের জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, পৌষ্টিককর্ম ও মূর্দ্ধাভিঘ্রাণকর্ম চলিত নাই।' কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে অনেক স্থানে এখনও দশবিধসংস্কারই বিদ্যমান আছে।

নিবন্ধকার হলায়ুধ দশসংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন[৭]—যেমন গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। রঘুনন্দনও এই দশবিধ সংস্কার স্বীকারপূর্বক অপর দুইটি কর্ম সংযোজিত করিয়াছেন, যথা—শোষ্যন্তীহোম ও সমাবর্তন। এই দুইটি কর্ম সংস্কারের অঙ্গমাত্র। হলায়ুধও এই দ্বিবিধ কর্মের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন।

রঘুনন্দন হারীতের বচন আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে[৮] গর্ভাধান বিধি দ্বারা বিষ্ণুযোনিকে কল্পনা করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইয়া বেদগ্রহণযোগ্য গর্ভ উৎপাদন করিবে। পুংসবন সংস্কার দ্বারা অব্যক্ত লিঙ্গরূপ গর্ভে পুত্র প্রাপ্তি কামনা করিবে। ফলস্থাপনরূপ সীমন্তোন্নয়ন দ্বারা মাতা ও পিতা কর্তৃক জাত

(৬) ভবদেবপদ্ধতি ভূমিকা, পৃঃ ।৵০—।০।

(৭) ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পৃঃ ২০৪।

(৮) তত্র হারীতঃ—গর্ভাধানবদুপেতো ব্রহ্মগর্ভং সন্দধাতি, পুংসবনাৎ পুংসীকরোতি ফলস্থাপনাৎ মাতাপিতৃজং পাপ্মানমপোহতি। রেতোরক্তগর্ভোপঘাতঃ পঞ্চগুণো জাতকর্মণা প্রথমমপোহতি, নামকরণেন দ্বিতীয়ং, প্রাশনেন তৃতীয়ং, চূড়াকরণেন চতুর্থং, স্নাপনেন পঞ্চমম্ এতৈরষ্টাভিঃ সংস্কারৈ গর্ভোপঘাতাৎ পূতো ভবতীতি। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩০১]

গর্ভস্থ জাতকের আশ্রয় সংস্কার দ্বারা অপত্যসংস্কার করিবে। রেতোরক্ত গর্ভপ্রাপ্তিতে পাঁচপ্রকার পাপ যথা উপপাতক, জাতিভ্রংশকরণ, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলিনীকরণ পাপগুলির মধ্যে জাতকর্ম দ্বারা প্রথম প্রকার পাপ দূরীভূত হয়, নামকরণ দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার, অন্নপ্রাশন দ্বারা তৃতীয় প্রকার, চূড়াকরণ দ্বারা চতুর্থ প্রকার এবং সমাবর্তন দ্বারা পঞ্চম প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব এই অষ্ট প্রকার সংস্কার দ্বারা গর্ভোপঘাত হইতে লোকে শুদ্ধ হয়।

ভবদেবের নির্দেশ অনুসারেই সংস্কারকর্ম এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রঘুনন্দন ভবদেবের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিছু কিছু খণ্ডন করিলেও রঘুনন্দনের সেই ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হয় নাই[৯]।

রঘুনন্দনের মতের সহিত ভবদেবের মতের পার্থক্য

যেমন আমরা দেখি রঘুনন্দন তাঁহার সংস্কারতত্ত্বে বলিয়াছেন, হোমবিধিতে গৃহে অগ্নিস্থাপন করতঃ হোতা দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাকে স্থাপন করিবে। ব্রহ্মার উপবেশনে 'আবসোঃ সদনে সীদ'—এই বলিয়া পাতিত কুশগুলির উপর দর্ভবটু প্রভৃতিকে পূর্বাগ্রে স্থাপন করিতে হয় এবং সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে সেই ব্রাহ্মণই 'সীদামি' বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া বসিবে—এইরূপ ভবদেবের অভিমত[১০] রঘুনন্দন কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কারণ গৃহ্যসূত্রের মতে ব্রহ্মাই স্বয়ং তৃণনিরসন পূর্বক 'আবসোঃ সদনে সীদামি' বলিয়া বসিবে। পূর্বোক্ত 'সদনে সীদ' এইরূপ মন্ত্র গৃহ্যসূত্রে নাই। এইজন্য রঘুনন্দন ভবদেবের এইরূপ নির্দেশকে কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১১]। কিন্তু সামবেদীয়গণ যখন ভবদেবের পদ্ধতি অনুসারেই কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তখন ভবদেব যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপই অনুসৃত হইবে।

---

(৯) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কথিত আছে রঘুনন্দন প্রাচীন স্মৃতির ব্যবস্থা সম্যগ্ রূপে খণ্ডন করিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে থাকিলে রঘুনন্দনের মাতা সংস্কারকর্মে ভবদেবের পদ্ধতির খণ্ডন করিতে রঘুনন্দনকে নিষেধ করেন। কারণ ভবদেবের নির্দেশেই সমাজব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সেই ব্যবস্থা অসিদ্ধ করিলে রঘুনন্দনের মাতাপুত্রের সম্বন্ধ এবং তাঁহার পিতামাতার বিবাহজনিত সম্বন্ধও অসিদ্ধ হইয়া যায়। এইজন্য মাতার আদেশেই রঘুনন্দন ভবদেবীয় সংস্কারের মূলব্যবস্থা অস্বীকার করেন নাই।

এই কিংবদন্তীটি কতদূর সত্য বলা কঠিন, তথাপি পণ্ডিতমহলে ইহা অত্যন্ত সুপরিচিত।

(১০) আস্তৃতকুশান্ অভিরভ্যুক্ষ্য ব্রহ্মাণং গৃহীত্বা প্রজাপতি র্ঋষিরগ্নি র্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ—ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ ইত্যনেন পূর্বাগ্রং কুশোপরি কুশাদিরচিতং ব্রহ্মাণং স্থাপয়েৎ ব্রাহ্মণব্রহ্মপক্ষে তু ব্রাহ্মণ এব 'ওঁ সীদামি' ইত্যুক্ত্বা উত্তরাভিমুখীভূয় উপবিশেৎ।

[কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ১২]

(১১) সীদামীতি প্রতিবচনং ব্রহ্মকর্তৃকমিতি ভবদেবভট্টকল্পনং কল্পনমেব সীদেতি সূত্রানুপাত্তাচ্চ।

[সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩০৩]

আবার ভূমিজপের বিধানে ভবদেব বলেন—ডান হাঁটু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণহস্ত যাহাতে উপরে থাকে এইভাবে দুইটি হস্তকে পরস্পর অসংলগ্ন ও অধোমুখ করিয়া ভূমিতে রাখিয়া ভূমির ভজনা করা হয়। কিন্তু তৎপরে দক্ষিণহস্তে কতকগুলি কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণাবর্তে তিনটি মন্ত্রে তৃণাদি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিবে—ভবদেবের এই মত[১২] রঘুনন্দন নিষ্প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ গৃহ্যসংগ্রহে এইরূপ কোন প্রমাণ নাই[১৩]।

প্রকৃত কর্মের অর্থাৎ হোমের পর কর্মে দোষত্রুটি সমাধানের জন্য উদীচ্যকর্মের পূর্বে প্রায়শ্চিত্তাত্মক হোম করিতে হয়। যদিও এই হোমের বিষয় গোভিল উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তৎপরিশিষ্টে উক্ত থাকার দরুণ ইহা গৃহ্যকর্মে অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ভবদেবভট্ট[১৪] কর্মের বৈগুণ্যহেতু শান্তির জন্য শাট্যায়নহোমের কথা বলিয়াছেন—তাহা রঘুনন্দনের মতে অপ্রামাণিক। কারণ ভবদেব অপেক্ষা মহাপ্রামাণিক ভট্টনারায়ণ স্বকৃতভাষ্যে উহা অপ্রামাণিক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। ছন্দোগপরিশিষ্টেও প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে—যথা, যেস্থলে মহাব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা প্রায়শ্চিত্তনিমিত্ত হোম করিবে, সেস্থলে স্ত্রীর বিবাহে যেমন 'ভূঃ স্বাহা', 'ভুবঃ স্বাহা', 'স্বঃ স্বাহা' এবং 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'—এই চার মন্ত্র পড়িয়া চারবার যাহাতে আহুতি দেওয়া হয় সেইরূপ করিবে। অথবা 'অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতম্…'ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করতঃ আহুতি দিবে, কিংবা প্রাজাপত্য মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে—প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে এই তিন প্রকার বিকল্পই উক্ত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে এই তিনটি পক্ষ এইরূপ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করায় গোভিলের মতানুযায়ী কর্মে শাট্যায়ন হোম অযুক্ত বলিয়া জানা উচিত[১৫]। পরে মহাব্যাহৃতি

---

(১২) ততো দক্ষিণহস্তেন কুশান্ গৃহীত্বা অগ্নেরুত্তরতঃ প্রভৃতি দক্ষিণাবর্তেন তৃণাদিকম্ অনেন মন্ত্রত্রয়েণ শোধয়েৎ। [কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ১৪-১৫]

(১৩) এতেন চ দক্ষিণহস্তেন কুশান্ গৃহীত্বেতি ভবদেবভট্টলিখনং নিষ্প্রমাণম্।
[সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩০৫]

(১৪) শাট্যায়নহোমাদিবামদেব্যগানান্তং সর্বকর্মসাধারণমুদীচ্যং কর্ম কর্তব্যং তদভিধীয়তে। তত্র প্রথমং সঙ্কল্পং কুর্যাৎ, বিষ্ণু র্ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শাট্যায়নহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্বীয়………মহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ পূর্ববৎ কৃত্বা প্রায়শ্চিত্ত-হোমং কুর্যাৎ। [কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ২৬-২৮]

(১৫) হোমানন্তরং কর্মবৈগুণ্যসমাধানার্থং প্রায়শ্চিত্তং গোভিলানুক্তমপি তৎপরিশিষ্টোক্তং কুর্যাৎ ………………………ততশ্চ ভবদেবভট্টোক্তপ্রায়শ্চিত্তাত্মকশাট্যায়নহোমো নিষ্প্রমাণঃ ভট্টনারায়ণৈঃ গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণীকৃতত্বাৎ। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩০৮]

মন্ত্রগুলিকে পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে এবং একসঙ্গে উচ্চারণপূর্বক চারটি আহুতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করাই সমীচীন। বিশারদ প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছেন। যদিও শাট্যায়নহোম সমূলক বটে, কিন্তু উহা ভিন্ন শাখাস্থিত লোকের পক্ষে কর্তব্য, সামবেদীয়দিগের পক্ষে নহে।

বিবাহসংস্কার প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে যে কন্যাসম্প্রদানকার্যে সম্প্রদাতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করতঃ সম্প্রদানশালাতে উত্তরদিকে একটি গাভী বাঁধিয়া রাখিবেন। বরের আচমনের পর সম্প্রদাতা মধুপর্ক দান করিলে বর তাহা ভক্ষণ করিবে।

বিবাহ সংস্কার

তিনবার মন্ত্রপাঠ করিবার পর উহা পান করিবার বিধি আছে। পরবর্তী কালে পান উঠিয়া গিয়াছে, এখন মাত্র ঘ্রাণ লইতে হয় এবং পরে আচমন করতঃ গোমোক্ষণ করিতে হয়। মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না বলিয়া বরকে মধুপর্ক দিবার সময় মাংসার্থে গাভী দিবার জন্যই পূর্বে গাভী বাঁধিবার প্রথা ছিল। তারপর নাপিত গাভীকে বন্ধনমুক্ত করিলে জামাতা মন্ত্রপাঠ করিবে।

বর্তমানে এই সংস্কারে আচারাদির পরিবর্তন

কিন্তু বর্তমানে কলিযুগে মধুপর্কে পশুবধ নিষিদ্ধ হওয়ায় সে প্রথা নাই। তথাপি গাভীবন্ধনের প্রথা না থাকিলেও মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। এইজন্য এখনও বিবাহের সময় নাপিতের 'গৌর্বচন' প্রথা প্রচলিত আছে। ভবদেব কন্যাদানের পরই গোমোক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন[১৬]। কিন্তু রঘুনন্দন কন্যাদানের পূর্বে গোমোচন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন[১৭]। তিনি এই বিষয়ে ভট্টভাষ্য ও মনুর বচনের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করেন।

পাণিগ্রহণের পূর্বে বর দুইখানি বস্ত্র (একটি অধোবস্ত্র ও একটি উত্তরীয়বস্ত্র) যথাক্রমে দুইটি মন্ত্র পড়িয়া বধূকে পরাইবে। বর্তমানকালে বধূ ঐরূপ বস্ত্র দুইখানি পরিয়া আসিলে বর ঐ বস্ত্র দুইটি স্পর্শ করিয়া মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। উত্তরীয়বস্ত্র যজ্ঞোপবীতের ন্যায় পরিতে হয়—ইহা ভবদেব বলিয়াছেন[১৮]।

---

(১৬) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং সবস্ত্রাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে........ ততো নাপিতেন মুক্তায়াং গবি, জামাতা ইমং মন্ত্রং পঠতি। প্রজাপতি ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। [কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ৫৩-৫৫]

(১৭) কন্যাদানানন্তরঞ্চ গৌরিত্যাদি গবামন্ত্রণপর্যন্তং লিখিতং তদ্ধেয়ং ভট্টভাষ্যাদিবিরোধাৎ প্রমাণাভাবাচ্চ। অর্হণাদিত্বেন কন্যাদানাৎ পূর্বমেব গোমোচনস্য যুক্তত্বাৎ। মনুবচনে অর্হয়িত্বেত্যনেন অর্হণানন্তরমেব কন্যাদানবিরোধাচ্চ। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩১২]

(১৮) অনেন যজ্ঞোপবীতরূপমুত্তরীয়বস্ত্রং পরিধাপয়েৎ। [কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ৬০]

সময়ের পরিবর্তনে স্মৃতিব্যবস্থারও পরিবর্তন হয় রঘুনন্দন ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন[১৯]—বর্তমানকালে বস্ত্রান্তর পরিধানের আচারের অভাববশতই বধূর পরিহিত বস্ত্রাঞ্চলের অংশবিশেষ উঠাইয়া পরিধান করানরূপ বিধি সম্পন্ন করা হয়। তারপর মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণের মত পরিধান করাইতে হয়।

পিণ্ডদানের সময়ে দেখা যায় পৈতা যেমন দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করিতে হয়, সেইরূপ স্ত্রী ও শূদ্রগণের মধ্যে উত্তরীয়বস্ত্র ধারণের আচার প্রচলিত আছে। কারণ হারীতবচনে আছে—স্নান করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয়—এই বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিবে। অতএব স্ত্রীলোকের উত্তরীয় বস্ত্রধারণ আবশ্যক হওয়াতেই গোভিলসূত্রে যে যজ্ঞোপবীতিনী পদটি আছে তাহার অর্থ ভট্টভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, স্ত্রীগণের যজ্ঞোপবীতের অভাবহেতু যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্রধারণ যুক্তিযুক্ত হইতেছে। এই উত্তরীয়ধারণ যখন যজ্ঞোপবীতের স্থলাভিষিক্ত হইল, তখন স্ত্রীগণের পিণ্ডদান সময়েও উত্তরীয়বস্ত্রকে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করা তাহাদের যুক্তিযুক্ত[২০]।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র বলেন—স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রদ্বয়মাত্র ধারণ করিলেই চলিবে, তাহাদিগের আর উত্তরীয় বস্ত্র দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করিতে হইবে না; কারণ ছন্দোগাচারকর্তা গ্রন্থে প্রতিহস্তক নামক পণ্ডিত ঐরূপই লিখিয়া গিয়াছেন—এই অভিমত রঘুনন্দন কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে[২১]। আবার হরিশর্মা যে স্ত্রীদিগেরও যজ্ঞোপবীত ধারণের কথা বলিয়াছেন, তাহাও রঘুনন্দন স্বীকার করেন নাই। কারণ স্ত্রীদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ উচিত নহে। সরলাভট্টভাষ্যেও এইরূপ বলা হইয়াছে[২২]।

---

(১৯) ইদানীং বস্ত্রান্তরপরিধানাচারাভাবেন প্রজাপতি র্ ঋষিঃ.........ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা পরিহিত-বস্ত্রাঞ্চলং পরিধানযোগ্যতয়োত্থিতাং বধূং পুনঃ পরিধাপয়েৎ.........পরিধত্ত পরিধত্ত.........ইতি মন্ত্রেণোত্তরীয়বস্ত্রং বামস্কন্ধাবস্থানদক্ষিণকক্ষলক্ষণবেষ্টনপ্রকারেণ যজ্ঞোপবীতধারণবৎ পরিধাপয়েৎ। [দশকর্মপদ্ধতি পুঁথি, ফোলিও ১৬ খ]

(২০) স্ত্রীশূদ্রয়োরপি দ্বিজোপবীতধারণবৎ উত্তরীয়ধারণাচারাৎ। ......স্নাত্বা বাসসী পরিধায়েতি হারীতেনোপদেশাচ্চ। অতএব বিবাহপ্রকরণীয়গোভিলসূত্রস্থপ্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমিত্যত্র স্ত্রিয়া উপবীতাভাবে যজ্ঞোপবীতধারণবৎ কৃতোত্তরীয়ামিতি ভট্টভাষ্যব্যাখ্যানাদত্রাপ্যপসব্যতয়া যুক্তত্বাচ্চ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬৯]

(২১) এতেন স্ত্রিয়াস্তু দ্বিবস্ত্রত্বমাত্রং নত্বপসব্যকরণমপি তথৈব ছন্দোগাচারকৃতো প্রতিহস্তক-লিখনাদিতি শ্রাদ্ধচিন্তামণ্যুক্তং নিরস্তম্। (ঐ, পৃঃ ৩৬৯)

(২২) ন তু যজ্ঞোপবীতিনীমিত্যনেন স্ত্রীণামপি কর্মাঙ্গত্বেন যজ্ঞোপবীতধারণমিতি হরিশর্মোক্তং যুক্তং। স্ত্রীণাং যজ্ঞোপবীতধারণানুপপত্তেঃ সরলাভট্টভাষ্যয়োরপ্যেবম্। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩১৪]

বিবাহের পূ
ভট্টভাষ্য কর্তৃক
নাই বলিয়া তা
বরের নাপিতরূ
করিয়াছেন[২৩]।
আবার রঘু
অবস্থিত বিদ্যা ও
কোণস্থিত গৃহা
অবস্থিত ব্রাহ্মণে
বধূকে আনা হয়
ব্রাহ্মণসমীপে ব
অত্যন্ত সহজসাধ্য
নিকটে আসিতে
প্রকৃত হোমে
পত্নী পিতৃগোত্র দ্ব
করা হইয়াছে।

কন্যার গোত্রান্তরবিষ
রঘুনন্দনের মত

প্রতিপন্ন হইয়াছে
রিতা হওয়ার পর

(২৩) ইদা
কাম্যত্বাচ্চ ন লিখিত

(২৪) ইদান
বেদিস্থব্রাহ্মণসমীপক্তা

(২৫) ততো
(২৬) গোত্র

ইতি বচনাৎ

বিবাহের পূর্বে জ্ঞাতি কর্তৃক মন্ত্রপাঠপূর্বক কন্যার অভিষেকরূপ জ্ঞাতিকর্ম ভট্টভাষ্য কর্তৃক কাম্যকর্ম বলিয়া লিখিত থাকায় বর্তমানকালে সেই আচার প্রচলিত নাই বলিয়া তাহার প্রমাণও রঘুনন্দন লেখেন নাই। এখন কেবলমাত্র কন্যা ও বরের নাপিতকৃত্য করাইয়া স্নান করাইতে হয়—ইহা রঘুনন্দন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন[২৩]।

আবার রঘুনন্দন বলেন[২৪]—পাণিগ্রহণ ক্রিয়ার পর ঈশান কোণের দিকে অবস্থিত বিদ্যা ও তপঃ সংযুক্ত ব্রাহ্মণকুলে বধূকে লইয়া আসিবে। এই ঈশান কোণস্থিত গৃহাদিতে গমনের অভাবে স্থানান্তরে স্থিত ব্রাহ্মণগৃহে, তাহার অভাবে অবস্থিত ব্রাহ্মণের নিকটে বধূকে আনা হইবে। বর্তমানে গোভিলোক্ত ব্রাহ্মণগৃহে বধূকে আনা হয় না বলিয়া ভবদেব কর্তৃক ইহা লিখিত হয় নাই। কিন্তু বেদিস্থ ব্রাহ্মণসমীপে বধূকে আনয়ন শাস্ত্রীয় মত এবং ইহা সুলভও বটে। ইহার অনুষ্ঠান অত্যন্ত সহজসাধ্য বলিয়া রঘুনন্দন ইহা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে অগ্নির নিকটে আসিতে হইবে।

প্রকৃত হোমের পরে পতি পত্নীকে অরুন্ধতী দর্শন করাইবেন। ভবদেবের মতে পত্নী পিতৃগোত্র দ্বারাই পতিকে অভিবাদন করিবে[২৫]। সরলাগ্রন্থেও ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন বলেন সপ্তপদীগমনের পরেই নারী স্বকীয় পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্র লাভ করে। সুতরাং ভবদেবের মতে যে বিবাহের চতুর্থদিন ও রাত্রির পর কন্যা ভর্তার গোত্র প্রাপ্ত হয় এই ব্যবস্থা রঘুনন্দনের মতে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রেও রঘুনন্দনের মত যুক্তিসিদ্ধ। কারণ কন্যা গোত্রান্তরিতা হওয়ার পর পুনরায় পিতৃগোত্রে স্বামীকে অভিবাদন করা যুক্তিপূর্ণ নহে[২৬]।

কন্যার গোত্রান্তরবিষয়ে রঘুনন্দনের মত

(২৩) ইদানীন্তনানাং বিবাহাৎ পূর্বং সমন্ত্রককন্যাভিষেকরূপজ্ঞাতিকর্মণো ব্যবহারাভাবাৎ কাম্যত্বাচ্চ ন লিখিতম্। ততঃ কন্যাবরয়োর্নাপিতকৃত্যং কারয়িত্বা স্নানং কারয়েৎ।

[দশকর্মপদ্ধতি পুঁথি, ফোলিও ১১ক]

(২৪) ইদানীন্ত গোভিলোক্তব্রাহ্মণগৃহগমনাভাবাৎ ভবদেবেন তথা ন লিখিতং কিন্তু বেদিস্থব্রাহ্মণসমীপস্থাপি শাস্ত্রার্থত্বাৎ সুকরত্বাচ্চ তৎকর্তুং যুজ্যতে তত্রাগ্নিরুপসমাহিতো ভবতি।

[সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩১৬]

(২৫) ততো বধূঃ পিতৃগোত্রেণ 'ভর্তারমভিবাদয়েৎ [কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ৭৭]

(২৬) গোত্রেণ পতিগোত্রেণ 'স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥'
ইতি বচনাৎ। এতেন পিতৃগোত্রেণ ভর্তুরভিবাদনং সরলাভবদেবভট্টাভ্যামুক্তং হেয়ম্।

[সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩১৬]

আবার রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে দেখাইয়াছেন[২৭]—পাণিগ্রহণ হেতুও পিতৃগোত্রের নিবৃত্তি হয়—ইহা শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতিবচনে পাওয়া যায়। যথা, পাণিগ্রহণের মন্ত্রসকল পিতৃগোত্রের নিবর্ত্তক। তাহার পর মৃত্যু হইলে নারীদিগের পিণ্ড ও উদক ভর্তার গোত্রানুসারে করিতে হইবে। তবে সপিণ্ডীকরণের পর যে পিতৃগোত্রের নিবৃত্তি হয় বলিয়া বচন আছে তাহা শিষ্টলোকে ব্যবহার করেন না, এইজন্য ইহা শাখান্তরীয় অর্থাৎ সামবেদীয় কৌথুমীশাখা ভিন্ন অন্যশাখানুসারে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদিগের জন্য বুঝিতে হইবে। গোভিল তদীয় গৃহ্যসূত্রে বলিয়াছেন—অনুমন্ত্রিতা কন্যা স্বামীকে পতিগোত্রের উল্লেখপূর্বক অভিবাদন করিবে। পতিকে সপ্তপদীগমনের পর এই অভিবাদন করা পর্যন্তই সামবেদীয় ব্যক্তিদিগের বিবাহ সমাপ্ত হয়। যেহেতু তাহার পর হইতে তাহারা দুইজনে অক্ষার লবণ খাইয়া ব্রহ্মচারী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। গোভিলের এই বচনে 'তাহার পর হইতে'—এই অংশের ভট্টনারায়ণ বিবাহকর্মের পর ইহা বলাতে পত্যভিবাদনের পরই বিবাহ সম্পূর্ণ হয় জানা যায়। এই কারণে পতিকে অভিবাদনের পরই প্রায়শ্চিত্তহোম, বামদেব্যগান ও দক্ষিণা বিধেয় বলিয়া ভবদেবভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যজুর্বেদীয়গণের বিবাহ দ্রষ্টাদিগের অভিমন্ত্রণ এবং বৃষচর্মে বর ও কন্যার উপবেশন হইলে তবে শেষ হয়[২৮]।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় রঘুনন্দন সংস্কারগুলির মূলবিষয় পরিবর্তন না করিয়া কেবল আনুষঙ্গিকক্রমে কিছু রদ বদল করিয়াছেন মাত্র। ভবদেবের সংস্কারপদ্ধতি প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবেই রহিয়াছে এবং সমাজেও ভবদেব-পদ্ধতি অনুসারেই ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত হইয়া আছে। রঘুনন্দন অনুষ্ঠানের অঙ্গ-কর্মের কিছু মত খণ্ডন করিলেও তাহা কেহ গ্রহণ করেন নাই। রঘুনন্দনও

---

(২৭) পাণিগ্রহণাদপি পিতৃগোত্রাপহারমাহ শ্রাদ্ধবিবেকে বৃহস্পতিঃ—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্তৃগোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥

যত্তু সপিণ্ডনস্য গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং তৎ শাখ্যন্তরীয়শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ। অতএবানুমন্ত্রিতা গুরুং গোত্রেণাভিবাদয়েত ইতি গোভিলোক্তম্। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৭০]

(২৮) ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহ শয়ীয়াতামিতি তৎসূত্রে ততঃ প্রভৃতি বিবাহকর্মণঃ ঊর্দ্ধমিতি ভট্টনারায়ণব্যাখ্যানাৎ। অতএব তৎপত্যভিবাদনানন্তরং ভবদেবেনাপি প্রায়শ্চিত্তহোমবামদেব্যগানদক্ষিণা লিখিতাঃ। যজুর্বেদিনাস্তু প্রেক্ষকাভিমন্ত্রণান-ডুচ্চর্মোপবেশনান্তো বিবাহঃ। [ঐ, পৃঃ ৪৭১]

গ্রহণ হেতুও পিতৃগোত্রের
যায়। যথা, পাণিগ্রহণের
নারীদিগের পিণ্ড ও উদক
পর পর যে পিতৃগোত্রের
বহার করেন না, এইজন্য
শাখানুসারে অনুষ্ঠানকারী
। গৃহ্যসূত্রে বলিয়াছেন—
বাদন করিবে। পতিকে
দীয় ব্যক্তিদিগের বিবাহ
জনে অক্ষার লবণ খাইয়া
নে 'তাহার পর হইতে'—
ত্যভিবাদনের পরই বিবাহ
র পরই প্রায়শ্চিত্তহোম,
খিয়া গিয়াছেন। কিন্তু
র্ম বর ও কন্যার উপবেশন

সংস্কারগুলির মূলবিষয়
বদল করিয়াছেন মাত্র।
এবং সমাজেও ভবদেব-
রঘুনন্দন অনুষ্ঠানের অঙ্গ-
রেন নাই। রঘুনন্দনও

াতি:—

খান্তরীয়শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ।
াহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৭০]
র্মী সহ শয়ীয়াতামিতি তৎসূত্রে
তএব তৎপত্যভিবাদনানন্তরং
র্বদিনান্ত প্রেক্ষকাভিমন্ত্রণান-

ভবদেবের মূল সংস্কারের পরিবর্তন করেন নাই। সুতরাং সমাজে কোন সংস্কার-কর্ম অনুষ্ঠিত করিতে চাহিলে এখনও ভবদেবের গ্রন্থের অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে।

দশবিধসংস্কার

গর্ভাধান—গর্ভাধান অর্থাৎ গর্ভোৎপাদন। চলিত কথায় ইহাকে পুনর্বিবাহ বলে। ইহা একটি সংস্কার। কন্যার প্রথম ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গর্ভাধান সংস্কার করিতে হয়। অতএব গর্ভধারণযোগ্য অবস্থা সম্পাদক কালের নামই ঋতু। রজোযোগের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোলটি দিন ও রাত্রি-যুক্ত কালই গর্ভাধানের যোগ্য। এই দিন-গণনা সাবনমাস হিসাবে করিতে হইবে। গর্ভাধান সংস্কারের পূর্বে সামবেদীয়দিগের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় না। কারণ বিবাহাদি গর্ভাধানান্ত কর্মগুলির মধ্যে একটি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিলেই চলে। প্রতিকর্মের জন্য পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ইহা করিতে হয় না। তবে সামবেদীয়দিগের পক্ষে রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা দিয়াছেন[২৯]।

বর্তমানকালে গর্ভাধান সংস্কারের প্রচলন নাই বলিলেই চলে। তবে বিবাহের সময় এই সংস্কারের বিধিবদ্ধ মন্ত্রপাঠ এখনও করা হইয়া থাকে। রঘুনন্দন বলিয়াছেন[৩০]—গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারকর্ম একবারই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতেই গর্ভ সংস্কৃত হয়। সুতরাং কন্যার বহুবার গর্ভধারণে বারবার এই সংস্কারগুলি করিতে হয় না।

পুংসবন—পুত্রসন্তান লাভের ইচ্ছায় এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রঘুনন্দন বলেন—গর্ভ উৎপন্ন হইলে সাবনমাস অনুসারে তৃতীয় মাসের প্রথমদিন হইতে দশদিনের মধ্যে গর্ভস্পন্দনের পূর্বে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্কারকর্ম অধিকাংশ স্থলেই প্রচলিত নাই সত্য, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রজ্ঞদের গৃহে এখনও ইহা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভের পর চতুর্থমাস, ষষ্ঠমাস বা অষ্টমমাসই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের কাল। রঘুনন্দন বলেন—পুংসবনের পর সীমন্তোন্নয়ন হইতেছে কেশরচনাবিশেষ। অতএব বিশেষ প্রকার কেশবিন্যাসই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার। আবার বলা আছে—এই সংস্কারের পূর্বেই যদি প্রথম গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় গর্ভোৎপত্তিতে গর্ভস্পন্দন হইতে যে কোন দিনে ইহার অনুষ্ঠান করা

(২৯) শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(৩০) তেন গর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়নানি সকৃদেব কর্তব্যানি। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩১৮]

উচিত। আর যদি পূর্বে পুংসবন কর্ম না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দিনই প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া পুংসবন কর্ম সম্পন্ন করার পর সীমন্তোন্নয়ন করা হইয়া থাকে। বর্তমানকালে এই সংস্কার কিছু কিছু প্রচলিত আছে।

শোষ্যন্তীহোম—ইহা সংস্কার নহে। তবে প্রসববেদনা অনুভূত হইবার পর সুষ্ঠুভাবে প্রসব হইবার জন্য যে হোম করা হয় তাহাকে বলে শোষ্যন্তীহোম। এই কর্ম বর্তমানে আর দেখা যায় না।

জাতকর্ম—পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা স্নান করিয়া পুত্রের নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বেই জাতকর্ম অনুষ্ঠিত করিবে। তখন আবার পুত্রজন্মনিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও করিতে হয়। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমস্ত অঙ্গসহকারে সমাধা করিতে না পারিলে নাড়ীচ্ছেদনের পরই ইহা কর্তব্য। পুত্রের মেধা ও আয়ুবৃদ্ধির জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্তমানে অন্নপ্রাশনের সময়ে এই সংস্কারবিহিত মন্ত্রপাঠ করা হয়। এখনও বহু নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির গৃহে এই প্রথা প্রচলিত আছে। যাঁহারা পুত্রের জাতকর্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্যই করিয়া থাকেন, তাঁহারা বর্তমান প্রথানুসারে অন্নপ্রাশনের দিনে জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ ও অন্নপ্রাশনের জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া যথাক্রমে জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশন ও মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ করিবেন।

নামকরণ—জাতকের জন্মের দশদিন গত হইলে অর্থাৎ একাদশাহে অথবা শততমাহে কিংবা সংবৎসর অতীত হইলে নামকরণ কর্তব্য। ভবদেবের মতে[৩১] আচারবশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিক শততমাহে বা জন্মদিনে নামকরণ করিতে হয়। একাদশাহ অর্থাৎ সর্ববর্ণের অশৌচান্তদিনের পরদিনই নামকরণের মুখ্যকাল। যে কোনও সংস্কার মুখ্যকালে না করিয়া গৌণকালে করিলে প্রকৃত কর্মারম্ভের পূর্বে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন মুখ্যকালে মলমাসাদিতেও কর্তব্য। ইদানীন্তনকালে অন্নপ্রাশনের দিনেই নামকরণ হইয়া থাকে। বালিকার নামকরণে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধমাত্র করিয়া অমন্ত্রক নাম রাখিয়া মুখে অন্নপ্রদান করিতে হয়।

কন্যাদের সংস্কারসম্বন্ধে দেখা যায় যে, 'বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা'—এই উক্তিতে 'সদা' শব্দ থাকার দরুণ বিবাহ-সংস্কার নিত্য, অপর সংস্কারগুলি কাম্য কর্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। স্ত্রী ও শূদ্রের তুল্যধর্মনিবন্ধন স্ত্রীদিগেরও বিবাহমাত্র সংস্কারই নিত্য, বিবাহ ব্যতীত অন্য সংস্কার কাম্যকর্ম।

(৩১) তথাপ্যাচারাৎ দ্বাদশাহে একাধিকশততরাত্রে জন্মদিনে বা নামকরণং কর্তব্যম্।

[কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ৯২]

এইজন্য স্ত্রীদিগের অন্যসংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত করিলে ক্ষতি নাই, আবার অনুষ্ঠিত না করিলেও দোষ হয় না। কারণ—

'চিত্রং কর্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।

ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্বকৈঃ॥' (সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩০১)

এই বচনে পাওয়া যায় যে সংস্কার কর্মদ্বারা লোকের ব্রাহ্মণ্যের উন্মেষ হয়, কিন্তু কন্যার তাহা হয় না। এইজন্য কন্যাদের অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কার আবশ্যক কর্ম নহে। আবার উদ্বাহতত্ত্বে আছে (পৃঃ ৪৬৪) 'বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টস্য ভোজনম্'। এখানে 'বৈশ্যবৎ' বলার দরুণ শূদ্রদেরও যাবতীয় সংস্কারাদি ধর্মের প্রাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত বচনে 'সদা' থাকায় স্ত্রী ও শূদ্রদের কেবলমাত্র বিবাহ সংস্কার নিত্য, অপর সংস্কারগুলি কাম্যকর্ম বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।

নিষ্ক্রমণ—সূতিকাগৃহ হইতে পুত্রকে বাহির করার নাম নিষ্ক্রমণ। পুত্রজন্ম হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে বালককে স্নান করাইয়া পিতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করতঃ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সায়ং সন্ধ্যা অতীত হইলে চন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া বিধি অনুসারে চন্দ্রার্ঘ্যদান করিবেন। পরে দক্ষিণা দিয়া বামদেব্যগানান্তে পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন। তারপর সংবৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় নিষ্ক্রমণের দিনেও পিতা সায়ংকালের পর চন্দ্রাভিমুখে দাঁড়াইয়া চন্দ্রের উদ্দেশ্যে জলরূপ অঞ্জলি প্রদান করিবেন। ইহা সংস্কার কর্মরূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও বর্তমানে গৃহ হইতে শিশুকে অন্নপ্রাশনের পূর্বে সাধারণতঃ বাহির করা হয় না।

অন্নপ্রাশন—বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং বালিকার পঞ্চম বা সপ্তম মাসেই অন্নপ্রাশন সংস্কারের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। বালকের ষষ্ঠ মাস ও বালিকার পঞ্চম মাস অন্নপ্রাশনের মুখ্যকাল। মুখ্যকালে অন্নপ্রাশন না হইলে অগ্রে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তারপর মহাব্যাহৃতিহোম করতঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া পরে শাট্যায়নহোম হইতে বামদেব্যগান পর্যন্ত উদীচ্যকর্ম সমাপনপূর্বক মন্ত্র পাঠান্তে বালকের মুখে অন্নদান করিতে হয়। কাহারও কাহারও উপনয়নদিনেই নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে, সেরূপস্থলে এখনও উদীচ্যকর্ম না করিয়া সর্বশেষে অর্থাৎ সমার্তনের পর ইহা করিতে হইবে।

চূড়াকরণ—রঘুনন্দনের মতে কপুষ্ণিকা ও কপুচ্ছল সংজ্ঞক কেশসমূহকে চূড়া

বলে, তাহাদের সংস্কার। শিখাস্থানের নিম্নে মস্তকের দক্ষিণ ও উত্তর উভয়পার্শ্বস্থ কর্ণাভিমুখ উচ্চস্থানকে কপুষ্ণিকা বলে। 'ক' হইতেছে মস্তক, তাহাকে শীত ও আতপ হইতে রক্ষা করে বলিয়া কপুষ্ণিকা বলে, আর পশ্চাৎ দিকের কেশকে বলে কপুচ্ছল।

যাহার যেরূপ কুলাচার আছে তদনুসারে প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ কর্তব্য। কিন্তু মনুর মতে প্রথম বর্ষ এবং শঙ্খলিখিতের মতে পঞ্চম বর্ষে ইহা কর্তব্য। গোভিলগৃহ্যসূত্রানুসারে তৃতীয় বর্ষই চূড়াকরণের মুখ্যকাল[৩২]। প্রচলিত প্রথায় উপনয়নের দিনেই চূড়াকরণ হয় বলিয়া প্রথমতঃ মুখ্যকাল অতীত হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।

উপনয়ন—উপ—সমীপে, নয়ন—লইয়া যাওয়া। যে কর্ম সম্পাদন করতঃ বেদাধ্যয়নের জন্য বালককে গুরুর নিকট লইয়া যাওয়া হয়, সেই কর্মের নাম উপনয়ন। গর্ভাষ্টম অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হইতে গণনা করিয়া অষ্টম অথবা জন্ম হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন কর্তব্য। সেই সেই বর্ষে উপনয়ন অসম্ভব হইলে ব্রাহ্মণ বালকের ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত উপনয়নের অধিকার আছে। উহার পর অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চারাবধি ষোল বৎসরের পর ব্রাহ্মণ সাবিত্রীপতিত (ব্রাত্য) হয়, তাহার উপনয়ন হইতে পারে না। কিন্তু রঘুনন্দন জ্যোতিস্তত্ত্বে 'গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে' ইত্যাদি বচনমাত্র উদ্ধৃত করিয়া তৎপরেই লিখিয়াছেন 'তত্রাশক্তৌ প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা তদুত্তরে কার্যম্' অর্থাৎ গর্ভাষ্টম বা অষ্টমবর্ষে অশক্ত হইলে তৎপরবর্তী কালে মহাব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন কর্তব্য[৩৩]।

বর্তমানকালে উপনয়নের দিনই চূড়াকরণ হয় বলিয়া চূড়াকরণে একবার মুণ্ডন হওয়ায় পুনর্বার অনর্থক আর তাহা না করাইলেও চলে। মুণ্ডনের পর স্নানের

---

(৩২) কপুষ্ণিকা কপুচ্ছলাখ্যঃ কেশচূড়া তাসাং বিধিনা সংস্কারকরণম্ চূড়াকরণং কর্মণো নামধেয়ম্। অয়ং কালো মুখ্যো গৃহ্যোক্তত্বাৎ। অত্রাসামর্থ্যেঽন্যোঽপি কালঃ। যথা মনুঃ—

চূড়াকর্ম দ্বিজাতীনাং সর্বেষামেব ধর্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্তব্যং শ্রুতিদর্শনাৎ॥

শঙ্খলিখিতৌ—তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণং পঞ্চমে বেতি। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৯৩]

(৩৩) উপনয়নকালশ্চ—

গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্॥
ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে॥

সৈকে দ্বাদশে। তত্রাশক্তৌ প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা তদুত্তরে কার্যম্। [জ্যোতিস্তত্ত্ব, পৃঃ ২৩৩]

ক্ষিণ ও উত্তর উভয়পার্শ্বস্থ
: মস্তক, তাহাকে শীত ও
চাৎ দিকের কেশকে বলে

। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ
চ পঞ্চম বর্ষে ইহা কর্তব্য।
াল[৩২]। প্রচলিত প্রথায়
ল অতীত হওয়ার জন্য

যে কর্ম সম্পাদন করতঃ
ওয়া হয়, সেই কর্মের নাম
অষ্টম অথবা জন্ম হইতে
র্তব্য। সেই সেই বর্ষে
ন্তু উপনয়নের অধিকার
পর ব্রাহ্মণ সাবিত্রীপতিত
ন্তু রঘুনন্দন জ্যোতিস্তত্ত্বে
। তৎপরেই লিখিয়াছেন
ষ্টম বা অষ্টমবর্ষে অশক্ত
রিয়া উপনয়ন কর্তব্য[৩৩]।
ইয়া চূড়াকরণে একবার
ন। মুণ্ডনের পর স্নানের

ারকরণম্ চূড়াকরণং কর্মণো
কালঃ। যথা মনুঃ—

, পৃঃ ৩৩]

[জ্যোতিস্তত্ত্ব, পৃঃ ২৩৩]

[illegible] স্নানও করাইতে নাই। পৈঠীনসির বচন দ্বারা পাওয়া যায় যে কাম্য উপনয়নস্থলে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, তৎপরে কর্তব্য। কাম্য উপনয়নে নিত্য উপনয়নও সিদ্ধ হয়। আর চূড়াকরণে প্রাতর্ভোজনের বিধি না থাকায় প্রাতর্ভোজন কর্তব্য নহে। তারপর চতুর্থদিবসে (প্রচলিত প্রথায় উপনয়ন দিবসেই) সাবিত্রচরুহোম কর্তব্য। ভিক্ষালব্ধ ধান্য বা তণ্ডুলেই এই চরু পাক করিতে হয়।

মাঘ প্রভৃতি ছয়মাসে চূড়াকরণ ও উপনয়ন শুভফল প্রদান করে। তবে জন্মমাসে, যুগ্মমাসে, যুগ্মবৎসরে, বিশেষতঃ চৈত্র ও পৌষমাসে প্রথম ক্ষৌর অর্থাৎ চূড়াকরণ কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইহাদের যথাক্রমে ষোল বৎসর, বাইশ বৎসর এবং চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত উপনয়নের শেষকাল। এই বচনে যে 'আ ষোড়শাৎ' ইত্যাদিতে আঙ্ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে উহার অভিবিধিরূপ অর্থ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে ব্রাহ্মণাদির যথাক্রমে ১৬ বৎসর প্রভৃতি বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত উপনয়নের কাল। আর মর্যাদা অর্থ করিলে ১৬ বৎসর কিংবা ২২ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই অর্থাৎ ১৫ বা ২১ বৎসর বয়স শেষ হইলেই উপনয়নের কালের শেষ হয়। এখানে অভিবিধিরূপ অর্থ ভট্টভাষ্য, সরলা, মিতাক্ষরা, কল্পতরু ও স্মৃতিসার প্রভৃতি নিবন্ধে এবং ভবদেবভট্ট ও কুল্লুকভট্ট কর্তৃক যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বচনস্থিত 'আ' এর ঐরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে[৩৪]। শূলপাণিও স্বকৃত যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাতে উহার ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন[৩৫]। কিন্তু ঐ শূলপাণিই আবার তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে যমের বচন প্রমাণ দেখাইয়া যাজ্ঞবল্ক্যবচনস্থিত 'আ' এর মর্যাদারূপ অর্থ করিয়াছেন। যমের বচন যথা—বিশেষ করিয়া যে সকল ব্রাহ্মণের দশ এবং পাঁচ অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ব স্ব জাত্যুক্ত উপনয়নের শেষকাল পর্যন্ত যদি সাবিত্রীর (গায়ত্রীর) উপদেশই না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে[৩৬]। এখানে উল্লেখযোগ্য—

(৩৪) উপনয়নোত্তরাবধিকালমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—
আ ষোড়শাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ ॥
আঙ্ অভিবিধ্যর্থঃ। মর্যাদাভিবিধিসন্দেহে কার্যান্বিতত্বেনাভিবিধেরেব বলবত্বাৎ এবমেব ভট্টভাষ্যসরলাভবদেবভট্টমিতাক্ষরাকুল্লুকভট্টকল্পতরুস্মৃতিসারপ্রভৃতয়ঃ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬৪]

(৩৫) আষোড়শাদিত্যাদি—আঙিত্যভিবিধিঃ সংবধ্যতে সর্বত্র, পরোঽন্ত্যঃ। [দীপকলিকা, পৃঃ ৬]

(৩৬) আঙশ্চাত্র মর্যাদাবচনত্বং তেন ব্রাহ্মণস্য ষোড়শবর্ষস্য মর্যাদাভূতত্বাৎ পঞ্চদশবর্ষপর্যন্তং কালঃ। এবং রাজন্যবৈশ্যয়োরেকবিংশতিবর্ষং যাবৎ কালদ্বয়ম্ এতচ্চানন্তরং যমবচনে স্ফুটীভবিষ্যতি···
যমঃ—পতিতা যস্য সাবিত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্যবৈশ্যয়োঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তং ভবেদেষাং প্রোবাচ বদতাং বরঃ ॥ [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৩৭০-৩৭১]

যাজ্ঞবল্ক্যবচনস্থিত 'আ ষোড়শাৎ' এই পদের অন্তর্গত 'আ'-এর অভিবিধিরূপ অর্থই স্থির হইয়াছে। এই উপনয়ন কার্যের অনুষ্ঠানে যে বয়সের বৎসর গণনা করিতে হয়, তাহা সাবনমাস হিসাবেই করা হইয়া থাকে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে ১২, ১৬ এবং ২০ বৎসর বয়স অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যবায় হয়, ঐ প্রত্যবায় নাশ করিবার নিমিত্ত কেবল মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। কিন্তু ষোড়শ বৎসরাদি বয়স পর্যন্ত উপনয়ন না হইলে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন দিতে হয়। আর ১৬ বৎসরের পর গুরু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়[৩৭]।

রঘুনন্দন যে সমাজের প্রতি কতখানি দৃষ্টি দিয়া শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন—পিতৃমাতৃহীন, নিঃস্ব, দেশোপপ্লব ইত্যাদি অবস্থায় বালকের উপনয়ন না হইলে বালক পতিতসাবিত্রীক হয় মাত্র। তাহাদের পক্ষে রঘুনন্দন তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করতঃ উপনয়নের ব্যবস্থা নির্দেশ দিয়াছেন[৩৮]।

সমাবর্তন—বেদাধ্যয়ন সমাপন করিলে আচার্যের অনুমতিক্রমে বালককে যথাবিধি গুরুগৃহ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয় ইহাতে স্নান (অর্থাৎ অভিষেক) প্রধান কার্য বলিয়া ইহাকে স্নান বা আপ্লবন বলে। যে ঐরূপে ফিরিয়া আসে, তাহাকে সমাবৃত্ত, স্নাত বা স্নাতক বলে।

বর্তমানে উপনয়ন দিনেই সমাবর্তন পর্যন্ত শেষ করিয়া তৎপরে ঐদিন হইতে ত্রিরাত্র পালন করা হয়। কারণ এখন বেদাধ্যয়নের প্রথা না থাকায় উপনয়নে যে সাবিত্রী অধ্যয়ন করান হয়, তাহাতেই বেদাধ্যয়নের ফল হইয়া থাকে। এইজন্য সেইদিনেই সমাবর্তন করা হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় রঘুনন্দন সংস্কারগুলির মধ্যে কোথাও ভবদেবের মত খণ্ডন করেন নাই। বরং সংস্কারগুলি ভবদেবের মত অনুসারে অনুষ্ঠিত করিতে রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন। আবার শূলপাণির বিরুদ্ধ মতবাদে যাহাতে লোকে বিভ্রান্ত না হয় তজ্জন্য তিনি ঐ বিরোধের মীমাংসা করিয়া যথার্থ-পথের নির্দেশ দিয়াছেন।

---

(৩৭) তদ্দ্বাদশবর্ষাদ্যূর্ধ্বপরিব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষোপরি গুরুপ্রায়শ্চিত্তমিতি। [সংস্কারতত্ত্ব, পৃঃ ৩২৫]

(৩৮) পিতৃমাতৃরহিতস্য নিঃস্বস্য দেশোপপ্লবাদিনা পতিতসাবিত্রীকস্য বা বিষয়ে তু মনুবিষ্ণূ—
যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥ [ঐ, পৃঃ ৩২৫]

বিবাহের
উত্থাপন ক
পিতার অস
বিহিত। দা
দারকর্ম শব্দে
অন্যান্য ধর্মশা
দেখি যমের
দারকর্মে গ্রহ
হইয়া দারপ

বিবাহের লক্ষণ

কর্তার যে জ্ঞা
স্বীকরণরূপ জ্ঞা
বরে এবং ঐ
থাকে। এইরূ
কর্মরূপে নির্দেশ
কর্মত্বরূপ ভিন্নবি
সহিত কন্যা ও
হইয়াছে।

কিন্তু রঘুনন
ইতরেতরাশ্রয় দে
বিবাহজ্ঞান ভার্য
বলেন—বিবাহ ক
পরিচায়কমাত্র।

(১) তত্র মনুশাতা

দারকর্মণি ভ
সদৃশানাহরেদ্দারান
......তেন ভার্যাত্বসম্পা

২। বিবাহ

বিবাহের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে রঘুনন্দন প্রথমে মনু ও শাতাতপের বচন উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন[১]—মাতামহের অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা এবং পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা দ্বিজাতিগণের দারকর্ম ও মৈথুনক্রিয়ায় বিহিত। দারকর্ম শব্দের অর্থ ভার্যাত্বসম্পাদককর্ম, সেই কর্মই গ্রহণ। অতএব দারকর্ম শব্দের অর্থ হইল—কোন পুরুষ কর্তৃক কোন কন্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে দারকর্মের পরিবর্তে দারগ্রহণই বলা হইয়াছে। যেমন আমরা দেখি যমের বচনে আছে—কুল, জাতি ইত্যাদির দ্বারা সদৃশ বিবাহযোগ্য কন্যাকে দারকর্মে গ্রহণ করিবে। সংবর্তবচনেও আছে—ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পর সমাবৃত্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করিবে। গ্রহণই বিবাহের ধর্ম বলিয়া সকল স্মার্তমতেই নিরূপিত হইয়াছে। অতএব রঘুনন্দনের মতে সিদ্ধান্ত হইতেছে—ভার্যাত্বসম্পাদক গ্রহণই বিবাহ অর্থাৎ বিবাহকর্তার যে জ্ঞান দ্বারা কন্যার পত্নীত্ব নিষ্পন্ন হয়, সেই জ্ঞানই বিবাহ। এই গ্রহণ স্বীকরণরূপ জ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ কোন বস্তুর গ্রহণরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে বরে এবং ঐ জ্ঞান কন্যার প্রতি উদিত হয় বলিয়া তাহাতে বিষয়তাসম্বন্ধে বর্তমান থাকে। এইরূপ সম্বন্ধভেদ নিবন্ধনই বিবাহক্রিয়াতে বরকে কর্তারূপে এবং কন্যাকে কর্মরূপে নির্দেশ করা হয়। একই বিবাহক্রিয়ায় বর ও কন্যার যথাক্রমে কর্তৃত্ব ও কর্মত্বরূপ ভিন্নবিধ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে বলিয়া কন্যা ও পুত্রের বিবাহরূপে বিবাহের সহিত কন্যা ও পুত্রের পৃথগ্‌ভাবে যে অন্বয় করা হইয়া থাকে তাহা সঙ্গত হইয়াছে।

বিবাহের লক্ষণ

কিন্তু রঘুনন্দন যে ভার্যাত্বসম্পাদক গ্রহণই বিবাহ বলিয়াছেন তাহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে অর্থাৎ এই লক্ষণে ভার্যাত্বজ্ঞান বিবাহজ্ঞানের অধীন ও বিবাহজ্ঞান ভার্যাত্বজ্ঞানের অধীন হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য রঘুনন্দন বলেন—বিবাহ লক্ষণে ভার্যাত্বরূপ বিশেষণটি লক্ষণের মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, কেবল পরিচায়কমাত্র। বিবাহ শব্দের অর্থ একজাতীয় জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞানটি হওয়ার

---

(১) তত্র মনুশাতাতপৌ—অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥
দারকর্মণি ভার্যাত্বসম্পাদকে কর্মণি। তচ্চ কর্ম গ্রহণরূপম্।
সদৃশানাহরেদ্দারানিতি যমবচনাৎ। অতঃ পরং সমাবৃত্তঃ কুর্যাদ্দারপরিগ্রহমিতি সংবর্ত্তবচনাৎ।
······তেন ভার্যাত্বসম্পাদকগ্রহণং বিবাহঃ। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬২]

পরই বর সেই কন্যাকে ভার্যা বলিয়া ব্যবহার করে। অতএব সেই জ্ঞানটিই ভার্যাত্বসম্পাদক জ্ঞান।

প্রাচীন স্মৃতিকারগণের মতে 'দান'কে বিবাহ বলিয়া ধরা হইয়াছে। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতিতে 'ব্রাহ্ম' বিবাহের যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে দানই বিবাহ বলিয়া প্রতীত হয়। দান বিবাহের নিষ্পাদকমাত্র এবং ঐদানের প্রকারভেদেই বিবাহের অষ্টপ্রকার ভেদ হইয়াছে। যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণে আছে[২]—আহ্বান করিয়া আনিয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃতকন্যা প্রদান করা হইলে ব্রাহ্মবিবাহ হয়। এইরূপ লক্ষণে মিতাক্ষরাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'যাহাতে বরকে আহ্বান করিয়া আনিয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যাকে দেওয়া হয়, তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। এখানে রঘুনন্দন যাহাতে (যস্মিন্) অর্থাৎ 'যে গ্রহণে' এইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত করিয়া গ্রহণই বিবাহের ধর্ম বলিয়াছেন। আবার দেখা যায় মনুবচনে আছে[৩]—শাস্ত্রজ্ঞ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া আনিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া অর্চনাপূর্বক কন্যার দানই ধর্মশাস্ত্রসম্মত 'ব্রাহ্মবিবাহ'। এই বচনে দান বিবাহরূপে প্রতীত হইলেও ঐ দানশব্দের অর্থ গ্রহণ।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, রঘুনন্দন স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা প্রাচীনমতেরও স্বকীয় অনুকূলে ব্যাখ্যাপূর্বক নিজের সিদ্ধান্ত দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। আরও তিনি বলেন—দান করা হয় যাহার জন্য এইরূপ বাক্য করিয়া সম্প্রদানবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় দ্বারা 'দান' পদটি সিদ্ধ করিলে দানপদটির গ্রহণরূপই অর্থ ধরা হয় এবং অনট্ প্রত্যয় সম্প্রদানবাচ্যে নিষ্পন্ন করিয়া গ্রহণরূপ অর্থ হয়। কিন্তু এখানে ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দানকেই বিবাহ বলিলে বিবাহকর্তা এবং দানকর্তা একই ব্যক্তি হইয়া পড়েন অর্থাৎ কন্যাদাতা বিবাহ-ক্রিয়ারও কর্তা হন—ইহাতে মহাবিপ্লব উপস্থিত হয় এবং বিবাহের অর্থই ব্যর্থ হইয়া যায়।

সুতরাং রঘুনন্দনের মতে সম্প্রদানবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। কিন্তু এখানে আহ্বান করার কর্তা কন্যাদাতা আর দানপদের অর্থ গ্রহণ ধরিলে উহার কর্তা হয় বর। ইহাতে ভিন্ন কর্তা হওয়াতে 'আহূয়' পদে ল্যপ্ প্রত্যয় সিদ্ধ হয় না বলিয়া

---

(২) ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনে স ব্রাহ্মাভিধানো বিবাহো যস্মিন্ উক্তলক্ষণবরায় আহূয় যথাশক্ত্যলংকৃতকন্যা দীয়তে ইতি মিতাক্ষরা। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬২]

(৩) আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ [ঐ, পৃঃ ৪৬২]

হইয়াছে এবং উহার
তাহার অর্থ যে দা
'আহূয়' এবং 'দা' প্র
পদটি সিদ্ধ হইয়াছে
করিলে আর কোন দে
রঘুনন্দনের মতে
বর ও কন্যার সংস্কা
শেষপদ গমনেই নিষ্ঠা
রত্নাকরগ্রন্থেও[৪] পাণি
নির্দেশ করা হইয়াছে
পাণিগ্রাহণিক মন্ত্রপাঠ
সপ্তমপদগমনেতেই সম্প
রঘুনন্দন দেখাইতে
অঙ্গকর্ম কিছু বাদ থাকে
পাণিগ্রহণের মন্ত্রপাঠের
স্পষ্টরূপে অবগত হও
পাণিগ্রাহণিক মন্ত্রপাঠের
পাঠের পূর্বে অপহৃতা
পাণিগ্রহণ জন্য মন্ত্রদ্বা
বিবাহস্থলেই বুঝিতে

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

অগ্ন্যাধানাদি এবং সা

---

(৪) তথাচ রত্নাকরঃ—
লঘুহারীতঃ—তত্রাপি পাণিগ্র

(৫) সুব্যক্তং ত্রিশঙ্কু পাখ্য
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বি
যেন ভার্যা হৃতা পূর্বং

... অনট্ প্রত্যয়ের গ্রহণরূপ অর্থমাত্র করা হইয়াছে এবং উহার কর্তাই বর, কিন্তু ঐ অর্থের নিমিত্তীভূত 'দা' ধাতু বা প্রকৃতি, তাহার অর্থ যে দান বা ত্যাগ করা রূপ ক্রিয়া, উহার কর্তা কন্যাদাতা। সুতরাং 'আহূয়' এবং 'দা' প্রকৃতির অর্থ দান করা, এই উভয়ের কর্তা এক হওয়ায় আহূয় পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা 'আহূয়' এই ক্রিয়ার পর স্থিতাদিপদের অধ্যাহার করিলে আর কোন দোষ থাকে না।

রঘুনন্দনের মতে বিবাহকার্যে পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদি বিবাহে প্রবৃত্ত বর ও কন্যার সংস্কারবিশেষ সাধিত হয়। এইজন্য সপ্তম অর্থাৎ সপ্তপদগমনের শেষপদ গমনেই নিষ্ঠা অর্থাৎ বিবাহের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় বলা হইয়াছে। রত্নাকরগ্রন্থেও[৪] পাণিগ্রাহণিক মন্ত্রসকলকে বিবাহকর্মের একটি অঙ্গমাত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার ঐ রত্নাকরগ্রন্থেই লঘুহারীতের বচন আছে—পাণিগ্রাহণিক মন্ত্রপাঠ আরম্ভের সহিতই কন্যাতে 'পত্নীত্ব' ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং সপ্তমপদগমনেতেই সম্পূর্ণ দম্পতিভাব সিদ্ধ হয়।

রঘুনন্দন দেখাইতেছেন—পাণিগ্রহণের পূর্বেই ভার্যাত্ব সিদ্ধ হয়, তবে বিবাহের অঙ্গকর্ম কিছু বাদ থাকে। এই পাণিগ্রহণ ও বিবাহ এককর্ম নহে। বিবাহ যে পাণিগ্রহণের মন্ত্রপাঠের পূর্বেই সিদ্ধ হয়, ইহা হরিবংশবর্ণিত ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানপাঠে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়[৫]। যথা, সেই দুর্মতি অপরের পূর্ববিবাহিতা ভার্যা পাণিগ্রাহণিক মন্ত্রপাঠের পূর্বে অপহরণ করিয়াছিল। এখানে পাণিগ্রাহণিক মন্ত্রপাঠের পূর্বে অপহৃতাকেও বিবাহিতা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পাণিগ্রহণ জন্য মন্ত্রদ্বারা সংস্কারবিশেষের সাধন কেবল সবর্ণকন্যার সহিত বিবাহস্থলেই বুঝিতে হইবে। বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে-

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

মৈথুনকর্মের অর্থ স্ত্রী বা দম্পতি, এই উভয়ের একযোগে সাধ্যকর্ম। ইহা দুইপ্রকার—সাগ্নিকদিগের অগ্ন্যাধানাদি এবং সাধারণের পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি। অগ্ন্যাধান প্রভৃতি কর্ম ও

(৪) তথাচ রত্নাকরঃ—পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা বিবাহকর্মাঙ্গভূতা ইতি ব্যক্তমাহ রত্নাকরধৃতো লঘুহারীতঃ—তত্রাপি পাণিগ্রহণেন জায়াত্বং কৃৎস্নং হি জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে ইতি।

[উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬২]

(৫) সুব্যক্তং ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে—
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে স দুর্মতিঃ।
যেন ভার্যা হৃতা পূর্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ॥ [ঐ, পৃঃ ৪৬২]

মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ—এই উভয়ের একযোগে সাধ্য বলিয়াই স্মৃতির বচন পাওয়া যায়[৬]—ঘরকেই যে গৃহ বলে তাহা নহে, গৃহিণীকেও 'গৃহ' বলা হয়, যেহেতু গৃহিণীর সহিত মিলিত হইয়াই পুরুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারপ্রকার পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উত্থাপন করিয়াও রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন—যেহেতু স্ত্রী হইতেই পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র দ্বারা স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পুণ্যলোক সকলের প্রাপ্তি ঘটে, এই হেতু স্ত্রীদের প্রতি সম্মান করিবে এবং উত্তমরূপে রক্ষা করতঃ তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে।

রঘুনন্দন এখানে ভার্যাত্বের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ প্রভৃতিতে মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি ছাড়া সর্বোপরি হইতেছে ভার্যাত্বসম্পাদন। এইজন্যই তিনি বিবাহের লক্ষণ করিয়াছেন ভার্যাত্বসম্পাদন ব্যাপারই বিবাহ।

রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ ভবদেবভট্ট, শূলপাণি, শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি প্রভৃতি সকলেই 'অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ' এই মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, সপিণ্ড, সগোত্র ইত্যাদির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ বিবাহের আসল কর্মই যে ভার্যাত্বসম্পাদন তাহা উল্লেখ করেন নাই। ভবদেব মনুবচনস্থিত দারকর্ম বলিতে দারসম্পাদনকর্ম এবং তাহাই বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের প্রয়োজন মিথুনসাধ্য যজ্ঞাদি—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে[৭]।

শূলপাণিও ঐ বচনের ব্যাখ্যায় দারকর্ম অর্থে দারসম্পাদনকর্ম বিবাহ, আর মিথুন অর্থাৎ মিথুনসাধ্য অগ্ন্যাধান প্রভৃতি ও পুত্রোৎপত্তিতে স্ত্রী প্রশস্তা—এইরূপ বলিয়াছেন[৮]। কিন্তু শ্রীনাথ বিবাহের লক্ষণ আলোচনা করেন নাই, কেবল বিবাহের পরই যে ভার্যাত্ব হয় তাহা বলিয়াছেন[৯]।

---

(৬) ভট্টভাষ্যে স্মৃতিঃ—ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃ্হিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ— লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥ [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬২]

(৭) দারকর্মণি দারসম্পাদকে কর্মণি বিবাহে, মৈথুনে মিথুনসাধ্যে যজ্ঞাদৌ প্রশস্তা।
[ভবদেবীয় সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ২৫২, New Indian Antiquary, Vol VI. 1943-44]

(৮) দারকর্মণি দারত্বসম্পাদকে কর্মণি বিবাহে, তথা মৈথুনে মিথুনসাধ্যে অগ্ন্যাধানাদৌ পুত্রোৎপত্তৌ চ প্রশস্তা ইতি সম্বন্ধঃ। [শূলপাণির সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ১]

(৯) বিবাহানন্তরমেব ভার্যাত্ব-নিষ্পত্তেঃ। [বিবাহতত্ত্বার্ণব, পৃঃ ৩৩১,
Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951]

মৈথিল বি
মৈথুন ইত্যাদি
তিনি একটু
বিবাহ করা হ
সাধ্যকর্ম—এই
বলেন[১১]—দা
দুইয়ের জন্যই
এই সমস্ত
প্রসঙ্গক্রমে দা
বিবাহের আস
বর কর্তৃক কন্যা
সেই কন্যাকে ভ
বিবাহের লক্ষণ
একমাত্র নিবন্ধ
রাখেন নাই,
রঘুনন্দনের বাস্তব
গৃহিণী। গৃহিণী
অর্থে অগ্ন্যাধান
দিতেছেন।
নির্দেশ দিয়াছে
সংজ্ঞায় ভার্যাত্ব
দোষ স্খালনের
নিরূপণ করিয়া
রঘুনন্দনের শ্রেষ্ঠ

(১০) দারকর্ম
শব্দবাচ্যস্ত্রীপুংসসা
কল্পতরুঃ। [গৃহস্থ
(১১) দারকর্ম
প্রশস্তেতি সম্বন্ধঃ।

মৈথিল নিবন্ধকার চণ্ডেশ্বরঠাকুর[১০] দারকর্মই দারত্বজনককর্ম, উহাই বিবাহ, মৈথুন ইত্যাদি মিথুনসাধ্য ধর্মপুত্রোৎপাদন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তিনি একটু বিশেষ দেখাইয়াছেন—স্ত্রীদের যে কেবল পাকাদিকর্মের জন্যই বিবাহ করা হয় তাহা নহে। ধর্মপুত্র উৎপাদনের জন্য ও স্ত্রীকর্তৃক আশ্রমাদি সাধ্যকর্ম—এই দুইয়ের জন্যই স্ত্রীগ্রহণ করা হয়। মিথিলার বাচস্পতিমিশ্রও বলেন[১১]—দারকর্ম হইতেছে বিবাহ, আর মিথুনসাধ্য আধান ও পুত্রোৎপত্তি, এই দুইয়ের জন্যই বিবাহ করা হয়।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে এই নিবন্ধকারগণ মনুবচনের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে দারকর্মের উল্লেখ করিলেও তাহাতে বিশেষত্ব আরোপ করেন নাই। বিবাহের আসল ব্যাপার যে ভার্যাত্বসম্পাদন তাহা কেহ বলেন নাই অর্থাৎ বর কর্তৃক কন্যা স্বীকৃত হইলেও ভার্যা বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে না। কিন্তু রঘুনন্দন সেই কন্যাকে ভার্যারূপে স্বীকারকে প্রধান ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতেই বিবাহের লক্ষণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি রঘুনন্দনই একমাত্র নিবন্ধকার যিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রব্যাখ্যাতেই স্বকীয় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বাস্তববিষয়ের উপরই অত্যধিক দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সেইজন্য রঘুনন্দন স্মৃতির বচন উত্থাপনপূর্বক গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে গৃহের মূল হইতেছে গৃহিণী। গৃহিণী না থাকিলে গৃহ গৃহরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। তিনি মিথুন অর্থে অগ্ন্যাধান ও পুত্রোৎপাদন অনুমোদন করিলেও গৃহিণীকেই সর্বাপেক্ষা পূর্ণ মর্যাদা দিতেছেন। আবার যাজ্ঞবল্ক্যের বচন দ্বারা স্ত্রীদিগের প্রতি সম্মান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ভার্যাত্বসম্পাদনের উপর জোর দিবার জন্যই রঘুনন্দন বিবাহের সংজ্ঞায় ভার্যাত্বসম্পাদন পদের অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এই লক্ষণে ইতরেতরাশ্রয় দোষ স্খালনের জন্য ভার্যাত্বপদটি বিবাহের লক্ষণ না বলিয়া বিবাহের পরিচায়করূপে নিরূপণ করিয়া বহু আয়াসে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখিয়াছেন। এইখানেই রঘুনন্দনের শ্রেষ্ঠত্ব।

রঘুনন্দনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী

---

(১০) দারকর্মণি দারত্বজনকে বিবাহে মৈথুনে মিথুনসাধ্যধর্মপুত্রোৎপত্ত্যাদৌ। মৈথুনে মিথুন-শব্দবাচ্যস্ত্রীপুংসসাধ্যে স্বাশ্রমাদিকর্মণি ন কেবলং স্ত্রীসাধ্যপাকাদিকর্মণি অপি তূভয়সাধ্যেঽপীতি কল্পতরুঃ। [গৃহস্থরত্নাকর, পৃঃ ৮]

(১১) দারকর্মণি দারত্বসম্পাদকে কর্মণি বিবাহে, মৈথুনে মিথুনসাধ্যে আধানে পুত্রোৎপত্তৌ চ প্রশস্তেতি সম্বন্ধঃ। [সম্বন্ধচিন্তামণি, পৃঃ ৩৮৮, Indian Historical Quarterly, Vol 32, 1956]

আবার 'অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ'—এই মনুর বচনে পিতার অসগোত্রা কন্যা বিবাহ্যা বলা হইয়াছে। তাহাতে কেহ আশঙ্কা করেন—বর যেখানে একপিতৃক অর্থাৎ দত্তকপুত্র নহে, সেস্থলে বরের তো পিতার সহিত বরাবর একগোত্রই থাকে, কাজেই সেস্থলে কেবল 'অসগোত্রা বিবাহ্যা' এই কথা বলিলেই চলে, 'পিতুঃ' এই পদটির কোন সার্থকতা থাকে না, বর ও তাহার পিতা যখন এক গোত্র, তখন বরের অসগোত্রা কন্যা বরের পিতার অসগোত্রা হইবেই। অতএব পিতার অসগোত্রা বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে রঘুনন্দন বলেন—সাধারণতঃ পিতা এবং পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী কন্যা বর্জনের বিধি থাকাতে একপিতৃকের অর্থাৎ ঔরসপুত্রেরও পিতা হইতে সপ্তমী কন্যা বর্জনীয়া,—ইহা সূচনা করিবার নিমিত্ত মনুবচনে 'পিতুঃ' এই পদটির প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। বরের পিতা হইতেই সপ্তমী কন্যা বর্জনীয়া, বর হইতে নহে, ইহাই শাস্ত্রার্থ[১২]।

রঘুনন্দনের কালোপযোগী শাস্ত্রব্যাখ্যা

কিন্তু শূলপাণি মনুবচনস্থিত 'পিতুঃ' পদের অন্যপ্রকারে সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে[১৩]—ক্ষেত্রজ প্রভৃতি দ্বিপিতৃক পুত্রগণ যাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়, কেবল তাহারই গোত্র প্রাপ্ত হয়। যাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে তাহার গোত্র প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রদেরও বীজী পিতার সগোত্রা কন্যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, ইহা জানাইবার জন্যই মনুবচনে 'পিতুঃ' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

বর্তমানকালে ক্ষেত্রজ ইত্যাদি পুত্রের প্রচলন না থাকার দরুণ শূলপাণি-নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়া বাস্তববাদী রঘুনন্দন সমাজের বর্তমান প্রথা অনুসারে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইস্থানে রঘুনন্দনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

গোত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রঘুনন্দন বলেন[১৪]—জমদগ্নি, ভরদ্বাজ,

---

(১২) অতএব একপিতৃকস্যাপি পিত্রপেক্ষয়া সপ্তমবর্জনায় মনুবচনে পিতুরিতি সার্থকং ন বরাপেক্ষয়েতি। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬৩]

(১৩) বীজিক্ষেত্রিকয়োর্দ্বয়োরপি পিত্রোঃ সগোত্রায়াঃ সপিণ্ডসন্ততেশ্চ সপ্তমীপর্যন্তায়া বিবাহ-প্রতিষেধার্থং তৎ। অন্যথা পরক্ষেত্রেঽনিয়োগাদুৎপাদিতস্য ক্ষেত্রিসগোত্রত্বাদ্ বীজিসগোত্রায়াস্তদ-সগোত্রত্বাদ্ বিবাহত্বং প্রসজ্যেত। ততো বীজিসগোত্রানিষেধোঽপি সিদ্ধ এবেত্যর্থবৎ পিতুরিতি গ্রহণং, তস্যাপি বীজদানেন পিতৃত্বাৎ। [সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ৭]

(১৪) অত্র চ—জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে ইতি স্মৃতেঃ। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬৪]

বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং অগস্ত্য—এই সকল মুনি গোত্রের প্রবর্তক। ইহাদের অপত্যগণই 'গোত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোত্রনিরূপণ

এখানে এই সমস্ত ঋষির নামই পরে গোত্রসম্বন্ধ বুঝাইয়াছে। গোত্রশব্দের পারিভাষিক অর্থ বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণজাতীয় আদিপুরুষ। যেমন কাশ্যপ মুনি যাহাদের আদিপুরুষ বা গোত্র, তাহাদিগকে আমরা কাশ্যপগোত্র বলিয়া অভিহিত করি।

কেবল সমান গোত্রা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, সমানপ্রবরা কন্যারও বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রবর শব্দের অর্থ মাধবাচার্যের মতে[১৫] যে সকল মুনিগণ গোত্রপ্রবর্তক, তাহাদের পরস্পর ভেদ উৎপাদন করেন যাঁহারা তাঁহাদের নাম প্রবর। যেমন কাশ্যপ নামে দুইজন বিভিন্ন ঋষি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্তক হওয়ায় দুইটি গোত্রই কাশ্যপ নামে প্রসিদ্ধ।

প্রবর নিরূপণ

কিন্তু একটির তিন প্রবর এবং অপরটির পাঁচ প্রবর। এস্থলে এই উভয় গোত্রের পরস্পর ভেদ প্রবর দ্বারাই নিরূপিত হয়।

এখানে আলোচ্য যে গোত্র ও প্রবরের যেরূপ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই গোত্র ও প্রবর হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অপর জাতির গোত্র ও প্রবর হয় না। কারণ বংশপরম্পরায় আদিপুরুষ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ না হইলে গোত্র ও প্রবর কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা নিরসনের জন্য রঘুনন্দন বলেন—যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের নিজ নিজ গোত্রের অভাব হওয়ায় প্রবরেরও অভাব হইয়াছে, তথাপি স্বকীয় পৈতৃক পুরোহিতদিগের গোত্র ও প্রবর অনুসারে তাহাদিগের গোত্র ও প্রবর ঠিক করিতে হইবে।

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণেরই গোত্র ও প্রবর আছে, তবে ব্রাহ্মণদিগের উহা নিজস্ব অর্থাৎ উপদিষ্ট। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের উহা পুরোহিত হইতে প্রাপ্ত অর্থাৎ অতিদিষ্ট। শূদ্রদিগের গোত্রসম্বন্ধেও রঘুনন্দন বলেন—শূদ্রেরা বৈশ্যদিগের ন্যায় পুরুষক্রমাগত পুরোহিতগণের গোত্রোল্লেখ করিবে। কারণ ধর্মাচরণপরায়ণ শূদ্রগণের মাসান্তে ক্ষৌরকার্য, বৈশ্যদিগের ন্যায় শৌচানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট ভোজন কর্তব্য—এই মনুবচনে শৌচকল্পের পর যে 'চ' কার আছে, উহা দ্বারা গোত্রোল্লেখযোগ্যকার্যেও শূদ্রদিগের প্রতি বৈশ্যধর্মের

(১৫) প্রবরস্তু গোত্রপ্রবর্তকস্য মুনে র্ব্যাবর্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্যঃ। [উদ্বাহতত্ত্ব পৃঃ ৪৬৪]

অতিদেশ করা হইয়াছে[১৬]। তবে শূদ্রদিগের সগোত্রা ও সমানপ্রবরা ভার্যা গ্রহণ করিতে কোন নিষেধ নাই। কারণ শূদ্রদিগের গোত্র উপদিষ্টও হয় নাই, অতিদিষ্টও হয় নাই, কিন্তু অতিদিষ্টাতিদিষ্ট অর্থাৎ গৌণের গৌণস্বরূপ ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে সগোত্রা কন্যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু সপিণ্ডতা ও সমানোদতা বিষয়ে চারবর্ণের একই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে অর্থাৎ যথাক্রমে মাতা ও পিতা হইতে পঞ্চম ও সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সকল বর্ণের পক্ষেই সপিণ্ডতা বর্তমান থাকিবে। সামান্যতঃ সপ্তম পুরুষের পর যে পর্যন্ত জন্ম ও নামের জ্ঞান থাকে, সেই পর্যন্ত সমানোদকতা স্থায়ী হয়। এই বিষয়ে প্রমাণ বচন—"সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে।

সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে ॥"

উল্লেখযোগ্য যে—"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ ॥"

এই বচন দ্বারা প্রমাণিত হয়, পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্যা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভার্যা গ্রহণ বিধেয়। কারণ এই সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ডতা থাকে।

রঘুনন্দন সগোত্রা কন্যাবিবাহে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিবাহ ভ্রমবশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে চান্দ্রায়ণব্রত কর্তব্য এবং সেই স্ত্রীকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া তাঁহার ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য। শূলপাণি বলেন[১৭] সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণকারীর পক্ষে চান্দ্রায়ণবিধায়ক বচনে সগোত্রা এবং সমান প্রবরার উপলক্ষণ করা হইয়াছে। উহা দ্বারা অবিবাহ্যস্ত্রীমাত্রেরই পাণিগ্রহণে যে চান্দ্রায়ণ কর্তব্য ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণেও চান্দ্রায়ণ কর্তব্য বলিয়া রঘুনন্দন অনুমোদন করেন। সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যই রঘুনন্দন এত কঠোর নীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। কারণ মানুষের জীবনে বিবাহই প্রধান সংস্কার। অতএব সেই বিবাহের ফলে সমাজে যাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় তাহার জন্যই তিনি গোত্র, প্রবর, সাপিণ্ড্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সগোত্রা কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ

---

(১৬) বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টস্য ভোজনমিতি মনুবচনে চকারসমুচ্চিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্মাতিদেশাৎ পূর্বপুরুষপুরোহিতগোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে। [উদ্বাহতত্ত্ব পৃঃ ৪৬৪]

(১৭) সগোত্রাসমানপ্রবরাগ্রহণমবিবাহ্যস্ত্রীমাত্রোপলক্ষণম্। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৩৭৫]

রঘুনন্দনের সময়ে পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন ছিল—তাহা তাঁহার রচনা হইতেই পাওয়া যায়। তবে ইহা রঘুনন্দনের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল না বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি আশ্রমের প্রশংসা করিয়া বলেন দ্বিজগণ ক্ষণকালেও আশ্রমহীন হইয়া থাকিবে না, আশ্রমহীন হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সুতরাং স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুনরায় দারগ্রহণ অপরিহার্য হইলেও রঘুনন্দন বলেন—আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পরে যদি কেহ স্ত্রীর দ্বারা বিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলা হয়। এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পর লোকের আশ্রমরক্ষার জন্য পুনর্বিবাহ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ রঘুনন্দন এই বয়সের পর রণ্ডাশ্রম নামে নূতন একপ্রকার আশ্রমের কথা বলিয়া ইহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন[১৮]।

বহুবিবাহ রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে

আবার তিন-সংখ্যাটি যে অশুভসূচক এই কুসংস্কারও তখন দেশে বেশ প্রচলিত ছিল। কারণ রঘুনন্দন বলেন[১৯]—যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বিবাহ করিয়া চতুর্থবার তাহা না করে, সে আপনার সপ্তকুল পর্যন্ত নরকগামী করে এবং তাহার পক্ষে ভ্রূণহত্যাব্রত কর্তব্য—চণ্ডেশ্বরের এই বচন দ্বারা ত্রিবিবাহশব্দে লক্ষণা দ্বারা ভার্যাত্রয় বুঝিতে হইবে।

সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রঘুনন্দন আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইলে পরিবেদন দোষ হয়, অতএব তাহা নিষিদ্ধ। তথাপি উদারমতবাদী রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিয়াছেন যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি উন্মত্ত, পতিত, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ইত্যাদি হয় তবে পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহে দোষ হয় না। আবার সেইরূপ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হইতে পারিবে না। তবে জ্যেষ্ঠা কন্যা বিকৃতরূপা বা তাহার অন্য কোন দোষ থাকিলে কনিষ্ঠার বিবাহ দোষাবহ হইবে না। তবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকৃতিস্থ বা

সমাজের শৃঙ্খলারক্ষায় শাস্ত্রীয়ব্যবস্থা

---

(১৮) অত্র বিশেষয়তি ভবিষ্যপুরাণং—
চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ॥ [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৭৬]

(১৯) গৃহস্থরত্নাকরে—ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতং চরেৎ॥
এতদ্‌বচনং বর্তমানস্ত্রীত্রিকপরমিতি বদন্তি। [ঐ, পৃঃ ৪৬৫]

রোগহীন হইলে তাঁহার অনুমতি পাইলেও যে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া শূলপাণির অভিমত রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন, তাহা রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে বলিয়াই মনে হয়। কারণ তিনি দেখাইয়াছেন যে অগ্রজের অনুমতিতে কনিষ্ঠ যথাবিধি অগ্নিহোত্র করিতে পারিবে। অতএব বিবাহব্যাপারেও ইহা অনুমোদন-সাপেক্ষ[২০]।

অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ অনুমোদন

রঘুনন্দন অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা রোহিণী, ১০ বৎসরে কন্যকা এবং ইহার পর রজঃস্বলা হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্নসহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য[২১]।

কন্যার স্বয়ং পতি-নির্বাচনে অনুমোদন

আবার রঘুনন্দন যমের বচন উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন[২২]—যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা 'ব্রহ্মহত্যা' পাপের ভাগী হয়, এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ং বর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত। ইহা দ্বারা রঘুনন্দন কন্যার স্বয়ং পতি-নির্বাচনও অনুমোদন করেন। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন[২৩]—কন্যাদানে অধিকারীর অভাবে কন্যা নিজেই গম্য বরকে পতিরূপে বরণ করিবে। গম্যশব্দের অর্থ সবর্ণত্বাদি ধর্মদ্বারা আত্মপ্রদানের যোগ্য। এইরূপ বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে কন্যা পতিরূপে বরণ করিবে।

আরও দেখান হইয়াছে যে—দ্বাদশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে কন্যাকে যদি প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যার পিতা উহার রজোজন্য শোণিত পান

(২০) বশিষ্ঠঃ—অগ্রজোঽস্য যদানগ্নিরধিকার্যোঽনুজঃ কথম্।
অগ্রজানুমতঃ কুর্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি ॥
এতেন বিবাহস্ত্বনুমত্যাপি দোষায়েতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬৮]

(২১) অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা ॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ ॥ [ঐ, পৃঃ ৪৬৮]

(২২) যমঃ—কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্। [ঐ, পৃঃ ৪৬৮]

(২৩) গম্যত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্যাৎ স্বয়ং বরম্।.........
গম্যং সবর্ণত্বাদিনা স্বপ্রাপণার্হং বরং স্বপ্রদানেন পতিং কুর্যাদিত্যর্থঃ। [ঐ, পৃঃ ৪৬৯]

করে। কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় রজঃস্বলা দেখিয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—এই তিন জন নরকগামী হয়। মহাভারতেও আছে[২৪]—ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক ষোড়শবর্ষীয়া নগ্নিকাকে বিবাহ করিবে। একবারও রজঃপ্রবৃত্তি না হইতেই কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য। এখানে রঘুনন্দন নগ্নিকা অর্থে—যাহার ঋতুদর্শন হয় নাই—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের উদারতা

রঘুনন্দন এই প্রকারে অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ অনুমোদন করিলেও নির্গুণপাত্রের হস্তে কন্যাদান স্বীকার করেন নাই। এইজন্য তিনি মনুবচন উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন[২৫]—কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে থাকে সেও ভাল, তথাপি তাহাকে নির্গুণপাত্রের হস্তে প্রদান করিবে না। এই আলোচনার দ্বারা রঘুনন্দনের মনের উদার ভাব প্রকাশ পায়।

মঙ্গলজনক আচার

ইহা ছাড়াও রঘুনন্দন বিবাহ ব্যাপারে কতকগুলি মঙ্গলজনক আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন আমরা দেখি—উৎসবব্যাপারে বাদ্য প্রভৃতি মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। বাদ্য প্রভৃতির ফল দেখা যায়—বিদ্বান্ ব্যক্তি বিবাহকালে শ্রীবৃদ্ধির জন্য অমঙ্গলনাশক মঙ্গলবাদ্য, বেদমন্ত্র-পাঠ করাইবে ও গান করাইবে[২৬]। এইজন্য এখনও বিবাহবাড়ীতে বাদ্য প্রভৃতি বাজান হইয়া থাকে। আবার রঘুনন্দন বিবাহ সময়ে স্ত্রীলোকদিগের উলু-উলুধ্বনির প্রশংসা করিয়াছেন। যথা, মৎস্যসূক্তে উক্ত হইয়াছে[২৭]—বলিকর্ম অর্থাৎ পূজা প্রভৃতিতে, দেশ দেশান্তরে যাত্রাকালে, নবগৃহপ্রবেশে এবং মঙ্গলমহোৎসবে স্ত্রীলোকদিগের উলুধ্বনি শুভকর। এখানে স্ত্রীদিগের ধ্বনি

---

(২৪) মহাভারতে—ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ॥
মহদেনঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈব বিধিঃ সতাম্॥
নগ্নিকানাগতার্ত্তবা। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৬৮]

(২৫) কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥
ইতি মনূক্তগুণহীনসত্তাবমাত্রবিষয়ম্। [ঐ, পৃঃ ৪৬৮]

(২৬) মঙ্গল্যানি চ বাদ্যানি ব্রহ্মঘোষঞ্চ গীতকম্।
ঋদ্ধ্যর্থং কারয়েদ্ধীমানমঙ্গল্যবিনাশনম্॥ [ঐ, পৃঃ ৪৭৩]

(২৭) মৎস্যসূক্তে—বলিকর্মণি যাত্রায়াং প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
মহোৎসবে চ মঙ্গল্যে তত্র স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ শুভঃ॥
ধ্বনিঃ হুলুহুলুধ্বনিঃ। [ঐ, পৃঃ ৪৭৪]

বুঝাইতে রঘুনন্দন উলুধ্বনি অর্থ করিয়াছেন। অন্য কোন নিবন্ধকারই এইরূপ মঙ্গলবাদ্য প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন নাই।

কন্যাশুল্ক

রঘুনন্দন কন্যাশুল্ক গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি কাশ্যপের বচন আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—যে সমস্ত লোক লোভমুগ্ধ হইয়া শুল্ক লইয়া স্বকীয় কন্যা বরকে প্রদান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপী এবং মহাপাপের অনুষ্ঠাতৃগণ নরকে পতিত হয় এবং বংশের সাতপুরুষকে পর্যন্ত নষ্ট করে। এখানে রঘুনন্দন বলেন লোভ ও মোহবশতঃ কন্যার পিতা স্বার্থের জন্য ধন গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কন্যার অর্হণ অর্থাৎ অলঙ্কারাদির জন্য বরপক্ষ হইতে ধনগ্রহণে দোষ হইবে না[২৮]।

আবার রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে[২৯] সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিন প্রকার দ্রব্য ও দানের কথা আলোচনাকালে সাত্ত্বিক দ্রব্য বলিতে গিয়া কন্যার শ্বশুরের নিকট প্রাপ্ত ধনকে বুঝাইয়াছেন। ইহা শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিকধন। অতএব রঘুনন্দনের সময়ে যে কন্যাপণ দিবার রীতি ছিল তাহা বুঝা যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য বর্তমানকালে যে কন্যাপক্ষ হইতে বরপক্ষ ধনগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেবিষয়ে শাস্ত্রে কোন উল্লেখ নাই।

দেশীয় আচার

রঘুনন্দন আমাদের দেশীয় আচারও অনুমোদন করেন। যথা—বিবাহিতা কন্যার পুত্র বা কন্যা না জন্মিলে তদীয় পিতা বিবাহিতা কন্যার গৃহে কখনও ভোজন করিবেন না[৩০]। বিশেষতঃ ব্রাহ্মবিধানে বিবাহিতা কন্যার পিতা জামাতৃগৃহে কখনই ভোজন করিবে না। আবার দেখা যায় বিবাহে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

---

(২৮) কাশ্যপঃ—শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্॥…………
অত্র লোভমোহিতা ইত্যনেন স্বার্থং ন গ্রাহ্যং কন্যার্হণার্থন্তু গ্রহণে ন দোষঃ।
[উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৭৪]

(২৯) ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্।
শ্রুতেনাধ্যয়নেন শৌর্যেণ জয়াদিনা তপসা জপহোমদেবার্চনাদিনা কন্যাগতং কন্যয়া সহাগতং শ্বশুরাদের্লব্ধং শিষ্যগতং গুরুদক্ষিণাদিনা যাজ্যাগতং……শুদ্ধং সাত্ত্বিকম্।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৮৫]

(৩০) অপ্রজায়াস্তু কন্যায়াং ন ভুঞ্জীত কদাচন।……
অপ্রজায়াস্তু কন্যায়াং নাশ্নীয়াত্তস্য বৈ গৃহে।
ব্রাহ্মদেয়া বিশেষেণ নৈব ভোজ্যং সদৈব তু॥ [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃঃ ৪৭৬]

স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে। এইগুলির বিশেষ বিবরণ কোনও ধর্মশাস্ত্রাদিতে দেখা যায় না। রঘুনন্দন বিবাহে স্ত্রী-আচার অবশ্যপালনীয়রূপে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আমাদের দেশের বিভিন্ন রীতিনীতিও অধিকাংশ আচার হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আচারগুলিও ধর্মের প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত আছে।

পূর্বে পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্যা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভার্যা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। কারণ তাহারা সকলেই সপিণ্ড। এখন এই সাপিণ্ড্যসম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে।

সাপিণ্ড্যবিচার

সপিণ্ড শব্দের অর্থ হইতেছে যাহাদের পিণ্ড ও তল্লেপের সহিত সম্বন্ধ আছে। রঘুনন্দনের মতে পিণ্ড ও লেপের দাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অথবা এই দুইটির অন্যতরসম্বন্ধ বুঝাইয়াছে। মৎস্যপুরাণে সপিণ্ডতা নির্ণয় করা হইয়াছে। যথা, মৎস্যপুরাণে—"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥" অর্থাৎ চতুর্থপুরুষ হইতে (বৃদ্ধপ্রপিতামহকে লইয়া) ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষকে 'লেপভাক্' বলা হয়, পিতাকে লইয়া ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষ 'পিণ্ডভাগী' এবং পিণ্ডদাতা স্বয়ং—এই সাতপুরুষ 'সপিণ্ড' হয়। বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের যদিও সাক্ষাৎ পিণ্ড ও লেপের সহিত সম্বন্ধ নাই, শ্রাদ্ধকর্তা তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ডদান করে না, তথাপি পিণ্ড মাখিবার সময় এবং পিণ্ডদান করিবার সময় হাতে যে পিণ্ডের লেপ লাগে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তিন পুরুষ তাহারই অংশগ্রহণ করেন। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উহারা পরস্পর সপিণ্ড। আর পিতা হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ সাক্ষাৎ পিণ্ডভাগী। পিণ্ডদাতার পিণ্ডের সহিত দাতৃত্বরূপ সম্বন্ধও সাক্ষাৎরূপে বর্তমান আছে, কাজেই এই সাতপুরুষ পরস্পর সপিণ্ড হইল। বৌধায়নের বচনে আছে[৩১]—প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, পিণ্ডদাতা স্বয়ং, সহোদরগণ, ভ্রাতৃগণ, বিবাহিতা সবর্ণা পত্নীর পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র, ইহারা অবিভক্ত পিণ্ডরূপ দায় ভোজন করে বলিয়া ইহাদিগকে সপিণ্ড বলে এবং বিভক্ত পিণ্ডভোগীদিগকে সকুল্য বলে, পুত্রগণ বর্তমান থাকিলে তাহারাই ধনভাগী হয়। রঘুনন্দন ইহার ব্যাখ্যা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেন—বর্তমান সময়ে যে ব্যক্তি পিণ্ডদাতা হইয়া আপনার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র—এই তিন জনের মধ্যে যে কেহ তাঁহার

(৩১) তথাচ-বৌধায়নঃ—প্রপিতামহঃ পিতামহঃ পিতা স্বয়ং সোদর্যভ্রাতরঃ সবর্ণায়াঃ পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা এতানবিভক্তদায়াদান্ সপিণ্ডানাচক্ষতে। বিভক্তদায়াদান্ সকুল্যানাচক্ষতে সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামী হর্থো ভবতীতি। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০০]

সপিণ্ডীকরণাখ্য শ্রাদ্ধ করুক না কেন, ঐ পূর্ব পিণ্ডদাতারই পিত্রাদি উর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ডের সহিত উহার পিণ্ডের সংমিশ্রণ হইবে, অতএব বাঁচিয়া থাকাকালে ঐ ব্যক্তি যাহাদের পিণ্ড দান করিয়াছিল, মৃত্যুর পর সে তাঁহাদেরই অংশভোক্তা হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ পিত্রাদি উর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ডে ভোক্তৃত্বসম্বন্ধ এবং তাঁহার অধস্তন পুত্রাদি তিন পুরুষের সহিত উহার পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধ থাকায় মধ্যবর্তী পিণ্ডদাতা বাঁচিয়া থাকিবার সময় আপনার উর্দ্ধতন পূর্ব তিন পুরুষের পিণ্ডদান করে এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদেরই পিণ্ডের অংশভোগ করে, অন্যদিকে নিজের মৃত্যুর পর আবার যে অধস্তন পুত্রাদি জীবন্ত তিন পুরুষের পিণ্ডদানের পাত্র হইয়াছিল তাহারা সকলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সহিতই দৌহিত্রাদি কর্তৃক প্রদত্ত উহাদেরই পিণ্ডের অংশভোগ করে। অতএব মধ্যবর্তী পুরুষ যাঁহাদিগের পিণ্ডদাতা এবং যাঁহারা উহার পিণ্ডদাতা তাঁহারা সকলে একই অবিভক্ত পিণ্ডদান ও ভোগ করে বলিয়া তাঁহারা পরস্পর সপিণ্ড। যদি একই পিণ্ডে পরস্পরের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ লইয়া সপিণ্ডগণনা করাই শাস্ত্রসিদ্ধ হইল, তাহা হইলে ভ্রাতৃপ্রভৃতিও সপিণ্ড হইল। কারণ যেমন লোকে প্রপিতামহাদি তিন পুরুষের সহিত একপিণ্ডভোগী হইয়া পরে নিজের অধস্তন তিন পুরুষের সহিতও একপিণ্ড ভোগ করে, তাঁহার ভ্রাতাও ঠিক সেইরূপ তাঁহারই উর্দ্ধতন পুরুষদিগের সহিত একপিণ্ডভোগী হইয়া নিজ নিজ অধস্তন তিন পুরুষের সহিত পরে আবার একই পিণ্ড ভোগ করে। সুতরাং একপিণ্ড ভোগরূপ সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় ইঁহারা সকলেই সপিণ্ড। জীমূতবাহন নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া রঘুনন্দন বৌধায়নের সূত্র অনুসারে সপিণ্ড ও সকুল্যের যে পরিভাষা করিয়াছেন, ইহা কেবল ধনাধিকারের জন্যই বুঝিতে হইবে। কারণ বৌধায়নকৃত সপিণ্ডের পরিভাষায় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রপিতামহের উপরে এবং প্রপৌত্রের নীচে বর্তমান পুরুষে আর সপিণ্ডলক্ষণ যায় না, সুতরাং সপিণ্ডত্ব সাত পুরুষব্যাপী না হইয়া চারপুরুষমাত্র ব্যাপী হইয়া পড়ে। এইজন্য রঘুনন্দন বলেন—বৌধায়ন যে সপিণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহা ধনাধিকারের জন্য মাত্র; অশৌচাদি গ্রহণবিষয়ে পিণ্ড এবং লেপ—এই উভয় ভোজীদিগকেই পরস্পর সপিণ্ড বলা হইবে। অনিরুদ্ধভট্ট তাঁহার হারলতা গ্রন্থে এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন। আবার হারলতায় কূর্মপুরাণে বলা হয়[৩২] সপ্তম পুরুষ

(৩২) কূর্মপুরাণে—সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্। [হারলতা, পৃঃ ৯৮]

জন্য স্থায়ী হইয়া সপি
সেই পর্যন্ত সমানোদ
অভাব হইলে তাহা
প্রপিতামহ এই পিণ্ডভ
পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা
এই বচন হইতে
সপিণ্ডনাদি শ্রাদ্ধ প্রপি
উভয়ে জীবিত থাকি
পুরুষের সহিত করিবা
নিজ হইতে সপ্তমপুরুষে
তাহাদের সহিত ঐ ব্য
পর্যন্ত নির্দেশ থাকায়
আছে[৩৩]।

এখানে উল্লেখযোগ
নির্ণীত হওয়ায় মাতা
মহাদিও সপিণ্ড হইয়া য
আছে[৩৪] ‘অসাবেতত্তে
অসাবেতত্তে যজমানস্য প্রা
পিতা প্রভৃতি উপদেশা
‘মাতামহানামপ্যেবম্’—
প্রাপ্তি হয় না।

স্ত্রীদিগের সপিণ্ডতা
স্বামীর সাপিণ্ড্য অনুসারেই
দাতৃত্ব বা ভোক্তৃত্বরূপ সম্বন্ধ

(৩৩) জীবৎপিতৃকত্বাদিনা
সর্বদেশীয়াচারোঽপি তথা। [
(৩৪) শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ১০৪।
(৩৫) কূর্মপুরাণং—অপ্রত্তানাং
প্রত্তানাং ভ

জন্য স্থায়ী হইয়া সপিণ্ডতার নিবৃত্তি হয় এবং যে পর্যন্ত জন্ম ও নামের জ্ঞান থাকে সেই পর্যন্ত সমানোদকতা স্থায়ী হয়, কোন এক গোত্রজাত পুরুষে সেইরূপ জ্ঞানের অভাব হইলে তাহার সহিত সমানোদকতারও নিবৃত্তি হয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই পিণ্ডভাগী তিন পুরুষ এবং প্রপিতামহের পূর্বে উর্দ্ধতন লেপভাগী তিন পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা—এই সাত পুরুষ ব্যাপিয়া সপিণ্ডতা বিদ্যমান হয়।

এই বচন হইতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে পিতা জীবিত থাকিতে মৃতব্যক্তির সপিণ্ডনাদি শ্রাদ্ধ প্রপিতামহের উর্দ্ধতন তিন পুরুষের সহিত এবং পিতা পিতামহ উভয়ে জীবিত থাকিতে মৃতব্যক্তির সপিণ্ডনাদি শ্রাদ্ধ প্রপিতামহের উর্দ্ধতন তিন পুরুষের সহিত করিবার বিধান থাকায় যদিও ঐ ব্যক্তির পিণ্ড ও পিণ্ডলেপ সম্বন্ধে নিজ হইতে সপ্তমপুরুষের উর্দ্ধতন পুরুষের সহিতই ঘটিয়া উঠে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সহিত ঐ ব্যক্তির আর সপিণ্ডতা হইবে না, কারণ বচনে সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত নির্দেশ থাকায় ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সর্বদেশে এইরূপ আচারই প্রচলিত আছে[৩৩]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পিণ্ড ও লেপের দান ও ভোগ সম্বন্ধ দ্বারা সাপিণ্ড্য নির্ণীত হওয়ায় মাতামহ প্রভৃতিতে দৌহিত্রের পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকায় মাতামহাদিও সপিণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু তাহা বেদ ও লোক বিরুদ্ধ। কারণ শ্রুতি আছে[৩৪] 'অসাবেতত্তে যজমানস্য পিত্রে অসাবেতত্তে যজমানস্য পিতামহায় অসাবেতত্তে যজমানস্য প্রপিতামহায়, মাতামহানামপ্যেবম্'। এই শ্রুতিতে দেখাযায় পিতা প্রভৃতি উপদেশবিধিবোধ্য হইলেও মাতামহাদি অতিদিষ্ট হইয়াছে। 'মাতামহানামপ্যেবম্'—এইরূপ অতিদিষ্টবিধি হওয়ায় মাতামহাদিতে সপিণ্ডতার প্রাপ্তি হয় না।

স্ত্রীদিগের সপিণ্ডতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে[৩৫]—বিবাহিতা স্ত্রীদিগের সপিণ্ডতা স্বামীর সাপিণ্ড্য অনুসারেই নির্ধারিত হইবে। স্ত্রীদের সহিত পিণ্ডের বা লেপের দাতৃত্ব বা ভোক্তৃত্বরূপ সম্বন্ধ বর্তমান না থাকিলেও বাচনিক সাপিণ্ড্য স্থির করিতে

---

(৩৩) জীবৎপিতৃকত্বাদিনা অধিকপুরুষেষু পিণ্ডলেপসম্বন্ধেঽপি সপিণ্ডতা নিবৃত্তিজ্ঞাপনায় সর্বদেশীয়াচারোঽপি তথা। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১]

(৩৪) শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ১০৪।

(৩৫) কূর্মপুরাণং—অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্।
প্রত্তানাং ভর্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১]

হইবে। আর অবিবাহিতা কন্যাদিগের সাপিণ্ড্য পিতৃবংশে তিনপুরুষব্যাপী হইয়া থাকে। অতএব অবিবাহিতা কন্যাদিগের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ পর্যন্তই সাপিণ্ড্য, বৃদ্ধপ্রপিতামহ বা তাহার সন্ততির সহিত কন্যার সাপিণ্ড্য থাকে না। সুতরাং প্রপিতামহের ভ্রাতা এবং তদীয় সন্ততিবর্গের সহিত কন্যার সপিণ্ডতা না থাকায় কন্যার জন্ম বা মরণে তাঁহাদিগের সাপিণ্ড্যাশৌচ হয় না, কিন্তু মাত্র সমানোদকতা নিমিত্ত অশৌচ হয় এবং প্রপিতামহের ভ্রাতা বা তদীয় সন্ততিবর্গের জন্ম বা মৃত্যুতে কন্যারও এইরূপ অশৌচ হয়—ইহা শূলপাণি নিরূপণ করেন[৩৬] বলিয়া রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন। অপ্রদত্তা কন্যাদের পিতৃমরণে পিণ্ডদান একদিন পরেই করিতে হয় বলিয়া অশৌচও একদিনই হইবে বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আর রঘুনন্দনের মতে একমাত্র বিবাহস্থলেই পিতৃপক্ষবিষয়ক সাপিণ্ড্য সাতপুরুষব্যাপী হইবে, অশৌচাদিসম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না। কারণ বিবাহস্থলে পিতৃপক্ষীয় সপ্তমী কন্যা পর্যন্ত যে সপিণ্ডরূপে পরিগণিত হয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাহিতা স্ত্রীদিগের যে স্বামীর সপিণ্ডের সহিত সাপিণ্ড্য বলা হইয়াছে, সেস্থলেও সপ্তমপুরুষব্যাপী সাপিণ্ড্যেরই অনুবৃত্তি করা হইয়াছে। অতএব তাহাদের সাপিণ্ড্যকেও স্বামীর সহিত তুল্যরূপই বুঝিতে হইবে[৩৭]। বিবাহব্যাপারে সাপিণ্ড্য-নির্ণয় এইরূপে করিতে হইবে যে—উহাতে পিণ্ড ও লেপের দাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ থাকুক, বা নাই থাকুক, কিন্তু পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ ও মাতৃপক্ষে পাঁচপুরুষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভার্যাগ্রহণ করিতে হইবে। আবার দেখা যায় পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ ও মাতৃপক্ষে পাঁচপুরুষের মধ্যে যদি বর হইতে কন্যার গোত্রত্রয়ের ব্যবধান থাকে তাহা হইলে সন্নিকর্ষ অর্থাৎ নিকটসম্বন্ধেও বিবাহ হইতে পারিবে[৩৮]।

সপিণ্ডতাবিষয়ে পিণ্ডঘটিত সম্বন্ধ নিবন্ধনই সপিণ্ডতা হয়—এই যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহাতে মিতাক্ষরা এবং রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে পিণ্ড শব্দের শরীর এবং স অর্থাৎ, সমান—এইরূপ অর্থ করতঃ একই শরীরের অবয়ঘটিত সম্বন্ধ নিবন্ধনই সাপিণ্ড্য হয়,

---

(৩৬) অতএব কন্যায়াঃ প্রপিতামহভ্রাত্রা তৎসন্ততিভিশ্চ সহ সাপিণ্ড্যাভাবাৎ কন্যাজনন-মরণয়োস্তেষাং সপিণ্ডাশৌচং নাস্তি, কিন্তু সকুল্যসমানোদকমরণাদিনিমিত্তকমেবাশৌচমিতি, এবং তেষামপি জননমরণয়োঃ কন্যানামিতি। [শূলপাণির সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ৫]

(৩৭) ভর্তৃসাপিণ্ড্যমিত্যত্র সাপ্তপৌরুষমিত্যনুষজ্যতে। তেন ভর্তৃসমানসাপিণ্ড্যমিত্যর্থঃ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১]

(৩৮) সন্নিকর্ষেঽপি কর্তব্যং ত্রিগোত্রাৎ পরতো যদি ইতি মৎস্যপুরাণবচনম্। [ঐ, পৃঃ ৪৬৫]

ঃনপুরুষব্যাপী হইয়া
ং প্রপিতামহ পর্যন্তই
াপিণ্ড্য থাকে না।
কন্যার সপিণ্ডতা না
হয় না, কিন্তু মাত্র
তদীয় সন্ততিবর্গের
। নিরূপণ করেন[৩৬]
ণে পিণ্ডদান একদিন
ল্পনা করিয়া লইতে
পক্ষবিষয়ক সাপিণ্ড্য
কারণ বিবাহস্থলে
বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত
পিণ্ড্য বলা হইয়াছে,
। অতএব তাঁহাদের
াহব্যাপারে সাপিণ্ড্য-
াতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ
ক্ষে পাঁচপুরুষ পর্যন্ত
। পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ
ত্রয়ের ব্যবধান থাকে
াবে[৩৮]।
এই যে সিদ্ধান্ত করা
শরীর এবং স অর্থাৎ,
নিবন্ধনই সাপিণ্ড্য হয়,

াপিণ্ড্যাভাবাৎ কন্যাজনন-
ন্তকমেবাশৌচমিতি, এবং

াসাপিণ্ড্যমিত্যর্থঃ।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১]
নম্। [ঐ, পৃঃ ৪৬৫]

এইরূপ অর্থান্তর রঘুনন্দনের মতে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। মিতাক্ষরা[৩৯] ও মিথিলার চণ্ডেশ্বরবিরচিত গৃহস্থরত্নাকর মতে বলা হয়[৪০]—সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে একই শরীরাবয়বের সম্বন্ধই সপিণ্ডতার হেতু। পিতার শরীরাবয়বের সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় পিতা এবং পুত্র পরস্পর সপিণ্ড এবং পিতা দ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে পিতামহাদির শরীরাবয়বের সহিত সম্বন্ধ থাকায় পৌত্রাদির সহিত তাঁহাদের সাপিণ্ড্য হয়। এইরূপ মাতার শরীরের সম্বন্ধ থাকায় মাতা এবং মাতামহাদির সহিত সাপিণ্ড্য হয়। পত্নীর সহিত পতির সম্মিলন অপত্যনিবন্ধন একশরীরের আরম্ভ করে বলিয়া পত্নীর সহিতও পতির সপিণ্ডতা। পতি এবং পত্নী—এই উভয়ের শরীরই যে একশরীরের আরম্ভক সেকথা গর্ভোপনিষদে বলা হইয়াছে[৪১]। যথা—এই মনুষ্য-শরীর ষাট্‌কৌশিক অর্থাৎ ৬টি কোষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন, তন্মধ্যে ৩টি কোষ পিতৃশরীর হইতে উৎপন্ন এবং ৩টি মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন। অস্থি, স্নায়ু এবং মজ্জা—এই তিনটি পিতৃশরীর হইতে এবং ত্বক্, মাংস, রুধির—এই তিনটি মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ যে যে পুরুষে সপিণ্ডতা স্বীকৃত হইয়াছে সেই সেই পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে একশরীরসম্বন্ধই প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। অন্যদিকে দেয় পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ অনুসারে সপিণ্ডতা স্বীকার করিলে ভ্রাতা এবং পিতৃব্য প্রভৃতির সহিত আর সপিণ্ডতা হইতে পারে না, কিন্তু ভ্রাতা এবং পিতৃব্য প্রভৃতির সহিত সপিণ্ডতা সর্ববাদি-সম্মত, সুতরাং ভ্রাতা এবং পিতৃব্য প্রভৃতিও সপিণ্ডতা লক্ষণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল।

রঘুনন্দন মিতাক্ষরাদিমতে অতিব্যাপ্তিদোষ দেখাইতেছেন। কারণ 'সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে একশরীরের সহিত সম্বন্ধই সপিণ্ডতার ঘটক হয়'—এইরূপ লক্ষণ

(৩৯) সপিণ্ডতা চ একশরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি। তথাহি পুত্রস্য পিতৃশরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রা সহ সাপিণ্ড্যম্। এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ তচ্ছরীরাবয়বান্বয়াৎ। এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা তথা মাতাদিভিরপি মাতৃদ্বারেণ তথা মাতৃস্বসৃমাতুলাদিভিরপি একশরীরাবয়বান্বয়াৎ। তথা পিতৃব্যপিতৃস্বস্রাদিভিরপি। তথা পত্ন্যা সহ পত্যুঃ একশরীরারম্ভকতয়া। [মিতাক্ষরা, পৃঃ ১৩]

(৪০) সমান একঃ পিণ্ডো দেহো যস্যাঃ সা সপিণ্ডা ন তথা অসপিণ্ডা, সপিণ্ডতা চ একদেহাবয়বান্বয়েন ভবতি। তথাহি পুত্রস্য পিতৃশরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রা সহ। এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ শরীরাবয়বান্বয়ঃ। এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা তথা মাতামহাদিভিরপি মাতৃদ্বারেণ।

[গৃহস্থরত্নাকর, পৃঃ ৮]

(৪১) তথাচ গর্ভোপনিষদি—এতৎ ষাট্‌কৌশিকং শরীরং ত্রীণি পিতৃতঃ ত্রীণি মাতৃতঃ অস্থিস্নায়ু-মজ্জানঃ পিতৃতঃ ত্বঙ্‌মাংসরুধিরাণি মাতৃতশ্চেতি তত্র তত্রাবয়বান্বয়প্রতিপাদনাৎ নির্বাপ্য পিণ্ডান্বয়ে তু সাপিণ্ড্যে ভ্রাতৃপিতৃব্যাদিসাপিণ্ড্যং ন স্যাৎ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১]

করিলে সপ্তম পুরুষের অতিরিক্ত অষ্টমনবমাদি পুরুষেও সপিণ্ডতা থাকিবার কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। কিন্তু অষ্টমনবমাদি পুরুষে সপিণ্ডতা কেহই স্বীকার করেন না বলিয়া অষ্টমাদিপুরুষে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এই দোষ নিরসনের জন্য মিতাক্ষরাদি মতে বলা হয়—সপিণ্ড কথাটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ঐরূপ হইলেও কেবল ঐ যৌগিক অর্থানুসারেই উহার প্রয়োগ হয় না, উহার সহিত এইরূপ একটি বিশেষ অর্থের যোগ করিতে হইবে—যথা, 'সপ্তম পুরুষের মধ্যে যাহাদের সহিত উক্তরূপ একশরীরের সম্বন্ধ বর্তমান হইবে, তাহারাই পরস্পর সপিণ্ড'—এইরূপ যোগরূঢ় অর্থেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের মতে এই অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা হইতে পারে না। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে মাতামহের মৃত্যুতে অশৌচ যে ত্রিরাত্র হইবে তাহা বিশেষ বচন দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা না হইলে মাতামহের মরণেও সপিণ্ডতা হিসাবে দশরাত্রাশৌচই হইত। যেস্থলে এইরূপ বিশেষ বচন দৃষ্ট হয় না, সেস্থলেও দশরাত্রাশৌচই হইয়া থাকে। রঘুনন্দন যেভাবে সাপিণ্ড্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা দ্বারা মিতাক্ষরা এবং রত্নাকরের মত খণ্ডিত হইয়াছে[৪২]। কারণ এক পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও কেবল বচনপ্রভাবে লেপভোগীদিগকে যে সপিণ্ড মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, তাহাতে মিতাক্ষরা প্রভৃতির স্বকপোলকল্পিত একশরীরাবয়বের সম্বন্ধমূলক সাপিণ্ড্য বিষয়ে প্রদর্শিত যুক্তি কার্যকরী হইতে পারে না। মিতাক্ষরাদির কল্পিত যুক্তিমূলক সাপিণ্ড্যের লক্ষণই যদি শাস্ত্রকার ঋষিদিগের অভিপ্রেত হইত, তবে তাঁহারা লেপভোগীদের সাপিণ্ড্য প্রতিপাদনার্থ কখনই আর বিশেষ বচনের অবতারণা করিতেন না, যেহেতু একশরীর সম্বন্ধনিবন্ধন সপিণ্ডতা তাহাদের আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়াছিল। ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত পিণ্ড বা তল্লেপভাগিত্বরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধনই ভ্রাতা প্রভৃতির সহিতও সাপিণ্ড্য ঘটে। এই মত কামধেনু, হারলতা এবং কল্পতরু প্রভৃতি নিবন্ধে এবং পারিজাতকার প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা রঘুনন্দনই বলিয়াছেন।

পতিপত্নীর সম্মিলন একশরীরের আরম্ভক বলিয়া উহারা যে পরস্পর সপিণ্ড হয়

---

(৪২) অতিপ্রসঙ্গস্তু সপ্তম্যন্তমত্বেন প্রয়োগোপাধিনা নিরসনীয়ঃ।.. মিতাক্ষরারত্নাকরাদিমতমপাস্তম্। লেপভাজ ইত্যাদি বাচনিকেঽর্থে সাপিণ্ড্যে একশরীরাবয়বান্বয়রূপস্বকপোলরচিতার্থানবকাশাৎ। নির্বাপ্য পিণ্ডসম্বন্ধেন ভ্রাত্রাদীনাং সাপিণ্ড্যস্থ। মৎস্যপুরাণবৌধায়নাভ্যাং পূর্বমুক্তত্বাৎ কামধেনুহারলতাকল্পতরুপারিজাতকারাদিভিস্তথৈব ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ।

[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১].

তাহা প্রমাণ করিতে মি
তাহাতে অগত্যা সকল
সম্মিলন তাহাদের শর
উভয়ের এক অভিন্ন শরী
সুতরাং তাহারা পরস্পর
সপিণ্ড বলিয়া দশরাত্রা
ত্রিরাত্রাশৌচই বিহিত হ
পরস্পর দশরাত্রাশৌচই
বিশেষ বচন না থাকি
আরও সন্দেহ উপস্থিত হ
কিন্তু মিতাক্ষরাদিমতে উ
মিতাক্ষরাদির মতানুসারে
এবং মাতামহমরণে বেদে
বেদের অভিপ্রেত, কিন্তু
নির্দেশ করা বেদবিরুদ্ধও
একশরীর হয় বলিয়া উহ
'সপ্তমপুরুষে সপিণ্ডতার
সপিণ্ডতা হইলেও সপ্তমপুরু
করিতে হইবে, সেইরূপ 'এ
বচনানুসারে যে সাতপুরু
সম্ভূত হওয়া চাই এইরূপ বি
কন্যাদিগের পিতার সহি
এই বচন অনুসারে তিন পু
সপিণ্ডদিগের সহিতই সা
ভর্তার সপিণ্ডদিগের সহিত
সম্বন্ধনিবন্ধন সপিণ্ডতা নিয়
বিবাহস্থলে সাপিণ্ড্যনি
কথা বলা হইয়াছে। যথা
যোগ্য। এস্থলে ইহাও বক্ত
পিণ্ড বা উদকের সম্বন্ধ নাই

ঃতা থাকিবার কোন
াণ্ডতা কেহই স্বীকার
এই দোষ নিরসনের
পত্তিলভ্য অর্থ ঐরূপ
হয় না, উহার সহিত
'সপ্তম পুরুষের মধ্যে
া, তাহারাই পরস্পর
। সুতরাং তাঁহাদের
কিন্তু রঘুনন্দনের মতে
বচন দ্বারাই নির্ধারিত
হসাবে দশরাত্রাশৌচই
দশরাত্রাশৌচই হইয়া
দ্বারা মিতাক্ষরা এবং
তে সম্বন্ধ না থাকিলেও
রিগণিত করা হইয়াছে,
ার সম্বন্ধমূলক সাপিণ্ড্য
ক্ষরাদির কল্পিত যুক্তি-
ত হইত, তবে তাঁহারা
ষ বচনের অবতারণা
হাদের আপনা হইতেই
গিত্বরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধনই
হারলতা এবং কল্পতরু
ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

। যে পরস্পর সপিণ্ড হয়

....

াপিণ্ড্যে একশরীরাবয়বান্বয়-
সাপিণ্ড্যম্। মৎস্যপুরাণ-
খৈব ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০১].

তাহা প্রমাণ করিতে মিতাক্ষরা প্রভৃতিতে গর্ভোপনিষদের যে প্রমাণ দেখান হইয়াছে তাহাতে অপত্য সকল রেতঃ এবং শোণিতের পরিণামস্বরূপ, কিন্তু পতি এবং পত্নীর সম্মিলন তাহাদের শরীরের আরম্ভক হইলেও পতি ও পত্নীর সম্মিলনে যে ঐ উভয়ের এক অভিন্ন শরীর হইয়া থাকে তাহা কেহ কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং তাহারা পরস্পর সপিণ্ড হয় কিরূপে? আর মিতাক্ষরাদিমতে মাতামহসম্বন্ধে সপিণ্ড বলিয়া দশরাত্রাশৌচ প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষবচন বশতঃ তাহা ত্রিরাত্রাশৌচই বিহিত হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে সকল সপিণ্ডের পরস্পর দশরাত্রাশৌচই বা হইবে কি প্রকারে এবং প্রমাতামহাদির সম্বন্ধে ঐরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে তাহাদের মৃত্যুতে দশরাত্রাশৌচই বা হইবে না কেন? আরও সন্দেহ উপস্থিত হয়, মাতামহাদিতে 'সাপিণ্ড্য' শব্দের ব্যবহার কেহই করে না, কিন্তু মিতাক্ষরাদিমতে উহাদিগকে সপিণ্ড বলিবার কোন বাধাই থাকে না; সুতরাং মিতাক্ষরাদির মতানুসারে মাতামহাদিতে সাপিণ্ড্যব্যবহার লোকবিরুদ্ধ হইতেছে এবং মাতামহমরণে বেদে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান থাকায় উহারা সে সপিণ্ড নয় ইহাই বেদের অভিপ্রেত, কিন্তু মিতাক্ষরাদির মতানুসারে উহাদিগকে সপিণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা বেদবিরুদ্ধও হইয়া পড়ে। যদিও বৈবাহিক মন্ত্রদ্বারা পতির সহিত পত্নীর একশরীর হয় বলিয়া উহাদিগের মধ্যে সপিণ্ডতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও 'সপ্তমপুরুষে সপিণ্ডতার নিবৃত্তি হয়' এই মনুবচনানুসারে একশরীরসম্বন্ধনিবন্ধন সপিণ্ডতা হইলেও সপ্তমপুরুষের মধ্যেই সপিণ্ডতা বর্তমান হইবে, এইরূপ যেমন নিয়ম করিতে হইবে, সেইরূপ 'একগোত্রসম্ভূত সাত পুরুষের মধ্যেই সপিণ্ডতা থাকিবে' এই বচনানুসারে যে সাতপুরুষের মধ্যে সপিণ্ডতা থাকিবে, তাহারা পরস্পর যে একগোত্র-সম্ভূত হওয়া চাই এইরূপ নিয়মও করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা 'অবিবাহিতা কন্যাদিগের পিতার সহিত একগোত্রতানিবন্ধন সাতপুরুষ পর্যন্তই সাপিণ্ড্য হয়' এই বচন অনুসারে তিন পুরুষ পর্যন্তই সাপিণ্ড্য হইবে এবং 'প্রদত্তা কন্যাদিগের স্বামীর সপিণ্ডদিগের সহিতই সপিণ্ডতা হইবে' এই বচনানুসারে বিবাহিতা কন্যাদিগের ভর্তার সপিণ্ডদিগের সহিত সপিণ্ডতা হইবে। সপ্তম পুরুষের মধ্যে একপিণ্ড ঘটিত সম্বন্ধনিবন্ধন সপিণ্ডতা নিয়মিত—ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ।

বিবাহস্থলে সাপিণ্ড্যনির্ণয়ের সময়ও পিণ্ডসম্বন্ধই যে সাপিণ্ড্যের মূল বিষয় এই কথা বলা হইয়াছে। যথা—যে কন্যা পিণ্ড বা উদকের সম্বন্ধশূন্য সেই কন্যা বিবাহের যোগ্য। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সাধারণতঃ কন্যাদিগের স্বকীয় পূর্বপুরুষের সহিত পিণ্ড বা উদকের সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু পুত্রিকারূপে পরিগৃহীত কন্যার পার্বণশ্রাদ্ধে

অধিকার থাকায় পূর্বপুরুষগণের সহিত পিণ্ড এবং উদকের সম্বন্ধ ঘটে। যেহেতু সাধারণতঃ কন্যামাত্রেরই পুত্রিকারূপে পরিগৃহীত হইবার স্বরূপযোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার্য হইতেছে। এইজন্য সেই স্বরূপযোগ্যতা নিবন্ধনই কন্যামাত্রে পিণ্ড এবং উদকের সম্বন্ধ আরোপিত করা হয় বলিয়া কন্যামাত্রকেই পিণ্ডোদকসম্বন্ধা বলা হইয়াছে। সুতরাং দেহসম্বন্ধ না ধরিয়াও পিণ্ডসম্বন্ধ মূলকই যে কন্যার সপিণ্ডতা, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিও 'সপিণ্ডশব্দ অবয়ববাচক' এইমত খণ্ডন করিয়া পিণ্ডদাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ বুঝাইয়াছেন[৪৩]।

শূলপাণি[৪৪] এবং গোবিন্দানন্দও[৪৫] ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

কিন্তু ভবদেবভট্ট সপিণ্ডতাশব্দে পিণ্ডদাতৃত্বভোক্তৃত্বসম্বন্ধ ও একশরীরাবয়বত্ব—এই উভয় মতই পোষণ করেন[৪৬]।

জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগে ধনাধিকার আলোচনাকালে সপিণ্ড শব্দ দ্বারা পিণ্ডদাতৃত্ব ও পিণ্ডভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ বুঝাইয়াছেন[৪৭] এবং তিনি উপকারকতা সম্বন্ধে অর্থাৎ পিণ্ডদান সম্বন্ধেই যে ধনাধিকার নিরূপিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন[৪৮]।

বঙ্গীয়নিবন্ধকারগণ সকলেই পিণ্ডদান ও পিণ্ডভোগ দ্বারা সপিণ্ডতা নিরূপণ করিলেও মৈথিলনিবন্ধকারগণ অবয়ব-সম্বন্ধ দ্বারা সাপিণ্ড্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

---

(৪৩) যদ্বা যস্মাৎ সন্তানভেদঃ তমাদায় তৎসপ্তমপুরুষান্তর্বর্তীনাঃ পরস্পরং সপিণ্ডাঃ তৎপিণ্ডেন সহ সর্বেষাং দাতৃতয়া সম্বন্ধাৎ সর্বেষামেব একপিণ্ডসম্বন্ধিত্বমিতি। [বিবাহতত্ত্বার্ণব, পৃঃ ৩৩২]

(৪৪) একসম্প্রদানপিণ্ডলেপভাগেষু যেষাং দাতৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন বা সম্বন্ধস্তেষাং পরস্পরং সাপিণ্ড্যম্। [শূলপাণির সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ২]

(৪৫) পিণ্ডঃ পিণ্ডলেপসম্বন্ধঃ তেন সহ বর্তমানাঃ সপিণ্ডাঃ। স চ সম্বন্ধঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়াপি। তেষাং সপ্তানাং পিণ্ডলেপদাতৃত্বভোক্তৃত্বসম্বন্ধঃ সাক্ষাৎ সন্ততীনান্তু পিণ্ডলেপয়োস্তুল্যসম্প্রদানকত্বসম্বন্ধঃ পরম্পরয়েতি। [শুদ্ধিকৌমুদী, পৃঃ ৪৯-৫০]

(৪৬) সপিণ্ডতা চ পিণ্ডসংপ্রদানত্বেন পিণ্ডদাতৃত্বেন পিণ্ডদাতৃপরম্পরাত্বেন যোগ্যত্বেন চ বোদ্ধব্যা।

... ...

অথবা সপিণ্ডত্বমেকশরীরত্বং, সমান একঃ পিণ্ডো যেষামিতি ব্যুৎপত্ত্যা। তচ্চ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চৈকজাতত্বাদেব ভবতি। 'আত্মা জজ্ঞে আত্মনঃ' ইতি শ্রুতেঃ। [ভবদেবের সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ২৫২]

(৪৭) পিত্রাদিপিণ্ডত্রয়ে সপিণ্ডনেন ভোক্তৃত্বাৎ পুত্রাদিভিশ্চ ত্রিভিঃ তৎপিণ্ডস্যৈব দানাৎ যশ্চ জীবন্ যৎ পিণ্ডদাতা স মৃতঃ সন্ সপিণ্ডনাৎ তৎপিণ্ডভোক্তা..........। [দায়ভাগ, ১১।১।৩৮]

(৪৮) উপকারকত্বেনৈব ধনসম্বন্ধো ন্যায়প্রাপ্তো মন্বাদীনামভিমত ইতি মন্যতে। [ঐ, ১১।৬।৩১]

কারণ আমরা দেখি বাচস্পতিমিশ্র শরীরাবয়ব দ্বারা সপিণ্ডতা হয় বলিয়াছেন[৪৯]। কিন্তু মিথিলার রুদ্রধর তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি পিণ্ড ইত্যাদি দান দ্বারা সাপিণ্ড্য নির্ণয় করিয়াছেন[৫০]।

এই আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে মৈথিলনিবন্ধকারগণ যে মত পোষণ করেন বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ সেই মত গ্রহণ করেন নাই। আবার বঙ্গীয়মতও মৈথিলগণ স্বীকার করেন নাই। তবে বঙ্গীয়নিবন্ধকারগণের মধ্যে একমাত্র ভবদেব-ভট্টই দুইমত অনুমোদন করিয়াছেন। আর শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন স্পষ্টভাবে সাপিণ্ড্য বিষয়ে মৈথিলমত খণ্ডন করিয়া স্বকীয়মত স্থাপন করিয়াছেন। দুইমতের সম্যক্ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বঙ্গীয়মতই শ্রেষ্ঠ। কারণ রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে, মৈথিলমতে প্রমাণ না থাকায় অতিব্যাপ্তিদোষ নিরসনের জন্য অতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু বঙ্গীয়মতে তাহার প্রয়োজন হয় না। আবার মনে হয় বাস্তবক্ষেত্রেও পিণ্ডদান ও ভোগ সম্বন্ধ দ্বারা সাপিণ্ড্যবিচার অধিক ফলশালী হইয়া থাকে। কারণ অবয়ব দ্বারা সাপিণ্ড্যনির্ণয়ে মাতামহ প্রভৃতিতেও সপিণ্ড-সম্বন্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্যই রঘুনন্দন মৈথিলমতে দোষ প্রদর্শন করতঃ স্বকীয়মত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশের সমাজেও তাহা প্রচলিত হইয়া আছে।

৩। আচার, কৃত্য, ব্রত ইত্যাদি

আচার, কৃত্য, ব্রত ইত্যাদির আলোচনায় রঘুনন্দন বহুস্থানে স্বকীয়মতস্থাপনের পূর্বে পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মত নিরাকরণ করিয়াছেন। স্থানবিশেষে তিনি অধ্যাপক শ্রীনাথের মত খণ্ডন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। আবার স্থান-বিশেষে স্বসিদ্ধান্তস্থাপনে যত্নবান্ হইয়া গুরুর মত স্বীকারও করিয়াছেন। অধ্যাপকের মতখণ্ডনে রঘুনন্দন কখনও কখনও অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করেন, আবার কখনও বা নাম উচ্চারণ না করিয়া 'কেচিত্তু' 'অপরে তু' ইত্যাদিরূপে তাঁহার মত উত্থাপন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রীনাথের মতে মাঘমাসের প্রাতঃস্নান যখন সূর্যোদয়ের পূর্বেও কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, তখন মাঘমাসে প্রাতস্নান করিবে এবং মাঘীসপ্তমীতে অরুণোদয়কালে স্নান করিবে—এইরূপ দুইটি বিধি করা অপেক্ষা

---

(৪৯) অত্র পিণ্ডশ্চ শরীরম্, এবং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া সমানশরীরকত্বং পরম্পরয়া অষ্টমাদৌ সমানশরীরত্বসম্ভবেঽপি বীজিনমারভ্য সপ্তমান্ততমত্বমুপাধিঃ পঙ্কজপদে পদ্মত্বমিবেতি রমণীয়ম্।
[শুদ্ধিচিন্তামণি, পৃঃ ৪৯]

(৫০) গোত্রতঃ সন্তানতঃ তদানুগং সম্মতাভাবেন তামনুগতং তদানুগং তেন সপ্তমপুরুষাবধি-সন্তানজানাং পরস্পরং সপিণ্ডতেত্যর্থঃ। [শুদ্ধিবিবেক, পৃঃ ২৩]

মাঘমাসের প্রাতঃস্নান যখন অরুণোদয়কালেও বিহিত আছে, তখন ঐ প্রাতঃস্নানেতেই মাঘীসপ্তমীস্নানের নিমিত্ত কথিত বিশেষ ফলগুলির সন্নিবেশ করিলে লাঘব হয়[১]।

কিন্তু রঘুনন্দন বলেন—এই মত ঠিক নহে[২]। কারণ জৈমিনীর সূত্র আছে—'প্রকরণান্তে প্রয়োজনান্যত্বম্' অর্থাৎ প্রকরণ ভিন্ন হইলে ফলও ভিন্ন হয়। মাঘমাসের প্রাতঃস্নান এবং মাঘীসপ্তমীস্নান—এই দুইটির প্রকরণ ভিন্ন অর্থাৎ এই দুইটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ কর্ম, সুতরাং ইহাদের মধ্যে একের ফল অন্যের স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে না। দুইটি কর্মের মধ্যে একটি প্রধান, অন্যটি উহার অঙ্গস্বরূপ হয়—তথাবিধ স্থানেই অঙ্গের ফল প্রধানের সহিত মিলিত হইতে পারে কিন্তু উপরি উক্ত দুইটির মধ্যে একটিকে প্রধান এবং অপরটিকে তাহার গুণ বলা যাইতে পারে না বলিয়া গুণফলবিধি হয় না। কারণ মাঘমাসের প্রাতঃস্নান ও মাঘীসপ্তমীতে অরুণোদয়ে স্নান—এই দুইটি বিধির মধ্যে, মাঘমাসে প্রাতঃস্নান না করিলেও মাঘীসপ্তমী স্নানের স্বতন্ত্র ফল লাভ হইতে পারে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রধান ও গুণভাবের আশঙ্কাই হইতে পারে না।

রঘুনন্দন কর্তৃক অধ্যাপকের মত খণ্ডন

শাস্ত্রে বিধি আছে যে কাম্য ও নিত্যস্নানস্থলে একমাত্র কাম্যস্নান করিলে নিত্যস্নানেরও সিদ্ধি হয়। কিন্তু পূর্বোক্তস্থলে মাঘপ্রাতঃস্নান ও মাঘীসপ্তমীস্নান—এই দুই প্রকার স্নান হইলেও নৈমিত্তিক কাম্য বলিয়া একই প্রাতঃকালে বিহিত হওয়ায় তন্ত্রতা অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় সকৃৎ অনুষ্ঠানেই উভয় কর্মের সিদ্ধি হইবে বলিয়া রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কাল, দেশ ও কর্তা প্রভৃতির অভেদে এই তন্ত্রতা হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে তীর্থ ভেদে নানাস্নানের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্থানে তীর্থরূপনিমিত্তের ভেদ

(১) অত্র সূর্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকঃ ক্রম ইত্যাদিবচনদর্শনাৎ অরুণঃ সূর্য ইতি বহবঃ।

অরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ।
প্রাতঃ সন্ধ্যাং জপস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমর্কদর্শনাৎ॥

ইত্যাদি বচনদর্শনাৎ সূর্যোদয়াৎ প্রাগপি প্রাতঃস্নানস্য বিধানাৎ তত্রৈব মাঘসপ্তমাখ্যগুণফলবিধিঃ লাঘবাদিতি তু পরমার্থঃ। [কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৭১ খ]

(২) মাঘসপ্তমাখ্যগুণফলবিধির্লাঘবাদিত্যাহুঃ, তচ্চিন্ত্যং প্রকরণান্যত্বে প্রয়োজনান্যত্বমিতি জৈমিনিসূত্রেণ প্রকরণভেদে গুণবিধ্যসিদ্ধেঃ।..............

নিত্যস্নানপ্রকরণাৎ প্রকরণান্তরস্নানাৎ প্রকরণান্তরাধিকরণ-ন্যায়েন কাম্যস্নানান্তরমিদমপূর্বং ন তু গুণফলবিধিঃ, কিন্তু কাম্যকরণে প্রসঙ্গান্নিত্যসিদ্ধিরিতি অত্র মাঘমাসনিমিত্তকমাঘসপ্তমীনিমিত্তক-কাম্যস্নানয়োঃ প্রাতর্বিধানাৎ নৈমিত্তিকত্বেন প্রায়শ্চিত্তবৎ সকৃদনুষ্ঠানম্। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৫]

...তে তন্ত্রতা বা প্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাবাক্যাবলী ও তীর্থচিন্তামণিতে বলা আছে যে[3] কেহ কেহ বলেন প্রয়াগতীর্থে উপর্যুপরি তিনদিন স্নান বিহিত। যদি কোন ব্যক্তি এমনদিনে প্রয়াগে গমন করে, যাহাতে মাঘীসপ্তমীস্নানাদির ঐ প্রয়াগবিহিত তিনদিন স্নানের মধ্যেই পড়ে, তাহা হইলে একমাত্র প্রয়াগস্নানেই যে মাঘীসপ্তমীস্নান সিদ্ধ হইবে তাহা নহে, মাঘীসপ্তমী প্রভৃতি স্নানাদির নিমিত্ত বিশেষরূপ সঙ্কল্প করিয়া পুনর্বার প্রাতঃকালে স্নান করিতে হইবে—রঘুনন্দনের মতে ইহা খুবই অসঙ্গত। কারণ প্রয়াগে তিন দিন প্রত্যহ একবার করিয়া স্নানই বিহিত হইয়াছে। সপ্তমীতে একবার স্নান দ্বারাই মাঘীসপ্তমীস্নানের ফলপ্রাপ্তি হইবে, উহার জন্য বারংবার স্নানের প্রয়োজন নাই। আর প্রয়াগে তিনদিনে এক একবার মাত্র স্নান বিহিত—এইরূপ না বলিলে কোন ব্যক্তি প্রয়াগস্নান, মাঘী সপ্তমীস্নান এবং মাঘস্নান উপলক্ষ্য করিয়া বারে বারে স্নান করিলে অনেকবার স্নানের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এইজন্য একবার স্নানেই প্রয়াগস্নান, মাঘস্নান এবং মাঘীসপ্তমী স্নান ইত্যাদির ফললাভ হইবে।

কিন্তু গোবিন্দানন্দের মতে মাঘীসপ্তমীস্নান ও মাঘস্নান কখনই তন্ত্রতা দ্বারা একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে উভয় স্নানের ফল লাভ হয় না। কারণ এই দুইটি স্নানের ফল পৃথক্ এবং মন্ত্রও ভিন্ন, কাজেই পৃথক্ স্নানই বিধেয়[4]।

এখানে লক্ষণীয় যে এই বিষয়ে সমাজে রঘুনন্দনের মতই প্রচলিত হইয়া আছে। অন্য নিবন্ধকারগণ ভিন্নমত পোষণ করিলেও তাহা কেহ গ্রহণ করে নাই।

আবার রঘুনন্দন যে স্বীয় গুরুর মত সমর্থন করিয়াছেন তাহাও দেখা যায়। যথা—চতুর্থী পঞ্চমীযুক্ত হইলে তাহাতে ধর্মানুষ্ঠানের বিধান থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের একটি বচনে বলা আছে—তৃতীয়াবিহিত ধর্মকার্য চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়াখণ্ডেই করিবে আর চতুর্থীবিহিত ধর্মকার্য তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীখণ্ডে করিবে, কখনও পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীখণ্ডের গ্রহণ করিবে না। এই বচনে পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীখণ্ডে চতুর্থীবিহিত ধর্মকার্যের যে নিষেধ করা হইয়াছে, ঐ নিষেধকে চতুর্থীবিহিত একমাত্র বিনায়কব্রত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে—তাহা গুরু শ্রীনাথাচার্য

স্থলবিশেষে অধ্যাপকের মত সমর্থন

(৩) অতএব গঙ্গাবাক্যাবলীতীর্থচিন্তামণ্যোঃ—যত্তু প্রয়াগে ত্র্যহস্নানক্রোড়ীকৃতেঽপি মাঘসপ্তমী-স্নানাদাবসাধারণসঙ্কল্পেন পুনস্তত্রৈব প্রাতঃস্নানাচরণং তদযুক্তম্, তদা সকৃৎ স্নানস্যৈব বিহিতত্বাৎ। অন্যথা তত্র্যাহফলকামনায়াং তদানন্ত্যাপত্তেরিত্যুক্তম্। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৫]

(৪) বস্তুতস্তু ফলভেদান্ মন্ত্রভেদাচ্চ স্নানদ্বয়ং পৃথগের কর্তব্যমিতি প্রতীমঃ।

[বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৫০০]

স্বীকার করেন। রঘুনন্দনের মতে ঐ বচনের তৃতীয়াবিহিত ধর্মকার্য চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়াখণ্ডেই করিবে, আর চতুর্থীবিহিত ধর্মকার্য তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীখণ্ডে করিবে না, কিন্তু পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীখণ্ডেই করিবে—এইরূপ অর্থ করিলে বচনস্থিত 'ক্বচিৎ' পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ তাহাতে তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীখণ্ডে কর্মানুষ্ঠানের নিষেধ থাকায় সকলকার্যেই যদি পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীর গ্রহণ করিতে বলাই অভিপ্রেত হয়, তবে আবার 'ক্বচিৎ' পদটি কেন বলা হইয়াছে? সুতরাং রঘুনন্দনের মতে সিদ্ধান্ত হইতেছে—সাধারণতঃ পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীখণ্ডেই চতুর্থীবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, কেবল বিনায়কব্রতে উহার নিষেধ করা হইয়াছে[৫]।

আবার দেখা যায়[৬] মাঘাদি মাসে আরম্ভ করিয়া একবৎসর বারোটি শুক্ল-সপ্তমীতে যথাক্রমে বিধানসপ্তমীব্রত করিবে। মাঘাদি মাসে বিহিত হওয়ায় মলমাসভিন্ন মাসেই উহা কর্তব্য। কারণ লিঙ্গপুরাণের বচনে বলা আছে, ব্রত আরম্ভ করিবার পর যদি মলমাস আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে পূর্ববৎসরের হিসাবে ঐ মলমাস পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশ মাসই ব্রত করিবে। কিন্তু বিষ্ণুরহস্যের বচনে আছে—মলমাসেও শঙ্করের সহিত দেবীকে পূজা করিবে, কিন্তু ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে না—এইবচন দ্বারা মলমাসেও পূর্বারব্ধব্রতের অনুষ্ঠান যে কর্তব্য তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহাতে পূর্বোক্ত লিঙ্গপুরাণের বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা নিরসনের জন্য রঘুনন্দন বলেন—যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠানারম্ভ কোন একটি বিশেষ মাস ধরিয়া বিহিত হয় নাই এবং যে ব্রত সামান্যতঃ মাসে মাসে মাত্র কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সেই ব্রত মলমাসেও কর্তব্য—ইহাই বিষ্ণুরহস্যের

বিরুদ্ধ মতবাদে প্রকৃত শাস্ত্রীয় নির্দেশ

(৫) যত্তু—চতুর্থীসংযুতা কার্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।
তৃতীয়য়া যুতা নৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ ক্বচিৎ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তবচনং পঞ্চমীযুতানিষেধকং তদ্বিনায়কব্রতপরিমিতি গুরুচরণাঃ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১২]

(৬) লিঙ্গপুরাণং—প্রারব্ধে তু ব্রতে পশ্চাৎ সম্প্রাপ্তে ত্বধিমাসকে।
পূর্বমানেন তং ত্যক্ত্বা কার্যং দ্বাদশমাসিকম্॥
পূর্বমানেন মলিম্লুচশূন্যবৎসরমানেন তং মলমাসং দ্বাদশমাসিকং দ্বাদশমাসেষেব কার্যং ন মলমাস ইত্যর্থঃ।
যত্তু—মাসে মলিম্লুচেঽপ্যেবং যজেদ্দেবীং সশঙ্করাম্।
কিন্তু নোদ্যাপনং কার্যমিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ॥
ইতি বিষ্ণুরহস্যবচনং তন্মাসবিশেষানঙ্কিতমাসমাত্রকর্তব্যামাবস্যাদিব্রতকর্তব্যতাপরম্ উদ্যাপনং প্রতিষ্ঠা এবমারম্ভোঽপি নিষিদ্ধঃ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৪]

বচন দ্বারা বুঝা যায়। ইহা দ্বারা অমাবস্যাদিব্রত মলমাসে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু বিধানসপ্তমীব্রত মাঘাদিমাস উল্লেখপূর্বক বিশেষমাসে বিহিত থাকায় বিষ্ণুরহস্যের বচন এই ব্রতে খাটিবে না এবং বিরোধও হইবে না।

এই আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে রঘুনন্দন স্বকীয় পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিরুদ্ধ বচনগুলির সমাধানপূর্বক প্রকৃত শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিয়াছেন। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মধ্যে কিন্তু এইরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। রঘুনন্দনই সমাজ-ব্যবস্থায় জনগণের নিকট ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তখনকার বিশৃঙ্খল সমাজে এইরূপ দিগ্‌দর্শনের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

জন্মাষ্টমীপ্রসঙ্গে বিরুদ্ধ মতের সমাধান

জন্মাষ্টমীপ্রসঙ্গে দেখা যায়, ব্রহ্মপুরাণের বচনে আছে বর্ষাকালে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীযুক্ত মহানিশাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে জন্ম হইয়াছিল শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ-অষ্টমীতে। ব্রহ্মপুরাণে ভাদ্রমাস ও বিষ্ণুপুরাণে শ্রাবণমাস থাকায় যে বিরোধের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহা পরিহারের জন্য রঘুনন্দন বলেন যে, গৌণচান্দ্র ধরিয়া গণনাপূর্বক ভাদ্রমাস এবং মুখ্যচান্দ্র ধরিয়া গণনা করিলে শ্রাবণমাস জন্মমাস হইয়া পড়ে। সঙ্কল্পবাক্যের রচনা গৌণচান্দ্র অনুসারেই যে করিতে হইবে,তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই 'ভাদ্র' পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা না হইলে ভাদ্রমাসের উল্লেখ অনর্থক হইত, কেবল শ্রাবণমাসের নাম করিলেই চলিত। গৌণচান্দ্র ধরিয়া ভাদ্রমাসের উল্লেখবিষয়ে তিথিবিহিত কর্মসম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রতিপদাদি-পৌর্ণমাস্যন্ত মাসেরই গণনা করিতে হইবে—এই বচনই প্রমাণ[৭]।

কিন্তু বশিষ্ঠসংহিতার বচনে আছে—যে বৎসর মনুষ্যগণ শ্রাবণমাসেই হোক্, অথবা ভাদ্রমাসেই হোক্, রোহিণীনক্ষত্রের সহিত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী লাভ হইবে

---

(৭) ব্রহ্মপুরাণে—অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥
… … … … …

বিষ্ণুপুরাণে—মহামায়াং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥

ইত্যাদিষু ভাদ্রপদনভঃপদয়োর্ন বিরুদ্ধার্থতা তৎকালস্থৈকশ্রুতিমূলতয়া গৌণচান্দ্রেণ ভাদ্রতা মুখ্যচান্দ্রেণ শ্রাবণতেতি। অভিলাপস্তু গৌণচান্দ্রেণৈব তদর্থমেব ভাদ্রপদপ্রয়োগাৎ, অন্যথা তদভিধানমনর্থকং স্যাৎ তিথিকৃত্যে চ কৃষ্ণাদিমিতি বচনাৎ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৬]

তথাবিধ অষ্টমীকেই জয়ন্তী নামে অভিহিত করিবে[৮]। একই বচনে দুইটি ভিন্নমাসের উল্লেখ থাকায় যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া রঘুনন্দন বলেন—বশিষ্ঠসংহিতায় যে শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইটি মাসের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা চান্দ্রমাস হিসাবে নহে, কিন্তু সৌরমাস হিসাবেই বুঝিতে হইবে। একই চান্দ্রমাস কখনও সৌরশ্রাবণে, কখনও বা সৌরভাদ্রে হইতে পারে বলিয়া ঐ বচনে দুইমাসের কথা বলা হইয়াছে।

রঘুনন্দনের মতে—মধ্যরাত্রে অষ্টমী ও রোহিণীর যোগ হইলেই জয়ন্তীযোগ হইবে, নতুবা জন্মাষ্টমীর দিন যে কোন সময় অষ্টমী ও রোহিণী যোগেই যে জয়ন্তীযুক্ত জন্মাষ্টমী হইবে, তাহা নহে। এখানে বরাহসংহিতার বচন প্রমাণ—সূর্য সিংহরাশি গত হইলে (অর্থাৎ ভাদ্রমাসে) যদি জন্মাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রিতে অর্থাৎ দণ্ডদ্বয়াত্মক নিশীথকালে অথবা উহার পূর্ব বা পর দণ্ডমাত্রে রোহিণী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হয়, তা হইলেই উহাকে 'জয়ন্তীযোগ' বলে[৯]।

জীমূতবাহনও অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমী তিথির সহিত রোহিণীনক্ষত্রের যোগে জয়ন্তীযোগ হয় বলিয়াছেন[১০]।

গোবিন্দানন্দের মতে শ্রাবণমাসের অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমী ও রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তীযোগ হয়। যে স্থলে জয়ন্তীযোগ হইবে, সে স্থলে মধ্যরাত্রেই পূজা ইত্যাদি হইবে। কিন্তু জয়ন্তীযোগ না হইলে অষ্টমীবিহিত পূর্বাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিমিত্ত পূজাকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে[১১]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জয়ন্তীযোগ হউক বা না হউক রঘুনন্দনের মতে পূজা অর্দ্ধরাত্রেই হইবে।

আবার মৈথিল নিবন্ধকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর কৃত্যরত্নাকরে উল্লেখ করেন

---

(৮) যত্তু বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—একস্মিন্ বচনে শ্রাবণ-নভস্যোপাদানং তৎ সৌরাভিপ্রায়েণ।
যথা—শ্রাবণে বা নভস্যে বা রোহিণী সহিতাষ্টমী।
যদা কৃষ্ণে নরৈর্লব্ধা সা জয়ন্তীতি কীর্তিতা॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৬]

(৯) যথা—সিংহার্কে রোহিণীযুক্তা নভঃ কৃষ্ণাষ্টমী যদি।
রাত্র্যর্দ্ধপূর্বাপরগা জয়ন্তী কলয়াপি চ॥ ইতি বরাহসংহিতা। [ঐ, পৃঃ ১৬]

(১০) অর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যষ্টম্যো র্যোগে জয়ন্তীপদপ্রয়োগাৎ 'তস্য জন্মশতোদ্ভব'মিত্যাদিভ্যশ্চ জয়ন্ত্যা এব মহাফলশ্রুতেঃ জয়ন্তীশর্বরীতি চ ভগবজ্জন্মনিমিত্তত্বাৎ তিথিনক্ষত্রমুহূর্তানাং মেলকে সত্যেব জয়ন্তীপদবাচ্যতা। [কালবিবেক, পৃঃ ৪৯৫]

(১১) কৃষ্ণাষ্টম্যান্তু রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রেঽর্চনং হরেরিতি গরুড়পুরাণবচনাচ্চ। জয়ন্তীযোগাভাবে তু পূর্বাহ্ণ এবাষ্টম্যাং পূজেতি। [বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৩০১]

যে[১২] ভাদ্রমাসের ব
জয়ন্তীযোগ হয়।
অষ্টমীতে রোহিণীর
রঘুনন্দন হেয় প্রতি
সহিত বিরোধ ঘটে
গোভিল সূত্রানুসারে
একরাশিতে অবস্থান
যোগ একেবারেই অ
রঘুনন্দন জয়ন্ত
শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্ট
হইলে জয়ন্তী নামে

জন্মাষ্টমীব্রতে
জয়ন্তীযোগের প্রাধান্য

উহাতে বুধবারের যে
হইবে। এইরূপ পদ্ম

(১২) ভবিষ্যপুরাণে—

(১৩) দ্বাদশস্বপি কৃষ্ণা
(১৪) দ্বৈতনির্ণয়োক্তং
ইতি গোভিলসূত্রেণ জো
মাসেঽষ্টম্যাং রোহিণীযোগ
(১৫) যদা পুনঃ স্বল্পসূ
স্যাত্তদা সর্বাপবাদিকা সৈবে
উদয়ে চাষ্টমী
ভবেত্তু বুধস
অপি বর্ষশতে
তথা পদ্মপুরাণেঽপ্যুক্ত
প্রেতযোনিগত
যৈঃ কৃতা শ্রাব
কিং পুন র্বুধব
কিং পুন র্নবমী

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ যে কোন সময়ে হইলেই জয়ন্তীযোগ হয়। কিন্তু দ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র বারমাসেরই কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তীব্রত করিবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন[১৩] তাহা রঘুনন্দন হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ এরূপ মতে বরাহপুরাণের বচনের সহিত বিরোধ ঘটে। আর সূর্য ও চন্দ্রের অতিশয় সান্নিধ্যের নাম অমাবস্যা—এই গোভিল সূত্রানুসারে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনানুসারে অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্রের একরাশিতে অবস্থান নিশ্চিত হওয়ায় বার মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর সহিত যোগ একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে[১৪]।

জন্মাষ্টমীব্রতে জয়ন্তীযোগের প্রাধান্য

রঘুনন্দন জয়ন্তীযোগের প্রাধান্য স্থির করিয়াছেন। এইজন্য তিনি বলেন শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব বা পর দণ্ডমাত্রও যদি রোহিণীযুক্ত হয়, তাহা হইলে জয়ন্তী নামে কথিত হয় এবং ব্রত প্রভৃতিতে উহাই গ্রহণীয়। এইস্থানে আবার রঘুনন্দন গুরুদেবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা, শ্রীনাথের মতে[১৫] সূর্যোদয়ের পর কিঞ্চিৎকাল রোহিণী-যুক্ত অষ্টমী থাকিয়া পরে সমস্তদিন যদি নবমী থাকে এবং উহাতে বুধবারের যোগ হয়, তাহা হইলে উহাতেই অর্থাৎ পরদিনেই উপবাস হইবে। এইরূপ পদ্মপুরাণে আছে—তাহারাই প্রেতযোনিগত ব্যক্তিদিগের প্রেতত্ব

---

(১২) ভবিষ্যপুরাণে—রোহিণী চ যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্বপাপহরা তিথিঃ॥ [কৃত্যরত্নাকর, পৃঃ ২০৮]

(১৩) দ্বাদশস্বপি কৃষ্ণাষ্টমীষু রোহিণীযোগপুরস্কারেণ জয়ন্তীব্রতম্। [দ্বৈতনির্ণয়, পৃঃ ৬০]

(১৪) দ্বৈতনির্ণয়োক্তং নিরস্তং বরাহপুরাণবিরোধাৎ॥ সূর্যাচন্দ্রমসো যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সামাবস্যা ইতি গোভিলসূত্রেণ জ্যোতিঃশাস্ত্রগণনয়া চ চন্দ্রসূর্যয়োরমাবস্যায়ামেকরাশ্যবস্থাননিয়মেন দ্বাদশসু মাসেষষ্টম্যাং রোহিণীযোগস্য সর্বথৈবাসম্ভবাচ্চ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৬]

(১৫) যদা পুনঃ স্বল্পসূর্যোদয়ে স্বল্পাষ্টমী নক্ষত্রবতী অনন্তরং সম্পূর্ণা নবমী বুধবারেণ সোমবারেণ বা স্যাত্তদা সর্বাপবাদিকা সৈবোপোষ্যা।

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবেত্তু বুধসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো॥

তথা পদ্মপুরাণেঽপ্যুক্তম্—

প্রেতযোনিগতানান্তু প্রেতত্বং নাশিতন্তু তৈঃ।
যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা॥
কিং পুন র্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুন র্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥ [তাৎপর্যদীপিকা, পৃঃ ৩৯-৪০]

নাশ করে, যাহারা **শ্রাবণমাসের** রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমীতে **উপবাস** করে, বিশেষতঃ ঐরূপ অষ্টমী যদি **বুধবার ও সোমবার** এবং নবমীর সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে কোটিকুল উদ্ধার করে।

এইসমস্ত বচন **অবলম্বন** করিয়া শ্রীনাথ সিদ্ধান্ত **করেন**—সূর্যোদয়ের পর অল্পমাত্র রোহিণীযুক্ত **অষ্টমী থাকিয়া** পরে সমস্তদিন **নবমী থাকিলে** ঐ দিনই উপবাস কর্তব্য, যেহেতু **উহা** সকলের অপবাদিকা।

কিন্তু এই মত **রঘুনন্দন** গ্রহণ করেন নাই। কারণ গুণফলের অনুরোধে মুখ্যকালের বাধ **হইতে পারে না**। জয়ন্তীই উপবাসের **মুখ্যকাল**, ইহাতে উপবাস না করিলে দোষ হয়। **একথা শাস্ত্রে** স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, **সুতরাং পরদিনের** উপবাস দ্বারা কতকগুলি **অধিক ফলপ্রাপ্তির** আশায় পূর্বদিনের জয়ন্তীতে উপবাস ত্যাগ করা উচিত নহে। স্কন্দপুরাণে **আছে**—যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উদ্দেশে জয়ন্তীনামক ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, সে **যমের বশপ্রাপ্ত** হইয়া নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জয়ন্তীলঙ্ঘনে **পাপের** কথা শ্রুত হওয়া যায়। **কিন্তু বুধ বা** সোমবারের সহিত যোগকে **পরিত্যাগ করিলে** যে কোনরূপ পাপ হয়, **সেকথা** কোন শাস্ত্রে শোনা যায় না, **সুতরাং বুধ** বা সোমবারের যোগে উপবাসকে গুণফলপ্রদই বলিতে হইবে[১৬]।

রঘুনন্দন নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইয়া বুধ বা সোমবারের যোগ যে প্রধান নহে, কেবল গুণফলের**ই কারণমাত্র**—ইহা বুঝাইয়া সেইমতের খণ্ডন করিয়াছেন এবং তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন যে বুধ ও সোমবারযোগের অনুরোধে জয়ন্তীযোগকে ত্যাগ করা কখনই **উচিত** নহে। কিন্তু শ্রীনাথের মতে বুধ **বা** সোমবারের যোগ গুণফলবিধি হইলে **জয়ন্তীযোগ**ও গুণফলবিধি হইতে পারে। কারণ অষ্টমীতে উপবাস ও ব্রতটাই **প্রধান**, তাহার উপর জয়ন্তীযোগ বিশেষফল উৎপাদন করে। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে—এই **অভিমত** ঠিক নহে। কারণ রোহিণীযোগ **অপ্রধান** নহে। তিথির দ্বৈধ ঘটিলে **অর্থাৎ** অষ্টমী তিথি পূর্ব ও পর—এই দুইদিন অর্ধরাত্রব্যাপিনী হওয়ায় কোন্‌দিন **উপবাস** এবং ব্রত করিবে, এইরূপ সন্দেহের উদয় হইলে যেদিন

---

(১৬) গুণফলানুরোধেন জয়ন্ত্যাখ্যমুখ্যকালবাধাযোগাৎ।

স্কান্দে—ন করোতি যদা বিষ্ণো র্জয়ন্তীসংজ্ঞকং ব্রতম্।

যমস্য বশমাপন্নঃ সহতে নারকীং ব্যথাম্ ॥·········

জয়ন্তীলঙ্ঘনে প্রত্যবায়শ্রুতেশ্চ। বুধসোমযোগলঙ্ঘনে প্রত্যবায়াশ্রবণাদ্ গুণফলত্বমেব।

[তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১৯]

অর্ধরাত্রব্যাপিনী অষ্টমীতে রোহিণী যোগ হইবে সেইদিনই উপবাস ও ব্রত করিবে, শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম করিয়া বলা আছে। কিন্তু ঐ রোহিণীনক্ষত্র যদি উভয় দিন তিথির সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের যে খণ্ডে সূর্য অস্তগত হন সেইদিনই উপবাসের নিয়ম করা হইয়াছে। শূলপাণি তাঁহার তিথিবিবেকেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৪। দুর্গাপূজা

শারদীয়া দুর্গাপূজায় আবাহন হইতে বিসর্জন পর্যন্ত মহাপূজা একই কর্ম। পূজার অন্তর্গত স্নান প্রভৃতি কর্ম প্রত্যেকটি ভিন্ন হইলেও এই পূজা একবাক্যতাপন্ন ক্রিয়াকলাপস্বরূপ।

ষষ্ঠী তিথিতে দেবী দুর্গার বোধন ও দেবীর পত্রীপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্বদিন সায়ংকালে আমন্ত্রণ হইবে। এই বোধন ও আমন্ত্রণ দুইটি পৃথক্ কর্ম। ষষ্ঠীতে বোধনের পক্ষে কোন নক্ষত্রবিশেষের উল্লেখ নাই, কিন্তু আমন্ত্রণে কেবল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযোগের কথা আছে। যদি সায়ংকালে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অথবা ষষ্ঠীতিথি এই দুইটির একটিরও লাভ না ঘটে, তথাপি সায়ংকালেই বিল্ববৃক্ষে দেবীর আমন্ত্রণ করিতে হইবে। যদি অব্যবহিত পরদিন পত্রিকাপ্রবেশ না হয়, তবে পূর্বদিন সায়ংকালে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠীর লাভ ঘটিলেও উহা পরিত্যাগ করিবে। পত্রিকা-প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বদিন সায়ংকালে আমন্ত্রণ পূর্বক পরদিন পত্রীপ্রবেশ করাইবে। ব্রহ্মাণ্ড ও নন্দিকেশ্বর পুরাণে আছে—পত্রীপ্রবেশের পূর্বদিন সায়াহ্নে বিদ্বান্ ব্যক্তি বিন্ধ্যবাসিনী চণ্ডিকার আমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু পত্রীপ্রবেশের পূর্বদিন সায়ংকালে ষষ্ঠীর তিথি না থাকিলে সপ্তমীতেও অধিবাস বিধেয়[১]।

রঘুনন্দনের মতে যাঁহারা এই সকল বচনের উপর অনাদর প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলেন যে পত্রিকাপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্বদিনেই ষষ্ঠীতিথিতে সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের নিকট আমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাঁহারা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে বৎসর পত্রিকাপ্রবেশের পূর্বের পূর্বদিন ষষ্ঠী ষাট দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরদিন এক ঘটিকাই হউক্ অথবা এক ঘটিকার কিছু কমক্ষণ ষষ্ঠীতিথি আছে তৎপরদিন প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ একমুহূর্ত বা তাহার কিঞ্চিৎ অধিককাল সপ্তমীর লাভ হইয়াছে—এরূপস্থলে পত্রিকাপ্রবেশ যে দিবসে ষষ্ঠীষাট্‌দণ্ড হইয়াছিল

(১) ব্রহ্মাণ্ডনন্দিকেশ্বরপুরাণয়োঃ—
পত্রীপ্রবেশাৎ পূর্বেদ্যুঃ সায়াহ্নে বিন্ধ্যবাসিনীম্।
চণ্ডীমামন্ত্রয়েদ্ বিদ্বান্ নাত্র ষষ্ঠীপুরস্ক্রিয়া॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩০]

তাহার পরের পরদিন অর্থাৎ যে দিবসে প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ এক মুহূর্ত অথবা তদধিককাল সপ্তমী পাইয়াছে, সেইদিনই হইবে। এক্ষণে পত্রিকাপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্বদিনই ষষ্ঠীতে সায়ংকালে আমন্ত্রণ করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা আর থাকে না। আবার ষষ্ঠী যে দিবস সায়ংকালব্যাপিনী হইয়াছে, সেইদিন তো অব্যবহিত পূর্বদিন হয় না এবং পত্রীপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্বদিনের ষষ্ঠীও কর্মযোগ্য হয় নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে দেবীর বোধন কৃষ্ণানবমীতে বা শুক্লাষষ্ঠীতে করিবার নিয়ম আছে। প্রতিপদাদিকল্প ও ষষ্ঠ্যাদিকল্পের শুক্লা ষষ্ঠীতেও দেবীর বোধন হইয়া থাকে। শূলপাণি বলেন[২] কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করিতে অসমর্থ হইলে প্রতিপদাদিকল্প ও ষষ্ঠ্যাদিকল্পেরও ষষ্ঠীতে বোধন করা যায়, কিন্তু তদতিরিক্তকল্পে বোধনের রীতি নাই। এইরূপ শাস্ত্রীয় নির্দেশ হইলে বর্তমানকালে যাঁহারা সপ্তম্যাদিকল্পে পূজা করেন তাঁহাদের ষষ্ঠীতে বোধন কি প্রকারে শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে? রঘুনন্দন স্পষ্টরূপে এই বিষয়ে কিছুই নির্দেশ করেন নাই। তবে কেহ কেহ কল্পনা করেন যে, যে স্থলে দুর্গা সপ্তমীর পূর্বের পূর্বদিন ষষ্ঠীতিথি প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত ষষ্ঠীতিথি থাকে, সেইস্থলে সপ্তমীর পূর্বের পূর্বদিন সন্ধ্যায় দেবীর বোধন হয়। কিন্তু ষষ্ঠ্যাদিকল্পের আরম্ভ বোধনের পরদিন প্রাতে মহাপূজার সঙ্কল্প হয় এবং সেই সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। তবে কেহ কেহ বলেন যে[৩] আগামী দিনে পূজা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির অধিবাসদিনে অঙ্গকর্মে অধিকারের জন্য উহার বীজস্বরূপ কাম্যকর্মে অধিকারের সম্পাদনকারী কুশতিলমিশ্রিত জলত্যাগের সহিত কামনার উল্লেখপূর্বক প্রধানকর্মের সঙ্কল্প কর্তব্য—এইরূপ বাক্যে দ্বৈতনির্ণয়গ্রন্থে যেমন অধিবাসের দিনই প্রধান কাম্যকর্মের সঙ্কল্প করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ এই স্থলেও কাম্যরূপেই হোক্, বা নিত্যরূপেই হোক্ ব্রতরূপে দুর্গাপূজা করিলে সেই সেই শাস্ত্রোক্ত কল্পারম্ভদিনে বোধন প্রভৃতির পূর্বেই সঙ্কল্প করিতে হইবে,

বোধন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত

---

(২) নবম্যাং বোধনাসামর্থ্যে ষষ্ঠ্যাং বোধনম্। প্রতিপদাদিষষ্ঠ্যাদিকল্পয়োরপি ষষ্ঠ্যামেব বোধনম্। তদতিরিক্তকল্পে বোধনং নাস্তি। [দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ৭]

(৩) ততশ্চ শ্বো যিযক্ষুণা অধিবাসদিনেঽঙ্গাধিকারায় তদ্বীজীভূতকাম্যপ্রধানাধিকারসম্পাদক-কুশতিলজলত্যাগসহিতঃ কাম্যাভিলাপপূর্বকপ্রধানসঙ্কল্পঃ কার্য ইতি দ্বৈতনির্ণয়োক্তবদত্রাপি কাম্যত্বেন নিত্যত্বেন বা করণেঽপি ব্রতত্বাত্তত্তৎকল্পারম্ভদিনে বোধনাদেঃ প্রাগেব সঙ্কল্পো ন তু দিনান্তরেঽপি।

[তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ২৬]

তাহার পরদিন আর সঙ্কল্প করিতে হইবে না। অতএব দেখা যায় বোধনরূপ অঙ্গাধিকারের জন্য পূর্বদিন সঙ্কল্প করিতেও কেহ কেহ অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে স্বকর্তব্যরূপে বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গাপূজার অঙ্গরূপ বোধন কল্পারম্ভদিনের পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সপ্তম্যাদিকল্পেও দেবীর বোধন হইতে পারে।

দেবী দুর্গার পূজার কাল সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে আছে[৪]—ব্রতী সপ্তমী প্রভৃতি দিনত্রয়ে পূজা করিবে, কিন্তু তিথির হ্রাসবৃদ্ধি নিবন্ধন কখনও বা দুই দিন, কখনও বা চারদিন পূজা করিবে।

পূজার কাল

অষ্টমীর উপবাস সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে আছে[৫]—পুত্রবান্ ব্যক্তি মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, এখানে যে উপবাসের নিষেধ করা হইয়াছে উহা দ্বারা পূজার অঙ্গীভূত উপবাসের অতিরিক্ত উপবাসই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পুত্রবান্ গৃহী যদি অষ্টমীতে দেবীর পূজা করে, তবেই তাহাকে উপবাস করিতে হইবে, পূজা না করিলে উপবাস করিতে হইবে না; অন্যথা প্রধান কার্য যে পূজা, তাহা উপবাসরূপ অঙ্গের হানিবশতঃ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, এইরূপ মত কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন বলেন এই মত ঠিক নহে। কারণ ঐ কালিকাপুরাণের উক্ত বচনেরই শেষভাগে বলা হইয়াছে—'পুত্রবান্ ব্রতী অন্য যে কোনরূপে পূতাত্মা হইয়া দেবীকে পূজা করিবে।' ইহার দ্বারা উপবাসভিন্ন হবিষ্যান্নাদি দ্বারা পূতাত্মা ব্যক্তি কর্তৃক পূজার বিধানই করা হইয়াছে। মৎস্যসূক্তেও বলা আছে—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতিথি প্রাপ্ত হইয়া ঐদিন হইতেই হবিষ্যাশী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া দেবীর পূজা করিবে। আর পুত্রবানের পক্ষে মহাষ্টমী-নিমিত্তক উপবাসের নিষেধ করা হইলেও কেবল অষ্টমীনিমিত্তক উপবাসের নিষেধ করা হয় নাই অর্থাৎ যদি কোন পুত্রবান্ ব্যক্তি একবৎসর ধরিয়া শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উপবাস করিব—ইত্যাদি প্রকার অষ্টমীবিহিত উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়া

---

(৪) যথা ভবিষ্যে—ব্রতী প্রপূজয়েদ্দেবীং সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ে।
দ্বাভ্যাং চতুরহোভি র্বা হ্রাসবৃদ্ধিবশাত্তিথেঃ।। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৪]

(৫) যথা কালিকাপুরাণম্—'উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ন সমাচরেৎ' অত্রেদং পূজাঙ্গোপবাসাতিরিক্তপরমন্যথা প্রধানস্যানির্বাহাপত্তেরিতি কেচিৎ তচ্চিন্ত্যম্। 'যথা তথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ' ইত্যুত্তরার্দ্ধেন পুত্রবত এব উপবাসেতরহবিষ্যাদিনা পূতাত্মনঃ পূজাবিধানাৎ। তথাচ মৎস্যসূক্তে—অথবাশ্বযুজে শুক্লপক্ষমাসাদ্য নন্দিকাম্।
সমারভ্য ততো দুর্গাং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৪-৩৫]

থাকে, তাহার পক্ষে ঐদিন উপবাসে নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং সংবৎসর ব্যাপিয়া শুক্লপক্ষের অষ্টমীনিমিত্ত উপবাসব্রতাচরণবিধিও তাহা হইলে সঙ্গত হয়[৬]। শূলপাণিও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

অষ্টমীর উপবাসের পরদিন মাংস প্রভৃতি দ্বারা পারণের বিধান থাকায় যাহারা সঙ্কল্প করিয়া মহাষ্টমীব্রত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পিতৃমরণাদি ঘটিলেও মহাষ্টমীর উপবাস অপরিহার্য, সুতরাং পরদিন মৎস্য-মাংসাদি দ্বারা পারণ তথাবিধ অশৌচকালেও তাহাদের প্রসঙ্গাধীন অপরিহার্য হইয়া ওঠে। এই আশঙ্কা-পরিহারের জন্য রঘুনন্দন বলেন—যাহা মানুষের নৈসর্গিক কোন প্রকার ইচ্ছাবশতঃ অথবা শাস্ত্রবচন দ্বারা পূর্বে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না—এইরূপ কার্যের নাম বিধি। আর যে কার্য রাগ বা ইচ্ছাবশতঃ কর্তব্য এবং তদভাবে অকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, এইরূপ কার্যের অবশ্য কর্তব্যত্ব প্রতিপাদনের নাম নিয়ম। অতএব পূর্বোক্ত দেবীপুরাণের বচন দ্বারা যাহাদের পক্ষে মাংসভোজন নিষিদ্ধ বা যাহারা নিয়মপূর্বক মাংসত্যাগী তাহাদের পক্ষে যে মাংস-ভোজনের বিধান করা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু মৎস্য ও মাংসের নৈবেদ্য দান-পূর্বক ইহা কর্তব্য—এইরূপই বচনের অর্থ, তাহা না করিলে ইহার শ্রুতিতে বাক্যভেদ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মহাষ্টমীর উপবাসের পারণের দিন রবিবারাদি হইলে মৎস্য মাংস ভোজন ব্যতিরেকেও পারণ সিদ্ধ হইবে।

অষ্টমীর উপবাসসম্বন্ধে রঘুনন্দন কর্তৃক শাস্ত্রীয় নির্দেশ

দুর্গাপূজায় হোমের পর জল দ্বারা অগ্নিকে শীতল করিয়া ঈশান কোণের দিকে স্রুক্ বা স্রুব দ্বারা ভস্ম সরান কর্মটি করিতে হয়। তারপর ললাট, কণ্ঠ ও উভয় স্কন্ধে হোমের ফোঁটা দিতে হয়। পরে শান্তি, অচ্ছিদ্রাবধারণ মন্ত্রের পাঠ, অনন্তর দক্ষিণা এবং গ্রহ প্রভৃতির বিসর্জন কর্তব্য। শান্তি শব্দের অর্থ এখানে মহাবামদেব্য ঋষি ইত্যাদি মন্ত্রের গান অর্থাৎ যাহা পাঠ করতঃ শান্তিজল দেওয়া হয়। কারণ আমরা ছন্দোগপরিশিষ্ট বচনে দেখিতে পাই যে[৭] সর্বত্রই 'আদিতে অনুমন্ত্র'

---

(৬) যস্মিন্ দিনে মহাষ্টমীপূজা তস্মিন্ দিনে এবোপবাসো ন তু সন্ধিপূজাদিনে, অষ্টমীত্বেনোপ-বাসবিধানাৎ।

যথাতথৈব পূতাত্মা হবিষ্যান্নাদিনা। অত্র কালীপুরাণীয়বচনোত্তরার্দ্ধে পুত্রবত উপবাসেতর-হবিষ্যান্নাদিনা পূজাবিধানাত্তস্য পূজাঙ্গমহাষ্টমীনিমিত্তকোপবাসস্য নিষেধো, ন তু প্রতিমাসকর্তব্যাষ্টমী-নিমিত্তকোপবাসনিষেধ ইতি শ্রীকরঃ। [দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ১৭]

(৭) শান্তি র্বামদেব্যগানাদিঃ—পর্য্যুক্ষণঞ্চ সর্বত্র কর্তব্যমদিতেঽন্বিতি।
অন্তে চ বামদেব্যস্য গানমিত্যথবা ত্রিধা॥
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৯]

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ প্রদক্ষিণ করা কর্তব্য এবং কার্যের শেষে 'মহাবামদেব্য' ইত্যাদি মন্ত্রের সুর করিয়া গান করা বিধেয়। যদি কেহ যথাযথ স্বরসংযোগে গান করিতে অসমর্থ হয়, তবে ঐ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। বর্তমানকালে কেবল মন্ত্রপাঠেই শান্তিজল প্রদান করা হইয়া থাকে।

অবধারণ অর্থে অচ্ছিদ্রাবধারণ। এই অচ্ছিদ্রাবধারণ কার্যটি যদিও বশিষ্ঠের বচনে দক্ষিণা দিবার পূর্বে পঠিত হইয়াছে, তাহা হইলেও দক্ষিণাদানের পরই উহা কর্তব্য। এখানে পাঠক্রমের আদর হইবে না। কারণ নারদ বলিয়াছেন[৮]—যে মনুষ্য দক্ষিণা না দিয়া শুভকার্যে বৃথা অচ্ছিদ্রাবধারণরূপ ব্রাহ্মণের বাক্য গ্রহণ করে, সে ঘোর নরকে গমন করে। এইজন্য ভবদেবভট্টও বামদেব্য গানের পরই দক্ষিণা দিবার কথা বলিয়াছেন[৯]। আর বশিষ্ঠ দক্ষিণা দিবার পরই বিসর্জন করিবার কথা বলিয়াছেন। শ্রাদ্ধেও দক্ষিণাদানের পরই ব্রাহ্মণগণের বিসর্জন দৃষ্ট হয় এবং কর্মের যে অঙ্গটি করিবার জন্য কোন একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট হয় নাই, তাহা ঐ প্রধানভূত কর্মের জন্য নির্দিষ্ট কালেই করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় শারদীয়া পূজার দক্ষিণা নবমীতেই দেওয়া উচিত। এসম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ আছে। কারণ মৎস্যসূক্তে আছে—ঐশ্বর্যাভিলাষী ব্যক্তি নবমীতে পূর্ববৎ পূজা করিবে এবং আচার্যকে দক্ষিণাস্বরূপ একজোড়া বস্ত্র প্রদান করিবে।

অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক নিবন্ধে দেবী-বিসর্জনের পর যে দক্ষিণা প্রদানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা রঘুনন্দনের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে[১০]। কারণ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বলিদানপূর্বক শিবাকে প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিবে এবং শ্রবণাযুক্ত দশমীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবে—এইরূপ বিধান থাকায় এবং

---

(৮) বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্ণাতি মনুজঃ শুভে।
অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

ইতি নারদীয়াৎ। অতএব ভবদেবভট্টেনাপি বামদেব্যগানানন্তরং দক্ষিণোক্তা। এবং বশিষ্ঠেন দক্ষিণানন্তরং বিসর্জনাভিধানেন শ্রাদ্ধেঽপি তথাদর্শনেনানির্দিষ্টকালাঙ্গস্য প্রধানকালকর্তব্যত্বেন শারদ্যাঃ পূজায়া নবম্যামেব দক্ষিণা দেয়া। ব্যক্তং মৎস্যসূক্তে—

নবম্যাং পূর্ববৎ পূজা কর্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
দক্ষিণাং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ আচার্যায় নিবেদয়েৎ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০]

(৯) ঋচো গীত্বা শান্তিং কুর্যাৎ। গানাশক্তৌ ত্রিধা পঠেৎ। ততো দক্ষিণাং দত্ত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্যাৎ। [কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, পৃঃ ৩৯-৪১]

(১০) ন তু দেবীবিসর্জনানন্তরং দক্ষিণেতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যুক্তং যুক্তম্। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০]

আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীকে বোধিত করিবে, মূলানক্ষেত্রে দেবীকে গৃহে প্রবেশ করাইবে এবং পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্রে পূজা করিয়া শ্রবণাতে বিসর্জন করিবে —এইরূপ যেমন পূজার নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেও নবমীতিথিযুক্ত উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রেই যে দেবীপূজার শেষ হইয়া যাইবে, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। কৃত্যকল্পলতাধৃত ভবিষ্যোত্তরের বচন দ্বারা দেবীর পূজা যে নবমীতেই শেষ হইয়া যায় ইহা বুঝা যায়। পূজারূপ কর্মের যখন সেইদিনই শেষ হইতেছে, তখন সেই নবমীর দিনই দক্ষিণা দেওয়া উচিত। কারণ ছন্দোপরিশিষ্টেও কর্মের অন্তেই দক্ষিণা দিবার বিধান করা হইয়াছে।

দক্ষিণা সম্বন্ধে রঘুনন্দনের নির্দেশ।

এখানে উল্লেখযোগ্য, রঘুনন্দন এই যে নবমীতে দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত হইয়া আছে। কিন্তু দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী মতে যে দশমীর দিন বিসর্জনান্তে দক্ষিণা দান করিতে হয়, রঘুনন্দন তাহা খণ্ডন পূর্বক নবমীতে দক্ষিণার ব্যবস্থা করিলে এখন পর্যন্ত কেহ কেহ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীমতে দুর্গাপূজা করিলেও নবমী দিনেই তাঁহারা দক্ষিণা দান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় সমাজে রঘুনন্দনের প্রাধান্য অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। শূলপাণি এবং শ্রীনাথও নবমীর পর দক্ষিণাদানের কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মত খণ্ডন করিয়া নবমীতে পূজার অন্তে দক্ষিণাবিধান সম্পর্কে শাস্ত্রীয়বিধি দৃঢ়রূপে স্থাপিত করেন নাই। রঘুনন্দনই এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। এইজন্য আমরা দেখি বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা রঘুনন্দন নির্দেশিত রীতিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শাবরোৎসব

আবার দেখা যায় শাবরোৎসবের সহিত দেবী দুর্গার বিসর্জন বিধেয়। এই শাবরোৎসবে অশ্লীল নৃত্যগীত ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পূর্বযুগে ইহা সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, পরবর্তী যুগে রঘুনন্দন শাবরোৎসব সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। ইহাতে মনে হয় পরবর্তী যুগে এই রীতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল না এবং রঘুনন্দনও তাহা অনুমোদন করেন নাই। পূর্বযুগে যে অশ্লীলতা সমাজে কত বেশী প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাই জীমূতবাহন তাঁহার কালবিবেক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শবরের ন্যায় পর্ণ প্রভৃতির দ্বারা আবৃত ও কর্দমে লিপ্ত শরীর লইয়া নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ নৃত্যগীত সহকারে ক্রীড়া, কৌতুক ও মঙ্গলের সহিত যে উৎসব করা হয়, তাহাই শাবরোৎসবনামে খ্যাত। ইহাতে ভগলিঙ্গাভিধান

[illegible] একে অপরকে গালাগালি দিবে। যে এই প্রকার অপরকে গালাগালি করে না অথবা অপরে এই গালাগালি দেয় না দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোর শাপ প্রদান করেন[১১]। এই সম্বন্ধে জীমূতবাহন যে সমস্ত বচন আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সভ্য সমাজে একেবারেই আলোচনার অযোগ্য।

শূলপাণিও এই শাবরোৎসবের নির্দেশ দিয়াছেন[১২]। শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিও এই বিষয় উল্লেখ করেন[১৩]। গোবিন্দানন্দও পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মত শাবরোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন[১৪]। কিন্তু রঘুনন্দন সমাজকে রক্ষা করিতে তৎপর হইয়া সমাজের এই অশ্লীলতাকে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। এইজন্য তিনি শাবরোৎসবের আলোচনাও করেন নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপৎ হইতে পর পর তিথিতে করণীয় বিষয় বলিতে গিয়া তিনি বলেন—প্রতিপৎ তিথিতে কেশসংস্কারক দ্রব্য দান ইত্যাদিক্রমে আরম্ভ করিয়া অষ্টমীতে উপবাস ও অষ্ট-শক্তির পূজা, নবমীতে দিবা উগ্রচণ্ডীর পূজা, দেবীর পূজা, বলিদান, কুমারীপূজা, দশমীতে শাবরোৎসবের সহিত বিসর্জন ইত্যাদি। এইরূপে কেবল ভবিষ্যপুরাণের বচন প্রসঙ্গক্রমে বলিলেও অপর কোনও স্থানে তিনি তাহার আলোচনা করেন নাই[১৫]।

সমাজোপযোগী রঘুনন্দনের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা

৫। বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন কৃত্য

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে দশহরা নিমিত্ত গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপক্ষয় হইয়া থাকে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দশহরায় গঙ্গায় স্নানই বিধেয় বলিয়া উল্লেখ

(১১) শবরবর্ণ ইব পর্ণাদ্যাবৃতঃ কর্দমালিপ্তশরীরো নানাবিধাসম্বন্ধবল্গিতনৃত্যগীতাদিপরো ভূত্বেতি শাবরোৎসবপদার্থঃ। ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈরিত্যস্যায়মেবার্থঃ। তথা—

ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ ক্রীড়য়েয়ুরলং জনাঃ॥
পরৈ র্নাক্ষিপ্যতে যস্তু যঃ পরান্ নাক্ষিপত্যপি।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাৎ সুদারুণম্॥

[কালবিবেকোক্ত দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ৩৩]

(১২) দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ২৪।

(১৩) শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকৃত দুর্গোৎসববিবেক, পৃঃ ৫১।

(১৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮।

(১৫) সংপূজ্য প্রেষণং কুর্যাদ্ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৪০]

করেন[১]। কিন্তু কৃত্যতত্ত্বে তিনি যদিও সুমহাপাতক, উপপাতক প্রভৃতি দশবিধ পাপক্ষয় যে কোনও নদীতে স্নান দ্বারাও হইতে পারে বলিয়া প্রাচীন ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন[২], তথাপি তাঁহার মতে গঙ্গায় স্নানই মুখ্য কল্প ও তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এইজন্য তিনি তিথিতত্ত্বে যে-কোনও নদীতে স্নানকে গঙ্গার স্বতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা না মানিলে নানাবিধ কল্পনা করিতে হয়। আবার এই স্নানকালে যে মন্ত্রপাঠ করিতে হয় তাহাতেও জাহ্নবীপদ পাওয়া যায়।

দশহরা

কিন্তু শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি দশহরায় নদীমাত্রে স্নানই বিধেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। গোবিন্দানন্দও ইহা স্বীকার করেন। তবে তাঁহার মতে হস্তানক্ষত্রে তর্পণ ব্যতীত গঙ্গায় স্নান করিলে দশবিধপাপক্ষয়রূপ ফল পাওয়া যায়। সতর্পণ স্নানে ফলাধিক্য ঘটে। কিন্তু নদীমাত্রে স্নানে হস্তাযোগ থাকিলেও ফলাধিক্য হয় না, কারণ উহাতে বিশেষ প্রমাণমূলক বচন পাওয়া যায় না[৪]।

জীমূতবাহনও তাঁহার কালবিবেক গ্রন্থে যে কোনও নদীতে স্নান অনুমোদনপূর্বক বিশেষরূপে বলেন যে কেবল দশমী স্বল্পফল দান করে, হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তদধিক ফল প্রদান করে, মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী মহাফল প্রদান করে। কিন্তু তিনি গঙ্গায় স্নান সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই[৫]।

আবার মৈথিল নিবন্ধকারগণের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র এবং চণ্ডেশ্বরঠাকুরও নদীমাত্রে স্নানই বিধেয় বলিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র গঙ্গাস্নানবিষয়ক বচন উদ্ধৃত

---

(১) বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণভবিষ্যে জাহ্নবীপদশ্রবণাৎ হেতুবন্নিগদস্বরসাচ্চ ব্রহ্মবৈবর্তেঽপি সরিৎপদং জাহ্নবীপরমন্যথা নানাবিধিঃ স্যাৎ। যাং কাঞ্চিদিতি তু জাহ্নবীস্তাবকমন্যথা কুল্যাস্নানেঽপি দশবিধপাপক্ষয়ঃ স্যাৎ মন্ত্রলিঙ্গে জাহ্নবীতি পদশ্রবণাচ্চ।

যথা ভবিষ্যপুরাণম্—জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাস্তু হস্তযোগেন জাহ্নবী।

হরতে দশপাপানি তস্মাদ্দশহরোচ্যতে ॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ২৪]

(২) তত্র যস্যাং কস্যাঞ্চিন্ নদ্যাম্ুদয়গামিন্যাং জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাং..................করিষ্যে। এবং দানেঽপি। গয়ায়ান্তু অদ্যেত্যাদি দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমিত্যাদি···। [কৃত্যতত্ত্ব, পৃঃ ৫০০]

(৩) কেবলদশম্যাঃ সংবৎসরবোধনং নদীমাত্রে তিলোদকতর্পণাঙ্গকস্নানস্য দশপাপক্ষয়ঃ ফলং প্রতীয়তে, এবং দানস্যাপি। [কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৪৩ ক]

(৪) অত্র গঙ্গায়াং তর্পণং বিনাপি হস্তাযোগে দশবিধপাপক্ষয়ঃ ফলং সতর্পণস্নানে তু ফলাতিশয়ঃ। অন্যনদ্যাস্তু হস্তাযোগেঽপি ফলাধিক্যং নাস্তি বিশেষাশ্রবণাৎ। [বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২৭৯]

(৫) তত্র স্কন্দপুরাণে—যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য·········কেবলা দশমী স্বল্পফলা, হস্তর্ক্ষযুক্তা তদধিকফলা, ভৌমবারহস্তর্ক্ষযুক্তা মহাফলা। [কালবিবেক, পৃঃ ৪০১]

করিলেও কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই[৬]। চণ্ডেশ্বর নদীমাত্রে স্নানে দশবিধ পাপনাশরূপ ফল হয় বলেন। আর মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠশুক্লা দশমীতে গঙ্গায় স্নান অশ্বমেধযজ্ঞের শতগুণফল এবং দশবিধপাপক্ষয়ের কথা অনুমোদন করেন[৭]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গীয় ও মৈথিল নিবন্ধকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই দশহরায় সরিৎমাত্রে স্নানই প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও রঘুনন্দনের মতে যে গঙ্গায় স্নান বিধেয় বলা হইয়াছে তাহাই সমাজে এখনও প্রচলিত হইয়া আছে।

ভীষ্মতর্পণ

আবার দেখা যায় রঘুনন্দন বলেন—মাঘমাসের শুক্লা অষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিতে হয়। ইহাতে সংবৎসরকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশপ্রাপ্ত হয়। এই ভীষ্মতর্পণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণেরই অধিকার আছে[৮]।

শ্রীনাথও ইহা স্বীকার করেন[৯]। কিন্তু গোবিন্দানন্দ ইহাতে কেবলমাত্র দ্বিজাতিগণের অধিকার বলিয়া মতপ্রকাশ করেন[১০]। জীমূতবাহনও সকলবর্ণের অধিকার অনুমোদন করেন[১১]। মৈথিল নিবন্ধকারগণের মধ্যে চণ্ডেশ্বরও গৌড়ীয়-নিবন্ধ উল্লেখপূর্বক সর্ববর্ণেই অধিকার স্বীকার করেন[১২]।

এক্ষণে দেখা যায় নিবন্ধকারগণ প্রায় সকলেই ভীষ্মতর্পণে শূদ্রগণেরও অধিকার

---

(৬) কৃত্যচিন্তামণি, পৃঃ ৭।

(৭) মঙ্গলবারহস্তযুক্তজ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যামেবংবিধঃ পুণ্যসঞ্চয়ো দশবিধপাপক্ষয়শ্চ ফলং গঙ্গায়াম্। সরিন্মাত্রে তু দশবিধপাপনাশনম্। ক্বচিন্ মহাপাতকনাশনমিতি পাঠঃ। [কৃত্যরত্নাকর, পৃঃ ১৮৮]

(৮) অষ্টম্যাস্তু সিতে পক্ষে ভীষ্মায় সতিলোদকম্।
অন্নঞ্চ বিধিবদ্দদ্যুঃ সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥
সর্বে বর্ণা ইত্যুপাদানাৎ ব্রাহ্মণশূদ্রয়োরপ্যধিকারঃ। দ্বিজাতয় ইতি সম্বোধনম্।

[তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ২৩]

(৯) অত্র দ্বিজাতিগ্রহণাৎ শূদ্রস্য নাধিকার ইতি ভ্রান্তাঃ। সর্বে বর্ণা ইতি বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, তস্মাৎ দ্বিজাতয় ইতি সম্বোধনমেব। [কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৭২ ক]

(১০) অত্র ত্রয়ো বর্ণা ইত্যভিধানাৎ শূদ্রস্য নাধিকারঃ। অন্যে তু—সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয় ইতি পঠিত্বা বর্ণপদবৈয়র্থ্যভিয়া শূদ্রেণাপীদং কর্তব্যমিতি বদন্তি। তন্ন, দ্বিজাতয় ইত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ বর্ণা ইতি তু অসবর্ণনিষেধপর্য্যুদাসসূচনার্থম্। [বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৫০৩]

(১১) কালবিবেক, পৃঃ ৪২৩-৪২৪।

(১২) এতস্য গৌড়স্মৃতিরাচারো বা প্রাপকং প্রমাণমিতি, তদ্বলাৎ সর্ববর্ণবিষয়তা।

[কৃত্যরত্নাকর, পৃঃ ৫১০]

প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবল গোবিন্দানন্দ ইহার বিরোধিতা করিলেও সমাজে তাহা প্রচলিত হয় নাই।

এখানে শূদ্রগণের অধিকারপ্রসঙ্গে শ্রীনাথ বলেন যে, শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে শূদ্রগণও মন্ত্রপাঠ করিবে। কারণ 'অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ' এবং 'যে সমানাঃ' এই মন্ত্র দুইটি প্রধান শরীর ঘটক বলিয়া এই মন্ত্রপাঠে স্ত্রী ও শূদ্রদের অধিকার কল্পনা করা হইয়াছে। আবার বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধেও 'এনং যুবানং' এই মন্ত্রপাঠে শূদ্রাধিকার আছে। গোবিন্দানন্দ শ্রীনাথের এই অভিমত কঠোরভাবে আলোচনাপূর্বক হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রাদ্ধে কেবল 'নমঃ' এই মন্ত্রদ্বারাই অদৃষ্ট সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণই শূদ্রের শ্রাদ্ধসময়ে মন্ত্রপাঠ করিবে। অতএব শূদ্রের মন্ত্রপাঠ কল্পনা করা অন্যায়[১৩]।

শূদ্রগণের অধিকার

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীনাথ এইরূপে শূদ্রদের প্রাধান্য কল্পনা করিলেও রঘুনন্দন তাহা অনুমোদন করেন নাই। রঘুনন্দনের মতে শূদ্র মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিবে। সেখানে ব্রাহ্মণই শূদ্রের পক্ষে মন্ত্রপাঠ করিবে[১৪]। আবার রঘুনন্দন মৈথিলমত খণ্ডন করিয়া বলেন—শ্রাদ্ধে শূদ্রদের পুরাণমন্ত্রপাঠও নিষিদ্ধ। স্নান, শ্রাদ্ধ, পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন অন্যস্থানে শূদ্রের পৌরাণিক মন্ত্রপাঠ বিধেয়[১৫]।

সমাজে শ্রীনাথের অভিমত প্রচারিত হয় নাই। রঘুনন্দনের মতই সমাজে প্রচলিত হইয়া আছে।

---

(১৩) আধুনিকাস্তু—অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ।
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যামেতজ্‌জ্ঞেয়ং সপিণ্ডনম্‌ ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণাৎ মন্ত্রদ্বয়স্য প্রধানশরীরঘটকত্বাবধারণাৎ তত্রাধিকারবোধকবিধিনৈব স্ত্রীশূদ্রয়োর্যে সমানা ইতি মন্ত্রদ্বয়পাঠেঽধিকারঃ কল্প্যতে। অতএব অনয়োরেবোৎসৃজেরন্নিতি পারস্করে এবকারেণ বাক্যান্তরনিরাসাৎ বৃষোৎসর্গে এনং যুবানমিতি মন্ত্রপাঠে শূদ্রাধিকার ইত্যাহুঃ, তন্‌মন্দম্‌।

নমো মন্ত্রেণৈব সপিণ্ডীকরণজন্যাদৃষ্টসিদ্ধেঃ দৃষ্টার্থপ্রকাশস্য চ ব্রাহ্মণপঠিতমন্ত্রাদেবজাতত্বাৎ ত্রৈবর্ণিকগোচরতয়া তু বিধেশ্চরিতার্থত্বাৎ যে সমানা ইতি মন্ত্রে শূদ্রস্যাধিকারকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ।
[শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৩৬-৪৩৭]

(১৪) অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জিতঃ।
অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে ॥

ইতি বরাহপুরাণাৎ। অয়ং শ্রাদ্ধেতিকর্তব্যতাকো বিধিঃ শূদ্রকর্তৃকমন্ত্রপাঠরহিতঃ।
[শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্ব, পৃঃ ৪০৭]

(১৫) শ্রাদ্ধে পুরাণমন্ত্রঃ শূদ্রেণ পঠনীয় ইতি মৈথিলোক্তং তন্ন, বরাহপুরাণে শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জিত ইত্যনেন মন্ত্রমাত্রনিষেধাৎ মৎস্যপুরাণেন নমস্কারেণ মন্ত্রেণ ইত্যুপাদানাচ্চ পৌরাণিকস্যাপি শ্রাদ্ধে নিষেধঃ প্রতীয়তে, এবং স্নানেঽপি।............ততশ্চ স্নানশ্রাদ্ধপঞ্চযজ্ঞেতরত্র শূদ্রস্য পৌরাণিকমন্ত্রপাঠঃ প্রতীয়তে। [ঐ, পৃঃ ৪০৭]

ধিতা করিলেও সমাজে

শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে শূদ্রগণও
প্রসেচয়েৎ' এবং 'যে
শরীর ঘটক বলিয়া এই
কল্পনা করা হইয়াছে।
শূদ্রাধিকার আছে।
চনাপূর্বক হেয় পতিপন্ন
দ্বারাই অদৃষ্ট সিদ্ধ হয়।
মন্ত্রপাঠ কল্পনা করা

াধান্য কল্পনা করিলেও
শূদ্র মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে
করিবে[১৪]। আবার
পুরাণমন্ত্রপাঠও নিষিদ্ধ।
বিধেয়[১৫]।
নন্দনের মতই সমাজে

ব্রবোধকবিধিনৈব স্ত্রীশূদ্রয়ো
ন্নিতি পারস্করে এবকারেণ
ঃ, তন্ মন্দম্।
ব্রাহ্মণপঠিতমন্ত্রাদেরজাতত্বাৎ
কল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ।
ক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৩৬-৪৩৭]

পাঠরহিতঃ।
দ্রাহ্নিকাচারতত্ত্ব, পৃঃ ৪০৭]
পুরাণে শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জিত
চ্চ পৌরাণিকস্যাপি শ্রাদ্ধে
ত্র শূদ্রস্য পৌরাণিকমন্ত্রপাঠঃ

আবার দেখা যায় গোবিন্দানন্দের মতে গ্রহণের সময়ে অশৌচ থাকিলে স্নান অবশ্য কর্তব্য এবং দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিও করিতে পারিবে[১৬]। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে অশৌচের সময়ে গ্রহণ উপস্থিত হইলে শুধুমাত্র স্নান বিধেয়. কিন্তু দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করা নিষেধ। কারণ প্রমাণ আছে যে জনন ও মরণাশৌচে রাহুদর্শন করিলে দোষ হয় না। তখন স্নানমাত্র কর্তব্য, দান ও শ্রাদ্ধ বর্জনীয়[১৭]। সমাজে রঘুনন্দনের মত অনুসারে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

এই প্রকার আলোচনা হইতে দেখা যায় যে সর্বত্র রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অনুসারেই সমাজের বিধিনিষেধ অনুসৃত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিলেও তাহা কেহ গ্রহণ করে নাই। রঘুনন্দন প্রমাণ বাক্য অনুসারে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহাই সকলে গ্রহণ করিয়াছে।

আবার সাবিত্রীব্রত, অনন্তচতুর্দশীব্রত, শিবরাত্রিব্রত, ইত্যাদিতে তেমন কিছু সংস্কার রঘুনন্দন করেন নাই। কিন্তু এইগুলিতে স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মকার্যে নিরত ও কর্ত্রীত্ব করিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে দেখা যায় বর্তমানকালে স্ত্রীলোকেরাই হিন্দুধর্ম বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

৬। তিথি, মাস ইত্যাদি

চন্দ্রের এক একটি কলা তিথিরূপে প্রতিভাত হয়। হেমাদ্রি ও কালমাধব গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে যে[১]—চন্দ্রমণ্ডলের ষোল ভাগের এক ভাগকে এক একটি কলা

(১৬) গ্রহণস্নানশ্রাদ্ধাদিকমশৌচেঽপি কার্যম্।...........
সূতকে মৃতকে নৈব সূতকং রাহুদর্শনে।
তাবদেব ভবেচ্ছুদ্ধি র্যাবন্ মুক্তি র্ন দৃশ্যতে॥
সূতকে মৃতকে ইতি কর্মানধিকারোপলক্ষকং ন তু নৈমিত্তিকোচ্ছেদঃ কর্তব্যো হি কথঞ্চনেত্যত্র কথঞ্চনেত্যভিধানাৎ। [বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ১০৭]

(১৭) অত্রাশৌচেঽপি সাঙ্গং স্নানং কর্তব্যং ন শ্রাদ্ধাদি।
তথা চ সংবৎসরপ্রদীপগঙ্গাবাক্যাবল্যোঃ স্মৃতিঃ—
সূতকে মৃতকে চৈব ন দোষো রাহুদর্শনে।
স্নানমাত্রন্তু কর্তব্যং দানশ্রাদ্ধবিবর্জিতম্॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৬২]

(১) হেমাদ্রিকালমাধবীয়য়োঃ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডম্—
অমা ষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥ [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১]

বলে। উহাদের মধ্যে 'অমা' (অমাবস্যা) নামে একটি মহাকলা আছে। উহাই পরমা মায়া অর্থাৎ ঈশ্বরের অদ্ভুত কার্যসম্পাদিকা শক্তিস্বরূপা এবং দেহীদিগের দেহধারিণী অর্থাৎ আধারশক্তিরূপা। ঐ অমাকলা হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত চন্দ্রের যে ষোলটি কলা আছে উহারা সকলেই তিথি নামে অভিহিত হয়। অমাবস্যা মহাকলারূপে অভিহিত, এইজন্য উহা নিত্য এবং মালার মধ্যস্থিত সূত্র যেমন মালার অন্তর্গত সকল পুষ্পের সহিত সম্বদ্ধ, সেইরূপ উহাও অপর সকল কলার সহিত সম্বদ্ধ। ঐ অমাবস্যা ছাড়া পৌর্ণমাস্যন্ত অপর পনরটি কলা প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর সেই অমাবস্যা কলা ঐ পনরটি কলার সহিত সম্বদ্ধ থাকায় উহাও তিথিরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ষোলটি কলাই তিথি হইল। চন্দ্রের কলা কখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি হয় তাহার নাম শুক্লপক্ষ এবং যখন চন্দ্রের ক্ষয় হয় তাহার নাম কৃষ্ণপক্ষ। প্রতি পক্ষেই প্রতিপৎ প্রভৃতি পনরটি তিথি যথাক্রমে হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষে ঐ সকল তিথির অন্তে অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষে উহাদের অন্তে পূর্ণিমা হয়। সূর্যসিদ্ধান্তে তিথির স্বরূপ কথিত হইয়াছে[২]—একরাশিতে অবস্থিত সূর্যমণ্ডল হইতে বিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ চন্দ্র যে পূর্বমুখে গমন করতঃ ত্রিশ অংশে বিভক্ত হইয়া এক একটি রাশির দ্বাদশ অংশ ভোগ করে তাহাই অর্থাৎ পূর্বমুখগামী চন্দ্র কর্তৃক এক একটি রাশির ঐরূপ দ্বাদশাংশ ভোগরূপ ক্রিয়া অথবা তদুপলক্ষিত কাল এক একটি তিথি, ঐ এক একটি তিথিকে এক একটি চান্দ্র দিন বলে। এই তিথিকে বলে শুক্লপক্ষীয় তিথি, আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতি তিথিতে চন্দ্র দূর হইতে ঐরূপ দ্বাদশ অংশ ভোগ করিয়া সূর্যমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয়। গোভিলের বচন হইতে পাওয়া যায় যে সূর্য এবং চন্দ্রের যখন পরম সন্নিকর্ষ হয় অর্থাৎ উভয়ে খুব নিকটে থাকে তখন উহাকে বলা হয় অমাবস্যা। আর সূর্য ও চন্দ্রের যখন পরম বিপ্রকর্ষ হয় অর্থাৎ খুব দূরে থাকে তখন হয় পূর্ণিমা[৩]। এই অমাবস্যা সূর্য ও চন্দ্রের সমসূত্রপাতে একই রাশির একাংশে অবস্থিতি বুঝায়। আর পরম বিপ্রকর্ষ অর্থে সূর্য ও চন্দ্রের সপ্তম রাশিতে অবস্থিতি বুঝায়।

তিথির স্বরূপ

শুক্ল প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত তিথি মাসের আদিতিথি। এই তিথি-

(২) অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্‌যাত্যহরহঃ শশী।
ভাগৈর্দ্বাদশভিস্তৎ স্যাত্তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনম্ ॥ ইতি সূর্যসিদ্ধান্তোক্তেন। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১]

(৩) তথাহি গোভিলঃ—সূর্যাচন্দ্রমসো র্যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সা অমাবস্যা।........
সূর্যাচন্দ্রমসো র্যঃ পরো বিপ্রকর্ষঃ সা পৌর্ণমাসী। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১]

ঘটিত মাসকে চান্দ্রমাস বলা হয়। রঘুনন্দন এই চান্দ্রমাসকেই মুখ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমে লঘুহারীতের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে[4]—ইন্দ্র এবং অগ্নি এই উভয় দেবতার উদ্দেশে যে তিথিতে হবন করা হয় তাহাই মাসাদি অর্থাৎ সেই তিথি হইতে মাসের আরম্ভ হইবে। তাহার পর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে ইন্দ্র এবং অগ্নি এই উভয় দেবতার উদ্দেশে কর্তব্য দর্শযাগে অমাবস্যাতে হবন বিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অমাবস্যাতে অগ্ন্যাধানমাত্র করা হয়, তৎপরবর্তী প্রতিপৎ তিথিতেই যাগের অঙ্গস্বরূপ হবনের সমাপ্তি হইয়া থাকে; সুতরাং শুক্লপ্রতিপৎই মাসের আদিভূত তিথি। মাসের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রতিপদে অগ্নি ও সোম একযোগে হবনীয়রূপে স্মৃত হইয়াছে এবং মাসের সমাপ্তিতে অর্থাৎ অমাবস্যাতে পিতৃসহিত সোম হবনীয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে। লঘুহারীতের এই বচনে ত্রিশটি তিথিতে মাস হয়—এইরূপ মোটামুটি মাসের পরিভাষা করিয়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে কর্তব্য বিশেষ বিশেষ কার্যের উল্লেখ সহকারে যে মাসের আদি, মধ্য এবং সমাপ্তির পরিভাষা করা হইয়াছে তাহাতে মাসশব্দটিকে প্রধানতঃ শুক্লপ্রতিপৎ হইতে অমাবস্যান্ত কালের বাচকরূপে প্রতিপাদন করাই হারীতমুনির অভিপ্রেত বলিয়া জানা যাইতেছে, তথাবিধকালই মাসের মুখ্য অর্থ। আর কৃষ্ণপ্রতিপদাদি পৌর্ণমাস্যন্ত ত্রিশটি তিথির দ্বারা ঘটিত চান্দ্রমাস গৌণচান্দ্র নামে অভিহিত এবং সেই সঙ্গে ইহাও সূচিত করা হইয়াছে যে গৌণচান্দ্র সাবন, সৌর প্রভৃতি মাসে যে মাসশব্দের ব্যবহার করা হয় তাহাতে মাসশব্দের গৌণ অর্থ।

মাসের স্বরূপ

মাস চার প্রকার[5]—চান্দ্র, সৌর, সাবন ও নাক্ষত্র। শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত কাল চান্দ্রমাস। ত্রিশটি দিন পূর্ণ হইলে একটি সাবনমাস হয়। সূর্য যে কাল পর্যন্ত এক রাশিতে অবস্থান করে, ঐ কালকে সৌরমাস বলে এবং সমস্ত নক্ষত্রের একবার পরিবর্তনে একটি নাক্ষত্রমাস হয়। কতকগুলি কর্ম চান্দ্রমাসেই কর্তব্যরূপে বিহিত, কতকগুলি কর্ম সৌরমাসেই বিহিত, কতকগুলি সাবনমাসে এবং কতকগুলি নাক্ষত্রমাসে—ইহা

মাসের শ্রেণীবিভাগ

---

(৪) তত্র লঘুহারীতঃ—ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে মাসাদিঃ স প্রকীর্তিতঃ।
অগ্নীষোমৌ স্মৃতৌ মধ্যে সমাপ্তৌ পিতৃসোমকৌ॥
যত্র শুক্লপ্রতিপদি। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬০]

(৫) ত্রিংশদহোরাত্রাত্মকঃ সাবনঃ আদিত্যৈকরাশিভোগাবচ্ছিন্নঃ সৌরঃ সপ্তবিংশতিনক্ষত্রাবচ্ছিন্নো নাক্ষত্র ইতি চতুর্বিধা মাসাঃ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬১]

বুঝাইবার জন্যই চার প্রকার মাসের স্বতন্ত্রভাবে পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মাসশব্দের মুখ্যার্থ কেবলমাত্র শুক্লাদিচান্দ্রমাসেই নিরূপিত হইয়াছে। কারণ যতপ্রকার মাস দেখা যায় তাহারা সকলেই যে মাসশব্দের মুখ্যার্থ-প্রতিপাদ্য সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। শুধু তাহাই নহে সেরূপস্থলে মুখ্যার্থবোধক শক্তিকেও ভিন্ন ভিন্ন মাসশব্দে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। সুতরাং তথাবিধ অনেকশক্তি কল্পনায় গৌরবও স্বীকার করিতে হয়। কারণ মুখ্যার্থবোধক শক্তি যে কোন একটি শব্দের একটি মাত্র সাঙ্কেতিক অর্থবোধ করিয়াই নিবৃত্ত হয়। যেমন মাসশব্দের একমাত্র চান্দ্রমাসই মুখ্য, অন্যবিধ মাসরূপ অর্থ লাক্ষণিক, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে একবার মাত্র শক্তির কল্পনা করিলেই চলে, নানাশক্তি কল্পনার জন্য গৌরবপক্ষের আর আশ্রয় করিতে হয় না[৬]। অপর মাসগুলিরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন। যথা পিতামহের বচন আছে[৭]—সাংবৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধে এবং সাধারণ পার্বণ প্রভৃতি পিতৃকার্যে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়, বিবাহাদিতে সৌরমাস এবং সত্রযজ্ঞাদিতে সাবনমাস আদৃত হইবে। বিবাহাদির 'আদি' পদ দ্বারা যাত্রা (বিদেশ গমন প্রভৃতি) এবং গ্রহ-সঞ্চারের বোধ করিতে হইবে। যে সকল কর্ম সূর্যভোগ্য রাশির উল্লেখপূর্বক বিহিত হইয়াছে এবং যে সকল কর্ম বিশেষ করিয়া উত্তরায়ণ ইত্যাদি কালে বিহিত হইয়াছে, আদিপদ দ্বারা ঐ সকল কর্মেরও গ্রহণ হইবে। কারণ সৌরমাস ধরিয়াই অয়নের গণনা করা শাস্ত্রসম্মত। চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি কর্মই বিশেষ করিয়া উত্তরায়ণাদিকালে বিহিত হইয়াছে। আর যজ্ঞাদির 'আদি' পদ দ্বারা সত্র (যাগ), ভৃতি (বেতন), বৃদ্ধি (সুদ ইত্যাদি), প্রায়শ্চিত্ত,

চান্দ্রমাসই মুখ্য

বিভিন্ন মাসের প্রয়োজনীয়তা

(৬) চান্দ্রসৌরসাবননাক্ষত্রমাসোল্লিখিতকর্মসু তে কীদৃশা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং বিষ্ণুধর্মোত্তরাদিবচনস্য তৎপরিচায়কত্বেনোপপত্তৌ মাসশব্দস্য তত্র তত্র শক্তিগ্রাহকত্বে প্রমাণাভাবাৎ। অনেকশক্তিকল্পনে গৌরবাৎ বক্ষ্যমাণযুক্তিভ্যশ্চ চান্দ্র এব শক্তিঃ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬২]

(৭) তত্র পিতামহঃ—আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥

প্রথমাদিপদং যাত্রাগ্রহচারপরম্। যৎকর্মসূর্যভোগ্যরাশ্যুল্লেখেন যচ্চ বিশেষ্যোদগয়নাদিবিহিতং তৎপরঞ্চায়নস্য সৌরমাসঘটিতত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাৎ তচ্চ চূড়োপনয়নাদি। দ্বিতীয়াদিপদং সত্রভৃতিবৃদ্ধি-প্রায়শ্চিত্তায়ুর্দায়াশৌচগর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়ননামকরণান্নপ্রাশননিষ্ক্রমণচূড়াদিপরম্।
[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬২]

দওয়া হইয়াছে। কিন্তু
ত হইয়াছে। কারণ
র মুখ্যার্থ-প্রতিপাদ্য সে
খ্যার্থবোধক শক্তিকেও
হইয়া উঠে। সুতরাং
কারণ মুখ্যার্থবোধক
অর্থবোধ করিয়াই
একমাত্র চান্দ্রমাসই
ক্ষণিক, এইরূপ ব্যবস্থা
নাশক্তি কল্পনার জন্য
রও যে প্রয়োজনীয়তা
আছে৭—সাংবৎসরিক
গ্রহণীয়, বিবাহাদিতে
বিবাহাদির 'আদি'
প্রভৃতি) এবং গ্রহ-
র সকল কর্ম সূর্যভোগ্য
শেষ করিয়া উত্তরায়ণ
র্মেরও গ্রহণ হইবে।
চূড়াকরণ, উপনয়ন
হ। আর যজ্ঞাদির
ত্যাদি), প্রায়শ্চিত্ত,

২ বিষ্ণুধর্মোত্তরাদিবচনস্য
াৎ। অনেকশক্তিকল্পনে

বিশেষোদগয়নাদিবিহিতং
য়াদিপদং সত্রভৃতিবৃদ্ধি-
াদিপরম্।
[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬২]

পরমায়ুগণনা, অশৌচ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন এবং চূড়াকরণ প্রভৃতি কর্মের বোধ করিতে হইবে।

এখানে চূড়াকরণ ও উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম সৌর ও সাবন উভয় মাসেই কর্তব্য বলিয়া যে বিরোধ উপস্থিত হয় রঘুনন্দন তাহার সমাধান করিয়াছেন[৮]। চূড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি কার্যে সংস্কার্য ব্যক্তির বয়সের মাসবর্ষাদির গণনা সাবনমাস হিসাবেই করিতে হইবে। তবে শুভাশুভ ফলের বিবেচনা সৌরমাস অনুসারে বিধেয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, বালকের ছয়মাস বয়সে অন্নপ্রাশন, দুইবৎসর বয়সে চূড়াকরণ, গর্ভাষ্টমে উপনয়ন দিবার যে বিধান করা হইয়াছে—এই সকল মাসবর্ষগণনা সাবনমাস অনুসারে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু মাঘাদি ছয় মাসে চূড়াকরণ ও উপনয়ন শুভফল প্রদান করে; জন্মমাসে, যুগ্মমাসে, যুগ্মবৎসরে, বিশেষতঃ চৈত্র এবং পৌষমাসে প্রথম চূড়াকরণ করিবে না ইত্যাদি বিধানে যে মাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ মাসগণনা সৌরমাস অনুসারেই কর্তব্য।

নাক্ষত্রমাসের প্রয়োজনীয়তাও রঘুনন্দন নিরূপণ করেন[৯]। যথা, বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা আছে—নক্ষত্রসত্রসকল এবং চন্দ্রের অয়ন অর্থাৎ গতিনিমিত্তক যাগসকলের সাতাইশটি নক্ষত্রের ভোগকালরূপ মাসে অনুষ্ঠান কর্তব্য। 'নক্ষত্রসত্র' বলিতে যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ মাস এবং সংবৎসরে নিষ্পাদ্য যাগবিশেষ। চন্দ্রের অয়ন বলিতে সোমায়ন নামে প্রসিদ্ধ সত্র—এই কথা সময়প্রকাশকার বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে কোন সময়ে জন্মনক্ষত্রের সহিত শনি কিংবা মঙ্গলবারের যোগ হইলে সেই মাসে যে অশুভ ফলোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, ঐ অশুভ ফল নাক্ষত্র-মাস হিসাবেই ঘটিয়া থাকে, কারণ নক্ষত্রনিমিত্তক শুভাশুভ ফল নক্ষত্রমাসেই হওয়া উচিত।

অতএব পূর্বোক্ত পিতামহাদির বচন দ্বারা চান্দ্র, সৌর, সাবন এবং নাক্ষত্র মাসে যে সমস্ত কর্ম বিহিত হইয়াছে ঐ শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল কালের পরিচায়ক মাত্র। উহারা 'মাস' এই শব্দের মুখ্যার্থের বোধক নহে।

শূলপাণি তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেকেও চান্দ্রমাসেই শক্তি প্রতিপাদন করেন[১০]।

(৮) ততশ্চূড়োপনয়নাদিষু মাসবর্ষগণনা সাবনেন, শুভাশুভবিবেচনন্তু সৌরেণেতি সিদ্ধম্।
[ঐ, পৃঃ ২৬৪]

(৯) নাক্ষত্রমাসপ্রয়োজনং বিষ্ণুধর্মোত্তরে 'নক্ষত্রসত্রাণ্যয়নাদি চেন্দো র্মাসেন কুর্যাৎ ভগণাত্মকেন'। নক্ষত্রসত্রাণি মাসসাধ্যযাগবিশেষাণি যাজ্ঞিকপ্রসিদ্ধানি ইন্দোরয়নানি সোমায়নাখ্যসত্রাণি ইতি সময়প্রকাশঃ। এবং জন্মনক্ষত্রে শনিভৌমবারফলং নাক্ষত্রমাসেন যোগ্যত্বাৎ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬৬]

(১০) শুক্লপ্রতিপদাদিদর্শান্তো মাসশব্দার্থঃ চান্দ্রোঽপ্যয়মেবেতি দর্শিতম্। অতঃ সিদ্ধং শুক্লপ্রতি-পদাদিদর্শান্তো মাসশ্চান্দ্রঃ স এব মলমাসো ন সৌর ইত্যাহ। [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ১৬৭, ১৭২]

রঘুনন্দন শূলপাণির মত গ্রহণ করিলেও বিষয়বিশেষে তাহা খণ্ডন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

চান্দ্রমাসের শক্তিনিরূপণে বিভিন্নযুক্তি

চান্দ্রমাসে কি প্রকারে শক্তি প্রতিপাদিত হয় তাহার উত্তরে শূলপাণি বলেন[১১] লঘুহারীতের বচনোক্ত 'ইন্দ্র এবং অগ্নিকে যাহাতে হবন করা হয়' ইত্যাদি প্রকারে বুঝিতে হইবে। কিন্তু রঘুনন্দন স্বকীয় যুক্তির প্রামাণ্য দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবার জন্য বলেন শ্রাদ্ধবিবেকের এই মত মনোরম নহে। কারণ 'ইন্দ্রাগ্নির যাহাতে হবন করা হয়' এই লঘুহারীতের উক্তির প্রতি ঐ লঘুহারীতোক্ত অপর বাক্যকে হেতুরূপে কল্পনা করা উচিত নহে। এইজন্য রঘুনন্দন বলেন বিশেষ শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারাই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই শ্রুতি যথা[১২]—উহার নাম বৈশাখের অমাবস্যা যাহা রোহিণীনক্ষত্রের সহিত সম্বদ্ধ হয়। বৃষরাশিভোগ্য রোহিণীযুক্ত অমাবস্যাকে বৈশাখমাসের অমাবস্যা বলিয়া নির্দেশ করে যে শ্রুতি তাহার মাসশব্দের চান্দ্রমাসে শক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। কারণ সৌর বৈশাখে রোহিণীযুক্ত অমাবস্যার অবস্থান সম্ভব হইতে পারে না।

'সূর্য এবং চন্দ্রের অত্যন্ত সন্নিকর্ষের নামই অমাবস্যা' এই গোভিলসূত্রে কৃত চন্দ্র ও সূর্যের বৃষরাশিতে অবস্থানকালেই রোহিণীযুক্ত বৈশাখমাসের অমাবস্যার সম্ভব হইতেছে[১৩]। ব্যাসের বচনে আছে—যাহাদের আরম্ভ প্রথমক্ষণে অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত মাসের আদ্যক্রিয়ার সময়ে সূর্য মীন ও মেষ প্রভৃতি রাশিতে অবস্থিত হন, বৎসরে সেই সকল চান্দ্রমাস বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ায় উহাদিগকে দ্বাদশ মাসই বলিতে হইবে। যদিও মলমাসে একটি মাস অধিক হয়, তথাপি তাহার আর ভিন্ন নাম হইবে না। মলমাসযুক্ত বৎসরে যে মাসটি অধিক হইবে, তাহাকে সেই মাসের নামেই অভিধান করিতে হইবে,

(১১) বিধানেন শাস্ত্রেণ স চান্দ্রো মাসঃ প্রকীর্তিতঃ। তচ্চ ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে ইত্যাদ্যুক্তমেবাহুদপি পঠন্তি। [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ১৮৬]

(১২) শ্রাদ্ধবিবেককৃৎ তন্ন মনোরমং লঘুহারীতোক্তৌ তদুক্তবাক্যান্তরস্য হেতুত্বকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ। কিন্তু বিধানেন শ্রুত্যাদিনা। তথাচ শ্রুতিঃ—সা বৈশাখস্যামাবস্যা যা রোহিণ্যা সম্বধ্যতে। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬৮]

(১৩) সূর্যাচন্দ্রমসো যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সামাবস্যা ইতি গোভিলসূত্রাচ্চন্দ্রার্কয়োরেকরাশ্যবস্থানসমাবস্যেতি বৃষস্থরবাবেব রোহিণীযুক্তামাবস্যায়াঃ সম্ভবাৎ। ব্যাসঃ—

মীনাদিস্থো রবি র্যেষামারম্ভপ্রথমক্ষণে।
ভবেত্তেঽব্দে চান্দ্রমাসাশ্চৈত্রাদ্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬৯]

যেমন চৈত্র মাস মলমাস হইলে দ্বিচৈত্র ইত্যাদি। মলমাসযুক্ত বৎসরে ত্রয়োদশটি মাস হইলেও ব্যাস কর্তৃক উহারা দ্বাদশ মাস নামেই উপদিষ্ট হওয়ায় শুক্লাদি মাসের বোধ করাইতে চৈত্রাদি পদের শক্তি অভিহিত হইয়াছে।

মাসগুলির যে চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে তাহার ব্যুৎপত্তি যথা—চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যাহাতে হয় তাহার নাম চৈত্র, বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যাহাতে হয় তাহার নাম বৈশাখ ইত্যাদি। কিন্তু মাসশব্দের সৌরমাসই মুখ্য প্রতিপাদ্য বলিলে সৌর পৌষ বা মাঘ প্রভৃতি মাসে তথাবিধ ব্যুৎপত্তি সম্ভটিত হয় না। কারণ পুষ্যা বা মঘা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী সৌরপৌষ বা সৌরমাঘে হইতেই পারে না[১৪]।

জীমূতবাহনের মতে সৌরমাসে শক্তি

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীমূতবাহন তাঁহার কালবিবেক গ্রন্থে সৌরমাসে শক্তি কল্পনা করেন। কারণ মাঘপ্রভৃতি দ্বাদশ মাসই শ্রুতি প্রমাণানুসারে যে সৌরমাসের বাচক তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রুতি যথা[১৫]—মাঘ এবং ফাল্গুন এই দুইটি শিশির ঋতুর অন্তর্গত, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্তঋতুর অন্তর্গত, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত—এই কয়টি মাস লইয়াই উত্তরায়ণ হয়, উহা দেবতাদিগের দিনস্বরূপ ইত্যাদি। এক্ষণে দেখা যায় অয়নটি সম্পূর্ণরূপে সৌর। কারণ উহা সূর্যের গতিবোধক বলিয়া অয়নের প্রযোজক মাঘ প্রভৃতিকেও সৌর বলিয়া ধরা উচিত। উপরিউক্ত শ্রুতিদ্বারা মাস, অয়ন ও নক্ষত্র সবই সৌরমাসের পরিচায়ক হেতু সৌরমাসে মুখ্যতা প্রমাণিত হয়। আবার ইহাতে স্মৃতিবচনও আছে[১৬]। বৈশাখে চান্দ্রমাসের প্রযোজক শ্রুতি বিদ্যমান থাকিলেও মাঘাদি বহুমাসের

---

(১৪) ন চ সৌরেঽপি পৌষমাঘাদৌ তাদৃশী ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি। পুষ্যমাঘাদিযোগস্য সৌরে পৌর্ণমাস্যামসম্ভবাৎ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭০]

(১৫) তথা শ্রুতিরপি—তপস্তপস্যৌ শৈশিরাবৃতুর্মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতুঃ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মাবৃতুঃ। অথৈতদুদগয়নং দেবানাং দিনম্। নভো নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতুঃ। ইষশ্চ ঊর্জশ্চ শারদাবৃতুঃ। সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতুঃ। অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরিত্যাদি।

[কালবিবেক, পৃঃ ১৬]

(১৬) তথাহি সৌরৌ বৈশাখাদিরিত্যাহ ভাগুরিঃ—

বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখৌ জ্ঞেয়ৌ তৌ মধুমাধবৌ।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়াবৃতু গ্রীষ্মঃ শুক্রশুচী চ তৌ স্মৃতৌ ॥·········

তেষাং চৈত্রবৈশাখাদিপদদ্বিকদ্বিকসামানাধিকরণ্যাৎ সৌরবাচকত্বং নির্ণীয়তে।

[কালবিবেক, পৃঃ ১৪-১৫]

অনুরোধে উহাও যে সৌরমাসের মুখ্যবাচক, তাহাই অবধারিত হইতেছে। আর "মীনরাশিতে সূর্যের অবস্থানকালে প্রারব্ধ শুক্ল প্রতিপৎ হইতে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে চান্দ্রমাসের বোধ করান হইয়াছে, তাহাও তো সৌরমাসকে অপেক্ষা করিতেছে। কারণ প্রথমে মীনরাশিতে সূর্যের অবস্থান জানিতে হইলে সৌরমাসের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা দ্বারাই চান্দ্রমাসের জ্ঞান হইবে। সৌরাগমসাপেক্ষ চান্দ্রাবগতি হওয়ার জন্য সৌরমাসই মাসশব্দের মুখ্য প্রতিপাদ্য[১৭]—এইরূপ যে জীমূতবাহন বলেন তাহা রঘুনন্দনের মতে খণ্ডিত হইয়াছে[১৮]। কারণ যে অমাবস্যাতে রোহিণীর সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহাকে বৈশাখের অমাবস্যা বলে—এই শ্রুতিতে বৈশাখ পদটি সাক্ষাৎ প্রযুক্ত হওয়ায় উহাতে চান্দ্রমাস বোধ করাইবার শক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ শক্তি উহার সহিত নিত্যরূপেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে জীমূতবাহনের মতে মাঘ প্রভৃতিতে সৌর মাস বোধ করাইবার অনুকূল শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে, ঐ শ্রুতিতে মাঘ প্রভৃতি শব্দ সাক্ষাৎ প্রযুক্ত হয় নাই, উহাদের পর্যায়ক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং সেই পর্যায়ক দ্বারাই মাঘাদিতে পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি কল্পিত হইয়াছে। আর জীমূতবাহন যে শ্রুতির প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহাতে রঘুনন্দনের মতে অয়নারম্ভক মাসেরই উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ কোন্ মাস হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভ, কোন্ মাস হইতে উত্তরায়ণের আরম্ভ উহাতে সেই কথাই বলা হইয়াছে, বিশুদ্ধমাসপদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করা হয় নাই। ঐ শ্রুতিতে উক্ত মাসগুলি যে অয়নারম্ভক, তাহার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণের বচন—যথা, দুইটি পক্ষে একমাস হয়, দুইটি সৌরমাসে একটি ঋতু হয়, তিনটি ঋতুতে এক অয়ন হয়, দুই অয়নে এক বৎসর হয়। আর সূর্য কর্কট প্রভৃতি রাশিতে অবস্থিত হইলে দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে এবং মকর প্রভৃতি রাশিতে স্থিত হইলে উত্তরায়ণ হয়। দক্ষিণায়ণ শব্দের অর্থ

এই সম্বন্ধে রঘুনন্দনের যুক্তি

---

(১৭) তস্মাৎ সৌর এব মুখ্যত্বাৎ অনুৎকর্ষঃ কর্মণাম্ ।.........

তস্মাৎ সৌরো বৈশাখাদি র্মুখ্যো জঘন্যশ্চান্দ্র ইতি স্থিতম্। [ঐ, পৃঃ ১০৬]

(১৮) সৌর এব মুখ্য ইতি জীমূতবাহনোক্তং যুক্তমিতি তন্ন, 'সা বৈশাখস্যামাবস্যা যা রোহিণ্যা সম্বধ্যতে' ইতি শ্রুত্যা চান্দ্র এবোপদেশিকী শক্তিঃ কৢপ্তা সৌরে তু তপস্তপস্যাবিত্যাদি শ্রুত্যা পর্যায়-দ্বারা শক্তিঃ কল্প্যা সা চ কৢপ্তশক্তিবিরোধাদ্ ভবিতুং নার্হতীতি তপস্তপস্যাদিরিতি শ্রুতেরনারম্ভকমাস-পরিচায়কত্বেন।

... ...

দক্ষিণময়নং গমনং রবেঃ। এবমুত্তরায়ণমিতি। অতস্তস্যাঃ শক্তিগ্রাহকত্বে প্রমাণাভাবাৎ।

[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭১]

দক্ষিণদিকে সূর্যের
অতএব ঐ শ্রুতি দ্বার
তদ্বিষয়ে কোন প্রম
নিরূপণ করা হইয়া
সূর্যসিদ্ধান্তমতে সূর্যের
অবস্থানকালে দক্ষিণ
গতি অনুসারে দিনমা
সুতরাং উক্ত উভয়
কোন বিরোধ ঘট
ইত্যাদি বচনানুসারে
সৌরপ্রতীতি সাপেক্ষ
কারণ পূর্বোক্ত ব্যা
অপেক্ষা লাঘবপক্ষ হই
শ্রীনাথও চান্দ্রমা
বলেন[২০]—বহু মুনিই
বলিয়া চারিটি মাসই
এখানে লক্ষ্য ক
চান্দ্রমাসই মুখ্য বলি
বাহন যদিও সৌরমা
করেন এবং অয়ন,

রঘুনন্দনের যুক্তির প্রাবল্য

দ্বারা শক্তি কল্প্য। কল্প
(সৌর) কৢপ্তশক্তিকে
মাসকে অগ্রাহ্য করেন
হয়। কারণ আমাদে

(১৯) অতঃ সিদ্ধং চান্দ্রে

(২০) বহুনাং মুনীনাং
মুখ্যঃ। ন চ নানার্থকল্পনা

ারিত হইতেছে। আর
চ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
কে অপেক্ষা করিতেছে।
সৌরমাসের জ্ঞান হইয়া
গমসাপেক্ষ চান্দ্রাবগতি
এইরূপ যে জীমূতবাহন
র অমাবস্যাতে রোহিণীর
এই শ্রুতিতে বৈশাখ
বার শক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে
হার সহিত নিত্যরূপেই
মূতবাহনের মতে মাঘ
। রহিয়াছে, ঐ শ্রুতিতে
ক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে
সম্বন্ধে শক্তি কল্পিত
ন তাহাতে রঘুনন্দনের
কোন্ মাস হইতে
হাতে সেই কথাই বলা
শ্রুতিতে উক্ত মাসগুলি
ইটি পক্ষে একমাস হয়,
দুই অয়নে এক বৎসর
ক্ষিণায়ন হইয়া থাকে
ক্ষিণায়ণ শব্দের অর্থ

পৃঃ ১০৬]
াখস্যামাবস্যা যা রোহিণ্যা
গ্যাবিত্যাদি শ্রুত্যা পর্যায়-
রীতি শ্রুতেরনারব্ধকমাস-

...

ত্ব প্রমাণাভাবাৎ।
[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭১]

দক্ষিণদিকে সূর্যের গমন, এইরূপ উত্তরায়ণ শব্দের অর্থ উত্তরদিকে সূর্যের গমন। অতএব ঐ শ্রুতি দ্বারা মাস শব্দের মুখ্যার্থবোধানুকূল শক্তির যে প্রতীতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, মকরাদিতে এবং কর্কটাদিতে অবস্থিত সূর্য দ্বারা অয়ন নিরূপণ করা হইয়াছে। শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠানই উহার প্রয়োজন। তবে সূর্যসিদ্ধান্তমতে সূর্যের ধনুরাশিতে অবস্থানকালে উত্তরায়ণ এবং মিথুনরাশিতে অবস্থানকালে দক্ষিণায়ন হয়, এইরূপ যে নিরূপণ করা হইয়াছে উহা কেবল সূর্যের গতি অনুসারে দিনমান প্রভৃতির যে ভেদ হয় তাহা জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত। সুতরাং উক্ত উভয়বিধ অয়ন ভিন্নস্বরূপ বলিয়া তন্নিরূপক শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। মীনরাশিতে সূর্যের অবস্থিতিকালে আরব্ধ ইত্যাদি বচনানুসারে রূঢ়িশক্তি দ্বারা চান্দ্রমাসের মুখ্য অর্থ প্রতিপাদিত হওয়ায় সৌরপ্রতীতি সাপেক্ষ হয় বলিয়া রঘুনন্দনের মতে গৌরব পক্ষ স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্বোক্ত ব্যাসবচনে স্পষ্ট করিয়া চান্দ্রমাসের মুখ্যার্থ নিরূপিত হওয়ায় ইহা অপেক্ষা লাঘবপক্ষ হইতেই পারে না বলিয়া গৌরবপক্ষ স্বীকার করিতে হইতেছে।

শ্রীনাথও চান্দ্রমাসের মুখ্যত্ব অনুমোদন করেন[১৯]। কিন্তু গোবিন্দানন্দ বলেন[২০]—বহু মুনিই সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র মাসে সমান মূল্য দান করেন বলিয়া চারিটি মাসই মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, রঘুনন্দন যে চারটি মাসের মধ্যে একমাত্র চান্দ্রমাসই মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। জীমূতবাহন যদিও সৌরমাসকে মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করিতে গিয়া শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করেন এবং অয়ন, মাস প্রভৃতি সর্বদা সৌরাগমসাপেক্ষ বলিয়া সৌরমাস মুখ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি রঘুনন্দনের মতে চান্দ্রমাসে ঔপদেশিকী শক্তি কৢপ্ত, আর সৌরমাসে পর্যায় দ্বারা শক্তি কল্প্য। কল্প্য ও কৢপ্তশক্তির মধ্যে কৢপ্তশক্তি বলীয়সী। অতএব কল্প্যশক্তি (সৌর) কৢপ্তশক্তিকে (চান্দ্র) বাধা দিতে পারে না। রঘুনন্দন সৌর প্রভৃতি মাসকে অগ্রাহ্য করেন নাই। ঐ মাসগুলি শ্রৌত ও স্মার্তকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য প্রযুক্ত হয়। কারণ আমাদের উপনয়নাদি ধর্মীয় কার্য সৌরমাস অনুসারে হয়। এবিষয়ে

রঘুনন্দনের যুক্তির প্রাবল্য

(১৯) অতঃ সিদ্ধং চান্দ্রেষেব দ্বাদশসু মাসেষু সংবৎসরশব্দো মুখ্যোঽন্যত্র ভাক্ত ইতি।
[কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ২ ক]

(২০) বহূনাং মুনীনাং সৌরসাবনচান্দ্রনাক্ষত্রেষু তুল্যসঙ্কেতদর্শনাৎ চতুর্ষ্বেব নানার্থো মাসশব্দো মুখ্যঃ। ন চ নানার্থকল্পনাগৌরবাচ্চান্দ্রে মুখ্যোঽন্যেষু ভাক্ত ইতি বাচ্যম্। [শুদ্ধিকৌমুদী, পৃঃ ২৫০]

সৌরমাসের প্রাধান্য ও লৌকিকব্যবহারে সৌরমাসই প্রধান। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্মে চান্দ্রমাস গ্রহণযোগ্য। তখন সৌরমাসের স্থান নাই। জীমূতবাহন নির্দেশিত সৌরমাসের বোধক শ্রুতিতে মাঘ প্রভৃতি মাস সাক্ষাৎ প্রযুক্ত না হওয়ায় উহাতে পর্যায়ক শব্দ ও পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে নিত্যসম্বন্ধ থাকিতেই পারে না। আবার সেই শ্রুতিতে অয়ন আরম্ভক মাসের উল্লেখ করা আছে, কোন্ মাস হইতে দক্ষিণায়ন ও কোন্ মাস হইতে উত্তরায়ণের আরম্ভ ইত্যাদি বলা আছে। কিন্তু মাসের স্বরূপাদি নির্ণীত হয় নাই। রঘুনন্দনের মতেও শ্রুতি এবং অন্যান্য স্মৃতিবচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সৌরমাসের বহুল প্রয়োগহেতু সৌরমাসই মুখ্য, আর অল্প প্রয়োগ হেতু চান্দ্রমাস গৌণ এই যুক্তিও রঘুনন্দনের মতে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে সৌরমাসের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় না। অতএব রঘুনন্দনের মতে চান্দ্রমাসই মুখ্য। এই মত অত্যন্ত প্রমাণসিদ্ধও বটে, রঘুনন্দনের বিচারপ্রণালী অত্যধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া তাহাই শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণীয়।

৭। মলমাস

মলমাসের সংজ্ঞা

মলমাসসম্বন্ধে বলা হয়—যদি সূর্য একরাশিতে অবস্থিত থাকিয়া দুইটি অমাবস্যাকে অতিক্রম করে তাহা হইলে সেই মাস মলমাসরূপে খ্যাত হয়। অর্থাৎ যে মাসে দুইটি অমাবস্যা সূর্যের ভিন্নরাশিতে সংক্রমণশূন্য হইয়া বর্তমান থাকে তাহার নাম মলমাস[1]। এই মলমাসের কারণ জ্যোতিষে বলা আছে[2]—সূর্য প্রত্যহ তিথির ৬০ ভাগের একভাগ হরণ করে, এইজন্য একটি ঋতুতে সম্পূর্ণ একটি তিথির ছেদ হয়, এইরূপ চন্দ্রও প্রতি ঋতুতে একটি করিয়া তিথির ছেদ করে অর্থাৎ প্রতি দুই মাসে চন্দ্র ও সূর্য কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দুইটি করিয়া তিথির ক্ষয় হইতে থাকে। এই হিসাবে আড়াই বৎসরের শেষে একটি করিয়া মলমাস বা অধিকমাস হয়। এই মলমাস সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বৈশাখ প্রভৃতি তিন

মলমাসের কারণ

---

(১) জ্যোতিষে—অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্।
মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে॥ [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭১]

(২) জ্যোতিষে—দিবসস্য হরত্যর্কঃ ষষ্টিভাগমৃতো তদা।
করোত্যেকমহশ্ছেদং তথৈবৈকঞ্চ চন্দ্রমাঃ॥
এবমর্দ্ধতৃতীয়ানামব্দানামধিমাসকম্।
গ্রীষ্মে জনয়তঃ পূর্বং পঞ্চাব্দান্তে তু পশ্চিমম্॥ [ঐ, পৃঃ ২৭২]

মাসের মধ্যে
হয়। উহা প্র
চান্দ্রমাসেই স
বচনে যে দুইটি
বুঝিতে হইবে
সংক্রমণদ্বয় দ্বা
দ্বারা বর্জিত
অমাবস্যাদ্বয়ের
সূর্যের ক্রিয়ো
অধিমাস হইবে
শ্রাদ্ধবিবে
উৎপত্তি হইলে
একরাশিস্থিত
হওয়ার আশঙ্ক
মলমাস না হই
সেই নিয়মেরও
মাসটি মিথুন প্র
মাসের দ্বিত্বপ্র
কর্মের অনুষ্ঠান
ইত্যাদি বচনের
হয় তাহা বলা
অন্তক্ষণাদিত্ব হই
হইয়া পড়ে।
মাসের মধ্যে
পর—এই দুই

(৩) ততশ্চামাব
সংক্রান্তিশূন্যেন চ
তথাহি দর্শান্তপ্রাক্ক
পদাদের্মাসস্য ক্রোড়ী
প্রক্রিয়া সম্ভবতি।

মাসের মধ্যে একটি মলমাস হয় এবং পাঁচ বৎসরের পরে পরবর্তী মলমাসের সংঘটন হয়। উহা শ্রাবণ প্রভৃতি মাসত্রয়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মলমাস চান্দ্রমাসেই সংঘটিত হয়। ইহা অধিমাস অর্থাৎ অধিকমাস নামেও অভিহিত। বচনে যে দুইটি অমাবস্যা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা অমাবস্যার অন্ত্যক্ষণ অবধি কালকে বুঝিতে হইবে। তথাবিধ অমাবস্যাদ্বয়ের অন্ত্যক্ষণ অবধি কাল যদি সূর্যের সংক্রমণদ্বয় দ্বারা অর্থাৎ সংক্রমণ ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং উত্তরসংযোগরূপ দুইটি ক্রিয়া দ্বারা বর্জিত হয় তাহার নামই মলমাস। মলমাসের এইরূপ লক্ষণ হওয়াতে অমাবস্যাদ্বয়ের অন্ত্যক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব এবং পরবর্তী ক্ষণদ্বয়েও যথাক্রমে যদি সূর্যের ক্রিয়োৎপত্তি এবং উত্তরসংযোগরূপ ক্রিয়াদ্বয়ের যোগ হয় তাহা হইলে অধিমাস হইবে না।

শ্রাদ্ধবিবেকের মতে বলা হইয়াছে[৩], অন্তিম অমাবস্যার অন্তিমক্ষণে ক্রিয়ার উৎপত্তি হইলেও অমাবস্যার শেষক্ষণদ্বয়ে সূর্যের সংক্রমণরূপ ক্রিয়ার সংঘটনে একরাশিস্থিত সূর্য কর্তৃক সম্পূর্ণ একটি চান্দ্রমাস লঙ্ঘিত হইলেও মলমাস না হওয়ার আশঙ্কা হয়, এইমত রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে। নির্দ্ধারিত সময়ে মলমাস না হইলে প্রতি তৃতীয়বৎসরে যে মলমাস হইবার নিয়ম করা হইয়াছে, সেই নিয়মেরও ভঙ্গ হইয়া পড়ে। পূর্বমাসটি মলমাস না হইলেও তাহার পরবর্তী মাসটি মিথুন প্রভৃতি রাশিতে অবস্থিত সূর্য কর্তৃক আরব্ধ হওয়ায় আষাঢ় প্রভৃতি মাসের দ্বিত্বপ্রসঙ্গ হয়। শুদ্ধমাস দুইটি হইলে উহাদের মধ্যে কোন্‌টিতে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, এইরূপ আশঙ্কা দেখা দেয়। এইজন্যই 'অমাবস্যাদ্বয়—' ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রতিপদাদি চান্দ্রমাসই সূর্যসংক্রমণরূপ ক্রিয়াশূন্য হয় তাহা বলা হইয়াছে। অতএব কোনও মাসেরই অমাবস্যাদিত্ব বা অমাবস্যার অন্তক্ষণাদিত্ব হইতে পারে না। সেইরূপ বলিলে বৎসরের মধ্যে ছয়টি মাসের লোপ হইয়া পড়ে। একটি অমাবস্যার অথবা ঐ অমাবস্যার অন্ত্যক্ষণকে যদি দুই মাসের মধ্যে গণনা করা যায় অর্থাৎ পূর্বমাসের শেষস্থ অমাবস্যাকে পূর্ব এবং পর—এই দুই মাসেরই সীমারূপে ধরা হয়, তাহা হইলে অমাবস্যার অন্ত্যক্ষণে

(৩) ততশ্চামাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্ ইত্যত্রামাবস্যাপদেন তদন্ত্যো লক্ষ্যতে সংক্রান্তিশব্দেন চ ক্রিয়াদ্বিতীয়তে প্রথমামাবস্যান্তপ্রাক্ক্ষণ এব সংক্রমণে প্রতিপদাদের্লঙ্ঘনং সম্ভবতি তথাহি দর্শান্তপ্রাক্‌ক্ষণে সংক্রমণং দর্শান্তক্ষণে চ রাশ্যন্তরসংযোগঃ অপরক্ষণে চ প্রতিপদারম্ভে প্রতি-পদাদের্মাসস্য ক্রোড়ীকৃতস্য একরাশ্যবস্থিতেন রবিণা লঙ্ঘনং ভবতি দর্শান্তক্ষণে চ ক্রিয়োৎপত্তৌ নৈষা প্রক্রিয়া সম্ভবতি। [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ১৭০]

সংক্রান্তি হইলে পূর্ব অমাবস্যা এবং পরবর্তী অমাবস্যা এই দুইটিই সম্পূর্ণরূপে সূর্য কর্তৃক লঙ্ঘিত না হওয়াতে প্রতি তৃতীয় বৎসরে যে মলমাস হইবার নিয়ম করা হইয়াছে, সেই নিয়মের ভঙ্গ হয়। কেবল ইহাই নহে তথাবিধ অমাবস্যার অন্ত্যক্ষণে মৃত বা জাত ব্যক্তির কর্মসম্বন্ধে মাসবিশেষের নির্দ্ধারণও করা যায় না। অর্থাৎ অমাবস্যা বা তাহার অন্ত্যক্ষণকে যদি দুইটি মাসের ঘটকরূপে গণনা করা হয় তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য এবং জাতপুত্রের জাতকর্ম প্রভৃতি কার্য কোন্ মাসের উল্লেখে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা থাকে না এবং বিভিন্ন বচনে শুক্লপ্রতিপৎ হইতে মাস আরম্ভের কথা যে বলা হইয়াছে তথাবিধ উক্তিরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

বিভিন্ন মতখণ্ডনে প্রকৃত শাস্ত্রীয়নির্দেশ

এক্ষণে রঘুনন্দন তাঁহার অধ্যাপক শ্রীনাথের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রীনাথ বলেন[৪]—দুইটি অমাবস্যা ও দুইটি পূর্ণিমা, অতএব উপবাসী থাকিয়া পরদিনের প্রতিপদে যাগ করিবে—এই শ্রুতি দ্বারা ইন্দ্র এবং অগ্নি দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় যাগের অঙ্গভূত তিথির যাগাঙ্গরূপ ধর্মের সম্বন্ধ থাকায় অজহৎস্বার্থলক্ষণা দ্বারা যেমন অমাবস্যা—এই পদটি শুক্লপ্রতিপৎ এবং অমাবস্যা এই উভয়ের বাচক হইয়াছে, সেইরূপ সংক্রান্তি পদটিও সূর্যের অপররাশিতে সংযোগরূপক্রিয়ার বোধক। আবার অন্যেরা বলেন, অমাবস্যাদ্বয় ইহা একটি উপলক্ষণ বিশেষণ, ইহা দ্বারা পূর্ব এবং পরবর্তী অমাবস্যা কর্তৃক পরিচালিত শুক্লপ্রতিপৎ হইতে অমাবস্যান্ত কালের বোধ হইতেছে। এই উভয়মতেই রঘুনন্দন দোষ দেখাইয়াছেন[৫]। কারণ পূর্ববর্তী অমাবস্যার যদি উপলক্ষণের ধর্ম স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উহার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় না থাকায় উহাতে ক্রিয়াব্যাপ্তিও থাকে না। তাহা হইলে 'সূর্য যৎকালে মিথুনরাশিতে স্থিত হইয়া দুইটি

---

(৪) ঐন্দ্রাদিযাগাঙ্গতিথিত্বধর্মযোগেনাজহৎস্বার্থলক্ষণয়া অমাবস্যাদিপদানাং শুক্লপ্রতিপদমাবস্যা-পরত্বমিতি। অতএব দ্বে হ বৈ পৌর্ণমাস্যৌ দ্বে অমাবস্যে তস্মাৎ প্রতিপদ্যুপবসন্ যজেতাপরেদ্যুরিতি শ্রুতিঃ। [কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ১০ খ]

(৫) শুক্লপ্রতিপদাদিদর্শান্তকালো বোধ্যতে ইত্যপরে, তন্ন। পূর্বামাবস্যায়া উপলক্ষণত্বে ক্রিয়ানন্বয়িত্বাৎ তদ্ব্যাপনাভাবাৎ। 'মিথুনস্থো যদা ভানুরমাবস্যাদ্বয়ং স্পৃশেৎ' ইত্যত্রামাবস্যাদ্বয়মিতি কর্মতা ন স্যাৎ। তস্যার্কো দর্শকস্থৈকরাশৌ দর্শদ্বয়াতিগ ইত্যভিধানঞ্চাসঙ্গতং স্যাৎ পূর্বমাবস্যায়া উপলক্ষণত্বে পূর্বামাবস্যান্ত্যক্ষণবৃত্তিরাশিস্থঃ সন্ সূর্যোতিবাহ্য গচ্ছেদিতি স্বোক্তব্যাপ্ত্যনুপপন্নঃ স্যাৎ।

[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭২]

ংটিই সম্পূর্ণরূপে সূর্য
হইবার নিয়ম করা
তথাবিধ অমাবস্যার
রণও করা যায় না।
রটকরূপে গণনা করা
ত্রর জাতকর্ম প্রভৃতি
া থাকে না এবং
া হইয়াছে তথাবিধ

ন করিতে প্রয়াসী
. অতএব উপবাসী
বে--এই শ্রুতি দ্বারা
অনুষ্ঠেয় যাগের
সম্বন্ধ থাকায়
পৎ এবং অমাবস্যা
র্যের অপররাশিতে
স্যাদ্বয় ইহা একটি
কর্তৃক পরিচালিত
উভয়মতেই রঘুনন্দন
ক্ষণের ধর্ম স্বীকার
াতে ক্রিয়াব্যাপ্তিও
স্থিত হইয়া দুইটি

শুক্লপ্রতিপদমাবস্যা--
ান্ যজেতাপরেদ্যুরিতি

বস্যায়া উপলক্ষণত্বে
ইত্যত্রামাবস্যাদ্বয়মিতি
ং স্যাৎ পূর্বমাবস্যায়া
প্যনুপপন্নঃ স্যা'ৎ।
মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭২]

অমাবস্যাকে স্পর্শ করে' এই বচনে 'স্পৃশেৎ' এই ক্রিয়ার অমাবস্যাদ্বয় যে কর্মকারকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে পারে না এবং ঐ 'এক রাশিতে অবস্থিত হইয়া অমাবস্যাদ্বয়ের অতিক্রমকারী সূর্য সেই মলমাসের জ্ঞাপক'—এই বচনটিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। প্রথম অমাবস্যার যদি উপলক্ষণ ধর্ম স্বীকার করা হয় তাহা হইলে পূর্বমাসের অন্ত্যক্ষণবর্তী রাশিতে অবস্থিত হইয়া সূর্য সেই মাসকে অতিক্রম করিয়া গমন করে—লঘুহারীতের বচনের এইরূপ অর্থ যে করা হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

এইজন্য বলা হয় কোনও একটি চান্দ্রমাস যদি সূর্যকর্তৃক লঙ্ঘিত হয় তাহা হইলে উহাকে মলমাস বলে। ঐ মাসে যে কর্ম বিহিত হইয়াছে তাহা তৎপরবর্তী শুদ্ধমাসেই কর্তব্য। আবার বলা হয়—যদি শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই দুইটি পক্ষের মধ্যে সংক্রান্তি না হয়, তাহা হইলে ঐ মাসবিহিত কর্ম পরমাসে কর্তব্য। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সূর্যের লঙ্ঘন বা অসংক্রমণ তবেই হয়, যদি সেই মাস এবং তাহার পূর্বমাসের অন্ত্যক্ষণে সূর্য একরাশিতে অবস্থিত থাকে আর সেই মাস অতীত হইবার পরই অপররাশিতে সূর্যের সংযোগ হয়। একরাশিস্থিত সূর্য দ্বারা একমাসের ব্যাপ্তিকেই উক্তরূপে লঙ্ঘন বা অসংক্রমণ বলা যাইতে পারে। যদি সেইরূপ ব্যাপ্তিকেই লঙ্ঘন বা অসংক্রমণ বলা যায়, তাহা হইলে পূর্বমাসে চতুর্দশীতে অবস্থিত সূর্য তৎপরমাসীয় প্রতিপদের প্রথমক্ষণে তৎপরবর্তী রাশিতে সংক্রান্ত হইলে এবং তৎপরবর্তী রাশিতে দ্বিতীয়া বা প্রতিপদে সূর্যের সংযোগ হইলে দ্বিতীয় মাসেরও মলমাসত্ব হইতে পারে অর্থাৎ ঐরূপস্থলে প্রথমমাসের মলমাসত্ব তো সর্ববাদিসম্মত, কিন্তু অপর ব্যক্তিগণের মতে দ্বিতীয় মাসেরও মলমাসত্ব অপরিহার্য হইয়া উঠে। কাজেই তথাবিধ বর্ষে তন্মাসীয় বৈধক্রিয়ার লোপের আপত্তি হইয়া পড়ে। এইজন্যই জ্যোতিষে বলা হইয়াছে৬ —অমাবস্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং সূর্যের সংক্রমণবর্জিত শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত কালরূপ চান্দ্রমাসকেই মলমাস বলিয়া জানিবে, উহা সর্ববিধ বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানে বর্জনীয়। অতএব সূর্য এক রাশিতে অবস্থিত হইয়া দুইটি অমাবস্যাকে অতিক্রম করিলে মলমাস হইয়া থাকে।

---

(৬) অতএব জ্যোতিষে—অমাবস্যাপরিচ্ছিন্নং রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্।
মলমাসং বিজানীয়াদ্ গর্হিতং সর্বকর্মসু।
তস্মার্কো দর্শকশ্চৈকরাশৌ দর্শদ্বয়াতিগঃ।। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭২]

জীমূতবাহনের কালবিবেকেও এই মত অনুমোদিত হইয়াছে[৭]। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কখনও কখনও একই বৎসরে দুইটি মলমাস ও একটি ক্ষয়মাস আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ঐ দুইটি মাসকে যথাক্রমে মলমাস ও ভানুলঙ্ঘিত মাস বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তবে ঐ ভানুলঙ্ঘিত মাস প্রকৃত মলমাস নহে, উহা উৎপাতবিশেষের উৎপাদক বলিয়া উহাতে মলমাসের সমান ধর্ম বিদ্যমান হয় মাত্র। মলমাসে যেমন বৈধধর্ম-সকল বিহিত নয়, তেমনই কিন্তু ভানুলঙ্ঘিত মাসেও কাম্যকর্ম করণীয় নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে—চূড়াকরণ, উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, মহালয়াশ্রাদ্ধ, রাজ্যাভিষেক এবং অপরবিধ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান মলমাস ও ভানুলঙ্ঘিত মাসে কর্তব্য নহে। ভীমপরাক্রম বচন অনুসারে দেখান হইয়াছে[৮]—মলমাসে, দিনপাতে (অর্থাৎ ত্র্যহস্পর্শে), সূর্যের ধনুরাশিতে অবস্থান কালে, ভানুলঙ্ঘিত মাসে এবং হরিশয়ন-কালে মাঙ্গল্য কর্ম ও বিবাহ কর্ম কর্তব্য নহে।

একই বৎসরে দুইটি অধিমাস

এখানে বক্তব্য এই যে একই বৎসরে দুইটি অধিমাস পড়িলে সেই বৎসরে একটি ক্ষয়মাস অবশ্যই হইবে। জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত ও ভীমপরাক্রম গ্রন্থে ক্ষয়মাসের লক্ষণ করা হইয়াছে যথা—অসংক্রান্ত অর্থাৎ সংক্রান্তিশূন্য মাসকে অধিমাস এবং দ্বিসংক্রান্তিযুক্ত মাসকে ক্ষয়মাস বলা হয়[৯]। এই ক্ষয়মাস সচরাচর সংঘটিত হয় না। কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিনটি মাসেই কেবল ক্ষয়মাস হইয়া থাকে, অন্যসময় হয় না এবং ঐরূপ ক্ষয়মাস স্থলে বৎসরের মধ্যে দুইটি অধিমাস হয়।

ক্ষয় মাস

---

(৭) একরাশিস্থসূর্যস্য দর্শদ্বয়াতিক্রমমাত্রং তস্য লক্ষণম্। তেন তল্লক্ষ্যতে অতএব তস্যার্কো দর্শকশ্চৈকরাশৌ দর্শদ্বয়াতিগ ইত্যুক্তম্।.........প্রতিপদ্বপক্ষান্তমাবস্যান্ত ইত্যর্থঃ। তথৈব মুনিভি র্নানাবিধমুপলক্ষণং দর্শিতম্। অন্যথা 'অমাবস্যাদ্বয়ং স্পৃশেৎ', 'অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্' অমাবস্যামতিক্রম্যেত্যব্যবস্থিতবাদান্নর্থো ব্যবতিষ্ঠেতে। [কালবিবেক, পৃঃ ১৭৩-১৭৪]

(৮) ভীমপরাক্রমেঽপি—অধিমাসে দিনপাতে ধনুষি রবৌ ভানুলঙ্ঘিতে মাসি।
চক্রিণি সুপ্তে কুর্যান্নো মাঙ্গল্যং বিবাহঞ্চ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৩]

(৯) ক্ষয়মাসলক্ষণমাহতু র্জ্যোতিঃসিদ্ধান্তভীমপরাক্রমৌ—

অসঙ্ক্রান্তমাসোঽধিমাসঃ স্ফুটঃ স্যাদ্
দ্বিসঙ্ক্রান্তমাসঃ ক্ষয়াখ্যঃ কদাচিৎ।
ক্ষয়ঃ কার্তিকাদিত্রয়ে নান্যদা স্যাৎ
তদা বর্ষমধ্যেঽধিমাসদ্বয়ং স্যাৎ॥ [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৬]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলা সন ১৩৭০ সালে একই বৎসরে দুইটি অধিমাস সংঘটিত হইয়াছিল

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

হইয়াছে[1]। এখানে
াস ও একটি ক্ষয়মাস
মাস ও ভানুলঙ্ঘিত
তবে ঐ ভানুলঙ্ঘিত
তবিশেষের উৎপাদক
াসে যেমন বৈধবর্ম-
য়কর্ম করণীয় নহে।
য়শ্রাদ্ধ, রাজ্যাভিষেক
ত মাসে কর্তব্য নহে।
দিনপাতে (অর্থাৎ
 মাসে এবং হরিশয়ন-

। পড়িলে সেই বৎসরে
জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত ও
ণ করা হইয়াছে যথা—
ন্তিযুক্ত মাসকে ক্ষয়মাস
ক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ
না এবং ঐরূপ ক্ষয়মাস

ক্ষ্যতে অতএব তস্মার্কো
; ইত্যর্থঃ। তস্যৈব মুনিভি
ষং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্'
পৃঃ ১৭৩-১৭৪]
: মাসি।
মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৩]

১৬]
ধিমাস সংঘটিত হইয়াছিল
[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৮। শ্রাদ্ধ

আত্মা অবিনশ্বর। অতএব মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার মৃত্যু নাই। দেহের নাশ হইলে আত্মা অপর দেহকে আশ্রয় করে। মানুষের মৃত্যুক্ষণেই জীবাত্মা

বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হওয়ায় সমাজে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এখানে রঘুনন্দনের শাস্ত্রীয় মতটিই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রঘুনন্দন ঋষিবাক্যগুলির প্রমাণবলেই নির্দেশ দিয়াছেন যে—আশ্বিন হইতে চৈত্র এই মাসগুলির মধ্যে দুইটি মাস সূর্য কর্তৃক লঙ্ঘিত হইলে আশ্বিন মাসটি 'মলমাস' এবং চৈত্রমাসটি 'ভানুলঙ্ঘিত' হইবে।

'মাধব প্রিয় ষট্ স্বকমাসি দর্শদ্বয়ং স্যা'—ইত্যাদি ভোজরাজের বচনানুসারে বৈশাখাদি আশ্বিনান্ত মাসই মলমাসের কাল বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত থাকায় ঐ বৎসরে আশ্বিনমাস মলমাস, চৈত্রমাস ভানুলঙ্ঘিত এবং পৌষমাস ক্ষয়মাস হইয়াছে। রাজমার্তণ্ডবচনেও বলা হইয়াছে যে—

'অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র মাসি মাসি প্রবর্ততে।
উত্তরস্তত্তয়োর্জ্ঞেয়ঃ পূর্বস্তত্র মলিম্লুচঃ॥'

অর্থাৎ যে বর্ষে ক্রমশঃ দুইটি সৌরমাসে অমাবস্যাদ্বয়ের প্রবৃত্তি হয়, উহাদের মধ্যে পরবর্তী মাসই শুদ্ধ এবং পূর্বটি মলমাস বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে কেহ কেহ জাবালের বচন উত্থাপন করিয়া বলেন যে—

'একস্মিন্নপি বর্ষে চ দ্বৌ মাসাবধিমাসকৌ।
প্রকৃতস্তত্র পূর্বঃ স্যাদুত্তরস্তু মলিম্লুচঃ॥'

অর্থাৎ যদি এক বৎসরের মধ্যে দুইটি অধিমাসের সংঘটন হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে প্রথমটি প্রকৃত বা শুদ্ধমাস এবং পরবর্তীটি মলমাস।

এই জাবালের বচনসম্বন্ধে রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে—আশ্বিন ও বৈশাখমাস অধিমাস হইলে পরবর্তী বৈশাখমাসটি মলমাস হইবে এবং প্রথম আশ্বিনমাসটি ভানুলঙ্ঘিত হইবে। ইহা ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বচনের সহিত মিল রাখিয়া সিদ্ধ হইতেছে।

তাহাতে আছে—'চৈত্রাদর্বাঙ্ নাধিমাসঃ পরতস্ত্বধিকো ভবেৎ।' অর্থাৎ চৈত্রকে অবধি করিয়া (অর্থাৎ চৈত্র মাসের পূর্বে ও পরে) যদি দুইটি মাস সূর্য কর্তৃক লঙ্ঘিত হয় তাহা হইলে পূর্বমাস মলমাস হইবে না, কাজেই পরবর্তী মাসটিই মলমাস হইবে। চৈত্রপদে 'অবধিতে পঞ্চমী' করিলে কারকবিভক্তি হয়, আর 'ল্যপ্‌লোপে পঞ্চমী' করিলে তাহা হয় না। ব্যাকরণমতে অন্যবিভক্তি অপেক্ষা কারক-বিভক্তিই প্রধান। অতএব এখানে অবধিতে পঞ্চমী ধরিয়া চৈত্রের পূর্বে মলমাস হয় না, ভানুলঙ্ঘিত মাস হয়, পরবর্তী মাসটি মলমাস হয়—তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। তবে এই জাবালের বচনের সহিত আলোচ্য বৎসরের মলমাস প্রভৃতির মিল না হওয়ায় জ্যোতিঃপরাশরের উক্তি অনুসারে কার্তিক প্রভৃতি ছয় মাসের মধ্যে দুইটি ভানুলঙ্ঘিত মাস পড়িলে প্রথমটি মলমাস ও পরবর্তীটি ভানুলঙ্ঘিত মাস হইবে। যথা—

'কার্তিকাদিষু মাসেষু যদি স্যাতাং মলিম্লুচৌ।
সর্বকর্মহরঃ প্রোক্তঃ পূর্বস্তত্র মলিম্লুচঃ॥'

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যে শরীর গ্রহণ করে তাহাকে আতিবাহিকদেহ বলে[১]। এই দেহ কেবল তেজঃ, আকাশ ও বায়ুকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে। এই আতিবাহিক দেহ অত্যন্ত যাতনা ভোগ করে। এই বিষয়ে প্রমাণ আছে—"বাযদপ্রসারি তদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে, তৎ কেবলং যাতনার্থেন মাতৃপিতৃসম্ভবম্।"

এই দেহ কোন আশ্রয় লাভ করে না। উহা শীত, বায়ু ও রৌদ্র জন্য অতিশয় ক্লেশ ভোগ করে, ঐ ক্লেশের সাময়িক নিবৃত্তির জন্য দুগ্ধ ও জল আকাশে দিবার বিধি আছে। ইহা শাস্ত্রে আছে—"তস্মাদ্ বিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথা, সর্বতাপোপশান্ত্যর্থমধ্বশ্রমবিনাশনম্।"

আবার মন্ত্রলিঙ্গ হইতেও দেখা যায় যে— "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয় ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব।"

ইহা সাময়িক ক্লেশ নিবৃত্তির জন্য মাত্র।

এই বিষয় ভোজরাজ ও রাজমার্তণ্ডের বচনেও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।

অতএব রঘুনন্দনের মতে আলোচ্য বর্ষে আশ্বিন হইতে চৈত্র—এই সময়ের মধ্যে দুইটি অধিমাস হওয়ায় আশ্বিনটি মলমাস, চৈত্রটি ভানুলঙ্ঘিত ও পৌষ ক্ষয়মাস হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষের মলমাসনিরূপণ রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বের অংশবিশেষ হইতে স্পষ্টই পাওয়া যায়। যথা, যেস্থলে অমাবস্যাতে সূর্যের কন্যারাশিতে সংক্রমণ হইয়াছে, পরে তুলারাশিতে সংক্রমণ প্রতিপৎতিথিতে হইয়া পরে বৃশ্চিক এবং ধনুরাশিতে সংক্রমণও ঐ প্রতিপৎতিথিতেই ঘটিয়াছে, অনন্তর বক্রগতিহেতু অমাবস্যাতে যথাক্রমে মকর, কুম্ভ এবং মীনরাশিতে সংক্রান্তি হইয়া আবার প্রতিপৎতিথিতে মেষসংক্রমণ হইয়াছে, সেইবৎসর যথাক্রমে কন্যাতে মলমাস, ধনুতে ক্ষয়মাস এবং মীনে ভানুলঙ্ঘিত মাস হইবে।

'যত্র তু দর্শে কন্যাসংক্রান্তি ভূর্তা তুলাসংক্রান্তিস্তু প্রতিপদি এবং প্রতিপদি বৃশ্চিকধনুঃসংক্রান্তী ততশ্চ বক্রগত্যা দর্শে মকরকুম্ভমীনসংক্রান্তয়ঃ প্রতিপদি চ মেষসংক্রান্তিস্তত্র কন্যায়াং মলমাসো ধনুষি ক্ষয়ো মীনে চ ভানুলঙ্ঘিতঃ।' [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৭৪]

অতএব রঘুনন্দনের এই মত অনুসারে আলোচ্যবর্ষে আশ্বিনমাস মলমাস, চৈত্রমাস ভানুলঙ্ঘিত-মাস ও পৌষমাস ক্ষয়মাসরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উদাহরণরূপে প্রদর্শিত মলমাস ও ভানুলঙ্ঘিত মাস স্পষ্টরূপে উল্লিখিত থাকায় এই বিষয়ে মতান্তর রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

(১) তথাচ বিষ্ণুধর্মোত্তরম্—তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
উর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥
ত্রীণি ভূতানি তেজোবায়্বাকাশানি পৃথিবী জলে তু অধোগচ্ছতঃ। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৬]

এই দেহ কেবল তেজঃ,
াতিবাহিক দেহ অত্যন্ত
প্রসারি তদ্রূপং দেহমন্যৎ

য়ু ও রৌদ্র জন্য অতিশয়
ও জল আকাশে দিবার
াশে দশরাত্রং পয়স্তথা,

স্থা নিরালম্বো বায়ুভূতো

াছে।
ময়ের মধ্যে দুইটি অধিমাস
হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষের
পাওয়া যায়। যথা, যেস্থলে
তে সংক্রমণ প্রতিপৎতিথিতে
য়াছে, অনন্তর বক্রগতিহেতু
া আবার প্রতিপৎতিথিতে
ধনুতে ক্ষয়মাস এবং মীনে

প্রতিপদি বৃশ্চিকধনুঃসংক্রান্তী
র কন্যায়াং মলমাসো ধনুষি

মাস, চৈত্রমাস ভানুলঙ্ঘিত-
শত মলমাস ও ভানুলঙ্ঘিত
গুলি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই

।
ৎ॥
ক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৬]

এং দেহ হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রেতশরীর নিষ্পাদক দশটি পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে। এতদ্ বিষয়ে প্রমাণ বচন—

"প্রেতপিণ্ডং ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৬)

দশটি পিণ্ড এই দেহের অবয়ব সম্পাদন করতঃ সম্পূর্ণ প্রেতশরীর নিষ্পন্ন করে। যেমন প্রথম পিণ্ড দ্বারা মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ড দ্বারা কর্ণ, নাসিকা, অক্ষি, প্রভৃতি সৃষ্টি হয়[২]। এই দশপিণ্ডের অপর নাম পূরকপিণ্ড। আবার আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি হইতে সপিণ্ডন পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করার পর ঐ জীবাত্মা প্রেতদেহ পরিত্যাগপূর্বক আত্মকৃত কর্মভোগের জন্য যে দেহ লাভ করে তাহাকেই ভোগদেহ বলে। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৬)

এই ভোগদেহ প্রাপ্তিকেই পিতৃত্বপ্রাপ্তি বলা হয়। এইজন্য উক্ত আছে—

"প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু।
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ॥"

শূলপাণি তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেক গ্রন্থে এই পিতৃত্ব প্রাপ্তির বিষয়ে বলেন—

"প্রেতত্ব-নিস্তারপূর্বা পিতৃলোকপ্রাপ্তিরবগম্যতে, প্রেতত্ব-নিস্তারশ্চ ষোড়শশ্রাদ্ধসাধ্যঃ।"

শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজনীয়তা

অতএব দেখা যায় যে হিন্দুধর্ম অনুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য। ইহা ব্যতীত আত্মার মুক্তি হয় না। এই প্রেতত্ব হইতে মুক্তির জন্য শাস্ত্রে ষোড়শ প্রকার শ্রাদ্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা এইরূপ—"দ্বাদশপ্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা। সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধষোড়শম্॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ১০৫)

---

(২) শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসতঃ॥
গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথা ক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্বদা।
সর্বমর্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ॥
দন্তরোমাদ্যষ্টমেন বীর্যঞ্চ নবমেন তু।
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্যয়ঃ॥
ইতি ব্রহ্মকূর্মপুরাণীয়ং বাক্যম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৮]

ইহার আলোচনায় দেখা যায়—মাসশ্রাদ্ধ, বারটি মাসিক, দুইটি ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ। আবার সপিণ্ডীকরণ করার পরও সেই পিতৃপ্রভৃতির উদ্দেশে পুত্রগণ প্রতিমাসে শ্রাদ্ধ করিবে—উহা সাগ্নিকের কেবল অমাবস্যায় কর্তব্য। আর নিরগ্নিকগণ কৃষ্ণপক্ষের যে কোন তিথিতে বিশেষতঃ অমাবস্যায় এই শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণ বৎসরের মধ্যে তিনটি মাসে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। এই তিন মাস হইতেছে কন্যা, কুম্ভ ও বৃষ রাশিতে সূর্য অবস্থিত থাকিলে অর্থাৎ আশ্বিন, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠমাসে ইহা বিধেয়। ইহাতে অশক্ত হইলে কেবল মহালয়াশ্রাদ্ধ কর্তব্য, তাহাতেও অপারগ হইলে কেবল দীপান্বিতাশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার শ্রাদ্ধ আছে, যেমন—আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ প্রভৃতি।

শ্রাদ্ধ বলিতে বুঝায় শ্রদ্ধা সহকারে অন্নপ্রভৃতির দান। এই শ্রাদ্ধশব্দ যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—'শ্রাদ্ধ করিবে' এই উক্তি দ্বারা শ্রাদ্ধনামক প্রসিদ্ধ কর্মবিশেষের বোধ হওয়ায় উহা রূঢ় এবং শ্রদ্ধাসহকারে যে অন্নাদির দান করা হয় তাহার নাম শ্রাদ্ধ—এই উক্তি দ্বারা শ্রাদ্ধশব্দের যৌগিকত্বও প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহা শ্রাদ্ধনামক কর্মবিশেষ বলিয়া অভিহিত।

শাস্ত্রে আছে মৃতব্যক্তির একবৎসর যাবৎ প্রেতত্ব বিদ্যমান থাকে। বৎসরান্তে মৃততিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিবার পর প্রেতত্ব বিমুক্ত হয়—ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। বৎসরান্তের মৃততিথিতেই সপিণ্ডীকরণের মুখ্যকাল। তাহা ভিন্ন ষণ্মাস প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণের কতকগুলি অপকর্ষকালও উক্ত হইয়াছে। যথা—ষণ্মাস, তিনপক্ষ অথবা যেদিন গর্ভাধান প্রভৃতিরূপ আবশ্যক বৃদ্ধিকর্ম অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার পূর্বদিনে সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করা যাইতে পারে। অপকর্ষ বলিতে বুঝায় মুখ্যকালের পূর্বে কর্মের অনুষ্ঠান। এইজন্য ছয়মাস প্রভৃতিতেও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করিতে বলা আছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে সপিণ্ডীকরণে অপকর্ষ ব্যতীত যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হয়, তথাবিধ বৃদ্ধির নিমিত্তই সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ বিহিত হইয়াছে। গর্ভাধান প্রভৃতি অন্নপ্রাশনান্ত সংস্কারগুলি নিরবকাশকর্ম অর্থাৎ এইগুলি নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠেয়। কারণ প্রমাণ দেখা যায় যে নৈমিত্তিক কাম্যকর্মগুলি যেমন যেমন আসিয়া উপস্থিত হইবে সেই নির্দিষ্ট সময়েই সেইগুলির অনুষ্ঠান করিবে। ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। এই সংস্কারগুলির জন্য কোন প্রকার বিশেষ কাল বিহিত হয় নাই অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম শুদ্ধকালেই হোক্, আর অশুদ্ধ কালেই হোক্

যে কালেই উপস্থিত হইবে সেই সময়েই উহাদের অনুষ্ঠান কর্তব্য। অতএব এই মতে নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম যেমন অশুদ্ধকালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সেইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারকর্মেরও পিত্রাদি মরণের বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।

কোনও মঙ্গলজনক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহার পূর্বে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। আভ্যুদয়িক শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অভ্যুদয়নিমিত্তক। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ বিবাহাদি, তাহার নিমিত্ত শ্রাদ্ধের নাম আভ্যুদয়িক। অভ্যুদয় অর্থাৎ ইষ্টলাভ, উহা আবার ভূত ও ভবিষ্যৎ ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। ভূত যথা—পুত্রজন্ম প্রভৃতি এবং ভবিষ্যৎ যথা বিবাহাদি। পুত্রজন্মাদিরূপ অভ্যুদয় হইবার পর এই শ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং বিবাহাদি অভ্যুদয় হইবার পূর্বে এই শ্রাদ্ধ বিধেয়। এই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধের ভেদগণনার সময় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধরূপে এবং কর্মাঙ্গশ্রাদ্ধরূপে অর্থাৎ বিবাহ প্রভৃতি কর্মের পূর্বে কর্তব্য শ্রাদ্ধকে কর্মাঙ্গশ্রাদ্ধ এবং পুত্রজন্ম প্রভৃতির পর কর্তব্য শ্রাদ্ধকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই উভয় প্রকার শ্রাদ্ধেই আভ্যুদয়িকত্বরূপ ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

আবার এই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকে কেবল বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অর্থাৎ উন্নতিবিধায়ক শ্রাদ্ধরূপেও অভিহিত করা হয়। ইহা আবার নান্দীমুখ শ্রাদ্ধরূপেও বিদিত। কারণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ' এবং 'নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ' এই উভয়স্থলেই পিতৃশব্দের পূর্বে নান্দীমুখ এই বিশেষণটি সংযোজিত করা হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধবিবেকে বলা আছে[৩] পিতৃগণ পতিত হইলে বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহারা শ্রাদ্ধের যোগ্য নয় বলিয়া সেইসব পিতৃগণ অশ্রুমুখ অর্থাৎ বিষণ্ণ হইয়া থাকেন, আর তদ্ব্যতীত শ্রাদ্ধযোগ্য পিতৃগণ প্রসন্নমুখ হইয়া থাকেন বলিয়া নান্দীমুখ নামে তাঁহাদের অভিহিত করা হয় এবং 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ' এই মন্ত্রও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এখানে রঘুনন্দন বলেন—'নান্দীমুখ পিতৃগণ' এই বিষ্ণুপুরাণের বচন, 'মাতামহেভ্যশ্চ তথা নান্দীমুখেভ্য এব চ' এই ব্রহ্মপুরাণের বচনেও যথাক্রমে নান্দীমুখ বিশেষণযুক্ত পিতৃগণই শ্রাদ্ধের

---

(৩) যথা হজনকাদয়ঃ পতিতত্বাদিনা শ্রাদ্ধানর্হত্বেনাশ্রুমুখা অপ্রসন্নমুখা ভবন্তি তদা তেভ্যঃ পূর্বতরাঃ পুরুষাঃ শ্রাদ্ধার্হত্বেন প্রসন্নমুখত্বান্নান্দীমুখাঃ।........

ইতরথা জনকাদয় এব শ্রাদ্ধার্হত্বে প্রসন্নমুখত্বান্নান্দীমুখসংজ্ঞাং লভন্তে।

[শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৪২৪]

দেবতা ও তাহাই উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু পিতৃদয়িতা গ্রন্থে (পৃঃ ৭০) নান্দীমুখ বিশেষণশূন্য কেবলমাত্র 'পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্' এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই অভিমত রঘুনন্দনের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। পিতা প্রভৃতি ষট্ পুরুষের পূর্বেই নান্দীমুখ এই বিশেষণের যোগ করিয়া মন্ত্রপাঠ করা সঙ্গত। আবার দেখা যায় মৈথিলগণ যে তন্ত্রতার বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ সকলের উদ্দেশে 'নান্দীমুখ' বিশেষণটির একবারমাত্র প্রয়োগের বিধান করিয়াছিলেন তাহাও নিরস্ত হইয়াছে[৪]। এখানে দেবতাভেদ করার জন্যই নান্দীমুখ বিশেষণ পৃথক্ পৃথক্ দেওয়া হইয়াছে।

এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে রঘুনন্দনের মতে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি সকলেই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দ্বারা প্রসন্নচিত্ত হইয়া থাকেন বলিয়া গৃহে শুভকর্মের পূর্বে অবশ্যই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। এইজন্য দেখা যায় অপর নিবন্ধকারগণ যে পিতার মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ করা না হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ব্যতীতই অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কর্মের নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা রঘুনন্দন খণ্ডনপূর্বক সেই স্থলেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্যই অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিয়াছেন। রঘুনন্দন কোন্ কোন্ সংস্কারকর্মে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিধেয় তাহা বলিয়াছেন[৫]—যথা, পুত্রকন্যার বিবাহে, নূতন গৃহপ্রবেশে, বালকদিগের নামকরণকর্ম ও চূড়াকর্ম প্রভৃতি কার্যে, সীমন্তোন্নয়নে, পুত্রের প্রথম মুখদর্শনে গৃহী ব্যক্তি সংযত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবে। শ্রাদ্ধবিবেকেও ইহা স্বীকার করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন গর্ভাধান হইতে অন্নপ্রাশন পর্যন্ত সংস্কারকর্মের অঙ্গীভূত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা না হইলে গর্ভাধান প্রভৃতি ক্ষুদ্রকর্মের নিমিত্ত যদি সপিণ্ডনরূপ মহাকর্মের অপকর্ষ করা হয়, তাহা হইলে মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। রঘুনন্দন বলেন এইমত ঠিক নহে। আবার যাঁহারা বলেন—গোভিল যে সম্ভাবিত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পূর্বদিনে সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করিতে বিধান দিয়াছেন, তাহা অন্নপ্রাশনান্ত সংস্কারের স্থলে নহে। কারণ ঐ সকল সংস্কার

(৪) ন তু নান্দীমুখবিশেষণশূন্যং পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তামিত্যাদি পিতৃদয়িতোক্তং যুক্তং নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তামিত্যত্রান্বিতস্য নান্দীমুখেভ্য ইত্যস্য পিতামহেভ্য ইত্যাদাবনন্বয়িত্বেন প্রাগুক্তযুক্ত্যা প্রাপ্তস্য নান্দীমুখবিশেষণস্য পিতামহেভ্য ইত্যাদাবপ্রাপ্তেঃ।

এতেনাত্র মৈথিলোক্তং তন্ত্রতাবিধানমপি নিরস্তম্। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ১১৫]

(৫) বিষ্ণুপুরাণং—কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্মণি বালানাং চূড়াকর্মাদিকে তথা।।
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রয়তো গৃহী।। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ১১৯]

য়িতা গ্রন্থে (পৃঃ ৭০)
এইরূপ প্রয়োগ করা
ত্য প্রভৃতি ষট্‌ পুরুষের
ঙ্গত। আবার দেখা
দর উদ্দেশে 'নান্দীমুখ'
াও নিরস্ত হইয়াছে[৪]।
ঃ দেওয়া হইয়াছে।
তে পিতা, পিতামহ,
য়া থাকেন বলিয়া গৃহে
এইজন্য দেখা যায়
য়া না হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
রঘুনন্দন খণ্ডনপূর্বক
দিয়াছেন। রঘুনন্দন
ন[৫]—যথা, পুত্রকন্যার
ড়াকর্ম প্রভৃতি কার্যে,
। নান্দীমুখ পিতৃগণের

ংস্কার কর্মের অঙ্গীভূত
ান প্রভৃতি ক্ষুদ্রকর্মের
হা হইলে মহাবিপ্লব
ার যাঁহারা বলেন—
পকর্ষ করিতে বিধান
ণ ঐ সকল সংস্কার

পিতৃদয়িতোক্তং যুক্তং
মহেভ্য ইত্যাদাবনয়িত্বেন্দ্র

]

।, পৃঃ ১১৯]

...মধ্যেও করিতে পারা যায়, তখন উহাদের নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করিতে হইবে না এবং ঐ সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষের অভাবে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না হইলেও কোন দোষ হইবে না। রঘুনন্দনের মতে এই উক্তিও ঠিক নহে। কারণ সপিণ্ডীকরণের পরই মৃতব্যক্তি পার্বণের শ্রাদ্ধের ভাগী হইয়া থাকে এবং ঐ সপিণ্ডীকরণের পরই গৃহস্থ ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি কার্যে অধিকারী হয়। সুতরাং মহাগুরুপ্রেত অবস্থা থাকিতে বৃদ্ধিকর্ম মাত্রেই অধিকার না থাকায় নিরবকাশ বৃদ্ধি অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে সমস্ত সংস্কার কর্মেই সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এইজন্যই নির্ণয়ামৃতগ্রন্থে 'অন্নপ্রাশন প্রভৃতির জন্যও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ কর্তব্য'—এই কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ক্ষুদ্র কর্মের জন্য সপিণ্ডীকরণরূপ মহৎকর্মের অপকর্ষ করিলে মহাবিপ্লব হয়—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন তাহা রঘুনন্দনের মতে সর্বপ্রকারে খণ্ডিত হইয়াছে[৬]।

এখানে বক্তব্য এই যে যাহাদের গর্ভাধানসংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবার প্রথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষের ব্যবহার প্রচলিত আছে। সামবেদিগণের গর্ভাধান সংস্কারের পূর্বে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা না হইলেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অভাবে যদিও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করার ব্যবহার নাই বটে, কিন্তু সেস্থলেও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত। কারণ গর্ভাধান সংস্কারটিই বৃদ্ধিস্বরূপ, সুতরাং উহার উপস্থিতি হওয়াতে গোভিলের 'যদহ র্বা বৃদ্ধিরাপদ্যেত' এই সূত্র অনুসারে সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ কর্তব্য[৭]।

আরও দেখা যায় নিষ্ক্রমণ কর্মটি গোভিল কর্তৃক উক্ত হওয়ায় উহা একটি গৃহ্যোক্তকর্ম। এক্ষণে সমুদয় গৃহ্যোক্তকর্মই অন্বাহার্য (অর্থাৎ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) বিশিষ্ট।

---

(৬) ন চাঙ্গবাধাৎ সংস্কারাণাং বৈগুণ্যমিতি বাচ্যং তদ্বদেবাঙ্গবোধকবিধীনাং তদিতরপরত্বাদিতি অন্যথা গর্ভাধানাদিনিমিত্তত্বেনাপ্যপকর্ষে মহাবিপ্লবাপত্তেঃ, ইত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যম্।

... ...

মহাগুরুনিপাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিনা করণীয়ৌ তথা গর্ভাধানাদ্যন্নপ্রাশনান্তাঃ কর্তব্যা ইতি তদপি ন সমীচীনম্। অত্র তু তথাবিধবচনাভাবাৎ কথং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিনা অন্নপ্রাশনান্তকর্মসিদ্ধিঃ। অতএব নির্ণয়ামৃতে অন্নপ্রাশনাদ্যর্থঃ সপিণ্ডীকরণাপকর্ষ ইত্যভিহিতম্। এতেন যদপ্যুক্তং গর্ভাধানাদি-নিমিত্তেনাপ্যপকর্ষে মহাবিপ্লবাপত্তেরিতি তদপি চিন্ত্যম্। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ৩০০]

(৭) যতো যত্র গর্ভাধানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমস্তি তত্র সুতরামপকর্ষব্যবহারঃ। যত্র তু ছন্দোগানাং নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তত্রাপি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাভাবেনৈব ন ব্যবহ্রিয়তে ইতি কিন্তু তত্রাপ্যপকর্ষো যুজ্যতে গর্ভাধানস্য বৃদ্ধিরূপত্বাদিতি। [ঐ, পৃঃ ৩০০]

অতএব নিষ্ক্রমণকর্মেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আর অন্নপ্রাশন সম্বন্ধে উক্ত আছে—ষষ্ঠমাসে পুণ্যদিবসে দধি, মধু এবং আজ্যমিশ্রিত অন্নদ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নপ্রাশনরূপ বৃদ্ধিকর্ম সম্পাদন করাইবে। বাচস্পতিমিশ্র বলেন[৮] বালকদিগের নামকরণে এবং চূড়াকর্মাদিতে—এই আদি শব্দ দ্বারা উপনয়ন ধরিয়া চূড়াকরণের পূর্বকর্তব্য নিষ্ক্রমণ ও অন্নপ্রাশনে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, তবে নামকরণ চূড়াকরণের পূর্বকর্তব্য হইলেও উহার জন্য যখন বিশেষ করিয়া আভ্যুদয়িক করিবার বিধান করা হইয়াছে, তখন উহাতে আভ্যুদয়িক কর্তব্য, অন্যথা আদিপদ দ্বারা নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি গ্রহণ করা হইলে নামকরণের গ্রহণও তো উহার দ্বারা হইতে পারিত। সুতরাং বচনে নামকরণের পৃথক্ কথন ব্যর্থ হইয়া পড়িত। রঘুনন্দনের মতে বাচস্পতিমিশ্রের এই মত পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইল[৯]।

কিন্তু গোবিন্দানন্দ বেদের সমস্ত শাখীয়দের পক্ষেই গর্ভাধানসংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এইজন্য তিনি যাঁহারা সামবেদীয়দিগের গর্ভাধানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই, বিবাহাদি গর্ভাধান প্রভৃতি কর্ম বিবাহকালে অনুষ্ঠেয় একবারমাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানেই সম্পন্ন হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন তাঁহাদের মত হেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ গর্ভাধানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সামবেদীয় ভিন্ন অপর বেদীয়দিগের কর্তব্য এই বচনে প্রমাণ নাই। বিবাহ ও গর্ভাধানের মধ্যস্থিত চতুর্থীহোম প্রভৃতিতে সামবেদ ভিন্ন অন্য বেদীয়দিগের শ্রাদ্ধনিষেধ কি প্রকারে পাওয়া যায়? সুতরাং সমস্ত শাখীয়গণ কর্তৃকই গর্ভাধানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্তব্য[১০]।

(৮) তত্র নামকর্মণীত্যভিধায় চূড়াকর্মাদিকেম্বিতি বচনাৎ নামকরণচূড়াকরণমধ্যপাতিনো নিষ্ক্রমণান্নপ্রাশনয়ো বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং নাস্তীতি প্রতীয়তে। অন্যথা নামকর্মাদিক ইতি বদেৎ।

[কৃত্যচিন্তামণি, পৃঃ ৮৬]

(৯) এতেন 'নামকর্মণি বালানাং চূড়াকর্মাদিকে তথা' ইতি বিষ্ণুপুরাণবচনে চূড়াকর্মাদিক ইত্যাদিশব্দাৎ উপনয়নপরিগ্রহঃ। তেন চূড়াকরণাৎ প্রাক্ নিষ্ক্রমণান্নপ্রাশনয়োরাভ্যুদয়িকং ন কার্যং ——ইতি বাচস্পতিমিশ্রোক্তং নিরস্তম্। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ৩০০]

(১০) ততশ্চ সামগানাং গর্ভাধানে শ্রাদ্ধং নাস্তীত্যাহুঃ, তন্মন্দম্। নিষেককাল ইতি বচনস্য সামগেতরপরতয়া সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাৎ পরিশিষ্টবচনে দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়েতিবদন্তশব্দস্য সমীপার্থত্বেনোপপত্তেঃ অন্যথা পরিশিষ্টবচনস্য সামগমাত্রপরত্বে বিবাহগর্ভাধানয়োর্মধ্যপঠিতেষু চতুর্থীহোমাদিষু সামগেতরেষাং শ্রাদ্ধনিষেধঃ কুতো লভ্যত ইতি। তস্মাৎ সর্বশাখিভিরেব গর্ভাধানে শ্রাদ্ধং কার্যম্। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৮৫]

বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে স্বীকার করেন যে গর্ভাধানেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কর্তব্য। বেদশাখা ভেদে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই[১১]।

কিন্তু শূলপাণি ও শ্রীনাথ গর্ভাধানে সামবেদীয়দিগের পক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন। শূলপাণি বলেন বিবাহাদিতে একটি মাত্র শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে আদি শব্দ দ্বারা সমসনীয়, চরুহোম, গৃহপ্রবেশ, যানারোহণ, চতুষ্পথ আক্রমণ অক্ষভঙ্গ সমাধানের জন্য হোম, চতুর্থীহোম ইত্যাদিতে বিবাহ হইতে গর্ভাধান পর্যন্ত কর্মে একবার মাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্তব্য[১২]। শ্রীনাথও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন[১৩]।

এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে মৈথিলদিগের মতের সঙ্গে বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের মতের পার্থক্য বর্তমান। বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের মধ্যে গোবিন্দানন্দ মৈথিলমত অনুমোদন করিলেও সমাজে তাহা প্রচলিত হয় নাই। রঘুনন্দন দৃঢ়হস্তে মৈথিলমতের সমালোচনা করিয়া বঙ্গদেশের নিজস্ব মত স্থাপন করিয়াছেন এবং সমাজও তাহা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়াছে।

ভবদেবভট্ট গর্ভাধানে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কথা লেখেন নাই। কিন্তু অপর-বেদীয়গণের মতে নিষেক কালে অর্থাৎ গর্ভাধানে, সোমরস নিঃসারণ করিবার দিনে, সীমন্তোন্নয়নে এবং পুংসবনে কর্মাঙ্গশ্রাদ্ধ কর্তব্য—এইরূপ বচন দ্বারা গর্ভধারণকর্মে তদঙ্গভূত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য।

অষ্টকাহোমে, গৃহোক্ত অন্বষ্টকাদিশ্রাদ্ধে, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞশ্রাদ্ধে এবং আসন্নপ্রসবার গর্ভবেদনায় অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হইলে সুখপ্রসবের জন্য যে শোষ্যন্তী নামক

---

(১১) বিবাহাদারভ্য গর্ভাধানাৎ প্রাক্ যশ্চতুর্থীহোমাঙ্গসমসনীয়চরুহোমগৃহপ্রবেশন-যানারোহণচতুষ্পথমন্ত্রণাক্ষভঙ্গসমাধানাদিহোমরূপঃ কর্মগণ উক্তস্তত্র বিবাহোপক্রম এব শ্রাদ্ধং ন তু সমসনীয়াদ্যুপক্রমেঽপীত্যর্থঃ।

কেচিত্তু গর্ভাধানমপি গণেঽন্তর্নিবেশ্য তত্রাপি শ্রাদ্ধপ্রতিষেধং বর্ণয়ন্তি তন্ন, নিষেককালে সোমে চেত্যাদিনা গর্ভাধানোপক্রমে শ্রাদ্ধবিধানাৎ। [শ্রাদ্ধচিন্তামণি, পৃঃ ১৮১]

(১২) বিবাহাদিঃ কর্মগণো য উক্তো গর্ভাধানং শুশ্রুম যস্য চান্তে।

বিবাহাদাবেকমেবাত্র কুর্যাৎ শ্রাদ্ধং নাদৌ কর্মণঃ কর্মণঃ স্যাৎ ॥.........

বিবাহাদিরিতি সমসনীয়চরুহোম......চতুর্থীহোমানামাদিশব্দেন গ্রহণম্। এষু বিবাহাদি-গর্ভাধানান্তকর্মস্বেকমেব শ্রাদ্ধং কার্যম্। [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৪৪৩, ৪৪৬]

(১৩) ন হি বিষ্ণুপুরাণোক্তকর্মাদৌ শ্রাদ্ধমিতি নিয়মঃ প্রমাণাভাবাৎ। ন শোষ্যন্তীজাত-কর্মেত্যাদিনা পরিশিষ্টে নিষেধরূপপ্রকরণপ্রসক্তত্বাৎ অত্রৈব সীমন্তোন্নয়নে চৈবেতি গর্ভধারণ-প্রসবনয়োরনুক্তত্বাৎ তয়োঃ শ্রাদ্ধাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। অতঃ প্রদর্শনমাত্রানুক্রমকত্বাৎ বাচাং প্রাপকপ্রমাণস্তু সর্বাণ্যেবাভ্যুদয়িকবন্তীতি গোভিলসূত্রম্। [শ্রাদ্ধদীপিকা পুঁথি, কে লিও ৪৬ খ, ৪৭ক]

হোম করা হয়, সেই শোষ্যন্তীহোমে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে না—ছন্দোগপরিশিষ্টের বচনে জাতকর্মে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের নিষেধ করায় জাতকর্মে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধবিষয়ক যে বচনান্তর দেখা যায়, তাহা সামবেদীয়ভিন্ন অপরবেদীয়বিষয়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু সামবেদীয়দিগের জাতকর্মনিমিত্তক এবং পুত্রমুখ-দর্শনার্থ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। মার্কণ্ডেয়বচনে জাতকর্মের সমান পুত্রের জন্মেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে—ইহা দ্বারা পুত্রজন্মনিমিত্ত আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ জাতকর্মশ্রাদ্ধের সমকালে বিধান করায় নাড়ীচ্ছেদের পূর্বেই উহা কর্তব্য। কারণ উক্ত আছে—পুত্রজন্মনিমিত্ত শ্রাদ্ধ নাড়ীচ্ছেদের পূর্বেই কর্তব্য অথবা পুত্রজন্মনিমিত্ত অশৌচ শেষ হইবার পরই উহা অনুষ্ঠেয়।

হারলতাকারের মতে[১৪] পুত্রজন্মনিমিত্ত শ্রাদ্ধ অশৌচ শেষ হইবার পরই কর্তব্য। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে[১৫] হারলতাকৃত এই ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে॥ বচনে যে নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে এবং অশৌচাপগমের পর শ্রাদ্ধের বিধান করা হইয়াছে উভয় বিধানের মধ্যে সমর্থ অসমর্থভেদে বিকল্প দেখান হইয়াছে। সমর্থ হইলে নাড়ীচ্ছেদের পূর্বেই শ্রাদ্ধ করিবে, আর সে সময় শ্রাদ্ধ করিতে সমর্থ না হইলে অশৌচাপগমের পরই উক্ত শ্রাদ্ধ করিবে, ইহাই বচনের অভিপ্রেত। যদি বলা যায় ততটাকাল স্তন্যপান বন্ধ থাকিলে নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে সমুদয় অঙ্গের সহিত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে রঘুনন্দন বলেন—ঐ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অঙ্গবিকলই হইবে অর্থাৎ কোন অঙ্গদ্বারা হীন হইলেও ক্ষতি নাই—ইহা শ্রাদ্ধবিবেকেও অনুমোদিত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে সাঙ্গ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা হইয়া উঠিবে না বলিয়াই অঙ্গহীন শ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত হওয়াতে বলা আছে—এই পুত্রজন্ম জন্য শ্রাদ্ধে কুলাচার, দেশ এবং সময়ের অনুরোধে পিণ্ডদানান্তশ্রাদ্ধ না করিতে পারিলেও কোন ক্ষতি নাই।

শ্রাদ্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ। যথা, ভাদ্রী পূর্ণিমা অতীত

---

(১৪) এবঞ্চ পুত্রজন্মস্নানবৎ পুত্রমুখদর্শনোত্তরকালমেব বৃদ্ধিশ্রাদ্ধন্তু পুত্রে.ৎপত্त্যনন্তরং ন কর্তব্যং কিন্ত্বশৌচাপগমে কর্তব্যম্। [হারলতা, পৃঃ ১৯]

(১৫) বিষ্ণুধর্মোত্তরং—অচ্ছিন্ননাড্যাং কর্তব্যং শ্রাদ্ধং বৈ পুত্রজন্মনি।
অশৌচাপগমে কার্যমথবাপি নরাধিপ॥

ন চাস্য পূর্বপক্ষোত্তরভাবেন ব্যবস্থা হারলতোক্তা যুক্তা পূর্বার্দ্ধবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ জাতকর্মসমকাল-বিধানবিরোধাচ্চ। তস্মাদ্বিকল্প এব শক্তাশক্তভেদেনোক্তঃ তাবৎকালং স্তনদানে পুত্রনাশপ্রসঙ্গাৎ সাঙ্গং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কর্তুং ন শক্যতে চেদঙ্গবিকলমেব ভবিষ্যতীতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ২২৯

হইবার পর মঘাযুক্ত কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মধু এবং পায়স দ্বারা অবশ্য শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ

মুখ্য চান্দ্রের কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যদি মঘানক্ষত্রে এবং সূর্য হস্তানক্ষত্রে অবস্থিত হন, তাহা হইলে এই যোগকে গজচ্ছায়াযোগ বলে, ইহা বহুপুণ্যে লাভ করা যায়। এই হস্তানক্ষত্রের সময় হইতেছে—কন্যারাশির ভোগকালের দশদিনের পর হইতে সপাদ ত্রয়োবিংশাংশ পর্যন্ত অর্থাৎ কন্যারাশির ভোগফলের ২০দিন এবং ২০ দণ্ড পর্যন্ত। মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতেই গজচ্ছায়ানামক যোগ সংঘটিত হয়। ত্রয়োদশীর যোগ ছাড়া কেবল মঘানক্ষত্রে চন্দ্র এবং হস্তানক্ষত্রে সূর্য অবস্থিত হইলেও উক্ত যোগ হয়। এখানে একবার মঘানক্ষত্র ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়াযোগ, আবার মঘানক্ষত্র চন্দ্র ও হস্তানক্ষত্রে সূর্য—এইরূপ মঘাপদটি পৃথক্ করিয়া দুইবার প্রয়োগ দ্বারা মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীনিমিত্তক শ্রাদ্ধেই যে গজচ্ছায়াযোগের প্রাশস্ত্য অর্থাৎ ইহা গুণফলবিধি—ইহাই জ্ঞাত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কেবল মঘাতে ঐরূপযোগ হইতে পারে, কিন্তু তাহা শ্রাদ্ধের পক্ষে গণ্য নহে। ইহা না বলিলে মঘাপদটির দুইবার প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে[১৬]। অন্যথা চন্দ্র মঘানক্ষত্রে অবস্থিত এবং সূর্য হস্তানক্ষত্রে অবস্থিত হইলে গজচ্ছায়াযোগ হয় একবারমাত্র, এইরূপ বিধান করিলেই চলিত।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র বলেন[১৭]—মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীনিমিত্তক শ্রাদ্ধেই গজচ্ছায়াযোগের প্রাশস্ত্য শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়ায় যেস্থলে কন্যারাশিতে সূর্য থাকাকালীন দশম দিনে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী এবং পরদিবসে ত্রয়োদশীর যোগ ছাড়া কেবলমাত্র মঘানক্ষত্র পাইয়াছে এরূপ স্থলে পূর্বদিনে মঘাত্রয়োদশী নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিনে আবার গজচ্ছায়ানিমিত্তক স্বতন্ত্র শ্রাদ্ধ বিধেয়। রঘুনন্দনের মতে ইহা হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—উপরি উক্ত বচনে মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়া এবং কেবল মঘাতেও গজচ্ছায়াযোগ হয়, এইরূপে দুইবার গজচ্ছায়াযোগের বিধান করিয়া ইহাই জানান হইয়াছে যে মলমাসে সাধারণ শ্রাদ্ধের

---

(১৬) যোগো মঘাত্রয়োদশ্যাং কুঞ্জরচ্ছায়সংজ্ঞিতঃ।
ভবেন্ মঘায়াং সংস্থে চ শশিন্যর্কে করে স্থিতে॥

ইত্যর্থ মঘাপদদ্বয়বৈয়র্থ্যাপত্তে র্মঘাত্রয়োদশীনিমিত্তকশ্রাদ্ধ এব কুঞ্জরচ্ছায়স্য গুণফলত্ববিধানাৎ।

[শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ৯৮]

(১৭) তথাচ পূর্বদিনে শ্রাদ্ধে কৃতে উত্তরস্মিন্নহনি গজচ্ছায়াশ্রাদ্ধং গজচ্ছায়াপুরস্কারেণ কার্যং বিশিষ্টস্য কেবলাদন্যত্বেন পৃথঙ্ নিমিত্তত্বাৎ বিদ্যমানজ্যেষ্ঠপুত্রকেণ তু পূর্বদিনে ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধং কৃতবতা তদুত্তরদিনে মঘাপ্রযুক্তং গজচ্ছায়াপ্রযুক্তং বা শ্রাদ্ধমনারব্ধপক্ষশ্রাদ্ধেন পিণ্ডরহিতমেব কার্যম্]

[শ্রাদ্ধচিন্তামণি, পৃঃ ২৮]

নিষেধ থাকিলেও গজচ্ছায়ানিমিত্ত শ্রাদ্ধের বিধান শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই মলমাসবিহিত গজচ্ছায়ানিমিত্ত শ্রাদ্ধের পক্ষেই শেষোক্ত গজচ্ছায়াযোগের বিধান করা হইয়াছে। কারণ গজচ্ছায়া এবং কুঞ্জরচ্ছায়া এই দুইটি শব্দ একার্থেরই বাচক। রঘুনন্দন বলেন এই মতও গ্রহণীয় নহে। কারণ প্রকৃতপক্ষে মলমাসস্থলে কন্যারাশির দশমদিনে মঘাযুক্তত্রয়োদশী এবং তৎপরদিনে কেবল মঘানক্ষত্রের নিবন্ধন গজচ্ছায়াযোগ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। অসম্ভব এইজন্য যে একরাশির ভোগকালের মধ্যে দুইটি অমাবস্যা হইলেই মলমাস হইবে, অতঃ কন্যারাশির দশমদিনে অমাবস্যা হইলে বাকী রহিল ১৮ দিন, এই ১৮ দিনের মধ্যে ৩০টি তিথি হওয়া অসম্ভব[১৮]। সুতরাং তৎবিধ স্থলের নিমিত্ত যে দুইটি গজচ্ছায়াযোগের বিধান করা হইয়াছে ইহাও রঘুনন্দনের মতে ঠিক নহে।

মলমাসেও এই গজচ্ছায়ানিমিত্ত শ্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ। এই গজচ্ছায়াযোগ শ্রাদ্ধের একটি স্বতন্ত্র নিমিত্ত নহে, ইহা ফলের আধিক্য বিধান করে। এইজন্য বচনে 'শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে' অর্থাৎ অতি পুণ্যেই শ্রাদ্ধবিষয়ে ঐরূপ যোগের লাভ হয় বলা হইয়াছে। অতএব মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ এবং কুঞ্জরচ্ছায়াযোগশ্রাদ্ধ পৃথক্ কর্তব্য নহে অর্থাৎ যেস্থলে কন্যারাশির দশমাংশের শেষে অপরাহ্ণে মঘাত্রয়োদশীর লাভ হইয়াছে, সেস্থলে তৎপরদিনে গজচ্ছায়াযুক্ত মঘাত্রয়োদশীর লাভ হইলেও কুঞ্জরচ্ছায়াযোগনিমিত্ত শ্রাদ্ধ আর হইবে না। কারণ পূর্বদিনই মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধের বিহিতকাল প্রাপ্ত হইয়াছে[১৯]। এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় মৈথিলগণ কপালাধিকরণন্যায় অনুসারে অর্থাৎ প্রথমে যাহার উপস্থিতি হইয়াছে তাহাকে কার্যকালে গ্রহণ করা কর্তব্য—ইত্যাদিরূপ ন্যায় অনুসারে উভয়দিন মধ্যাহ্নকালে শ্রাদ্ধীয় তিথির লাভ হইলে পূর্বদিনেই যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধান করিয়াছিলেন, তাহাও নিরস্ত হইয়াছে। রঘুনন্দনের মতে এই শ্রাদ্ধে শূদ্রদেরও অধিকার

---

(১৮) এতেন পূর্বদিনে মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধং কৃত্বা পরদিনে কুঞ্জরচ্ছায়ে শ্রাদ্ধং কর্তব্যমিতি মিশ্রোক্তং হেয়ম্। অত্র কুঞ্জরচ্ছায়গজচ্ছায়য়োঃ পর্যায়ত্বং মলমাসে গজচ্ছায়াপ্রতিপ্রসূতশ্রাদ্ধস্য বিষয়ত্বমিতি মতং চিন্ত্যং বস্তুতোঽসম্ভবান্ন তথাত্বমিতি ধ্যেয়ম্। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ৯৮]

(১৯) মঘাত্রয়োদশ্যামেব ফলাতিশয়ায় কুঞ্জরচ্ছায়াখ্যযোগো ভবতীতি ন নিমিত্তান্তরম্ ইত্যেতদর্থমেব হি। অতএবোক্তবচনে শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে ইত্যুক্তং নতু শ্রাদ্ধায় নিমিত্তান্তরমিতি।

... ...

তেন যদা কন্যাদশমাংশাপরাহ্ণে মঘাত্রয়োদশীলাভস্তদা তৎপরদিনে তল্লাভেঽপি ন কুঞ্জরচ্ছায়াযোগঃ পূর্বদিন এব মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধবিধানাৎ [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৮২]

আছে। আবার একান্নবর্তী সহোদরদিগেরও প্রত্যেকের পৃথগ্‌ভাবে মঘাশ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। এইজন্য বচন আছে—ভ্রাতৃগণ পৃথক্ অন্নবর্তীই হোক্ কিংবা একান্নবর্তীই হোক সকলেই অদৈবিকশ্রাদ্ধ এবং মঘাশ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ করিবে। এতদ্ভিন্ন অপর শ্রাদ্ধে পৃথগন্ন না হইলে উহাদের প্রত্যেকের অধিকার হইবে না।

আবার কেহ কেহ বলেন ভাদ্রপূর্ণিমা অতীত হইবার পর মঘাযুক্ত ত্রয়োদশী লাভ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে—এইরূপ বিধিবাক্যে ভাদ্র পূর্ণিমার পরবর্তী মঘাত্রয়োদশী এইরূপ প্রয়োগ থাকায় এবং পিতৃগণ অষ্টকা ও মঘাতে অন্নের অভিলাষ করেন—এই সকল অর্থবাদ থাকায় অপরমাসে কেবল ত্রয়োদশীনিমিত্তক শ্রাদ্ধ অথবা কেবল মঘানিমিত্তকশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। রঘুনন্দনের মতে ইহাও ঠিক নহে। তাঁহার মতে মঘাত্রয়োদশীতে একবার শ্রাদ্ধ করিয়া কেবল ত্রয়োদশী বা কেবল মঘাতে আর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।

এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে রঘুনন্দন মৈথিলমত কঠোরভাবে সমালোচনা দ্বারা হেয় প্রতিপন্ন করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শূলপাণি যদিও ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে মৈথিলমত খণ্ডন শূলপাণির গ্রন্থে দেখা যায় না। কারণ কথিত আছে, শূলপাণি মিথিলায় শিক্ষালাভ করেন বলিয়া স্পষ্টতঃ মৈথিলমত খণ্ডন করেন নাই। কিন্তু রঘুনন্দন মৈথিলমত হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দৃঢ়ভাবে স্বকীয়মত স্থাপন করিয়াছেন, সমাজেও তাহা প্রচলিত হইয়াছে। এইজন্য মিথিলাদেশে যে মত বহুল প্রচলিত, রঘুনন্দন বঙ্গদেশে তাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তি কর্তৃক পিণ্ডদান কর্তব্য নহে। এইরূপ মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তির পিণ্ড ব্যতিরিকে শ্রাদ্ধ করার বিধান থাকায় কোনও পুত্রবান্ ব্যক্তি কর্তৃক অপিণ্ডক মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা দ্বারা সপিণ্ডক অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষ নিমিত্তক শ্রাদ্ধেরও সিদ্ধি হইবে। আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতি তিথিতেই একটি করিয়া সপিণ্ডক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীও ঐ আশ্বিনমাসীয় কৃষ্ণপক্ষের অন্তর্গত একটি তিথি। এই মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে পুত্রবানের পক্ষেই পিণ্ডদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঐ অপিণ্ডক মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ দ্বারা সপিণ্ডক অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। পুত্রবান্ ব্যক্তির তাহাতে আর স্বতন্ত্র সপিণ্ডক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র বলেন[২০]—অপিণ্ডক শ্রাদ্ধ দ্বারা যেমন সপিণ্ডক শ্রাদ্ধের

(২০) ন চৈবং সপিণ্ডকেনাপিণ্ডকসিদ্ধিরিতি মিশ্রোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম্। অনয়োরেকতরকৃত্যে পিণ্ডদানতদভাবান্তরস্য লোপস্যাবশ্যকত্বেনোভয়ত্র সাঙ্গকরণনিষ্পত্তেঃ। লাঘবেনাপিণ্ডকরণস্যৈবৌচিত্যাৎ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৮৩]

সিদ্ধি হয়, সেইরূপ যদি কোনও পুত্রবান্ ব্যক্তি পক্ষশ্রাদ্ধ হিসাবে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তবে তাহার আর মঘাত্রয়োদশী হিসাবে অপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। রঘুনন্দনের মতে এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অপিণ্ডক মঘাশ্রাদ্ধ করিলে সপিণ্ডক পক্ষশ্রাদ্ধের পিণ্ডদানরূপ অঙ্গের লোপ হইতেছে এবং সপিণ্ডক পক্ষশ্রাদ্ধ করিলে অনুষ্ঠানে অন্যটিকে অঙ্গহীন করা হইতেছে। অতএব লাঘব হওয়ায় অপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। কারণ মঘাতে পিণ্ডদান করিলে জ্যেষ্ঠপুত্র বিনষ্ট হয়— এই বচন দ্বারা মঘাত্রয়োদশী দিনে পিণ্ডদানের নিন্দাও করা হইয়াছে।

গোবিন্দানন্দের মতে [২১] যখন পূর্বদিনে অপরাহ্ণে তিথিলাভ হয় এবং পরদিনে পূর্বাহ্ণে নক্ষত্রযুক্ত তিথিলাভ হয়, তখন পূর্বদিনে পক্ষশ্রাদ্ধ করিয়া পরদিনে মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ পূর্বাহ্ণে কর্তব্য। এইরূপ একদিনে পূর্বাহ্ণে মঘাত্রয়োদশী লাভ হইলে পুত্রবান্ ব্যক্তি অপিণ্ডক মঘাশ্রাদ্ধ করিয়া অপরাহ্ণে কেবল ত্রয়োদশীতে সপিণ্ডক পক্ষশ্রাদ্ধ করিবে।

মৈথিলনিবন্ধকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের মতে [২২] মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধে সপুত্রক অপুত্রক সকলেই পিণ্ডদান করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। কারণ ব্রহ্মপুরাণ-বচনে সপুত্রক ও অপুত্রকদের শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ না থাকায় চণ্ডেশ্বর এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। তবে মঘাশ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তি পিণ্ড ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিবে।

রঘুনন্দন এখানে একবারমাত্র অপিণ্ডক মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ দ্বারাই সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় বলিয়াছেন, তাহার জন্য আর অপরাহ্ণে পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব দেখা যায় রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় অনেক শিথিলতা অনুমোদন করিয়াছেন।

---

(২১) যদা তু পূর্বদিনেঽপরাহ্ণে তিথিলাভঃ পরদিনে চ পূর্বাহ্ণে নক্ষত্রযুক্ততিথিলাভস্তদা পূর্বদিনে পক্ষশ্রাদ্ধং বিধায় পরদিনে মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধং পূর্বাহ্ণে কার্যং রাত্র্যাদিনিষিদ্ধেতরস্যৈব শ্রাদ্ধকালত্বাৎ। এবমেকদিনে পূর্বাহ্ণ এব মঘাত্রয়োদশীলাভে জ্যেষ্ঠপুত্রিণা অপিণ্ডকং মঘাশ্রাদ্ধং বিধায়াপরাহ্ণে ত্রয়োদশীমাত্রে সপিণ্ডকং পক্ষশ্রাদ্ধং কর্তব্যম্। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২৭৯]

(২২) কৃষ্ণত্রয়োদশীমঘয়োঃ প্রত্যেকমেব নিমিত্তত্বং নৈরপেক্ষশ্রুতে মিলিতয়োরপি ব্রহ্ম-পুরাণানুসারাৎ বিশিষ্টফলে নিমিত্তত্বং, পুত্রিণি অস্যাবশ্যকশ্রাদ্ধস্যানিষেধাৎ সপুত্রাপুত্রয়ো র্দ্বয়োর-প্যধিকারঃ।.........

...কেবলমঘানিমিত্তকস্য শ্রাদ্ধস্য সপুত্রাপুত্রয়ো বিধানাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রিণি চ পিণ্ডদাননিষেধাৎ পিণ্ডরহিতং শ্রাদ্ধং জ্যেষ্ঠপুত্রিণাপি কর্তব্যম্। [কৃত্যরত্নাকর, পৃঃ ৩১৮]

অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ
প্রত্যেক তিথিতে)

অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষশ্রাদ্ধ

প্রত্যেক তিথিতে শ্রা
দুইভাগ বাদ দিয়া শে
অশক্ত হইলে ঐ তৃ
শ্রাদ্ধ করিবে। এখা
হইবে অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর
পারিবে না। সুতরা
তুল্যফলদায়ক বলা
প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু
ছয়টি গরু দক্ষিণা দিবে
দানের বিধি করা হইয়
বলা হইয়াছে। কার
যাইতে পারে না। বি
সঞ্চিত পাপক্ষয় প্রভৃতি
স্থলেও আয়াসতারতম্য
যে ঐরূপ শ্রাদ্ধের বিক
তাহা হইলে যে ব্যক্তি
ব্যক্তির ঐ কর্মানুষ্ঠান
শূলপাণিও ইহা
চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন

(২৩) ন চ তত এব
নিত্যত্বাদিতি শ্রাদ্ধচিন্তামণি
ভূয়স্ত্বসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ত

(২৪) তত্র চ পক্ষশ্রা
ষড় দেয়া ইতিবৎ ফলভূমা ক
(২৫) অত্রৈককল্পাশ্রয়ণে
যদুক্তং তদপি চিন্ত্যং, কল্পচতু

অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধে দেখা যায় আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন (অর্থাৎ প্রত্যেক তিথিতে) শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ঐ কৃষ্ণপক্ষকে সমান তিন ভাগ করিয়া প্রথম ভাগ বাদ দিয়া অর্থাৎ প্রতিপদাদি পাঁচটি তিথি পরিত্যাগপূর্বক ষষ্ঠ্যাদি অমাবস্যা পর্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে ঐ তিনভাগের প্রথম দুইভাগ বাদ দিয়া শেষ ভাগ অর্থাৎ একাদশ্যাদি পাঁচটি তিথিতে, আবার ইহাতেও অশক্ত হইলে ঐ তৃতীয় ভাগের অর্ধভাগে অর্থাৎ ত্রয়োদশী প্রভৃতি তিনটি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে যে চারটি পক্ষ করা হইয়াছে তাহা শক্তিসাপেক্ষেই অনুষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্তা ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন একটি পক্ষের অবলম্বন করিতে পারিবে না। সুতরাং তিনদিন শ্রাদ্ধের বিধি ও পঞ্চদশ দিন শ্রাদ্ধের বিধিকে যদি তুল্যফলদায়ক বলা হয় তাহা হইলে পঞ্চদশদিন ব্যাপী শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে বলা আছে যেমন একটি গরু, তিনটি গরু ও ছয়টি গরু দক্ষিণা দিবে, এস্থলে অল্পদানের বিধিসত্ত্বেও ফলের বাহুল্যনিমিত্ত অধিক দানের বিধি করা হইয়াছে, তেমনই অধিকদিন শ্রাদ্ধের বিধিকেও ফলের বাহুল্য হেতুই বলা হইয়াছে। কারণ এই সকল শ্রাদ্ধের নিত্যত্ব হেতু ফলবাহুল্যাদি কল্পনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে ইহা ঠিক নহে[২৩]। কারণ নিত্যকর্মেও সঞ্চিত পাপক্ষয় প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ফলের বাহুল্য হইয়া থাকে। এইজন্য এই শ্রাদ্ধস্থলেও আয়াসতারতম্যবশতঃ ফলেরও অল্পাধিক্য কল্পনীয়। কিন্তু শক্তি অনুসারে যে ঐরূপ শ্রাদ্ধের বিকল্প বিহিত হইয়াছে তাহা নহে, যদি তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে যে ব্যক্তি প্রধানপক্ষের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়া ন্যূনকল্পে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তির ঐ কর্মানুষ্ঠান জন্য ফললাভ হয় না।

শূলপাণিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন[২৪]। আবার কেহ কেহ বলেন[২৫]—এই চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি কল্পের আশ্রয় করিলে যদি উহা বিঘ্নাদিবশতঃ সমাপ্ত

(২৩) ন চ তত এব ফলভূমাঃ একা দেয়া তিস্রো দেয়াঃ ষড়্ দেয়া ইতিবৎ কল্পা ইতি বাচ্যং নিত্যত্বাদিতি শ্রাদ্ধচিন্তামণিঃ, তন্ন।......নিত্যেঽপ্যায়াসবাহুল্যাদুপাত্তদুরিতক্ষয়াণামানুষঙ্গিকফলানাঞ্চ ভূয়স্ত্বসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদ্বদত্রাপি তারতম্যেন ফলভূমঃ কল্পনীয়ত্বং, ন তু শক্ত্যপেক্ষয়া।

[মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৯৭]

(২৪) তত্র চ পক্ষশ্রাদ্ধাদিকল্পানাং বিষমশিষ্টত্বেন ইচ্ছাবিকল্পাসম্ভবাৎ একা দেয়া তিস্রো দেয়াঃ ষড়্ দেয়া ইতিবৎ ফলভূমা কল্পনীয়ঃ। [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ১১২]

(২৫) অত্রৈককল্পাশ্রয়ণে তদনির্বাহে সতি কল্পান্তরাশ্রয়ণং ব্রীহিযববদুদিতানুদিতহোমবচ্চ ইতি যদুক্তং তদপি চিন্ত্যং, কল্পচতুষ্টয়বিধানেনারম্ভান্তরসম্ভবাৎ। [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৯৮]

না হয়, তাহা হইলে অপর কল্পের আশ্রয় করিতে হইবে না। ইহাও রঘুনন্দনের মতে ঠিক নহে। কারণ এখানে পৃথক্ পৃথক্ চারটি শ্রাদ্ধ-কল্পের বিধান থাকায় উহাদের পৃথক্ পৃথক্ আরম্ভও সম্ভব হইতেছে।

নবান্নশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু নবান্নং শস্যতে বুধৈঃ"। ইহার অর্থ এইরূপ—সূর্য বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থিত থাকিলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে নবান্নশ্রাদ্ধ প্রশস্ত। শুক্লপক্ষে নবধান্য উত্তমরূপে পক হইয়াছে জানিতে পারিয়া ক্ষেত্রস্বামী গীতবাদ্য করিতে করিতে নিয়ম অনুসারে সেই ক্ষেত্রে গমন করিবে। সেই পকধানের দ্বারা দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। অতএব দেখা যায় নূতন ধান্য গৃহে আনয়ন করিয়া তাহা দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়—তাহাকেই নবান্নশ্রাদ্ধ বলে।

নবান্নশ্রাদ্ধ

ব্রীহি অর্থাৎ শরৎ-পকধান্য। ব্রীহিপাককালে এবং যবপাককালেও শ্রাদ্ধ কর্তব্য; কারণ শ্রাদ্ধ ব্যতীত ঐগুলি কখনও ভক্ষণীয় নহে—এইরূপ উক্তিতে শ্রাদ্ধের দুইটি নিমিত্ত দেখা যায়। নবোদকে, নবান্নে, গৃহপ্রবেশে, অষ্টকায় এবং মঘায় পিতৃগণ অন্নলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। অতএব ঐসকল সময়ে সর্বদা উদ্‌যুক্ত হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করিবে—এই শাতাতপবচনে নবান্ন কথাটির ব্যবহার থাকায় পূর্বে ব্রীহিপাক ও যবপাক শ্রাদ্ধের নিমিত্তরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য। কারণ ঐ দুইটিকে নবান্নরূপ নিমিত্ত বলিয়া ধরিলে লাঘব হয়। বচনটি এইরূপ—"নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।

পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ।

তস্মাদ্ দদ্যাৎ সদোদ্‌যুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥

ইতি শাতাতপবচনে পূর্বোক্তবহুষু বচনেষু চ নবান্নস্য শ্রুতে নবান্নত্বেনৈবোভয়-সাধারণং নিমিত্তত্বং লাঘবাৎ।" [মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৮৬]

এই বচনে 'সদা' পদটি উল্লিখিত থাকায় ইহা নিত্যকর্মরূপে প্রতীত হয় এবং ব্রীহি ও যবপাককালের শ্রাদ্ধের নিত্যত্ব বুঝা যাইতেছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে নবান্নশ্রাদ্ধ ঐ দুই সময়েই কর্তব্য। তবে অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে যে কালের নির্দেশ করা হইয়াছে উহা ধনুঃরাশি প্রভৃতি পর্যন্ত ভিন্ন গৌণকালগুলির মধ্যে প্রশস্ত বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে। উহাতে যে আর একটি শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, সেরূপ কোন বিধান করা হয় নাই। যেমন দেখা যায় কেহ শরৎ ও বসন্ত কালে ধান্যপাকবশতঃ নবযজ্ঞ (অর্থাৎ সাগ্নিক কর্তব্য নবশস্যেষ্টি) নামক

যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন, অপরে বানপ্রস্থদিগের পক্ষে শ্যামাক ধান্যপাকই নবযজ্ঞের কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—এই বচনে শরৎ এবং বসন্ত-কালে বিহিত নবশস্যেষ্টি নামক যজ্ঞের পক্ষে শ্যামাক ধান্য দ্বারা, ব্রীহিদ্বারা এবং যবের দ্বারা নির্দিষ্টকালে প্রথমে যাগ করা অবশ্য যুক্তিযুক্ত, কখনই নবশস্যেষ্টির লোপ করিবে না—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাতে যেমন একই নবযজ্ঞের পক্ষে কালান্তর উক্ত হইয়াছে, একই শ্রাদ্ধের পক্ষেও সেইরূপ ভিন্নকাল বিহিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধবিবেকেও (পৃঃ ৮৪) শূলপাণি ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

নবশস্যাগমকালে কদাচিৎ নবান্নের অভাব হইলে পুরাতন ব্রীহ্যাদির দ্বারা যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাতেও নবান্ননিমিত্তক শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। নবান্নশ্রাদ্ধ দ্বারাই নবধান্যের সংস্কার হয়। যে বৎসর নবধান্য দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা হয়, সে বৎসর ঐ নবধান্যের দ্বারা অপর কোনপ্রকার শ্রাদ্ধই করিবে না। অতএব দেখা যায় সংস্কারীকৃত ধান্যের অভাবে ব্রতশ্রাদ্ধ দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা করিবে। কারণ পার্বণ-শ্রাদ্ধে এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয়। যাঁহারা শ্রাদ্ধের অধিকারী নহেন, তাঁহারা বিধবাদিগের ন্যায় নবশস্যেষ্টির অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণকে কিছু নবান্ন দান করতঃ অসংস্কৃত ধান্য দ্বারা প্রেতশ্রাদ্ধ করিতে পারিবেন এবং উহা ভোজন করিতেও পারিবেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ বা ফাল্গুনমাসে নবান্নশ্রাদ্ধ কেবল নূতন ধান্য দ্বারাই হইয়া থাকে, যবশ্রাদ্ধ বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। উহা বঙ্গদেশের বাহিরে প্রচলিত আছে। তাহার কারণ বঙ্গদেশে যব উৎপন্নও কম হয় এবং উহার ব্যবহারও ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু বর্তমানে চাউলের অভাবে, গম, যব প্রভৃতি তণ্ডুলাদিস্থানীয়রূপে গৃহীত হয় বলিয়া উহার পাককালেও নবান্নশ্রাদ্ধ করা উচিত।

শ্রীনাথ হেমন্তঋতুতে পক্বধান্য দ্বারা পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন[২৬]। তাঁহার মতে শরৎকালে পক্বধান্য দ্বারা ব্রীহিপাকনিমিত্ত

---

(২৬) তত্র যদাশ্বিনে নবব্রীহ্যন্নেন শ্রাদ্ধং ন কৃতং তদা পক্ষে হৈমন্তিকধান্যে তদীয়তণ্ডুলেন নবান্নাগমনিমিত্তমেব শ্রাদ্ধং কর্তব্যং লাঘবাৎ।.................অত্র কেচিৎ হৈমন্তিকসস্যার্থং শ্রাদ্ধান্তরমবশ্যং কর্তব্যম্—অকৃতাগ্রয়ণশ্চৈব ইত্যাদি বরাহপুরাণবচনাদিত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যম্। ব্রীহিপাক-কৃতাগ্রয়ণেনৈব যবপাকপর্যন্তপক্বশস্যানাং কৃতাগ্রয়ণত্বস্য প্রাগুক্তত্বাৎ। অতএব যবপাকনিমিত্তাগ্রয়ণে কৃতে গোধূমবর্বধান্যাদয়োঽপি সংস্কৃতা ভবন্ত্যেবেতি ন তেষু পুনরাগ্রয়ণান্তরাচারঃ।

[কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, কে.লি.৫ ৬৬ খ]

নবান্নশ্রাদ্ধ করিলেই হৈমন্তিকশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে, ইহার জন্য পুনরায় পৃথক্ শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে। আর ব্রীহিলাভ না হইলে যথাবিহিতকালে এই শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে অনুকল্পে অগ্রহায়ণমাসে অন্য ধান্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কিন্তু গোবিন্দানন্দ শ্রীনাথের এই মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নবান্নশ্রাদ্ধ ও হৈমন্তিকশ্রাদ্ধ পৃথগ্‌রূপেই করিতে হইবে। কারণ ইহা না বলিলে বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য অবস্থিত থাকিলে নবান্নশ্রাদ্ধ করিতে হয়—এই বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং অনুকল্পবিধানও সঙ্গত হয় না। আবার বরাহসংহিতায় ব্রীহিপাক নিমিত্ত শ্রাদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া তাহার অনুকল্পকালের কল্পনা করা ঠিক নহে বলিয়া ব্রীহিশ্রাদ্ধের উদ্দেশে কাল ও দ্রব্য এই উভয় বিধানে বাক্যভেদ দোষ হয়। এই নবান্নশ্রাদ্ধ যে পৃথক্ কর্তব্য তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া গোবিন্দানন্দ নানা প্রমাণবচন উল্লেখ করিয়াছেন[২৭]।

আবার শ্রাদ্ধবিবেকেও বলা আছে[২৮]—নবান্নাগমনিমিত্ত শ্রাদ্ধ নিত্য, এই উক্তি দ্বারা ইহা পৃথক্ শ্রাদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়।

শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে আছে[২৯]—প্রথমাগত শ্রাদ্ধ না করিলে ধান্যজাত শরৎপক হৈমন্তিক প্রভৃতি ধান্যসমূহ বর্জন করিবে। হৈমন্তিক সংস্কারের জন্য পৃথক্ শ্রাদ্ধ অবশ্য করিতে হইবে।

গোবিন্দানন্দ বলেন[৩০]—সকল শিষ্টগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়ায় সমস্ত

---

(২৭) বৃশ্চিকে নবান্নং শস্যতে ইতি বিরোধাৎ আনুকল্পিকস্য প্রশস্তত্বাভাবাৎ বরাহসংহিতায়াং ব্রীহিপাকনিমিত্তকশ্রাদ্ধস্যানুক্তত্বেন তদানুকল্পিকালকল্পনায়া অন্যায্যত্বাচ্চ। ব্রীহিশ্রাদ্ধমনূদ্য কালদ্রব্যোভয়বিধৌ বাক্যভেদাপত্তেশ্চ।

কিঞ্চ—অষ্টকাসু চ কর্তব্যং শ্রাদ্ধং হৈমন্তিকীষু চ।
অন্বষ্টকাসু ক্রমশো মাতৃপূর্বং তদিষ্যতে ॥
গ্রহণে চ ব্যতীপাতে শালিধান্যসমাগমে।
জন্মর্ক্ষ গ্রহপীড়ায়াং শ্রাদ্ধং পার্বণমুচ্যতে ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণে শালিপদবাচ্যস্য হৈমন্তিকধান্যস্য সমাগমনিমিত্তং স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রাদ্ধং বিহিতমিতি।
[শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৮৪]

(২৮) নবান্নাগমনিমিত্তমপি নিত্যমিতি বক্ষ্যতে ইত্যনেন পৃথক্ শ্রাদ্ধমিত্যুক্তম্।
[শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৮৪]

(২৯) হৈমন্তিকসংস্কারার্থমপি পৃথগেব শ্রাদ্ধম্। তদুক্তং বরাহপুরাণে 'অকৃতাগ্রয়ণশ্চৈব........'।
[শ্রাদ্ধচিন্তামণি, পৃঃ ১৮]

(৩০) তস্মাৎ সর্বশিষ্টৈরঙ্গীকৃতং সর্বদেশেষু পারম্পর্যক্রমাগতমাচারমুন্মূলয়িতুমিচ্ছতামাধুনিকানাং বচসি নাদরঃ কার্যঃ। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২৬৪]

ন্য পুনরায় পৃথক্ শ্রাদ্ধ
লে এই শ্রাদ্ধ করিতে
ান করিতে হয়।
য়াছেন যে, নবান্নশ্রাদ্ধ
বলিলে বৃশ্চিকরাশিতে
ইত বিরোধ উপস্থিত
তায় ব্রীহিপাক নিমিত্ত
ন্না ঠিক নহে বলিয়া
ভেদ দোষ হয়। এই
গোবিন্দানন্দ নানা

ত্ত শ্রাদ্ধ নিত্য, এই

ল ধান্যজাত শরৎপক
ান্নের জন্য পৃথক্ শ্রাদ্ধ

কৃত হওয়ায় সমস্ত

ন্ত্বাভাবাৎ বরাহসংহিতায়াং
ব্রীহিশ্রাদ্ধমনুক্ত কালদ্রব্যো-

ন্নাণ শ্রাদ্ধং বিহিতমিতি।
শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৮৪]
হ্যুক্তম্।
[শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৮৪]
'অকৃতাগ্রয়ণশ্চৈব........'।
[শ্রাদ্ধচিন্তামণি, পৃঃ ১৮]
ম্ লয়িতুমিচ্ছতামাধুনিকানাং

নিবন্ধ শ্রীনাথের মত আদরণীয় নহে। গোবিন্দানন্দ স্বকীয় মত স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তখনকার শাস্ত্রজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিবন্ধকার শ্রীনাথের মত কঠোরভাবে সমালোচনা দ্বারা হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি গোবিন্দানন্দের অভিমত সমাজে প্রচলিত হয় নাই। কারণ রঘুনন্দন এবিষয়ে দুইটি পৃথক্ শ্রাদ্ধ না করিয়া তন্ত্রতা দ্বারা একবার শ্রাদ্ধই কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিয়াছেন।

তীর্থশ্রাদ্ধ

আবার দেখা যায় তীর্থে গমন করিলে সেখানে তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে হয়। শুচিব্যক্তি তীর্থপ্রাপ্তির পর শ্রাদ্ধোপযোগী বিহিত প্রথমদিনেই শ্রাদ্ধ করিবে। তবে কোনও শুদ্ধব্যক্তি পূর্বদিনে রাক্ষসীবেলা ইত্যাদি অবিহিত সময়ে যদি তীর্থে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে তৎপরদিনে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইবে না, যেহেতু ঐ পরদিনই তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধোপযোগী বিহিত প্রথমদিন। এবিষয়ে হলায়ুধধৃত বচন যথা[৩১]—পূর্বাহ্ণেই হোক্ অথবা প্রাতঃকালেই হোক্ তীর্থে গমন করিবামাত্রই পূর্বদক্ষিণদেশে অর্থাৎ অগ্নিকোণে শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধ তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্ত হইবে। তীর্থে গমন করিয়া মস্তকমুণ্ডন ও উপবাস—উভয়ই কর্তব্য। উক্ত আছে—কোন এক বৎসরে একবার তীর্থে যাইয়া সেইবৎসর পূর্ণ হইবার দুই মাস মাত্র বাকী থাকিতে যদি কেহ পুনর্বার তীর্থে গমন করে, তাহা হইলে সে যত্নপূর্বক মুণ্ডন ও উপবাস—দুই-ই করিবে। ইহা দ্বারা দশমাসের মধ্যে পুনরায় তীর্থগমনে মুণ্ডন ও উপবাস কর্তব্য নহে—ইহা প্রতীত হইতেছে। তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্ত শ্রাদ্ধবিষয়েও এই মত অনুসরণীয়।

তবে গয়া, গঙ্গা, বিশালা ও বিরজা—এই কয়টি তীর্থ ছাড়া আর সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাস অবশ্য কর্তব্য[৩২]। তীর্থে যে উপবাসের কথা বলা হইয়াছে তাহাও ফলবিশেষের প্রাপ্তিনিমিত্তমাত্র। কারণ তীর্থে গমন করিয়া

---

(৩১) গত্বৈব তীর্থং কর্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তিহেতুকম্।
পূর্বাহ্ণেঽপ্যথবা প্রাতর্দেশে স্যাৎ পূর্বদক্ষিণে॥
তত্তৎপ্রাপ্ত্যৈবমিতি কর্তব্যবচনেন তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকশ্রাদ্ধাভিধানেনোক্তস্যাবাধাৎ।
[শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ৯৮]

(৩২) স্কান্দে—মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব পৃঃ ১৭৭]

ব্রত, উপবাস এবং নিয়মযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র অবগাহন করে এবং তিনরাত্রি তীর্থে বাস করে, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল প্রাপ্ত হয়—এইরূপ উক্ত আছে[৩৩]।

কিন্তু স্মৃতিসমুচ্চয়ে অপর একটি বচন পাওয়া যায়[৩৪]—গঙ্গায়, ভাস্করক্ষেত্রে, পিতামাতার মৃত্যুতে, গুরুর মৃত্যুতে, অগ্নিগ্রহণে এবং সোমযাগে—এই সাতটি বিষয়ে মস্তক মুণ্ডন অবশ্য কর্তব্য।

এখানে বক্তব্য এই যে পূর্ববচনে গঙ্গায় মুণ্ডন নিষেধ করায় এবং পরবর্তী বচনে বিধি থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। এইজন্য রঘুনন্দন সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন যে, পূর্ববচনে গঙ্গামাত্রেই কেশমুণ্ডন নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর পরবর্তী বচনে যে গঙ্গায় কেশমুণ্ডনের বিধান করা হইয়াছে, উহা প্রয়াগাবিচ্ছিন্ন গঙ্গা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল—কেবল গঙ্গাতে কেশমুণ্ডন করিবে না, কিন্তু প্রয়াগাবচ্ছিন্ন গঙ্গায় কেশমুণ্ডন করিবে। এইরূপ বলিলে রঘুনন্দনের মতে আর কোন বিরোধ থাকে না। কিন্তু তথাপি সাতটি বিষয়ে যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সপ্তসংখ্যা তো নির্ধারিত হয় না। তাহার জন্য রঘুনন্দন বলেন—বচনে সাতটি বিভিন্ন ধর্মযুক্ত পদার্থ লইয়াই সপ্তসংখ্যার নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং গঙ্গাত্ব ও ভাস্করক্ষেত্রত্ব—এই উভয়ের যে ভেদ তাহাই নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ববর্তী স্কন্দপুরাণের বচনে যে সর্বতীর্থ আছে তাহা দ্বারা পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ দেশবিশেষকে তীর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ শিষ্টপরম্পরায় ঐরূপভাবেই তীর্থশব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আবার প্রয়াগে মুণ্ডন না করিলে দোষ হয়। প্রয়াগে স্ত্রীদিগেরও মস্তকমুণ্ডনের ব্যবস্থা রঘুনন্দন দিয়াছেন[৩৫]। এখানে স্ত্রী বলিতে সধবা স্ত্রী বুঝাইতেছে। কারণ

---

(৩৩) এখানে উল্লেখযোগ্য যে গয়াতে মস্তক মুণ্ডন বর্জনীয়—এইরূপ নির্দেশ থাকিলেও আমরা দেখিয়াছি গয়াতে যাইয়া অনেকেই মস্তকমুণ্ডন করিয়া থাকেন। কিন্তু গয়াতে মস্তকমুণ্ডনের শাস্ত্রীয় বিধি রঘুনন্দন বা অপর বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ অনুমোদন করেন নাই। যাঁহারা ইহা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রলঙ্ঘনপূর্বকই ইহা করিয়া থাকেন, অথবা তত্তদ্দেশীয় আচারবশতই উহা করিয়া থাকেন।

(৩৪) গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মাতাপিত্রো র্মৃতে গুরৌ।
আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতম্ ॥

ইতি স্মৃতিসমুচ্চয়লিখিতবচনম্। তত্র পূর্ববচনং সামান্যতো গঙ্গায়াং নিষেধকং পরবচনন্তু প্রয়াগাবচ্ছিন্নগঙ্গায়াং বিধায়কমিতি ন বিরোধঃ। সপ্তমত্বন্তু গঙ্গাত্বভাস্করক্ষেত্রত্বভেদাৎ।
[প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৭৭]

(৩৫) প্রয়াগে স্ত্রীণামপি মুণ্ডনং, ন তু কেশানাং দ্ব্যঙ্গুলচ্ছেদমাত্রম্।......
সর্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্।
সর্বত্রৈব হি নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্ ॥

সর্বত্র ইতি প্রাগুক্ত-মহাপাতকাদিপরং ন তু প্রয়াগপরং কেশমূলান্যপাশ্রিত্য ইতি বচনাৎ।
[প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৭৭, ১৮৪]

রঘুনন্দন পরে যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে সধবা স্ত্রীদিগের কেশের অঙ্গুলীদ্বয় ছেদন বুঝাইতেছে। কিন্তু এখানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে প্রয়াগে সমস্ত কেশই মুণ্ডন করা হইবে, কেবল কেশের অঙ্গুলীদ্বয় ছেদন নহে।

শূলপাণি তীর্থশ্রাদ্ধসম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন উত্থাপনপূর্বক বলেন[৩৬]—পুষ্কর তীর্থগুলিতে শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপস্যা করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় এবং পুষ্কর-তীর্থে স্নানমাত্রই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ তীর্থে, নদীতে, সঙ্গমে, নদীর উৎপত্তিস্থান প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ অক্ষয়পুণ্যজনক হয়। গয়াতীর্থে পিতৃগণকে উদ্ধার করার জন্য বৃষোৎসর্গ ইত্যাদি শ্রাদ্ধ অত্যন্ত ফলদায়ক হয়। গয়াস্থানে পঞ্চতীর্থ আছে। যথা—গয়া, ধর্মপৃষ্ঠ, ব্রহ্মার গৃহ, গয়াশীর্ষ ও অক্ষয়বট। এই সমস্ত তীর্থে পিতৃগণের উদ্দেশে দান অক্ষয় হইয়া থাকে। গয়াস্থানে এই প্রকার বিশেষ তীর্থের প্রাপ্তি অধিক ফললাভের বিষয় হয়। শূলপাণি বলেন[৩৭]—এখানে 'পুষ্কর প্রভৃতি স্থানে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়' ইত্যাদি বিষ্ণুর বচনদ্বারা সাধারণ-ভাবে তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইলে এবং অমাবস্যাদি শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইলে পুষ্করতীর্থগুলি গুণফলবিধিরূপে অন্বিত হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে—শূলপাণি পুষ্করতীর্থগুলিতে গুণফলবিধিরূপে অন্বিত করায় গয়াতীর্থে গমন করিয়া একদিনে একই তিথিতে কি প্রকারে গয়াস্থিত পাঁচতীর্থে শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে? কারণ একই তিথিতে পাঁচতীর্থে শ্রাদ্ধদানের বিধি শূলপাণি বা রঘুনন্দন কেহই অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি গয়াস্থানে একই দিনে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পাঁচতীর্থে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। কিন্তু রঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে বচন উত্থাপন পূর্বক দেখাইয়াছেন[৩৮]—বাৎসরিক কর্ম বৎসরে ও মাসিক কর্ম মাসেতেই কর্তব্য। ইহার ন্যূন বা অধিক কর্ম কর্তব্য

---

(৩৬) তত্র বিষ্ণুঃ—পুষ্করেষক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসি চ।
পুষ্করে স্নানমাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
[শ্রাদ্ধবিবেক পৃঃ ৭০-৭১]

(৩৭) অত্র গয়ামুপাদায় গয়াস্থানবিশেষোপন্যাসোঽধিকফলার্থঃ।.........
অত্র পুষ্করেষক্ষয়ং শ্রাদ্ধমিত্যাদিবিষ্ণ্বাদিবাক্যৈঃ সামান্যতস্তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তে অমাবস্যাদিশ্রাদ্ধে চ প্রাপ্তে পুষ্করাদিদেশাখ্যগুণফলবিধিঃ। [ঐ, পৃঃ ৭২]

(৩৮) অতএব স্মৃতিঃ—যথাব্দেনাব্দিকং কর্ম মাসেনৈব চ মাসিকম্।
ন্যূনাধিকং ন কর্তব্যং ন চৈকত্র ক্রিয়াদ্বয়ম্॥
একস্যাঃ ক্রিয়ায়া একদা বারদ্বয়বিধানং ন যুক্তমিতি হলায়ুধঃ। [একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪২৭]

নহে। আবার একত্র ক্রিয়াদ্বয়ও কর্তব্য নহে। একদিনে একটি কর্মের দুইবার বিধান যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া হলায়ুধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব রঘুনন্দনের মতে একদিনে গয়াস্থানের পঞ্চতীর্থে শ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। এইজন্য তিনি তীর্থযাত্রাতত্ত্বে গয়াপদ্ধতিতে পাঁচদিনে পাঁচটি কৃত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন[৩৯]। যেমন প্রথমদিনকৃত্য—প্রথমে ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া তর্পণান্তে গয়াতীর্থপ্রাপ্তি-নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করিবে। দ্বিতীয়দিনে—ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ, দেবার্চনা ইত্যাদি করিয়া অপরাহ্ণে গয়ার বায়ুকোণে অবস্থিত প্রেতপর্বতের মূলসংলগ্ন ঈশানকোণস্থ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ ব্রহ্মবেদীতে পার্বণবিধিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। তারপর পঞ্চতীর্থকৃত্য শ্রাদ্ধ যথা, গয়াপ্রাপ্তির তৃতীয়দিনে—ফল্গুতীর্থে স্নান, তর্পণ ইত্যাদি শেষে উত্তরমানসে যাইয়া সেখানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়। তারপরদিন গয়াশীর্ষে রুদ্রপদসমীপে যাইয়া শ্রাদ্ধ ও পরে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনপূর্বক তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। পরে ব্রহ্মার পদসমীপে যাইয়া সেখানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পঞ্চমদিনে অক্ষয়বটে যাইয়া ইহার মূলসমীপে শ্রাদ্ধ করতঃ তিনজন ব্রাহ্মণকে, তদভাবে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে রঘুনন্দন বিভিন্ন তীর্থপ্রাপ্তিতে বিভিন্নদিনে শ্রাদ্ধ করিতে অনুমোদন করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গয়াতে একদিনে পাঁচস্থানে শ্রাদ্ধ অনুমোদন করেন মৈথিল নিবন্ধকার বাচস্পতিমিশ্র[৪০]। কারণ তাঁহার মতে গয়ারূপতীর্থপ্রাপ্তি শ্রাদ্ধদেশরূপে উল্লিখিত থাকায় যথান্যায়ে ঐ পঞ্চস্থানও তীর্থবিশেষ হইতেছে। অতএব তীর্থভেদ হওয়ায় শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যে তীর্থ তাহাও সিদ্ধ হইল এবং তীর্থভেদের জন্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধেরও কর্তব্যতা আসিল। বাচস্পতিমিশ্র ঐ সকল স্থানকে গুণফলবিধিরূপে উল্লেখ করেন নাই। শূলপাণি গয়ার ঐ সকল স্থানকে গুণফলবিধিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া শ্রাদ্ধের নিমিত্ত হইল না। তাঁহার মতে মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে যেমন গজচ্ছায়া গুণফলবিধিরূপে অন্বিত হয়, সেইরূপ গয়ার পঞ্চতীর্থও গুণফলবিধিরূপে অন্বিত হইয়াছে। রঘুনন্দনও

---

(৩৯) তীর্থযাত্রাতত্ত্ব, পৃঃ ২-২৪।

(৪০) বায়ুপুরাণে—মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াং প্রাপ্য বিনশ্যতি।

তথা—গয়াস্রাং ধর্মপৃষ্ঠে চ সদসি ব্রহ্মণস্তথা।

গয়ি গৃধ্রবটে চৈব শ্রাদ্ধং দত্তং মহাফলম্ ॥

(এখানে 'তথা' বলিয়া আরম্ভ করিয়া 'চ'-কার দ্বারা পৃথক্ তীর্থবিশেষ বুঝাইতেছে)।

[তীর্থচিন্তামণি, পৃঃ ২৭৪]

একটি কর্মের দুইবার
অতএব রঘুনন্দনের
হে। এইজন্য তিনি
ল্লেখ করিয়াছেন[৩৯]।
র্ণান্তে গয়াতীর্থপ্রাপ্তি-
রিয়া তর্পণ, দেবার্চনা
তপর্বতের মূলসংলগ্ন
থিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য।
ল্গুতীর্থে স্নান, তর্পণ
তারপরদিন গয়াশীর্ষে
দর্শনপূর্বক তাহাতে
শ্রাদ্ধ করিতে হয়।
: তিনজন ব্রাহ্মণকে,

র্থপ্রাপ্তিতে বিভিন্নদিনে
যে গয়াতে একদিনে
পতিমিশ্র[৪০]। কারণ
থাকায় যথান্যায়ে ঐ
য় শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যে
শ্রাদ্ধেরও কর্তব্যতা
উল্লেখ করেন নাই।
য়াছেন বলিয়া শ্রাদ্ধের
ছায়া গুণফলবিধিরূপে
হইয়াছে। রঘুনন্দনও

ঝাইতেছে)।
[তীর্থচিন্তামণি, পৃঃ ২৭৪]

...তত্ত্বে পাঁচদিনে পঞ্চতীর্থে পিণ্ডদানের নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে বঙ্গীয়নিবন্ধকারগণের বিধান গয়াতীর্থে অনুসৃত হয় না, কিন্তু মিথিলায় বাচস্পতিমিশ্রের মতই অনুসৃত হইয়া থাকে।

প্রেতত্বমুক্তির কারণরূপে যে ষোড়শশ্রাদ্ধ বলা হইয়াছে তাহাতে ষাণ্মাসিকদ্বয় অনুষ্ঠানের কাল ষষ্ঠমাস পূর্ণ হইবার পূর্বদিন ও দ্বাদশমাস পূর্ণ হইবার পূর্বদিন। প্রথম ছয়মাসের মধ্যে মলমাস হইলেও ষষ্ঠমাসিকের পূর্বতিথিই প্রথম ষাণ্মাসিকের কাল, কারণ ছয়মাস পরিপূর্ণ হইতে একদিনমাত্র বাকী থাকিতেই প্রথম ষাণ্মাসিক

ষাণ্মাসিকদ্বয়ের কাল

বিহিত এবং ত্রয়োদশমাসিকের পূর্বতিথিই দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের কাল। ছন্দোগপরিশিষ্টে এই কথা উক্ত হইয়াছে[৪১]—যথা, 'ছয়মাস পূর্ণ হইতে একদিন বা তিন দিন বাকী থাকিলে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের অনুষ্ঠান করিবে।' আবার 'ষাণ্মাসিক এবং আব্দিকশ্রাদ্ধ পূর্বদিনই হইবে। মাসিকশ্রাদ্ধসকল প্রতিমাসের মৃততিথিতে অথবা অশৌচের পর দ্বাদশদিনেও হইতে পারে'—এই কালমাধবীয়ধৃত পৈঠীনসি-বচনের সহিত ছন্দোগপরিশিষ্টের বচনে যে একদিন বাকী থাকার কথা বলা হইয়াছে উহাকে মৃততিথির পূর্বতিথিরূপে বুঝিতে হইবে। এই যে ষাণ্মাসিক এবং আব্দিক-শ্রাদ্ধ মৃততিথির পূর্বতিথিতে কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা করা হইল, উহা প্রথম মৃত-তিথি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহার পর তিথি হইতে দ্বিতীয় মৃততিথি পর্যন্ত একমাস এবং ঐরূপ বারমাস বর্ষগণনার ব্যবস্থা দ্বারাই সিদ্ধ হইল। অতএব মৈথিলগণ প্রথম মৃততিথিকে ধরিয়া গণনাপূর্বক তিরিশ তিথিতে একমাস এবং ঐ হিসাবে বর্ষগণনা দ্বারা মৃততিথির পূর্বতিথি ত্যাগ করিয়া ষাণ্মাসিক মৃততিথির পূর্ব পূর্বদিনে প্রথম ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক মৃততিথির পূর্ব পূর্বদিনে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকই বলিতে হইবে[৪২]।

ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবার বিধান থাকিলেও পতিপুত্রহীনা স্ত্রী প্রভৃতির পক্ষে ষোড়শ শ্রাদ্ধটি কর্তব্যরূপে বিহিত হয় নাই, পঞ্চদশ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানেই তাঁহাদের প্রেতত্ব ঘুচিয়া পিতৃত্ব লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ দ্বারাই তাঁহাদের মুক্তি হয়, মৃতবৎসর পূর্ণ হইবার দিন উক্ত ষোড়শ বা পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে

(৪১) তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩-৪।

(৪২) এতচ্চ পূর্বমৃততিথিং বিহায়াপরমৃততিথিমাদায় মাসবর্ষগণনয়া সিদ্ধম্। এতেন পূর্বমৃত-তিথিমাদায় মাসবর্ষগণনয়া মৃততিথেঃ পূর্বতিথিং বিহায় তৎপূর্বদিনে মৈথিলানাং যৎ ষাণ্মাসিকদ্বয়-করণং তদ্ধেয়মেব। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৪]

আর একটি আব্দিকশ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে। গোভিলও মৃত সংবৎসর পূর্ণ হইবার দিন কেবলমাত্র সপিণ্ডীকরণ করিবার কথা বলিয়া প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতি বৎসর বাৎসরিক মৃততিথিতে শ্রাদ্ধের বিধান করিয়াছেন।

এইজন্য স্ত্রীগণের সপিণ্ডীকরণসম্বন্ধে বলা আছে—স্ত্রী কেবলমাত্র পুত্রহীনা হইলেই যে তাঁহার সপিণ্ডীকরণ হইবে না তাহা নহে। পুত্র ও পতি—উভয়হীন হইলেই স্ত্রীদের সপিণ্ডীকরণ হইবে না। কারণ উক্ত আছে যে—অপুত্রা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সপিণ্ডীকরণ করিবে। ইহা দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, কোন পুত্রহীনা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী পতিত অথবা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার বিবাহিতা কন্যা সেই পুত্রহীনা স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে। কিন্তু মৈথিলগণের মতে সপত্নীপুত্র থাকিলে সেই সপত্নীমাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে—এই যে বিধান দেওয়া আছে তাহা রঘুনন্দনের মত ঠিক নহে[৪৩]। অতএব রঘুনন্দনের মতে লঘুহারীতের বচনস্থিত 'পুত্রেণৈব' এই পুত্রপদ পরস্থিত নিয়মার্থ প্রকাশক 'এব' শব্দদ্বারা স্বকীয় গর্ভজাত পুত্রভিন্ন অতিদিষ্টপুত্র যে স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে না, এইরূপ নিষেধ করা হইয়াছে। এইজন্য এক মাত্র গর্ভজাত পুত্রভিন্ন অতিদিষ্ট পুত্রের দ্বারা সপিণ্ডীকরণ নিষিদ্ধ হওয়াতে উক্ত লঘুহারীতের বচনের উত্তরার্দ্ধে অপুত্রক পুরুষের সপিণ্ডীকরণানুষ্ঠান বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে নাম করিয়া অধিকারিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে।

প্রথম বৎসর পূর্ণ হইবার দিনে সপিণ্ডীকরণ ভিন্ন অতিরিক্ত একটি বাৎসরিক একোদ্দিষ্টের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না, ইহা হেমাদ্রি কর্তৃক উদ্ধৃতবচনে স্পষ্টরূপে বলা আছে[৪৪]—বৎসর পূর্ণ হইবার দিন যে ষোড়শ শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, ঐ

---

(৪৩) মনুবচনে সপত্নীপুত্রস্য পুত্রত্বাতিদেশাৎ তৎসত্ত্বেঽপি স্ত্রীণাং সপিণ্ডনং মৈথিলৈরুক্তং তন্ন, প্রাগুক্তলঘুহারীতবচনে পুত্রেণৈবেত্যবকারেণাতিদিষ্টপুত্রনিষেধাৎ অতএব তদুত্তরার্দ্ধে ভ্রাতৃপুত্রোপাদানং সঙ্গচ্ছতে। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ১১২]

(৪৪) এতেন সপিণ্ডীকরণাপকর্ষে আদ্যসংবৎসরেঽপি মৃতাহে শ্রাদ্ধান্তরং কর্তব্যমিতি মৈথিলোক্তং হেয়ম্। ব্যক্তমাহ হেমাদ্রিধৃতবচনং—

পূর্ণে সংবৎসরে শ্রাদ্ধং ষোড়শং পরিকীর্তিতম্।
তেনৈব চ সপিণ্ডত্বং তেনৈবাব্দিকমিষ্যতে॥

অত্র পূর্ণসংবৎসরক্রিয়মাণশ্রাদ্ধেন যথোভয়নির্বাহস্তথাপকৃষ্টসপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধাদপ্যুভয়নির্বাহো ন পূর্ণসংবৎসরে আব্দিকান্তরম্। এবং পঞ্চদশশ্রাদ্ধেঽপ্যূহনীয়ম্। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ১১৩]

শ্রাদ্ধের দ্বারাই পিতৃত্বপ্রাপ্তি এবং বাৎসরিক মৃততিথিতে কর্তব্যরূপে বিহিত একোদ্দিষ্টেরও সিদ্ধি হইয়া থাকে—এই বচনে বৎসর পূর্ণ হইবার দিন অনুষ্ঠীয়মান শ্রাদ্ধের দ্বারা যেমন সপিণ্ডীকরণ এবং আব্দিকশ্রাদ্ধ—উভয়ের নির্বাহ হইবার কথা বলা হইয়াছে, অপকৃষ্ট সপিণ্ডীকরণ দ্বারাও সেইরূপ সপিণ্ডীকরণ এবং আব্দিকশ্রাদ্ধ, এই উভয়েরও নির্বাহ হইয়া থাকে। বৎসর পূর্ণ হইবার দিনে অনুষ্ঠীয়মান সপিণ্ডীকরণ অথবা অপকৃষ্ট সপিণ্ডীকরণ দ্বারাই কেবল যে সপিণ্ডীকরণ এবং আব্দিকশ্রাদ্ধ এই উভয়ের নির্বাহ হয় তাহা নহে, যাহাদের নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণ বিহিত হয় নাই, কেবলমাত্র পনরটি শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, বৎসরপূর্তি হইবার দিন অনুষ্ঠীয়মান পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ অথবা উক্ত পনরটি শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহাদের কোন কারণে অপকৃষ্ট হইলেও সপিণ্ডত্ব এবং আব্দিকশ্রাদ্ধত্ব, এই উভয়ের যে নির্বাহ হইবে, ইহাও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যাহাদের উপদেশে ঐ পনরটি শ্রাদ্ধের অপকর্ষ করা হইয়াছে, বৎসর পূর্ণ হইবার দিন তাহাদের নিমিত্ত আর একটি স্বতন্ত্র বাৎসরিক একোদ্দিষ্ট করিতে হইবে না। শ্রাদ্ধবিবেকেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে[৪৫]।

সপিণ্ডীকরণের পরে যদি পতিত মাসিকের অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তবে সপিণ্ডীকরণেরও পুনর্বার অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ হইতেছে। রঘুনন্দনের মতে ইহা ঠিক নহে। তাঁহার মতে পিতৃলোকপ্রাপ্তির পর প্রেতের উদ্দেশে পৃথগ্‌ভাবে মাসিকাদি-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ষোলটি শ্রাদ্ধের পূর্তির অভাবে পিতৃত্ব-প্রাপ্তি না হওয়ায় মাসিক শ্রাদ্ধের পৃথক্ অনুষ্ঠানে কোন দোষ হইবে না। এবিষয়ে ছন্দোগপরিশিষ্টেরও একটি বচন দেখা যায়[৪৬]—সপিণ্ডনের পর আর একোদ্দিষ্ট বিধান অনুসারে প্রতিমাসে শ্রাদ্ধ করিবে না। এই সম্বন্ধে রঘুনন্দন বলেন[৪৭]—শ্রাদ্ধবিবেককার শূলপাণি যেমন অপ্রাপ্ত প্রেতভাবদিগের অপকৃষ্ট সপিণ্ডীকরণের

---

(৪৫) অপকৃষ্টসপিণ্ডনানন্তরমেকোদ্দিষ্টং ন কার্যমিত্যাহ অর্বাক্ সংবৎসরাদ্ বৃদ্ধাবিতি।

[শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৩৭৮]

(৪৬) অত্র তু ষোড়শশ্রাদ্ধাসম্পত্ত্যা তদসিদ্ধৌ পৃথক্‌করণেঽপি ন দোষঃ, ছন্দোগপরিশিষ্টবচনাচ্চ তদ্ যথা—সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধ্বং ন দদ্যাৎ প্রতিমাসিকম্।

একোদ্দিষ্টবিধানেন দদ্যাদিত্যাহ শৌনকঃ॥

ন দদ্যাৎ প্রতিমাসিকমেকোদ্দিষ্টবিধানেনেতি সম্বন্ধাৎ দদ্যাদিত্যাহ শৌনক ইত্যনেনৈকোদ্দিষ্টৈরপকৃষ্টসপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধ্বং বিকল্পো দর্শিতঃ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৭]

(৪৭) স চাপ্রাপ্তপ্রেতভাববিষয় ইতি শ্রাদ্ধবিবেকোক্তবদ্ ভ্রমপতিতমাসিকবিষয়োঽপীতি।

[তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৭]

পরও মাসিকশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ যেস্থলে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটি শ্রাদ্ধের সবগুলি যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হইবে, সেস্থলে আর সপিণ্ডীকরণের পর মাসিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, কিন্তু যে স্থলে কোন একটি মাসিকশ্রাদ্ধ ভ্রমে অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেস্থলে সপিণ্ডীকরণের পরও ঐ পতিত মাসিকশ্রাদ্ধ হইবে।

গোবিন্দানন্দ শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীনাথের মত খণ্ডনপূর্বক দেখাইয়াছেন যে, পূর্ণ মৃতাহকাল লাভ হেতু পতিত মাসিকশ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে, কিন্তু অকৃতমাসিক শ্রাদ্ধের সপিণ্ডনে অধিকার হয় না বলিয়া দ্বাদশ মাসিকশ্রাদ্ধটি পরে কৃষ্ণ-একাদশীতে করিবে। ইহাতে শ্রীনাথ পতিতমাসিকশ্রাদ্ধ মাসিকান্তরকালে করিতে যে বিধান দিয়াছেন তাহা গোবিন্দানন্দের মতে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে[৪৮]।

শ্রাদ্ধের যথাকালে অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটিলে বিশেষ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য—মৈথিলগণ বচনের এইরূপ অর্থ করেন[৪৯]। যথা—যেমন কোন বিঘ্নবশতঃ যথাকালে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না হইলে শুক্লপক্ষেরই হোক্ বা কৃষ্ণপক্ষেরই হোক্ একাদশীতিথিতে ঐ পতিত শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, তবে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে করিলে বিশেষ ফললাভ হইবে।

রঘুনন্দন বলেন[৫০]—মৈথিলগণের ঐরূপ ব্যাখ্যা ভ্রান্তিমূলক। কারণ তাঁহারা ঐ বচনস্থিত 'বিশেষতঃ' পদটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই ঐরূপ অর্থ করেন। কিন্তু ঐ 'বিশেষতঃ' পদ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, অশৌচাদিবিঘ্ননিবন্ধন যথাকালে শ্রাদ্ধের বিঘ্ন ঘটিলে ঐ পতিত শ্রাদ্ধের যে অমাবস্যাতে অনুষ্ঠান বিধান করা হইয়াছে, উহা অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে ঐ পতিতশ্রাদ্ধ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়।

---

(৪৮) পূর্ণমৃতাহোপবিহিতকাললাভাৎ পতিতমাসিকং ন কার্যং কিন্তু তদাদিতদন্ত্যায়াদকৃত-মাসিকস্য সপিণ্ডনানধিকারাৎ পতিতমাসিকং দ্বাদশমাসিকং সপিণ্ডনঞ্চ পরতঃ কৃষ্ণৈকাদশ্যাং কার্যমিত্যুক্তম্। এতেন পতিতমাসিকং মাসিকান্তরকালে কর্তব্যমিত্যাধুনিকোক্তং হেয়মেবেতি।

[গোবিন্দানন্দের শ্রাদ্ধবিবেকটীকা পুঁথি, ফোলিও ১ ক]

(৪৯) শ্রাদ্ধবিঘ্নে সমুৎপন্নে ক্ষয়াহেঽবিদিতে তথা।
একাদশ্যাং প্রকুর্বীত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥

বিশেষত ইতি বচনাদসম্ভবে শুক্লৈকাদশ্যামপি করণম্। [শ্রাদ্ধচিন্তামণি, পৃঃ ১৩৯]

(৫০) মৈথিলোক্তং শুক্লৈকাদশ্যাং তৎকরণং ন যুক্তম্, একাদশীমাত্রে প্রকুর্বীত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ প্রকুর্বীতেতি বাক্যভেদাপত্তেঃ। অস্মন্মতে তু কৃষ্ণপক্ষে একাদশ্যামমাবস্যাপেক্ষয়া বিশেষতঃ প্রকুর্বীতেত্যেকং বাক্যম্। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৭]

আবার দেখা
সেই তিথিতেই
যে মাসে মৃত্যুর শ্র
শ্রাদ্ধ করিবে। বি
ঘটিলে আর একো
কোন শাস্ত্রীয় প্র
রঘুনন্দনের মতে
মরণশ্রবণের তিথি
শ্রাদ্ধ করিবার বিধা
শ্রাদ্ধ করিবার
শ্রবণমাসীয় কৃষ্ণৈ
ব্যবস্থা হয় যে তিথি
করা হইয়াছে সেই
গ্রহণ করিতে হইবে
'শ্রাদ্ধে বিঘ্নে' ইত্যা
হইলে'—এই অংশ
দ্বারা একাদশীরই
এইরূপে দেখা
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য
সুস্পষ্টভাবে নির্দে
হইয়াছে।

(৫১) শ্রাদ্ধবিঘ্নে
কাদশ্যামমাবস্যায়াম্বা,
তন্মাসস্যৈকাদশ্যামমাক

(৫২) প্রভাসখণ্ডং-

......

তথা শ্রবণমাসস্যাপি
শ্রবণদিনবিস্মরণে তন্ম
তন্মাসীয়কৃষ্ণৈকাদশ্যভা

আবার দেখা যায় মৃততিথির অজ্ঞানে যে তিথিতে মরণের শ্রুতি হইবে, সেই তিথিতেই তাহার ঔর্দ্ধ্বদেহিক কার্য করিবে, শ্রবণতিথির বিস্মরণ হইলে যে মাসে মৃত্যুর শ্রবণ হইবে, সেইমাসের কৃষ্ণৈকাদশীতে বা অমাবস্যায় একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু যে মাসে মৃত্যুর শ্রুতি ঘটিয়াছিল সেই মাসের অবধি বিস্মরণ ঘটিলে আর একোদ্দিষ্ট করিতে হইবে না, কারণ সেস্থলে একোদ্দিষ্ট করিবার পক্ষে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই—বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন[৫১], রঘুনন্দনের মতে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ মরণের, প্রস্থানের এবং মরণশ্রবণের তিথি ও মাসের অজ্ঞান স্থলেই মাঘে বা অগ্রহায়ণমাসে অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবার বিধান বচনে স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে এবং মরণের শ্রবণতিথিতেও শ্রাদ্ধ করিবার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রোক্ত শ্রবণতিথির বিস্মরণে শ্রবণমাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ করিবার পক্ষে প্রমাণ নাই[৫২]। সুতরাং ব্যবস্থা হয় যে তিথির অজ্ঞানে মরণাদি নিমিত্ত যে যে মাসে শ্রাদ্ধ করিবার বিধান করা হইয়াছে সেই সেই মাসের কৃষ্ণৈকাদশীই এবং তাহার অপ্রাপ্তিতে অমাবস্যারই গ্রহণ করিতে হইবে। তথাবিধ শ্রাদ্ধকার্যে কৃষ্ণৈকাদশীই যে প্রথমপক্ষ তদ্বিষয়ে প্রমাণ 'শ্রাদ্ধে বিঘ্নে' ইত্যাদি বচন। এরূপ না বলিলে ঐ বচনস্থিত 'মৃততিথির অজ্ঞান হইলে'—এই অংশটুকুর প্রবৃত্তির স্থানই দৃষ্ট হয় না। আর 'বিশেষতঃ' এই পদটি দ্বারা একাদশীরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে।

এইরূপে দেখা যায় রঘুনন্দন বহুস্থানে মৈথিলমত নিরাকরণ করিয়া বঙ্গদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বঙ্গদেশীয় স্বকীয় মত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। জনগণও প্রকৃত শাস্ত্রীয়মত বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে।

---

(৫১) শ্রাদ্ধবিঘ্নে একাদশ্যাং তিথ্যজ্ঞানে মাসস্যৈকাদশ্যাং, তিথিপক্ষয়োরজ্ঞানে তন্মাসস্যৈকাদশ্যামমাবস্যায়াম্বা, এষামজ্ঞানে যস্যাং তিথৌ মৃতঃ শ্রূয়তে তস্মিন্নেব, তিথেরপি বিস্মরণে তন্মাসস্যৈকাদশ্যামমাবস্যায়াং বা একোদ্দিষ্টঃ শ্রবণমাসস্যাপি বিস্মরণে ন কার্যং মানাভাবাৎ।

[শ্রাদ্ধচিন্তামণি, পৃঃ ১৪০]

(৫২) প্রভাসখণ্ডং—মৃতস্যাহো ন জানাতি মাসং বাপি কথঞ্চন।
তেন কার্যমমাবস্যাং শ্রাদ্ধং মাঘেঽথ মার্গকে ॥

....

তথা শ্রবণমাসস্যাপি বিস্মরণে ন কার্যমেকোদ্দিষ্টং প্রমাণাভাবাদিতি বাচস্পতিমিশ্রোক্তং হেয়ং শ্রবণদিনবিস্মরণে তন্মাসীয়ৈকাদশ্যমাবাস্যয়োঃ গ্রহণং যদুক্তং তদপি প্রমাণশূন্যম্। ইত্থঞ্চ সর্বত্র তন্মাসীয়কৃষ্ণৈকাদশ্যভাব এব অমাবস্যা গ্রাহ্যা, শ্রাদ্ধবিঘ্ন ইতি বচনাৎ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৭০৮]

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ দ্বারা মৃতব্যক্তি প্রেতলোক পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গলোকে গমন করে। এই বৃষোৎসর্গ একটি যজ্ঞস্বরূপ। ইহাতে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধের কর্তব্যতা আসিতেছে। তবে একাদশাহে যে বৃষোৎসর্গ করা হয়, তাহাতে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ। এইজন্য স্মৃতিকার উশনা বলেন—সংবৎসরের মধ্যে যদি বৃষোৎসর্গ করা হয়, তবে তাহাতে আর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, সপিণ্ডীকরণের পর যে বৃষোৎসর্গ করা হইবে, তাহাতেই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে[৫৩]।

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ

রঘুনন্দনের মতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ দশদিন অশৌচের পর কর্তব্য, তবে যদি সেই সময় মলমাস পতিত হয় তাহা হইলেও উহা নিরবকাশ কর্ম বলিয়া ঐ সময়েই প্রেত বৃষোৎসর্গ করিতে হইবে। মলমাসে বৃষোৎসর্গের যে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা কাম্যবৃষোৎসর্গস্থলেই বুঝিতে হইবে, এই নিরবকাশ বৃষোৎসর্গস্থলে নহে।

রঘুনন্দন বলেন বৃষোৎসর্গে দক্ষিণাদান করিতে হইবে। হরিশর্মাও সিদ্ধান্ত করেন—কর্মের শেষে যজ্ঞীয়পশুর তুল্যবয়স্কা গাভী দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে। এই বিধানটি যখন গোযজ্ঞপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে, তখন গোযজ্ঞে পশুর অসদ্ভাব হইলেও যথাসম্ভব একটি পশুর কল্পনা করিয়া তৎতুল্য বয়স্কা গাভী দক্ষিণারূপে প্রদান করাই উচিত। ভবিষ্যপুরাণে আছে—হে দ্বিজগণ! পুরুষদিগের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে বৃষের তুল্যবয়স এবং উহার সমানবর্ণ একটি বৃষই দক্ষিণা দিবে এবং স্ত্রীদিগের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গে গাভী দক্ষিণাদানের বিশেষ ফল উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মৈথিলগণ যে বলেন—বৃষোৎসর্গে দক্ষিণা নাই, সে ব্যবস্থা ঠিক নহে[৫৪]।

বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে কর্তা ভিন্ন অপর ব্যক্তিও হোতা হইতে পারে। কারণ দেখা যায় 'আবশ্যক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আপনার স্ত্রীর উপর অগ্নিরক্ষণের ভার দিয়া এবং উহাতে হোম করিবার জন্য ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিয়া বিদেশ যাইতে পারে, কিন্তু বিনা কার্যে বিলম্ব করিবে না'—এই ছন্দোগপরিশিষ্টের

---

(৫৩) উশনসাপি—নার্বাক্ সংবৎসরাদ্ বৃদ্ধি বৃষোৎসর্গে বিধীয়তে।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিধীয়তে॥ ইত্যুক্তম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ২৯২]

(৫৪) অতস্তয়ো র্দক্ষিণেয়ং—গোযজ্ঞপ্রকরণে পাঠাৎ তত্রাপি যথাসম্ভবয়স্কা গৌর্দক্ষিণেতি হরিশর্মোপ্যেবম্। এবঞ্চ বৃষোৎসর্গেঽপি বৃষতুল্যাগৌর্দক্ষিণা।......
যত্তমাহ ভবিষ্যে—বৃষতুল্যবয়োবর্ণো বৃষঃ স্যাদ্দক্ষিণা দ্বিজাঃ।
বৃষোৎসর্গে তু পুংসাং বৈ স্ত্রীণাং স্ত্রীগৌর্বিশিষ্যতে॥
এতেন দক্ষিণাশূন্যমিদমিতি মৈথিলোক্তং হেয়ম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ২৯৫]

বচন এবং 'নিজে হোম করিবে অথবা অপর দ্বারা হোম করাইবে'—এইরূপ গোভিলবচন অনুসারে অপরদ্বারা হোম করান যুক্তিযুক্ত হইতেছে। আবার 'পাকযজ্ঞে কর্তা নিজেই হোম করিবে'—এই বিধান দ্বারা স্বকৃত হোমের ফলাধিক্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়ম করা হয় নাই যে পাকযজ্ঞে কর্তা ভিন্ন আর কেহ হোম করিতে পারিবে না[৫৫]।

বৃষোৎসর্গে হোতা কর্তা ভিন্ন অপরেও হইতে পারে ইহা না বলিলে 'অন্ত্যজন্মা অর্থাৎ শূদ্রেরাও কৃষ্ণবর্ণ বৃষোৎসর্গ করিবে'—এই বচন দ্বারা শূদ্রের যে বৃষোৎসর্গ করিবার বিধান আছে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ বৃষোৎসর্গ একটি পাকযজ্ঞ, অথচ হোতার কার্যে শূদ্রের অধিকার নাই।

আবার 'বৎসতরীযুক্ত বৃষকে ঈশানকোণের দিকে চালাইবে, হোতাকে বস্ত্রযুগল, সুবর্ণ এবং কাংস্য প্রদান করিবে এবং অয়স্কারকে মনের মত বেতন প্রদান করিবে'—এই বিষ্ণুধর্মোত্তরের বচনেও হোতাকে বস্ত্রযুগলাদি প্রদান করিবার কথা থাকায় কর্তা ভিন্ন অপর ব্যক্তিও যে হোতা হইতে পারে তাহা প্রতীয়মান হয়।

পরিশিষ্টপ্রকাশকার বলেন[৫৬]—বৃষোৎসর্গে কর্তা যদি নিজে হোম করে, তাহা হইলে বিষ্ণুধর্মোত্তরে যে দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণই প্রদান করিবে এবং অপরে যদি হোম করে তাহা হইলে সেই হোতা উক্ত দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবে। আর কর্তা যদি নিজেই হোতার কার্য এবং ব্রহ্মার কার্য—এই উভয় কার্য করে, তবে অন্য যে-কোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দান করিবে'—এই ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন অনুসারে অপরে হোম করিলে দক্ষিণার অর্দ্ধ অংশ ব্রহ্মাকে এবং অর্দ্ধ অংশ হোতাকে দান করিবে—তাহাও খণ্ডিত হইল রঘুনন্দনের মতে। কারণ বৃষোৎসর্গের দক্ষিণা যে আচার্যকেই দিতে হইবে,

---

(৫৫) ন চ পাকযজ্ঞে স্বয়ং হোতেতি শ্রবণাদ্ বৃষোৎসর্গে নান্যো হোতেতি বাচ্যম্।

নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।

প্রবসেৎ কার্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং কচিৎ॥

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেন গোভিলেন চ জুহুয়াদ্ধাবয়েদ্বাপীত্যনেনারভ্য তস্য বিধানেনান্যকর্তৃত্বলাভাৎ।

....

অন্যথা কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মনঃ ইতি মৎস্যপুরাণীয়েন প্রতিপন্নশূদ্রকর্তৃকবৃষোৎসর্গো ন স্যাৎ।

[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৯৪]

(৫৬) স্বয়ং চেত্তুভয়ং কুর্যাদন্যস্মৈ প্রতিপাদয়েদিতি ছন্দোগপরিশিষ্টাদর্দ্ধং ব্রহ্মণেঽর্দ্ধং হোত্রে দেয়মিতি পরিশিষ্টপ্রকাশোক্তং নিরস্তম্। বৃষোৎসর্গদক্ষিণা চাচার্যায় দেয়েতি। [ঐ, পৃঃ ৩৯৪]

ইহা বলা হইয়াছে। আর পরিশিষ্টপ্রকাশকার যে অপরে হোম করিলে বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত হোতার দক্ষিণা ব্রহ্মা এবং হোতার মধ্যে অর্দ্ধেক ভাগাভাগি করিয়া দিতে বলেন, তাহাও ঠিক নহে।

পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীকার বলেন[৫৭]—বিষ্ণুধর্মোত্তরীয় বচন অনুসারে হোতার জন্য বস্ত্রযুগল, কাংস্য ও সুবর্ণাদি দক্ষিণা যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে উহা হোতাকেই দেয় এবং ইহাও বক্তব্য যে বিষ্ণু ঋগ্বেদান্তর্গত কঠশাখীয়দিগের গৃহ্যসূত্রকার হইলেও তিনি হোতার দক্ষিণার বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন কঠশাখীয়দিগের অর্থাৎ সামবেদীয়দিগের পক্ষেও তাহা গ্রাহ্য। কারণ সামবেদীয়দিগের গৃহ্যসূত্রকার কাত্যায়ন হোতার দক্ষিণা সম্বন্ধে কিছু বিধান করেন নাই। কাজেই সর্বপ্রকার শাখাতে যাহার নিষেধের অভাব দৃষ্ট হয়, তাদৃশ কর্ম সকল-শাখাতে একরূপই হইয়া থাকে—এই ন্যায় অনুসারে ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রকার বিষ্ণু কর্তৃক উল্লিখিত হোতার দক্ষিণা সামবেদীয়দিগেরও গ্রাহ্য।

সর্বশাখীয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে হোতাকে দক্ষিণা দিবার বিধিব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়াতেই পাশ্চাত্যগণ যে বলেন 'যজমান স্বয়ংই হোতা হইবে' এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ যজমান স্বয়ং হোতা হইবে—এই নিয়ম করিলে দক্ষিণা দিবার বিধিরও বাধা হইয়া পড়ে। কারণ নিজেকে নিজে দক্ষিণা দেওয়া সম্ভবপর নহে। স্বয়ং হোতাস্থলে যদি দক্ষিণার বাধা স্বীকার করিতে হয়, তবে সত্রযাগেও দক্ষিণার বাধা হইয়া পড়ে। সুতরাং পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীর মত গ্রহণীয় নহে।

এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, রঘুনন্দন যে কেবল মৈথিলমত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীনমত প্রভৃতিও হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং স্বীয় মত যুক্তি প্রমাণ বলে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার দ্বারা স্থাপিত ব্যবস্থা সমাজও গ্রহণ করিয়াছে।

বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে স্ত্রীদিগেরও অধিকার আছে। কারণ হলায়ুধের বচন আছে[৫৮]—স্ত্রীদিগের পার্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, কিন্তু কন্যাদান এবং বৃষোৎসর্গে

(৫৭) হোতৃদক্ষিণা বস্ত্রযুগসুবর্ণকাংস্যরূপা হোত্রে দেয়া। হোতু বস্ত্রযুগমিতি বিষ্ণূক্তেঃ। সা চ কাতীয়কল্পেপ্যস্তেতি সর্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম ইতি ন্যায়াৎ। এবং যজমান এব হোতেতি পাশ্চাত্যমতমপাস্তম্। সত্রবদ্দক্ষিণাবাধাপত্তেরিতি পিতৃভক্তিতরঙ্গিণ্যামুক্তং তচ্চিন্ত্যম্।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৯৪]

(৫৮) বৃষোৎসর্গে স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি।
ন স্ত্রীণামধিকারোঽস্তি শ্রাদ্ধেষু পার্বণাদিষু।
কন্যাদানে বৃষোৎসর্গে হ্যধিকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ইতি হলায়ুধবচনাচ্চ।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৯৬]

নিশ্চয়ই অধিকার
নির্দেশ না থাকায় স
শূদ্র, ম্লেচ্ছ, তদপেক্ষ
ইহাতে অধিকারী।

অশৌচ—'ন
একার্থক। আশৌচ
দ্বারা এবং স্নানাদি
পর্যুদাসবিধির নিমিত্ত
অশৌচ সম্বন্ধে
সহিত পূর্ববর্তী নিবন্ধ
প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের ম
সংক্ষেপে আলোচিত
স্ত্রীদের অশৌচ

স্ত্রী-অশৌচ

করিয়াছেন। আবার
দেখা যায়, এখানে তা
রঘুনন্দন স্ত্রীদিগে
বচনকেই প্রমাণ বলিয়া

(১) আশৌচশব্দেন চ
নিমিত্তভূতঃ পুরুষগতঃ কশ্চন
(২) আদিপুরাণং—দত্তা
স্বমন
তদ্বন্ধু
আজ
সদ্যঃ।
ততো
অতঃ
বাকৃ
পিতুর্ব
স্বজাতু

নিশ্চয়ই অধিকার আছে। আবার বৃষোৎসর্গের অধিকারী কর্তার বিশেষরূপে নির্দেশ না থাকায় সর্বপ্রকার ব্যক্তিরই বৃষোৎসর্গে অধিকার স্বীকৃত হয়। অতএব শূদ্র, ম্লেচ্ছ, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি, অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালক প্রভৃতি সকলেই ইহাতে অধিকারী।

৯। অশৌচ, শুদ্ধি ইত্যাদি

অশৌচ—'ন শৌচং শৌচাভাব ইত্যর্থঃ'। অশৌচ এবং আশৌচ শব্দ একার্থক। আশৌচ শব্দ দ্বারা কেবল কর্মে অনধিকারই বুঝায় না, ইহা কাল দ্বারা এবং স্নানাদি দ্বারা অপনোদনযোগ্য পিণ্ডোদকদানাদি বিধির ও অধ্যয়নাদি পর্যুদাসবিধির নিমিত্তভূত পুরুষগত কোন এক অতিরিক্ত ধর্মকে বুঝায়[১]।

অশৌচ সম্বন্ধে দেখা যায় যে, পুরুষদের অশৌচ বিষয়ে রঘুনন্দনের মতের সহিত পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু স্ত্রী-অশৌচ প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের মতের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য স্ত্রী-অশৌচ এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

স্ত্রীদের অশৌচ সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কি প্রকার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কিরূপ অশৌচ পালন করিতে হইবে সে সম্বন্ধে নিবন্ধকারগণ বহুপ্রকার ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন। আবার এই বিষয়ে নিবন্ধকারগণের মতের পার্থক্যও অত্যন্ত বেশী দেখা যায়, এখানে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

স্ত্রী-অশৌচ

রঘুনন্দন স্ত্রীদিগের অশৌচ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে আদিপুরাণের বচনকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[২]। তিনি বলেন—বিবাহিতা কন্যা যদি

(১) আশৌচশব্দেন চ কালস্নানাদ্যপনোদ্যঃ পিণ্ডোদকদানাদিবিধেঃ অধ্যয়নাদিপর্যুদাসস্য চ নিমিত্তভূতঃ পুরুষগতঃ কশ্চনাতিশয়ঃ কথ্যতে ন পুনঃ কর্মানধিকারমাত্রম্। [মিতাক্ষরা, পৃঃ ২৮১]

(২) আদিপুরাণং—দত্তা নারী পিতুর্গেহে সূয়তে ম্রিয়তেঽথবা।
স্বমশৌচং চরেৎ সম্যক্ পৃথক্স্থানব্যবস্থিতা॥
তদ্বন্ধুবর্গস্ত্বেকেন শুদ্ধ্যেত্তু জনকস্ত্রিভিঃ।
আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে॥
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ববর্ণেষু নিত্যশঃ।
ততো বাগ্দানপর্যন্তং যাবদেকাহমেব হি॥
অতঃ পরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ।
বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহম্॥
পিতুর্বরস্য চ ততো দত্তানাং ভর্তুরেব হি।
স্বজাত্যুক্তমশৌচং স্যাৎ সূতকে মৃতকেঽপি বা॥ [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৪]

পিতার গৃহে প্রসব করে অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে সেই কন্যা প্রসবের পর পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইয়া স্বকীয় জনন জন্য অশৌচ ভোগ করিবে। তাহার ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গ একদিনে এবং পিতা তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবে। জন্মের পর হইতে চূড়াকালের মধ্যে যদি কন্যার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সকল বর্ণের সদ্যঃ শৌচ হয়, ইহাই সনাতন নিয়ম। চূড়াকালের পর হইতে বাগ্দানকালের মধ্যে কন্যার মৃত্যুতে একদিন অশৌচ হয়। বাগ্দানোপযোগী বয়সের পর পিতৃগৃহে প্রবৃদ্ধ কন্যাদিগের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। বাগ্দান সম্পন্ন হইবার পর কন্যার মৃত্যু হইলে তাদৃশ কন্যার পিতা এবং বর এই উভয়ের সপিণ্ডদিগের পুত্র জন্মিলে বা তাহাদের মৃত্যু হইলে কেবল ভর্তৃপক্ষীয় সপিণ্ডদিগেরই স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন এখানে 'পৃথক্ স্থানব্যবস্থিতা' এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ—পৃথক্ স্থানে অর্থাৎ পিতা প্রভৃতির সংসর্গশূন্য পিতৃগৃহে যদি সেই কন্যা প্রসব করে বা মৃত হয়, তাহা হইলে পিতার তিন রাত্রি অশৌচ। শুক্রশোণিতসম্বন্ধজনিত জননকর্তৃত্ব মাতার আছে বলিয়া মাতারও তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে[৩]—যদি পিতার প্রধান গৃহে বিবাহিতা কন্যা প্রসব করে বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহার বন্ধুবর্গ (ভ্রাতা প্রভৃতি) একদিনে শুদ্ধ হয় এবং জনক পিতা তিনদিনে শুদ্ধ হয়। কিন্তু যদি পৃথক্ স্থানে অর্থাৎ পিতার শয়ন, ভোজন এবং দেবার্চন স্থান ভিন্ন অপর একটি স্বতন্ত্র গৃহে প্রসব করে বা মৃত হয়, তাহা হইলে কেবল ঐ স্ত্রীলোকের ভর্তৃপক্ষীয় জ্ঞাতিগণই নিজেদের জন্য বিহিত পূর্ণ অশৌচ ভোগ করিবে, তাহার পিত্রাদির আর স্বজাত্যুক্ত পূর্ণ অশৌচ হইবে না অর্থাৎ আদিপুরাণের এই সাধারণ বিধিটিকে তাঁহারা পরিসংখ্যারূপেই কল্পনা করিয়াছেন। এই বচন দ্বারা স্বামীর সপিণ্ডদিগের স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের কল্পনা-পূর্বক পিত্রাদির অশৌচের নিষেধরূপ পরিসংখ্যার কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বমত সমর্থন করার জন্য কল্পতরুর মত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বিবাহিতা

(৩) রঘুনন্দন এখানে 'কেহ কেহ বলেন' বলিয়া যে মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা গোবিন্দানন্দের মত বলিয়া মনে হয়। যথা—'পিতুঃ প্রধানগৃহে প্রসবমরণে বন্ধুবর্গস্ত্বেকরাত্রং পিতুস্ত্রিরাত্রম্ ।········ পৃথক্স্থানে ব্যবস্থিতা পিতুরপ্রধানগৃহে প্রসবে স্বমশৌচং ভর্তৃসম্বন্ধ্যশৌচং নার্য্যেব চরেৎ ন তু পিত্রাদিঃ। ম্রিয়ত ইত্যস্য যথাযোগ্যমন্বয়ঃ। তথাচ কল্পতরুলিখিতং ব্যাসবচনম্—

দত্তা নারী পিতুর্গেহে প্রধানে সূয়তে যদা।
ম্রিয়তে বা তদা তস্যাঃ পিতা শুদ্ধ্যেৎ ত্রিভি র্দিনৈঃ॥ [শুদ্ধিকৌমুদী, পৃঃ ৩৩]

আবার দেখা যায় অবিবাহিতা কন্যাদের মৃত্যুতেও নিবন্ধকারগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ভবদেবভট্ট বলেন[১৩]—দশাহের পর কন্যার মৃত্যুতে সর্বত্র মাতা ও পিতার তিন রাত্রি অশৌচ, অন্য সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হয়। চূড়াকরণের পর হস্তোদকদান পর্যন্ত কন্যার মৃত্যুতে একদিন অশৌচ হয়।

অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যুতে অশৌচ

অনিরুদ্ধভট্ট তাঁহার হারলতা গ্রন্থে বাগ্‌দানের পূর্বে কন্যার মরণে একদিন অশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন[১৪]।

শ্রীনাথও নির্দেশ দিয়াছেন যে, চূড়াকরণের পর বাগ্‌দান পর্যন্ত কন্যার মৃত্যুতে একরাত্রি অশৌচ[১৫]।

গোবিন্দানন্দের মতে—যেখানে বাগ্‌দান নাই, সেখানে বিবাহ পর্যন্ত কন্যাদের মৃত্যুতে একাহ অশৌচ[১৬]।

রঘুনন্দন অবিবাহিতা কন্যাদিগের মৃত্যুতে পিতামাতার একদিন অশৌচ নির্দেশ করেন। শাস্ত্রে অবাগ্‌দত্তা কন্যাদিগের স্বীয় পিতার উদ্দেশে একদিনেই দশপিণ্ডদানের নিয়ম করায় প্রায় সমুদয় নিবন্ধকারই পিতার মরণে অবাগ্‌দত্তা কন্যাদিগের একাহাশৌচের কল্পনা করিয়াছেন। অবাগ্‌দত্তা কন্যা যে একাহে পিণ্ডদান করিবে তৎসম্বন্ধে ঋষ্যশৃঙ্গের বচন যথা—অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পিণ্ডদাত্রী হইবে, ঐ কন্যা একদিনেই দশপিণ্ড প্রদান করিবে। অশৌচও সেই অনুসারে হইবে[১৭]।

---

(১৩) মাতাপিত্রো র্দশাহাদূপরি সর্বত্রৈব দুহিতৃমরণে ত্রিরাত্রম্। ইতরসপিণ্ডানাং চূড়াকরণাৎ পূর্বং সদ্যঃ শৌচম্। তত্র চূড়াকরণাদূপরি হস্তোদকদানপর্যন্তমেকাহঃ।

[শবসূতকাশৌচপ্রকরণ, পৃঃ ১৭]

(১৪) এতদেব বাগ্দানাৎ পূর্বং চূড়াকরণাৎ প্রভৃতি কন্যামরণে একাহোরাত্রমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অহত্তদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্।.........চূড়াপর্যন্তং সদ্যো বাগ্দানপর্যন্তমেকমহঃ পাণিগ্রহণপর্যন্তং ত্রিরাত্রং তদূপরি পিতৃকুলেঽশৌচাভাব ইতি। কূর্মপুরাণে ব্যাসঃ—অহত্তদত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্। [হারলতা, পৃঃ ৪৯, ৫৩]

(১৫) বাগ্দানাৎ পূর্বং চূড়াকরণোপরি একরাত্রমিত্যাহুঃ। তথা শঙ্খলিখিতৌ—একাহং কন্যায়া-মৃতায়াং গোত্রতঃ পিণ্ডাশৌচয়ো নিবৃত্তিঃ। কন্যায়ামকৃতবাগ্দানায়ামেকাহোরাত্রমশৌচম্।

[শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৫৭ ক]

(১৬) যত্র তু বাগ্দানং ন স্যাৎ তত্র বিবাহপর্যন্তমেকাহমশৌচম্। [শুদ্ধিকৌমুদী, পৃঃ ৩০]

(১৭) এবমবাগ্দত্তায়াঃ কন্যায়া একাহেন দশপিণ্ডদানানুরোধাৎ। একাহাশৌচং নিবন্ধৃভিঃ কল্প্যতে। তথাচ ঋষ্যশৃঙ্গঃ—অপুত্রস্য তু যা পুত্রী সাপি পিণ্ডপ্রদা ভবেৎ।

তস্য পিণ্ডান্ দশৈতান্ একাহেনৈব নির্বপেৎ॥

পূর্বোক্তাদিপুরাণবচনাৎ কন্যায়া মরণে পিতুর্বাগ্‌দানপূর্বাপরয়োরেকাহত্র্যহবিধানাৎ তস্যা অপি পিতৃমরণে তথৈবেতি। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০]

অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে—কন্যা চূড়াকরণের পর হইতে বাগ্‌দানকাল পর্যন্ত পিতৃমরণে একদিনেই দশপিণ্ড দান করিবে এবং বাগ্‌দানের পর পিতৃমরণে ত্রিরাত্রে দশপিণ্ড দান করিবে। হারলতা প্রভৃতি নিবন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর পিতামাতার পক্ষেও কন্যার মরণে এইরূপই অশৌচের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্বে বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে সন্তানপ্রসব বা মৃত্যু হইলে তিনরাত্রি অশৌচ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভর্তৃগৃহে অবস্থানকালেও যে দত্তা কন্যার মৃত্যুতে পিতার তিনরাত্রি অশৌচের নির্দেশ দেওয়া আছে, তাহা পিণ্ডদানকারী পিতার পক্ষেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে পিতা ভিন্ন দত্তা কন্যাদিগের আর কেহ পিণ্ডদানের অধিকারী নাই, সেই স্থলেই দত্তা কন্যার মরণে পিতার তিনরাত্রি অশৌচ হইবে, অন্য পিণ্ডদাতা থাকিলে আর পিতার ঐরূপ অশৌচ হইবে না। এইরূপ বিশেষ করিয়া না বলিলে পূর্বোক্ত দত্তা কন্যাদিগের মরণে স্বামিকুলেরই অশৌচ হইবে—এইরূপ পিতৃকুলে অশৌচের নিবৃত্তি হয় না। আবার দেখা যায় যাহাদের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই, এতাদৃশ ব্রাহ্মণসন্তানের দহন ও বহনে সদ্যঃশৌচ হইবে এবং যেসব ব্রাহ্মণের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের দহন ও বহনে তিনরাত্রি অশৌচ হইবে—এইরূপ উক্তিতে যে তিনরাত্রি অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, উহারা দহনাদি না করিলেও ঐ তিনরাত্রি অশৌচভাগী হইবে। এইরূপ না বলিলে কন্যাদের পিতামাতার মরণ হইলেই তাহাদের স্বামীর অশৌচ হইবে, অথচ কন্যাদের অশৌচ হইবে না—ইহা বড়ই বিষম দৃশ্য হয়।

কিন্তু রায়মুকুট প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ পিত্রাদির মরণে অবিবাহিতা কন্যার সম্পূর্ণাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে রঘুনন্দনের মতে তাহা ঠিক নহে। কারণ একটি বচন আছে—অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পিণ্ডদাত্রী হইবে এবং ঐ কন্যা মৃত পিতার উদ্দেশে দশপিণ্ড একদিনেই প্রদান করিবে। আবার দেখা যায়—অশৌচকালের মধ্যেই দশপিণ্ড প্রদান করিতে হইবে—এই দুইটি বচনের এক-বাক্যতা করিলে পিতামাতার অনূঢ়া কন্যারও একাহ অশৌচ হওয়াই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। কারণ একাহে দশটি পিণ্ডের বিধান করা হইয়াছে এবং অপর সকল নিবন্ধকারও একাহাশৌচেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন[১৮]।

---

(১৮) অত্রানূঢ়কন্যায়াঃ পিত্রাদিমরণে সম্পূর্ণাশৌচং কার্যমিতি রায়মুকুটপ্রভৃতয়ঃ তন্ন, 'অপুত্রস্য চ যা পুত্রী সৈব পিণ্ডপ্রদা ভবেৎ' ইতি বচনেন 'যাবদশৌচং পিণ্ডান্ দদ্যাদি'তি বচনয়োরেকবাক্যতয়া একাহো যুক্তঃ, একাহে দশপিণ্ডদানবিচারেণ একাহাশৌচাভ্যুপগমাৎ।

[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬১]

মৈথিল নিবন্ধ
অশৌচের ব্যবস্থা
হইতে বাগ্‌দান
এই বিষয়ে একাহ
অনিরুদ্ধভট্ট নির্দে
পর কন্যা অধিক
অশৌচ হয়। রুদ্র
সেখানে বিবাহ
প্রকাশ করেন নাই
প্রথা নাই বলিয়া
পিতামাতার একাহ
আবার রুদ্রধর
তাহার সমালোচন
কন্যাদিগের তিন
স্ত্রীদিগের সপ্তপুরুষ
দিগের তিন পুরুষ
বিষয়কই বলিতে
সাতপুরুষ হইতে
বরাবর সাতপুরুষ অ
রঘুনন্দন এই

(১৯) শুদ্ধিচিন্তামণি,
(২০) অতঃপরমক্ত
ব্যক্তীকরোতি বাক্‌প্রদানে
………এবমেব হারল
শৌচং ভবতীত্যর্থঃ। [
(২১) কূর্মপুরাণে—অ
প্র
অপ্রত্তানামবিবাহিতা
যদ্বশিষ্ঠবচনে প্রত্তানাং স্ত্রী
প্রতিভাতি কন্যানামপি সং
(২২) রুদ্রধরোক্তং ন
ত্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাৎ

মৈথিল নিবন্ধকারগণের মধ্যেও দেখা যায় অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যুতে একাহ অশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেমন বাচস্পতিমিশ্র নির্দেশ দেন যে, চূড়াকরণ হইতে বাগ্‌দান পর্যন্ত কন্যার মরণে একাহ অশৌচ হয়[১৯]। আবার রুদ্রধরও এই বিষয়ে একাহ অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন[২০]। দেখা যায় সমস্ত নিবন্ধকারই অনিরুদ্ধভট্ট নির্দেশিত 'অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং' অংশের অর্থ ধরিয়াছেন—বাগ্‌দানের পর কন্যা অধিক রূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তখন বরপক্ষ ও পিতৃপক্ষে তিন রাত্রি অশৌচ হয়। রুদ্রধরও তাহা স্বীকার করিয়া বলেন যে, যেখানে বাগ্‌দান হয় না সেখানে বিবাহ পর্যন্ত পিতৃপক্ষে একাহ অশৌচ। তবে ভবদেবভট্ট এসম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন নাই। রঘুনন্দনও ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে বাগ্‌দানের প্রথা নাই বলিয়া চূড়াকরণের পর হইতে বিবাহকাল পর্যন্ত কন্যার মৃত্যুতে পিতামাতার একাহ অশৌচ হইয়া থাকে।

আবার রুদ্রধর স্ত্রীদিগের সাপিণ্ড্য সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করায় রঘুনন্দন তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। সাপিণ্ড্য সম্বন্ধে বশিষ্ঠ বলেন—'অপ্রদত্তা কন্যাদিগের তিন পুরুষ সাপিণ্ড্য'। রত্নাকর গ্রন্থে উদ্ধৃত কূর্মপুরাণের 'অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের সপ্তপুরুষ সাপিণ্ড্য'—এই বচন দেখিয়া রুদ্রধর সিদ্ধান্ত করেন যে কন্যা-দিগের তিন পুরুষাবধি সাপিণ্ড্য প্রতিপাদক বচন সকলকে বাগ্‌দানের উত্তর-বিষয়কই বলিতে হইবে অর্থাৎ বাগ্‌দানের পরই স্ত্রীদিগের পিতৃকুলে সাপিণ্ড্য সাতপুরুষ হইতে কমিয়া আসিয়া মাত্র তিনপুরুষ অবধি হয়, বাগ্‌দানের পূর্বে বরাবর সাতপুরুষ অবধিই থাকে[২১]।

রঘুনন্দন এই মত হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন[২২]। কারণ ঐ সাতপুরুষ পর্যন্ত

---

(১৯) শুদ্ধিচিন্তামণি, পৃঃ ২৮।

(২০) অতঃপরমকৃতবাগ্‌দানাবস্থাতঃ পরং প্রবৃদ্ধানাং প্রাপ্তাধিকরূপাণামিত্যর্থঃ। অধিকরূপং ব্যক্তীকরোতি বাক্‌প্রদানে কৃত ইতি।

………এবমেব হারলতা। যত্র তু বাগ্‌দানং ন ভবতি তত্র চূড়ানন্তরং বিবাহপর্যন্তমেকাহমেবা-শৌচং ভবতীত্যর্থঃ। [শুদ্ধিবিবেক, পৃঃ ৮]

(২১) কূর্মপুরাণে—অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্।

প্রত্তানাং ভর্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।।

অপ্রত্তানামবিবাহিতানাং প্রত্তানাং বিবাহিতানাম্। এবঞ্চ রত্নাকরলিখিতৈতদ্বাক্যপর্যালোচনয়া যদ্বশিষ্ঠবচনে প্রত্তানাং স্ত্রীণাং ত্রিপুরুষমিতি সাপিণ্ড্যং প্রতিপাদিতং তদ্‌বাগ্‌দানোত্তরবিষয়মিতি প্রতিভাতি কন্যানামপি সপ্তপুরুষাবধি সাপিণ্ড্যত্বব্যবহারাৎ। [ঐ, পৃঃ ২৪]

(২২) রুদ্রধরোক্তং ন যুক্তং তস্য বচনস্যোদ্বাহপরত্বেনৈবোপপত্তেস্ত্রিপৌরুষবচনস্য বাগ্‌দানো-ত্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাৎ গৌরবাচ্চ। যথোক্তেন পূর্বার্দ্ধোক্তেন ত্রিরাত্রেণ শুধ্যতি। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৫]

সাপিণ্ড্য প্রতিপাদক কূর্মপুরাণীয় বচনকে কেবলমাত্র বিবাহকালে সাপিণ্ড্য গণনাতেই প্রযোজ্য—এই কথা বলিলেই সকল বিরোধের মীমাংসা হয়। অন্যদিকে কিন্তু অন্য শাস্ত্রোক্ত তিনপুরুষ পর্যন্ত সাপিণ্ড্য প্রতিপাদক বচন অনুসারেও স্ত্রীদিগের বাগ্‌দানের পরই যে তিনপুরুষ পর্যন্ত পিতৃকুলে সাপিণ্ড্য গণনা করিতে হইবে তাহার পূর্বে নহে, এইরূপ নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। কেবল প্রমাণের অভাবই নহে, ঐমতে গৌরবও হয় অর্থাৎ অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের অশৌচ সম্বন্ধে বাগ্‌দানের পূর্বে পিতৃকুলে সাতপুরুষ পর্যন্ত সাপিণ্ড্যের গণনা করিতে হইবে—এই দুইটি বিধিমূলক শ্রুতি কল্পনায় গৌরব হয়।

ইহার পর নিবন্ধকারগণ একটি বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, যদিও এই বিষয় সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া রঘুনন্দন এ সম্বন্ধে কোন মতই প্রকাশ করেন নাই।

ব্যভিচার বিষয়ে অশৌচ ব্যবস্থা

মিথিলার নিবন্ধকারগণের মধ্যে রুদ্রধর বলেন[২৩]—পিতা কর্তৃক প্রদত্তা হওয়ার পর যদি সেই কন্যা ইচ্ছানুসারে অন্যব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যার মৃত্যুতে বা সন্তান প্রসবে সেই আশ্রিত ব্যক্তি এবং পিতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার স্বামীর তিন দিন অশৌচ হয়। রুদ্রধরের মতে সেই কন্যা যদি ক্ষতযোনি হওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তবেই এই ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। কিন্তু যদি অক্ষতযোনি অবস্থায় পরে কোন পুরুষকে আশ্রয় করে তাহা হইলে সেই কন্যার প্রসবে বা মৃত্যুতে পরবর্তী আশ্রিত পুরুষেরই কেবল তিন দিন অশৌচ হইবে এবং সেই কন্যার গোত্রও পরবর্তী পুরুষের গোত্র অনুসারেই নির্ধারিত হইবে। কিন্তু পিতা কর্তৃক নির্ধারিত স্বামীর সহিত সংগম হইলে স্ত্রী সেই স্বামীর সগোত্রা হইবে।

আবার দেখা যায় সপ্তপদীগমনে বলপূর্বক যদি কোন কন্যা গোত্রান্তরিতা হইবার পূর্বেই অপহৃতা হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে সেই কন্যার গোত্র পূর্ববর্তী স্বামীর গোত্র অনুসারেই হইবে। আবার বিশেষভাবে বলা হয় যে বলপূর্বক অপহৃতা কন্যার যতদিন সন্তান প্রসব না হয় ততদিন পিতার গোত্রই

(২৩) বিবাহিতা স্ত্রী পাণিগ্রাহকাদন্যং যং পুরুষমাশ্রয়তি তস্যৈব পুরুষস্য তস্যাং মৃতায়াং প্রসূতায়াং বা ত্রিরাত্রমশৌচং ভবতি। স্বয়ং গ্রাহককুলজানামশৌচং তত্র ন ভবতি। যদি চ পাণিগ্রাহকেন তস্যাঃ সংগমঃ কৃতস্তদা তস্যাঃ পাণিগ্রাহকগোত্রমেব তিষ্ঠতি স্বয়ং গ্রাহকগোত্রং ন ভবতি। যদি তস্যাস্তৎসংগমো ন বৃত্তস্তদা যমেবাশ্রিতবতী ভবতি তস্যৈবান্যস্যান্যগোত্রস্য সগোত্রা সা ভবতি। অশৌচং তত্রাপি ত্র্যহমেব। [শুদ্ধিবিবেক, পৃঃ ৯]

সেই কন্যার থাকে কিন্তু সন্তান হইলে পূর্ববর্তী স্বামীর গোত্রই তাহার হইবে। তবে কখনই বলপূর্বক অপহারকর্তার গোত্র তাহার হইবে না। কিন্তু তাহার মৃত্যু বা প্রসব হইলে সেই অপহারকর্তারও তিনরাত্রি অশৌচ ভোগ করিতে হইবে[২৪]। মিথিলার বাচস্পতিমিশ্রও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন[২৫]।

পূর্বযুগে সমাজে স্ত্রী পরিণীতা হইয়াও অন্যপুরুষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিলে বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত না। কারণ আমরা দেখি বৃহস্পতিস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে যে[২৬] পূর্বে ব্যভিচার সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। এইজন্যই বঙ্গভূমি ও মিথিলা—উভয় দেশের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণই এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সমাজে এই ব্যভিচার অত্যন্ত প্রচলিত ছিল বলিয়াই নিবন্ধকারগণ মুক্তকণ্ঠে ইহাদের অশৌচ প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের নিবন্ধকারগণের মধ্যে ভবদেবভট্ট বলেন[২৭]—অন্য পুরুষগামিনী ভার্যার গর্ভে অন্যপুরুষের সংসর্গে জাত পুত্রের মৃত্যুতে এবং পরপূর্বা স্ত্রীর মৃত্যুতে পূর্ববর্তী স্বামী তিনরাত্রি অশৌচভাগী হইবে। আবার বৃহস্পতির বচনেও পাওয়া যায় অন্যাশ্রিত ভার্যাতে পরপুরুষের সংসর্গে জাত পুত্র ও সেই ভার্যা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অশৌচভোগ করিবে।

---

(২৪) পদে সপ্তমে যত্র বলাৎ কাচিদ্ধৃতা ভবেৎ।
স্বামিগোত্রং ভবেত্তস্যাস্তচ্চ ভূয়ো বিশিষ্যতে॥
পিতৃকন্থং প্রসূতায়াং ততঃ পৌর্বিকভর্তৃকম্॥

অস্যার্থঃ—পাণিগ্রহণে বৃত্তেঽসমাপ্তে সপ্তপদীসমারোহণে যা বলাৎ হৃতা অন্যমাশ্রিতা ভবতি তস্যাঃ স্বামিগোত্রং পাণিগ্রাহকগোত্রমেব ভবতি।……বলাৎকারহর্তু র্গোত্রং কদাপি ন ভবতি তস্যা ইতি অশৌচে তৎপ্রসবমরণয়োস্ত্রিরাত্রমেব হর্তু রিতি। [শুদ্ধিবিবেক, পৃঃ ৯]

(২৫) পিত্রা দত্তা তু যা কন্যা স্বাতন্ত্র্যাদন্যমাশ্রিতা।
যং যং শ্রিতবতী ভূয়স্তস্যাশৌচং ভবেত্র্যহম্।

ইদন্তু ক্ষতযোনেঃ স্বাতন্ত্র্যসঙ্কারপক্ষে। তথা কামাদক্ষতযোনিশ্চেদন্যং গত্বা ব্যবস্থিতা তস্যাস্তস্য সগোত্রা সা যং ত্বাশ্রিতবতী স্বয়ম্। অক্ষতযোনে দ্বিতীয়ে পুংসি স্থৈর্যে তদ্গোত্রতা।

[শুদ্ধিচিন্তামণি, পৃঃ ২৯]

(২৬) বৃহস্পতিঃ—মৎস্যাদাশ্চ নরাঃ পূর্বে ব্যভিচাররতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

[বিবেকার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৩ খ]

(২৭) তথা চ শঙ্খঃ—অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্যাস্বন্যগতাসু চ।
পরপূর্বাসু চ স্ত্রীষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥

তথা বৃহস্পতিঃ—অন্যাশ্রিতেষু দারেষু পরপত্নীসু তেষু চ।
মৃতেষ্বাপ্লুত্য শুধ্যেত ত্রিরাত্রেণ দ্বিজোত্তম॥ [শবসূতকাশৌচপ্রকরণ, পৃঃ ১৯-২০]

সুতরাং যদি উত্তমবর্ণ ব্যক্তির হীনবর্ণা ভার্যাতে অনৌরস পুত্র জাত হয় বা পরিণীতা হীনবর্ণা ভার্যা অন্যব্যক্তিদের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই ভার্যার ও পুত্রের মৃত্যুতে সেই ব্যক্তির একদিন পরেই শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। এইরূপ হীনবর্ণজাত ভার্যার মৃত্যুতেই একদিন অশৌচ হয়, কিন্তু অন্যত্র তাহা হইবে না। আবার অনৌরস পুত্রের মরণে যেখানে পিতার তিনরাত্রি অশৌচ, সেখানে সপিণ্ডদের একদিন অশৌচ হয়[২৮]।

অনিরুদ্ধভট্ট বলেন—সপ্তপদীগমনের পর পাণিগ্রহণ কর্তব্য। সপ্তপদীগমনের পর কোনও ব্যক্তি কর্তৃক বলপূর্বক কন্যা হৃতা হইলে পাণিগ্রহণের অভাবেও সপ্তপদীগমনকারী ব্যক্তির গোত্র কন্যার হইবে। আবার বলা হয় যতক্ষণ সেই কন্যার সন্তান প্রসব না হয়, ততক্ষণ পিতার গোত্রই কন্যার থাকে, প্রসবের পর পূর্ব স্বামীর গোত্র কন্যার হইবে। আর স্বতন্ত্রভাবে কন্যা ক্ষতযোনি হইয়া অন্যব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে পূর্বস্বামীর গোত্রই তাহার হইবে[২৯]। শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন[৩০]।

পরবর্তী যুগে যে ব্যভিচারিতা সমাজে নিন্দিত ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি গোবিন্দানন্দ স্ত্রী-অশৌচ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। কিন্তু সপিণ্ডাদি অশৌচপ্রসঙ্গে গোবিন্দানন্দ বলেন যে, হীনবর্ণা নারী প্রমাদবশতঃ যদি প্রসবপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রসবে ও মরণে তজ্জাত অশৌচের নিবৃত্তি হয় না। গোবিন্দানন্দ বলেন এখানে শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে[৩১]।

---

(২৮) তেন যদ্যুত্তমবর্ণস্য হীনবর্ণভার্যায়ামনৌরসপুত্রো ভবতি, পরিণীতহীনবর্ণভার্যা বান্যেষাং ভবতি, তদা তন্মরণে একাহাৎ শুদ্ধির্ভবতি ন তু সর্বত্রেতি। অনৌরসপুত্রমরণেঽপি যত্র তু পিতুস্ত্রিরাত্রং তত্র সপিণ্ডানামেকাহঃ। [শবসূতকাশৌচপ্রকরণ, পৃঃ ২০]

(২৯) তচ্চ ভূয়ো বিশিষ্যতে ইতি যাবৎ তস্যাঃ প্রসবো ন ভবতি তাবৎ পিতুরেব গোত্রং প্রসবোপরি পৌর্বিকস্য ভর্তুঃ সপ্তপদীমাত্রকর্তুর্গোত্রম্।......

ক্ষতযোনিত্বে তু যস্মিন্ পিত্রা দত্তা তদ্‌গোত্রেণৈবেত্যর্থঃ। [হারলতা, পৃঃ ৫৩-৫৪]

(৩০) স্বাতন্ত্র্যাদন্যমাশ্রিতায়াস্তু কতমদ্ গোত্রমিত্যত্রাহ—কামাদক্ষতযোনিত্বেঽপি যস্মৈ পিত্রা দত্তা তদ্ গোত্রৈবেত্যর্থঃ। এতেন যৎ সংশ্রিতবতীত্যাদি ন দ্বিতীয়ভর্তুর্যদশৌচমূৰ্দ্ধং তদক্ষতযোনিত্বে বোধ্যম্।.........ইত্থং পাণিগ্রহণনিষ্ঠায়ামকৃতায়ামপি স্বামিনঃ প্রতিগ্রহীতুরেব গোত্রং তস্যা ইত্যেবার্থ ইতি। [শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৬২ খ, ৬৩ ক]

(৩১) হীনবর্ণা তু যা নারী প্রমাদাৎ প্রসবং ব্রজেৎ।
প্রসবে মরণে তজ্জমশৌচং নোপশাম্যতি। [শুদ্ধিকৌমুদী, পৃঃ ৬৫]

নিবন্ধকারগণ

ব্যভিচার সম্বন্ধে ও
রঘুনন্দনের অভিে

আলোচনা কা
দেখা যায়, অন্য
ঔরসভিন্ন পুত্রা
ত্রিরাত্রাশৌচ হ
বাস্তবিক
ঐরূপে উৎপাদি
দুষ্ট হইয়া থাকে
আর শূদ্রক
অংশভাগী হইয়া
ভ্রাতাকেও অংশ
যাজ্ঞবল্ক্যের
দেখা যায়, অন্য
হইবে[৩২]।
শঙ্খলিখিতে
ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পু
তাহাদিগের উদ্দে
বচনটি অপকৃষ্টজা
এই সমস্ত আ

(৩২) বস্তুতস্ত প্রা
ইদানীং ব্যবহারোঽপি
তথাবিধাচারো নান্যেষা
(৩৩) যত্তু শঙ্খলিখি
ইতি তদপকৃষ্টজাতি

পূর্বযুগে ব্যভিচার সমাজে অধিকপরিমাণে প্রচলিত ছিল বলিয়াই পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন এসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্ত্রী-অশৌচ প্রসঙ্গে ইহার কোন আলোচনা না করিলেও সপিণ্ড প্রভৃতির অশৌচ প্রসঙ্গে কতকটা এই ধরণের আলোচনা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন যে শূদ্রদিগের মধ্যেই এইরূপ আচার প্রচলিত দেখা যায়, অন্যবর্ণের নহে। যেমন আমরা দেখি শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন বলেন—ঔরসভিন্ন পুত্রদিগের জন্ম ও মৃত্যুতে এবং অন্যপূর্বা ভার্যাদিগের প্রসবে ও মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়।

ব্যভিচার সম্বন্ধে আলোচনা রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে

বাস্তবিক পক্ষে রঘুনন্দনের মতে কলিকালে ক্ষেত্রজপুত্রকরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ঐরূপে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদকেরই পুত্ররূপে গণ্য হইবে, ব্যবহারও এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আর শূদ্রকর্তৃক দাসীর গর্ভে যথেচ্ছ উৎপাদিত পুত্রও উৎপাদক পিতার ধনের অংশভাগী হইয়া থাকে, সেইজন্য পিতার মৃত্যুর পর অপর ভ্রাতৃগণ তথাবিধ ভ্রাতাকেও অংশভাগী করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন অনুসারে শূদ্রদিগের ভিতরেই উক্তরূপ আচার প্রচলিত দেখা যায়, অন্য বর্ণের মধ্যে নহে। অতএব ইহা শূদ্রবিষয়ক বলিয়াই বুঝিতে হইবে[৩২]।

শঙ্খলিখিতের একটি বচন উল্লেখপূর্বক রঘুনন্দন বলেন—অন্যপূর্বা ভার্যা এবং ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্রের মৃত্যুতে অধ্যয়নের বাধা হইবে না, অশৌচও হইবে না এবং তাহাদিগের উদ্দেশে উদকক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণাদিও করিতে হইবে না। এই বচনটি অপকৃষ্টজাতিবিষয়ক বলিয়া রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন[৩৩]।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে ব্যভিচার সমাজে নিন্দনীয় না

---

(৩২) বস্তুতস্তু প্রাগুক্তাদিত্যপুরাণবচনাৎ কলৌ ক্ষেত্রজপুত্রকরণনিষেধাৎ স চ পুত্রো বীজিনামেব ইদানীং ব্যবহারোঽপি তথা—জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ।
মৃতে পিতরি কুর্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনম্ ॥ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদর্শনাচ্ছূদ্রাণামেব তথাবিধাচারো নান্যেষাং বর্ণানামিতি, অতএব প্রাগুক্তব্রহ্মপুরাণ বচনমপ্যেতৎপরম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬১]

(৩৩) যত্তু শঙ্খলিখিতৌ—অন্যপূর্বাসু ভার্যাসু কৃতেষু চ মৃতেষু চ।
নানধ্যায়ো ভবেত্তত্র নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥
ইতি তদপকৃষ্টজাতিবিষয়ম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬১]

হইলেও রঘুনন্দনের সময়ে ইহা অত্যন্ত গর্হিত কার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। রঘুনন্দন উচ্চবর্ণের মধ্যে এই বিষয়কে কখনই স্বীকৃতি দেন নাই।

রঘুনন্দনের সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রভাবে অরাজকতা ও বিলাসিতার স্রোতে জনগণ মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যভিচারিতাও সমাজে চলিতেছিল। ইহা সম্যক্ প্রতিরোধ করিতেই রঘুনন্দন বিধবাগণের সামাজিক জীবনযাত্রায় কঠোরতার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে কঠোরনীতি প্রচলিত করিয়া সমাজে ব্যভিচারিতা দমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দন সমাজে শুধু যে কঠোর মনোভাব লইয়াই শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোমলতাও সমভাবে প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দনের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই সমাজে সতীদাহপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। পূর্বে সহমরণপ্রথা সমাজে উচ্চ মহিমায় কীর্তিত ছিল। সমাজ-রক্ষার প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রঘুনন্দন কিন্তু স্ত্রীদিগের প্রতি এই নৃশংসতম আচরণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সমাজের এই নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থা হইতে অসহায় স্ত্রীদের রক্ষা করিবার জন্য সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।

সহমরণপ্রথা রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে

তিনি শুদ্ধিতত্ত্বে সহমরণ ও অনুমরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সহমরণ বলিতে বুঝায়—'ভর্তৃদেহসংস্কারাগ্নিপ্রবেশেন স্বশরীরসংস্কারঃ সহগমনম্'। অর্থাৎ ভর্তার দেহের সংস্কারনিমিত্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ দ্বারা স্বকীয় শরীরের সংস্কারই সহগমন নামে পরিচিত। এই সহগমন বা সমহরণ মাত্র ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীর পক্ষে বিহিত ছিল।

আর অনুমরণ বলিতে বুঝায়—'অনুগমনন্তু ভর্তৃশরীরপ্রতিনিধিপাদুকাদি-সংস্কারাগ্নিপ্রবেশেন স্বশরীরসংস্কারঃ'। অর্থাৎ ভর্তৃশরীরের প্রতিনিধিস্বরূপ পাদুকাদির সহিত প্রজ্বলিত অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় শরীরের সংস্কার অনুগমন বা অনুমরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অনুমরণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর পক্ষে বিহিত ছিল।

সহমরণ প্রসঙ্গে অঙ্গিরার বচন উল্লেখপূর্বক রঘুনন্দন বলেন[৩৪]—স্বামীর মৃত্যু

(৩৪) অঙ্গিরাঃ—মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥.........
যা নারীত্যুপাদানাৎ সহমরণ ভাবপক্ষোঽপি সূচিতঃ। নান্যো ধর্ম ইতি তু সহমরণস্তুত্যর্থম্।
[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৪৫]

হইলে যে নারী অগ্নিতে আরোহণ করে, সে অরুন্ধতীর সমান হইয়া স্বর্গলোকে বাস করে। এই অঙ্গিরার বচন হইতে সহমরণের বিষয় প্রাপ্ত হইলেও এই উদ্ধৃতি হইতেই পাওয়া যায় যে সতীদাহপ্রথা না মানিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ ঐ অঙ্গিরার বচনেই 'যে নারী' এইরূপ কথা উক্ত থাকায় সকলের পক্ষেই যে সহমরণ অবশ্য কর্তব্য, এইরূপ বুঝাইতেছে না। উহা দ্বারা কোন স্ত্রী অনিচ্ছুক হইলে সহমরণ নাও করিতে পারে, ইহাই সূচিত হইতেছে। আবার ঐ উদ্ধৃতিতেই যে 'সহমরণ ব্যতীত অন্য ধর্ম নাই' এইরূপ বলা হইয়াছে উহা সহমরণের স্তুতিবাদমাত্র। ইহার দ্বারা এইরূপ বুঝায় না যে ভর্তার মৃত্যুর পর স্ত্রীদিগের একমাত্র সহমরণই কর্তব্য। ইহার পক্ষান্তরও আছে। শাস্ত্রে বিধবা স্ত্রীর পক্ষে কর্তব্য ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি অপরধর্মেরও নির্দেশ করা হইয়াছে। স্ত্রীদিগের সহমরণ ভিন্ন অন্যপ্রকার ধর্মও যে আচরণীয় সে সম্বন্ধে বিষ্ণু এইরূপ বলিয়াছেন [৩৫]—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান অথবা তদীয় চিতায় আরোহণ—এই উভয় প্রকার ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই উদ্ধৃতিতে ব্রহ্মচর্য ও পরে চিতায় আরোহণের বিধি থাকায় ব্রহ্মচর্যের প্রাধান্য এবং অন্যটি তাহার অনুকল্প—এই ব্যবস্থা আছে। কারণ ইহার ঠিক পরেই রঘুনন্দন ব্রহ্মচর্যের অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মচর্যের অর্থ মৈথুন পরিত্যাগ এবং তাম্বূলাদি ব্যবহার পরিত্যাগ। প্রচেতা ব্রহ্মচর্য অবস্থায় আচরণীয় কর্মের নির্দেশ দিয়াছেন, যথা—যতী, ব্রহ্মচারী এবং বিধবাগণ তাম্বূল সেবন, অভ্যঞ্জন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। আবার স্মৃতি আছে[৩৬]—বিধবা স্ত্রী একবার মাত্র আহার করিবে, কদাচ দুইবার আহার করিবে না এবং যে নারী বিধবা হইয়া পর্যঙ্কে শয়ন করে, সে আপনার পতিকে অধঃপাতিত করে। বিধবা কদাচ গন্ধদ্রব্যের সম্ভোগ করিবে না এবং প্রত্যহ তিল, কুশ ও উদক দ্বারা ভর্তার তর্পণ করিবে। এখানে যে তর্পণের কথা বলা হইয়াছে উহা যেস্থলে মৃতব্যক্তির পুত্র-পৌত্রাদির অভাব ঘটিবে, সেইস্থলের জন্যই বুঝিতে হইবে। বিধবাগণ বৈশাখ এবং কার্তিকমাসে একটি ব্রতবিশেষের আচরণ

(৩৫) বিষ্ণুঃ—মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণং বেতি। ব্রহ্মচর্যং মৈথুনবর্জনং তাম্বূলাদি-বর্জনঞ্চ যথা প্রচেতাঃ—তাম্বূলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জয়েৎ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৪৫]

(৩৬) স্মৃতিঃ—একাহারঃ সদা কার্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্যং ভর্তুস্তিলকুশোদকৈঃ॥ [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৪৫]

করিবে এবং স্নান, দান ও সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর নাম জপ করিয়া জীবন যাপন করিবে।

উপরি উক্ত এই সমস্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে রঘুনন্দন সতীদাহ-প্রথা সমর্থন তো করেনই নাই, বরং ব্রহ্মচর্য পালনকে সতীদাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। আবার উচ্চবর্ণের বিধবাদের মধ্যে যাহাতে ব্যভিচার প্রবেশ না করে তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা যাহাতে সৎপথে চলিতে পারেন তাহার জন্যই তাঁহাদের আহার, বিহার, চলাফেরা ইত্যাদি সম্বন্ধে কঠোরতা দেখা যায়। তবে কেহ কেহ যে বলেন[৩৭]—রঘুনন্দন কর্তৃক সহমরণ প্রশংসিত হওয়ার জন্যই দেশে সহমরণ চলিতে থাকে, তাহা ঠিক নহে। পূর্বে বলপূর্বক চিতারোহণের কথা যে শোনা যায় তাহা কেবলমাত্র শূদ্রজাতীয়দের মধ্যেই দেখা যায়। কারণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে ধনসম্পত্তির লোভে জোর করিয়া চিতারোহণ করিতে বাধ্য করা হইত, তাহাও সত্য নহে।

ইহার পর রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে, গর্ভবতী ও শিশুসন্তানযুক্ত স্ত্রী ব্যতীত নিজের ও স্বামীর মঙ্গলকামনায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলবর্ণের ভার্যামাত্রেরই সহমরণে ও অনুমরণে অধিকার আছে। আবার বলা আছে—যে সকল স্ত্রীদের কোলে শিশুসন্তান, যাহারা গর্ভবতী, যাহাদের রজোদর্শন হয় নাই এবং যাহারা রজঃস্বলা—ইহারা চিতারোহণ করিবে না। বৃহস্পতির উক্তিতেও পাওয়া যায় যে, স্ত্রীগণ স্বকীয় কোলের শিশুসন্তান পোষণ পরিত্যাগ করিয়া অনুগমন করিবে না। রজঃস্বলা এবং সূতিকাও স্বামীর অনুগমন করিবে না। গর্ভবতীর পক্ষে আপনার গর্ভরক্ষা অবশ্য কর্তব্য[৩৮]।

এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন যে এইসব স্ত্রীলোকের সহমরণ ও অনুমরণ একেবারে নিষিদ্ধ। ইহা ছাড়া যাঁহারা স্বাভাবিক সহমরণের উপযুক্ত তাঁহাদেরও সহমরণ রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে। রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ সতীদাহপ্রথা প্রতিরোধ করিতে কোন বাক্যই উচ্চারণ করেন নাই। রঘুনন্দনই সর্বপ্রথম এই রীতি নিবারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিয়াছেন। রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কোন নিবন্ধকারই সহমরণের বিরুদ্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। বরং ভবদেবভট্ট ইহা অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন[৩৯]। গোবিন্দানন্দও ইহা

(৩৭) নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ২৮৩।

(৩৮) শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৪৫।

(৩৯) দাহশ্চ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীপত্নীসহিতস্যৈব, তত্রানুমরণস্যাবিহিতত্বাৎ। ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়স্য তু সপত্নীকস্যাপীতি। যদাহ পৈঠীনসিঃ—

মৃতানুগমনং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ।
ইতরেষাং তু বর্ণানাং স্ত্রীধর্মোঽয়ং বিধীয়তে॥ [শবসূতকাশৌচপ্রকরণ, পৃঃ ৩৮]

স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই তিনি করেন নাই[৪০]।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রঘুনন্দন ইহার প্রতিরোধে সম্যগ্‌ভাবে শাস্ত্র-আলোচনা করিলেও আমাদের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসিগণ ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া অন্ধমোহে পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারগণের নির্দেশ অনুসারে এই জঘন্যতম কার্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তবে রঘুনন্দন এসম্বন্ধে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, তাহারই পরিণতি আমরা পরে দেখি ভারতের ইংরাজ শাসনকর্তা লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় সতীদাহপ্রথা চিরতরে তিরোহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের কঠোর মনোভাবের মধ্যেই কোমলতার সন্ধান পাওয়া যায়; তিনি সকলের পক্ষেই একাদশীতে উপবাস অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্দেশ করিলেও অসমর্থদের পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উপবাসের অনুকল্প হইতেছে[৪১]—ফল, মূল, দুগ্ধ, জল ইত্যাদি পানভোজন। আবার উপবাসে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাকে ধন দান করতঃ দ্বাদশবার গায়ত্রীজপ করিলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে উপবাসের অনুকল্প হইবে। ইহা ছাড়া রাত্রিতে একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ বা অন্ন ব্যতীত অন্য দ্রব্য গ্রহণ, ফল, তিল, ক্ষীর, জল, পঞ্চগব্য—পূর্ব পূর্ব দ্রব্য গ্রহণ প্রশস্ত। সর্বোপরি বায়ুভক্ষণ অর্থাৎ নিরম্বু উপবাস প্রশস্ত। এইরূপ অনুকল্প করিলেও দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া পারণ করা কর্তব্য। এই বিষয়ে বায়ুপুরাণের বচনও প্রণিধানযোগ্য—

একাদশী-উপবাসে অনুকল্প ব্যবস্থা

"নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা
ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ
প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ॥" [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৪৩]

এখানে অনোদন বলিতে খৈ বুঝায়।

---

(৪০) ব্রাহ্মণ্যা তু সহমরণমেব কার্যং নানুগমনম্। [শুদ্ধিকৌমুদী, পৃঃ ৮৪]

(৪১) উপবাসাসমর্থশ্চেদেকং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।
তাবদ্ধনানি বা দদ্যাৎ যদ্‌ভক্তাদ্দ্বিগুণং ভবেৎ॥
সহস্রসম্মিতাং দেবীং জপেদ্বা প্রাণসংযমান্।
কুর্যাদ্ দ্বাদশসংখ্যকান্ যথাশক্তি ব্রতে নরঃ॥
দেবীং গায়ত্রীম্।.........তত্রাপি হবিষ্যাদিরনুকল্পঃ।.........অনুকল্পেঽপি দ্বাদশ্যাং বিষ্ণূপাসনং পারণঞ্চ কর্তব্যম্। [একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪৫৫]

আবার দেখা যায় রঘুনন্দন গতানুগতিকভাবে শাস্ত্র আলোচনা করেন নাই। কারণ আমরা দেখি পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মধ্যে কি বঙ্গদেশের কি মিথিলার— সকলেই পুত্রিকাপুত্র সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভ্রাতৃহীনা কন্যা বিবাহের অযোগ্যা বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন কলিযুগে ঔরসপুত্র ও দত্তকপুত্র ভিন্ন অপর পুত্র নিষিদ্ধ বলিয়া এই বিষয়ে বৃথা আলোচনা করেন নাই। পূর্বযুগে পুত্রিকাপুত্রগ্রহণ সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এইজন্যই বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্মসূত্রগুলিতে পুত্রিকাপুত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পরবর্তী যুগে এই ব্যবহার অনেক কমিয়া আসিলেও নিবন্ধকারগণের গ্রন্থে ইহার সম্যক্ আলোচনা আছে।

পুত্রিকাপুত্র

মিতাক্ষরামতে পুত্রিকাপুত্র দুইপ্রকার হইতে পারে, যথা[৪২]—প্রথমতঃ পুত্রিকার পুত্র অর্থাৎ কন্যার পুত্র; এই পুত্র ঔরসসম। যেমন বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—ভ্রাতৃহীনা অলঙ্কৃতা কন্যা তোমাকে প্রদান করিতেছি, এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার (কন্যাদাতার) পুত্র হইবে। এইভাবে প্রদত্তা কন্যার পুত্রই পুত্রিকাপুত্র।

আর দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে—পুত্রিকাই পুত্র অর্থাৎ কন্যাই পুত্ররূপে গণ্য। সেই পুত্রও ঔরসপুত্রের সমান। যথা বশিষ্ঠের বচনে আছে—দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে পুত্রিকা, এই পুত্রিকা দ্বিতীয় পুত্ররূপে গণ্য।

বঙ্গদেশের নিবন্ধকারগণের মধ্যে শূলপাণি উল্লেখ করেন যে কন্যাকে গুপ্তপুত্রিকাকরণের আশঙ্কা দূর করিতে ভ্রাতৃমতী কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। শূলপাণির মতে[৪৩] অভ্রাতৃকা কন্যা পুত্রিকাশঙ্কাশূন্য হইলে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। অতএব মনু বলিয়াছেন—যে কন্যার সোদর ভ্রাতা নাই, তাহাকে

(৪২) ঔরসঃ পুত্রো মুখ্যঃ। তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ তৎসম ঔরসসমঃ। পুত্রিকায়াঃ সুতঃ পুত্রিকাসুতঃ। অত এবৌরসসমঃ, যথাহ বশিষ্ঠঃ—

অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।

অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি।

অথবা পুত্রিকৈব সুতঃ পুত্রিকাসুতঃ সোঽপ্যৌরসসম এব পিত্রবয়বানামল্পত্বং মাত্রবয়বানাং বাহুল্যাচ্চ।

যথাহ বশিষ্ঠঃ—দ্বিতীয়ঃ পুত্রিকৈবেতি, দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ পুত্রিকৈবেত্যর্থঃ। [মিতাক্ষরা, পৃঃ ২০৪]

(৪৩) ভ্রাতৃমতীমিতি গুপ্তপুত্রিকাশঙ্কানিরাসার্থম্। তেনাভ্রাতৃকাপি পুত্রিকাশঙ্কাশূন্যা বিবাহ্যৈব। অতএব মনুঃ—যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।

নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মশঙ্কয়া॥ [সম্বন্ধবিবেক, পৃঃ ৭]

পুত্রিকা অর্থাৎ ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্রদ্বারা মাতামহ আপনার পুত্রের ন্যায় সপিণ্ডনাদি সম্পন্ন হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিবে না। অপুত্রকের যদি কন্যা থাকে তবে 'আপনার পুত্রের ন্যায় ঐ দুহিতৃপুত্র দ্বারা সপিণ্ডনাদি সম্পন্ন হইবে' উক্ত অপুত্রক পিতা এইরূপ অভিসন্ধি করিলে সেই কন্যার পুত্রিকাত্ব হয়।

শূলপাণি শ্রাদ্ধবিবেকেও পুত্রিকাপুত্রের চারপ্রকার ভাগ আলোচনা করতঃ উহাদের শ্রাদ্ধ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন [৪৪]।

শ্রীনাথাচার্যও ভ্রাতৃমতী কন্যাকে বিবাহ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। পুত্রিকা-আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্যই ভ্রাতৃমতী কন্যা বিবাহে প্রশস্তা। যদি কোনও প্রকারে সেই আশঙ্কার নিবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে অভ্রাতৃকাকেও বিবাহ করা চলিবে [৪৫]।

শ্রীনাথ তাঁহার শ্রাদ্ধদীপিকাগ্রন্থেও পুত্রিকাপুত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন [৪৬]। তিনি মনুবচন আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—পুত্রহীন ব্যক্তি বিধি দ্বারা পুত্রিকাকে সুতরূপে গণ্য করিবেন। এই পুত্রিকাতে যে পুত্র জাত হইবে সেই পুত্র কন্যার পিতার পিণ্ডদাতা হইবে। এখানে পুত্রিকাকেই পুত্রস্থানীয়া বলা হইয়াছে। এই পুত্রিকাতে জাতপুত্রই মাতামহের পুত্র হইবে। পুত্রিকারূপে অভিসন্ধিকৃত হোক্ আর নাই হোক্ ইহাতে সবর্ণ ভর্তা কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র দ্বারা মাতামহ পৌত্রবিশিষ্ট হইবেন এবং সেই পৌত্রই পিণ্ডদান করিয়া ধনের অধিকারী হইবে। এখানে পুত্রিকাই পুত্ররূপে গণ্য হওয়ায় তাহার পুত্রই পৌত্ররূপে অভিহিত

---

(৪৪) এতেন চতুর্বিধপুত্রিকা দর্শিতা। বাক্কৃতা অভিসন্ধিকৃতা আগর্ভশুল্কমুক্তা দত্তা পিত্রোরুপরতৌ এতস্যাং যদপত্যং তদেতৎ পিতুরিত্যুক্তা বান্ধবৈ র্দত্তা। শঙ্খলিখিতৌ—পুত্রিকা হি পুত্রবদিতি। [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৩০০-৩০১]

(৪৫) অরোগিণীমচিকিৎস্যরোগরহিতাং ভ্রাতৃমতীং পুত্রিকাশঙ্কানিবৃত্তয়ে।
······এতেন যদি কেনাপি প্রকারেণ সা শঙ্কা নিবর্ততে তদা অভ্রাতৃকামপি পরিণয়েদিত্যুক্তং ভবতি।

[বিবাহতত্ত্বার্ণব, পৃঃ ৩৩৪]

(৪৬) পুত্রিকামিতি পুত্রস্থানীয়ামিত্যর্থঃ। পুত্রিকায়া অপি—

অকৃতা বা কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতম্।
পৌত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনম্ ॥

অকৃতেতি অকৃতা অভিসন্ধিকৃতেত্যর্থঃ।··········অভিসন্ধিমাত্রাৎ পুত্রিকেয়মিতি গৌতমস্মরণাৎ অত্র পুত্রিকায়াঃ পুত্রত্বেনৈব তৎপুত্রস্য পৌত্রত্বমুপপদ্যত ইতি। পুত্রিকাপুত্রস্য চ ক্ষেত্রজাদ্যপেক্ষয়োৎকর্ষঃ ঔরসো ধর্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনৌরসসমত্বাভিধানাৎ।

[শ্রাদ্ধদীপিকা পুঁথি, ফোলিও ৫২ খ, ৫৩ ক]

হয়। ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্র অপেক্ষা পুত্রিকাপুত্র উৎকৃষ্ট। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন —ধর্মপত্নী হইতে ঔরসপুত্র জাত হয়, তাহার সমানই পুত্রিকাপুত্র। পুত্রিকার পুত্র এবং পুত্রিকারূপ পুত্র এইরূপ অভিধান করা হয়। যেমন বলা আছে—ঘৃতের অভাবে তৈল যেমন তাহার প্রতিনিধীভূত হয়, সেইরূপ পুত্রিকা ও ঔরসপুত্র ব্যতীত একাদশ পুত্র প্রতিনিধিরূপে গণ্য হয়।

গোবিন্দানন্দও পূর্বসূরীদের ধারা লক্ষ্য করিয়া একই পথে শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন। তিনি পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ ইত্যাদি পুত্রদের শ্রাদ্ধে অধিকারিরূপে নিরূপণ করিয়াছেন [৪৭]।

মৈথিল নিবন্ধকারগণের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র পুত্রিকাধর্ম আশঙ্কায় ভ্রাতৃমতী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে (পৃঃ ১৯২) তিনি দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পুত্রিকাপুত্র অন্যতম এবং পুত্রিকাই পুত্রস্থানীয়া বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মিথিলার রুদ্রধরও পুত্রিকাপুত্র অনুমোদন করেন (শুদ্ধিবিবেক, পৃঃ ২৯)। চণ্ডেশ্বর ঠাকুরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন [৪৮]।

বঙ্গদেশের ও মিথিলার নিবন্ধকারগণ সকলেই পুত্রিকাপুত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলেও রঘুনন্দন এসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ নাই। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে হেমাদ্রি ও পরাশরধৃত আদিত্যপুরাণের বচন অনুসারে কলিকালে বর্জনীয় কর্মগুলি যেখানে নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আছে [৪৯]—কলিযুগে দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অপরকে পুত্ররূপে গ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রের দ্বারা অন্নপাক করান প্রভৃতি বহুবিধ কার্য মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলিযুগের আদিতে লোকের রক্ষার জন্য ব্যবস্থাপূর্বক রহিত করিয়াছেন।

---

(৪৭) ঔরসো ধর্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ।..........তৎসম ইতি—অস্যা যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি বাচা অভিসন্ধিনা বা নিয়মা যা দত্তা সা পুত্রিকা তৎপুত্র ঔরসসম ইত্যর্থঃ। অত্র পুত্রিকাভাবে তৎপুত্র ইতি বোদ্ধব্যম্। মনুঃ—তেন মাতামহপৌত্রীতি।

[শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫]

(৪৮) পুত্রিকাধর্মশঙ্কায়ং যৎ পুত্রেণ কন্যাপিতা পুত্রবান্ জনকঃ। গৌতমঃ—অভিসন্ধিমাত্রাৎ পুত্রিকেত্যেকেষাং তৎসংশয়াৎ নোপযচ্ছেতাভ্রাতৃকাম্। অভিসন্ধিমাত্রাৎ অস্মদনুমতমেতদ-পত্যমিত্যভিপ্রায়াৎ। [গৃহস্থরত্নাকর, পৃঃ ২৪]

(৪৯) বস্তুতস্তু হেমাদ্রিপরাশরধৃতাদিত্যপুরাণেন বৃত্তাদিনিমিত্তাশৌচসঙ্কোচশ্চ কলৌ নিরস্তঃ যথা— কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

... ...

দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।

... ...

ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ॥

ইত্যাদীন্যভিধায়—এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।

নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপূর্বকং বুধৈঃ॥ [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৮]

শূলপাণি ও শ্রীনাথ

সমাজোপযোগী রঘুনন্দ
শাস্ত্র-ব্যাখ্যা

কোন বিকল্প ব্যবস্থ
কর্তৃক শ্রাদ্ধেও যে
আলোচনাকালে বা
তাহার দুহিতা ঐ
শাস্ত্রোক্ত বিধানানু
বিধানানুসারে' এই
করা হইয়াছে, ইহ
পুত্রিকাপুত্রদের বচন
তিনি শাস্ত্র-আলোচ
করিয়া কলিযুগে
সমাজরক্ষার প্রতিই
স্থান পায় নাই।

প্রেতক্রিয়ায় অ
অধিকারী, তাহার

প্রেতক্রিয়ায় অধিকার
নিরূপণ

দৌহিত্রের অধিকার
কিন্তু কেহ কেহ
এবং দুহিতার পর দৌ
দেখাইতেছেন [৫১]—জন

(৫০) মাতুঃ সপিণ্ডীক
যথোক্তেনৈব ক
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেন
তথেতি। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ
(৫১) পৌত্রদৌহিত্রয়ো
তয়ো হি মাতাপি

রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলেও শূলপাণি ও শ্রীনাথ নির্দেশ দিয়াছেন যে অভ্রাতৃকা কন্যার পুত্রিকাপুত্রত্বের আশঙ্কা না থাকিলে সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা। অতএব তাঁহাদের সময়ে যে এই প্রথা অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। কিন্তু মৈথিল নিবন্ধকারগণ এ সম্বন্ধে কোন বিকল্প ব্যবস্থা করেন নাই। তবে রঘুনন্দন সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে স্ত্রীগণ কর্তৃক শ্রাদ্ধেও যে মন্ত্রাদি পাঠের অতিদেশ করা হইয়াছে তাহার প্রামাণ্য বচন আলোচনাকালে বলেন[৫০]—যদি পুত্রিকারূপে গৃহীত কন্যার পুত্র না থাকে, তবেই তাহার দুহিতা ঐ পুত্রিকার সপিণ্ডীকরণ উহার মাতা এবং পিতামহীর সহিত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারেই করিবে। এই ছন্দোগপরিশিষ্টের বচনে 'শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে' এইরূপ কথনদ্বারা স্ত্রী কর্তৃক শ্রাদ্ধেও যে মন্ত্রাদিপাঠের অতিদেশ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব দেখা যায় রঘুনন্দন প্রসঙ্গক্রমে পুত্রিকাপুত্রদের বচন উল্লেখ করিলেও এই আলোচনা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি শাস্ত্র-আলোচনা বিষয়ে পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের অন্ধ আনুগত্য না করিয়া কলিযুগে বর্জনীয় বলিয়া এসম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা নির্দেশ করেন নাই। সমাজরক্ষার প্রতিই তাঁহার সর্বদা দৃষ্টি ছিল, সুতরাং তাঁহার রচনায় অবান্তর বিষয় স্থান পায় নাই।

সমাজোপযোগী রঘুনন্দনের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা

প্রেতক্রিয়ায় অধিকার নিরূপণপ্রসঙ্গে রঘুনন্দন বলেন—প্রথমে জ্যেষ্ঠপুত্র অধিকারী, তাহার অভাবে যথাক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র অধিকারী। ইহাদের অভাবে পত্নী অধিকারিণী, পত্নীর অভাবে দুহিতা, তাহাদের মধ্যে প্রথমে অদত্তা, তারপর বাগ্‌দত্তা ও পরে দত্তা কন্যার অধিকার। ইহাদের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার নিরূপিত হইয়াছে।

প্রেতক্রিয়ায় অধিকার নিরূপণ

কিন্তু কেহ কেহ বলেন দুহিতার পর সপিণ্ডদের অধিকার, তাহা যে ঠিক নহে এবং দুহিতার পর দৌহিত্রের অধিকারে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে তাহা রঘুনন্দন দেখাইতেছেন[৫১]—জগতে পৌত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে ধর্মতঃ কোন ভেদ নাই,

(৫০) মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং পিতামহ্যা সহোদিতম্।
যথোক্তেনৈব কল্পেন পুত্রিকায়া ন চেৎ সুতঃ॥
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেনাপি যথোক্তেনৈব কল্পেন ইত্যনেন মন্ত্রাদিকং সর্বমতিদিষ্টং ব্যবহারোঽপি তথেতি। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ১১১]

(৫১) পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নাস্তি ধর্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥ ইতি মনুবচনেন— [পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কারণ উহাদের উভয়েরই মাতা এবং পিতা একই ব্যক্তির দেহ হইতে সম্ভূত হইয়াছে —এই মনুবচন দ্বারা এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরীয় বচন যথা, যে সকল ব্যক্তি পৌত্র ও দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ঐসকল বালকদিগের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে তাহারা স্বর্গে গমন করে—ইহা দ্বারা দৌহিত্রকে পৌত্রের সহিত সমকক্ষভাবে নির্দেশ করায় পুত্রের পরই যেমন পৌত্র পিণ্ডদানে অধিকারী হয়, তেমনই দুহিতার পর দৌহিত্রেরই পিণ্ডদানে অধিকারী হওয়া উচিত।

সহোদর ভ্রাতার পূর্বেই যে দৌহিত্র পিণ্ডদানের অধিকারী তাহা আদিপুরাণের বচনে পাওয়া যায়। তাহাতে আছে—কে অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'সৎপুত্র, দৌহিত্র অথবা সহোদর, ইহাদের অন্যতম ব্যক্তি অস্থিগুলি কুড়াইয়া লইয়া তাহার সহিত শবদেহের ভস্ম একত্র করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে' এই বচনে যেমন পাঠক্রম অনুসারে অস্থিনিক্ষেপ কার্যে সহোদরের পূর্বে দৌহিত্রের নাম উল্লিখিত আছে সেইরূপ সহোদরের পূর্বে দৌহিত্রের অধিকার নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ পাঠক্রম অনুসারে পিণ্ডদানকার্যেও দৌহিত্রের অভাবেই সহোদরের অধিকার বুঝাইতেছে [৫২]।

শ্রীনাথও ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন [৫৩]। কিন্তু গোবিন্দানন্দ পত্নীর অভাবে দুহিতা, দুহিতার অভাবে সগোত্র, সপিণ্ড, সকুল্য ইত্যাদি নির্দেশের পর দৌহিত্রের অধিকার বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। যাঁহারা দুহিতার পরই দৌহিত্রের

পৌত্রদৌহিত্রসংযুক্তা যে তথা চিরজীবিনঃ।
প্রিয়ঙ্করাশ্চ বালানাং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরেণ চ পৌত্রতুল্যত্বাভিধানাচ্চ। তেন যথা পুত্রাভাবে পৌত্রাস্তথা দুহিত্রভাবে দৌহিত্রঃ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৯৬-৩৯৭]

(৫২) কশ্চিৎ ক্ষিপতি সৎপুত্রো দৌহিত্রো বা সহোদরঃ।
গৃহীত্বাস্থীনি তদ্ভস্ম নীত্বা তোয়ে বিনিঃক্ষিপেৎ॥

ইত্যাদিপুরাণে ক্রমদর্শনাদত্রাপি দৌহিত্রাভাবে সোদরঃ। [ঐ, পৃঃ ৩৯৭]

(৫৩) অপুত্রধনং পত্ন্যভিগামী তদভাবে দুহিত্রগামীত্যাদিবিষ্ণ্বাদিবচনে········দুহিতৃরভাবে দৌহিত্রঃ।

পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকেন বিশেষোঽস্ত্যনুগ্রহে।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥

ইত্যাদিনা পৌত্রতুল্যত্ববোধনাৎ অনুগ্রহে পার্বণপিণ্ডাদাবিত্যর্থঃ।
[শ্রাদ্ধদীপিকা পুঁথি, ফোলিও ৫৯ ক, ৫৯ খ]

অধিকার নিরূপণ করেন তাঁহাদের অভিমত উত্থাপনপূর্বক তিনি খণ্ডন করিয়াছেন [৫৪]।

শূলপাণি তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেকে দুহিতার পর সহোদরের অধিকার, তাহার অভাবে তৎপুত্র, তদভাবে সাপত্ন্য ভ্রাতা ইত্যাদি, পরে সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র ইত্যাদির অভাবে দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন [৫৫]।

অনিরুদ্ধভট্ট তাঁহার হারলতা গ্রন্থে (পৃঃ ১৭০, ১৭৫) পুত্রের অভাবে পত্নী, তদভাবে দুহিতা, তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদিরূপে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে (পৃঃ ২০৭) বাচস্পতিমিশ্র অপুত্রক ব্যক্তির শ্রাদ্ধকার্যের অধিকারী নিরূপণে পত্নীর অভাবে দুহিতা, দুহিতার অভাবে সহোদর, তদভাবে তৎপুত্র ইত্যাদিরূপে নির্দেশ দিয়াছেন। রুদ্রধরের শ্রাদ্ধবিবেকেও (পৃঃ ৪৮-৪৯) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তবে রুদ্রধর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অভাবে ভার্যা, তদভাবে ভ্রাতা, তারপর পিতা, তারপর ভ্রাতৃপুত্র, তারপর সপিণ্ড, পরে দুহিতা, তারপর সকুল্য ইত্যাদিরূপে অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন।

এইসব আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, সকল নিবন্ধকারই পুত্রের অভাবে পত্নী, পত্নীর অভাবে দুহিতা, তাহার অভাবে সহোদর ইত্যাদিরূপে সপিণ্ডদের অধিকার নিরূপণ করিলেও বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ নিবন্ধকার রঘুনন্দন ও তাঁহার অধ্যাপক শ্রীনাথ দুহিতার পরই দৌহিত্রের অধিকার নির্দেশ করিয়াছেন এবং সমাজেও তাহা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় কলিযুগে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন না থাকায় দুহিতার পরই দৌহিত্রের অধিকার নিরূপণ করিয়া পৌত্র ও দৌহিত্র—উভয়েই যে সমান তাহা রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন এবং বঙ্গদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ গোত্রভাগিত্ব ও ধনাধিকার—এই দুইটিই পিণ্ডদানাধিকারের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই উভয় হেতু বিদ্যমান আছে

(৫৪) কশ্চিত্তু—দুহিত্রনন্তরং দৌহিত্রাধিকারঃ পার্বণপিণ্ডদাতৃত্বেন ভ্রাতৃতো বলবত্ত্বাদিত্যাহ, তন্ন

পুত্রাভাবে সপিণ্ডাস্তু তদভাবে সহোদকাঃ।
কুর্যুরেতং বিধিং যস্য পুত্রস্যাপি সুতাসুতাঃ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণে মার্কেণ্ডেয়পুরাণে চ পুত্রস্যাত্মনঃ সুতায়াঃ সুতা দৌহিত্রা এতং দাহাদিকং বিধিং কুর্যুরিতি সমানোদকাভাবাদ্ দৌহিত্রাধিকারপ্রতিপাদনাৎ। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৫৭]

(৫৫) পিতুঃ পুত্রেণ কর্তব্যা পিণ্ডদানোদকক্রিয়া।
তদভাবে চ পত্নী স্যাৎ তদভাবে সহোদরঃ॥

পত্ন্যভাবে সহোদর ইত্যত্র দুহিত্রভাবেঽপি বোদ্ধব্যঃ॥ [শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৪০২-৪০৩]

বলিয়াই অদত্তা কন্যার পরে দত্তা কন্যা এবং দৌহিত্রগণের ধনাধিকার ঘটিয়াছে। কেন না দত্তা কন্যা এবং দৌহিত্রগণের ধনাধিকার থাকিলেও গোত্রভাগিত্ব নাই, কিন্তু ভ্রাতাদিগের গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার উভয় হেতুই বর্তমান, সুতরাং কেবল ধনাধিকারিণী দত্তা কন্যা এবং দৌহিত্র অপেক্ষা ভ্রাতৃগণেরই অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকার হওয়া উচিত—এই অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন রঘুনন্দনের মতে তাহা ঠিক নহে। কারণ পিণ্ডদান ধনসাধ্য হওয়ায় পিণ্ডদান গোত্রবল অপেক্ষা ধনাধিকারেরই কার্যতঃ বলবত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে, কাজেই প্রথমে ধনাধিকারিণী কন্যা এবং ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা দৌহিত্রগণের পিণ্ডদানাধিকারেও প্রাধান্য বলিতে হইবে। অদত্তা কন্যা দত্তা ও দৌহিত্র অপেক্ষা প্রথমে ধনভাগিনী হয় বলিয়া এবং তাহাতে প্রথম হইতেই গোত্রভাগিত্ব থাকায় দত্তা কন্যা ও দৌহিত্র অপেক্ষা অগ্রে তাহারই পিণ্ডাধিকার হওয়া উচিত[৫৬]।

দৌহিত্রের অভাবে সপত্নী পুত্র পিণ্ডদান করিবে। কারণ স্মৃতিতে তাহাকেও পুত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন মনু বলেন—এক পত্নীদিগের মধ্যে যদি যে-কোন এক পত্নীমাত্র পুত্রবতী হয়, তবে সেই পুত্র দ্বারাই অপর স্ত্রীদিগকেও মনু পুত্রবতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তবে মৈথিলগণ বলেন সপত্নীপুত্রে পুত্রত্বের অতিদেশ করা হইয়াছে বলিয়া স্বগর্ভজাত পুত্রবিহীনা স্ত্রীরও সপিণ্ডীকরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রঘুনন্দনের মতে ইহা ঠিক নহে[৫৭]। কারণ পুত্রই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিবে, পুরুষের সপিণ্ডন ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি অপরেও করিতে পারিবে—লঘুহারীতের এই বচনে 'এব' কার দ্বারা অতিদিষ্ট পুত্রের সপিণ্ডনের নিষেধ করা হইয়াছে। এইজন্য লঘুহারীতের বচনে ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম করিয়া পুরুষের সপিণ্ডীকরণের কর্তৃরূপে তাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং তাহা সঙ্গত হইয়াছে।

পিণ্ডদান সম্পর্কে আদিপুরাণে বলা আছে[৫৮]—যে ব্যক্তি প্রথমদিনে সমাহিতচিত্তে

(৫৬) ন চ দত্তকন্যাদৌহিত্রাভ্যাং প্রাক্ সগোত্রত্বাৎ সোদরাধিকার ইতি বাচ্যং, গোত্রবলাপেক্ষয়া পিণ্ডদানাদে র্ধনসাধ্যত্বাৎ ঋকৃথগ্রাহিণো দু র্হিতৃপৌত্রিকয়ো র্বলবত্ত্বাৎ। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ২৯৭]

(৫৭) যথা মনুঃ—সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতী মনুঃ॥

অত্র সপত্নীপুত্রস্য পুত্রত্বাতিদেশাৎ তৎসত্ত্বেহপি স্ত্রীণাং সপিণ্ডনং মৈথিলৈরুক্তং তন্ন। পুরুষস্য পুনস্তস্যে ভ্রাতৃপুত্রাদয়োহপি যে ইতি লঘুহারীতবচনে এবকারেণাতিদিষ্টপুত্রনিষেধাৎ। অতএবোত্তরার্দ্ধে ভ্রাতৃপুত্রোপাদানং সঙ্গচ্ছতে। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ২৯৮]

(৫৮) আদিপুরাণে—প্রথমেহহনি যো দদ্যাদ্ প্রেতায়ান্নং সমাহিতঃ।
যত্নান্নবস্ত্র চান্যেষু স এব প্রদদাত্যপি॥

·········অত্রাহঃপদমহোরাত্রপরম্।
রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।
স্নানদানাদিকং কুর্যু র্নিশি কাম্যব্রতেষু চ॥ [পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যত্নপূর্বক প্রেতকে
করিবে। এই ব
অহোরাত্র এই উভ
পুত্রজনন প্রভৃতি বৃ
যায়। এই দেব
শ্রাদ্ধবিবেককারও
'অনুদিন' এবং 'দি
বিষয়ে 'অনুদিন'
করাইতেছে এবং
দিবা-শব্দের অর্থ—
'দিবা চ' এই কথা
এই আলোচন
বচনে 'দিবস' এ
ব্যবস্থাও খণ্ডিত হ
তাহা দেখান হইয়
প্রথম পিণ্ডদান ক
পিণ্ডদান সেই ব্যা
পিণ্ডদান ছাড়া আ
হইয়াছে[৫৯]। রঘুনন

অর্থাৎ অসগো
প্রথমদিনে যে পিণ্ড
—রামায়ণের অযো

ইতি দেবলবচনেহন্যা
দিবসপদশ্রবণাদ্ রাত্রৌ
(৫৯) তেন যদা পু
দাশাহিকপিণ্ডদানং পুত্রা
পিণ্ডব্যতিরিক্তং সর্বং কুর্যা

যত্নপূর্বক প্রেতকে অন্নদান করিবে, সেই ব্যক্তিই অবশিষ্ট নয়দিনও অন্নদান করিবে। এই বচনে যে প্রথমদিনে ইত্যাদিতে 'অহঃ' শব্দটি আছে তাহাতে অহোরাত্র এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কারণ রাহুদর্শন, সংক্রান্তি, বিবাহ, মৃত্যু, পুত্রজনন প্রভৃতি বৃদ্ধিসময়ে এবং কাম্যব্রতে রাত্রিতে স্নানদান প্রভৃতি করিতে পারা যায়। এই দেবলবচনে মরণেও রাত্রিকালে স্নানদানের বিধান করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধবিবেককারও এই কথা অনুমোদন করেন। এইজন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত বচনে 'অনুদিন' এবং 'দিবা'—এই দুইটি শব্দ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পিণ্ডদান বিষয়ে 'অনুদিন' এই শব্দটি ব্যবহার করায় দিন শব্দটি অহোরাত্রেরই বোধ করাইতেছে এবং ভোজনবিষয়ে যে 'দিবা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, ঐ দিবা-শব্দের অর্থ—সূর্যকিরণাবচ্ছিন্ন কালমাত্র। এইরূপ অর্থ না করিলে বচনে 'দিবা চ' এই কথাটির পুনরুক্তি হয়।

এই আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে মৈথিলগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বচনে 'দিবস' এই পদটি ব্যবহৃত হওয়ায় 'রাত্রে পিণ্ডদান করিবে না' এই ব্যবস্থাও খণ্ডিত হইয়াছে। আবার প্রথম পিণ্ডদানকর্তাই যে দশপিণ্ডের অধিকারী তাহা দেখান হইয়াছে—মৃত্যুকালে পুত্রাদির অসন্নিধানবশতঃ যদি অপর ব্যক্তি প্রথম পিণ্ডদান করে, পরে পুত্রাদির আগমনের পরও দশদিন যাবৎ কর্তব্য পিণ্ডদান সেই ব্যক্তিই করিবে, পুত্রাদি আর করিবে না। তখন পুত্র প্রভৃতি দশ পিণ্ডদান ছাড়া আর আর সমুদয় প্রেতকার্যই করিবে। ইহা হারলতায় উক্ত হইয়াছে[৫৯]। রঘুনন্দনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

অসগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্।
প্রথমেঽহনি যো দদ্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ ॥

[শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৫]

অর্থাৎ অসগোত্রই হোক্ আর সগোত্রই হোক্, পুরুষই হোক্ বা স্ত্রীই হোক্, প্রথমদিনে যে পিণ্ডদান করিবে দশপিণ্ডদান সেই করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন —রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত প্রথম পিণ্ডদান করিলেও পরে রাম ইঙ্গুদীফল

ইতি দেবলবচনেঽত্যয়ে মরণে রাত্রাবপি স্নানদানাদিবিধানাৎ। এবমেব শ্রাদ্ধবিবেকঃ।......এতেন দিবসপদশ্রবণাদ্ রাত্রৌ পিণ্ডো ন দেয় ইতি মৈথিলমতমপাস্তম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৫]

(৫৯) তেন যদা পুত্রাদেরসন্নিধানেন প্রথমপিণ্ডো দত্তস্তদা দশাহমধ্যে পুত্রাদেরাগমনেঽপি দাশাহিকপিণ্ডদানং পুত্রাদিনা ন কার্যং কিন্তু প্রথমপিণ্ডদাত্রা কার্যম্। পুত্রাদিস্তু দাশাহিক-পিণ্ডব্যতিরিক্তং সর্বং কুর্যাৎ। [হারলতা, পৃঃ ১৬৫-১৬৬]

এবং বদরীফল মিশ্রিত তিলবাটা দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড দর্ভসংস্তরে স্থাপিত করিয়া বলেন—'হে মহারাজ ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভোজন করুন। এক্ষণে আমরা এইসকল ভক্ষণ করিয়াই দিন কাটাইতেছি। মনুষ্য স্বয়ং যাহা ভোজন করে, পিতৃ ও দেবতাকেও তাহা দান করিবে'। এইরূপ রামকর্তৃক পুনর্বার পিণ্ডদানের কথা থাকায় অপরে প্রথম পিণ্ডাদি দান করিলেও প্রধান অধিকারীরও দশ পিণ্ডদানের কথা আসিতেছে। কিন্তু রঘুনন্দন বলেন—এইরূপ সংশয় করা উচিত নহে। কারণ ঐ রামায়ণেই 'ভরত এই উত্তমরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যদি প্রীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রেতক্রিয়া নির্বাহার্থ সে আমার উদ্দেশে যাহা দান করিবে, তাহা আমি গ্রহণ করিব না'—এইরূপ দশরথ কর্তৃক ভরতের প্রতি অভিশাপ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভরত কর্তৃক প্রথম পিণ্ডদানাদি কৃত হইলেও উহা না করার মধ্যে গণ্য হওয়াতেই পুনর্বার রামকর্তৃক উহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অতএব সাধারণস্থলে সিদ্ধান্ত হয় যে আদিপুরাণের বচনে 'স এব' অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই পিণ্ডদান করিবে—এইরূপ নির্দেশ থাকায় অবশিষ্ট পিণ্ডদানে প্রথম দাতা ভিন্ন অপরের অধিকার নিবৃত্ত করা হইয়াছে। আবার বচনে এই জন্যই 'অপি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। হারলতায়ও বলা আছে—আদিপুরাণের অনেক বচনেই 'অপি' শব্দের নিশ্চয়ার্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অতএব সেই ব্যক্তিই অবশিষ্ট পিণ্ডদান করিবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিবার জন্যই 'অপি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে[৬০]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দনের অধ্যাপক শ্রীনাথ এই মত অনুমোদন করেন নাই[৬১]। প্রথমপিণ্ডদাতাই যে অবশিষ্ট পিণ্ডদান করিবে তাহা খণ্ডন করিয়া তিনি বলেন যে আদিপুরাণবচনস্থিত 'অপি' শব্দ দ্বারা প্রথমপিণ্ডদাতার অবশিষ্ট পিণ্ডদান অবশ্য কর্তব্য বুঝাইতেছে, কিন্তু ইহা দ্বারা অপর ব্যক্তির পিণ্ডদান নিষেধ বুঝাইতেছে না। অতএব প্রথম পিণ্ডদাতা যে অবশ্যই পিণ্ডদান করিবে

---

(৬০) স এবেত্যেবকারেণ ত্যাধিকারিনিবৃত্তেঃ, প্রদদাত্যপীত্যপিরবধারণে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ। অতত্রবাপি-শব্দো বহুতরেষ্বেবাদিপুরাণবচনেষু নিশ্চয়ার্থ ইতি হারলতা, তেন স এব দদ্যাদিত্যেবার্থঃ। পুত্রাদ্যসন্নিধানে যেন সগোত্রাদিনা দাহসংস্কারঃ কৃতস্তেনৈব দশাহাদিকং প্রেতকর্ম কর্তব্যম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৭৬]

(৬১) স এবেত্যনেনান্যনিষেধ ইতি ব্যাখ্যাতং তন্মন্দং, স এব প্রদদাত্যপীত্যস্য সোঽপি প্রদদাত্যেবেত্যেবগমাৎ প্রথমপিণ্ডদাতুরাবশ্যকত্বমেবাহ নান্যনিষেধমিতি। অতত্রবোত্তরবচনে স দাহং সমাপয়েদিতি সমাপ্তিশ্রুতিবদুপপন্নাপ্রক্রমাধিকরণন্যায়েন প্রক্রান্তপরিসমাপ্তেঃ শিষ্টাইভয়েনাবশ্যক-কর্তব্যত্বাদিতি। [শ্রাদ্ধদীপিকা পুঁথি, কোলিও ৫৬ খ]

তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে রঘুনন্দন অধ্যাপকের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

গোবিন্দানন্দও শ্রীনাথের মত অনুসরণ করিয়াছেন[৬২]। কিন্তু বাচস্পতি-মিশ্রের মতে প্রথমপিণ্ডদাতাই অবশিষ্ট পিণ্ডদান করিবে, পরে প্রকৃত অধিকারী আসিলেও এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে[৬৩]।

এই আলোচনায় দেখা যায় যে, রঘুনন্দন নির্দেশিত রীতি অনুসারে প্রথম-পিণ্ডদাতাই অবশিষ্ট পূরকপিণ্ডদানের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন-স্মৃতিতে দেখা যায়—যদি কোনও কারণে প্রকৃত অধিকারী অগ্নিদান ও প্রথম প্রেতপিণ্ডদান করিতে না পারেন, তবে পরে প্রকৃত অধিকারী আসিলে সেই অবশিষ্ট পিণ্ডদান করিবে। শ্রীনাথ এবং গোবিন্দানন্দও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন এই মত অনুমোদন করেন নাই বলিয়া বঙ্গদেশের সমাজেও তাহা প্রচলিত হয় নাই। তবে শোনা যায় ফরিদপুরের কোটালীপাড়ায় প্রাচীনস্মৃতি অনুসারে প্রকৃত অধিকারী দ্বারা মৃতের মুখাগ্নি না ঘটিলে অপর কেহ অগ্নিপ্রদান করিলেও প্রকৃত অধিকারী দ্বারা পিণ্ডপ্রদান করাইয়া অগ্নিদানকারী দ্বারাও পুনরায় পিণ্ডদান করান হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ ব্যক্তিগণ 'দোপিণ্ডা' আখ্যায় ভূষিত হন। উঁহারা প্রাচীনস্মৃতিতে আদর প্রদর্শন করিলেও রঘুনন্দনের মতকে অবহেলা করিতে পারেন নাই। অতএব দেখা যায় স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দনের মত সর্বত্রই প্রচলিত হইয়া আছে।

---

(৬২) প্রথমপিণ্ডদাতা দশাহং সমাপয়েদেবেত্যর্থোঽবগম্যতে। ন তন্ত্রো ন দদ্যাদিতি বচনার্থঃ। আদিপুরাণবচন এবকারোঽভিন্নক্রমে সোঽপি দদ্যাদেবেত্যর্থঃ। অন্যথাপিশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী. পৃঃ ৪৫০]

(৬৩) স এব হীতি সোঽপীত্যর্থঃ। যথা অগ্নিদাতা প্রেতপিণ্ডং দদ্যাদাত্মবিষ্করে কর্তৃপিণ্ড-প্রদানেন প্রেতাঙ্গমভিজায়তে।........যদি শ্রাদ্ধানধিকারিণাপি দাহং কৃত্বা প্রথমঃ পিণ্ডো দত্তস্তদা তদধিকারিণ্যায়াতেঽপি তেন সর্বে পিণ্ডা দেয়াঃ। [শুদ্ধিচিন্তামণি, পৃঃ ৬৮, ৭১]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১। ব্যবহার

ব্যবহার[১] শব্দের অন্তর্গত 'বি' শব্দের অর্থ বিবিধ বিষয়, 'অব' শব্দের অর্থ সন্দেহ, 'হার' শব্দের অর্থ যাহার দ্বারা হরণ করা হয়। অতএব নানা বিষয়ে সন্দেহের নাশ যাহার দ্বারা হয় তাহাকেই বলে ব্যবহার। এই পরিভাষাগত ব্যবহারশব্দ দ্বারা দায়, অধিকার, স্ত্রীধন, দস্যুতা ইত্যাদি সাহস, ঋণাদান প্রভৃতিতে সংশয় উপস্থিত হইলে ভাষা (অর্থীর আবেদন), উত্তর, সাক্ষী ও লেখ্য (দলিল পত্রাদি) দ্বারা বিষয়বস্তুর নির্ণয়সাধন কার্যকে ব্যবহার বলা হইয়া থাকে। মনু ঋণাদান, অস্বামিবিক্রয় প্রভৃতি অষ্টাদশ স্থানকে ব্যবহার বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন[২]। তাঁহার মতে, বিবাদাস্পদীভূত ব্যবহার অষ্টাদশ প্রকার—ঋণাদান, নিক্ষেপ, অস্বামিবিক্রয়, সম্ভূয়সমুত্থান, দত্তবস্তুর প্রতিপত্তি, বেতনের আদান, অঙ্গীকারের লঙ্ঘন, ক্রয় ও বিক্রয়সম্বন্ধে অনুতাপ, পশুর মালিক ও পালকের বিবাদ, সীমা হইয়া বিবাদ, দণ্ডপারুষ্য (মারামারি), বাক্‌পারুষ্য (গালাগালি), স্তেয়, সাহস, স্ত্রীসংগ্রহ, স্ত্রীপুরুষের ধর্ম, পৈতৃকধনের বিভাগ, পণপূর্বক পাশাখেলা এবং পাখী বা ষাঁড়ের খেলা। এই অষ্টাদশপদে মনুষ্যের বহু প্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়।

ব্যবহারের সংজ্ঞা

কোর্টকাছারিতে বিচারপদ্ধতি, আইনকানুন, মামলা মকদ্দমা ইত্যাদিই ব্যবহারের বিষয়। হিন্দু ল' প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের ঋষিগণ ধর্মের উচ্চ ভাবধারায় পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই স্বকীয় স্বার্থসাধনের কৌশল দ্বারা পরিচালিত হন নাই। এইজন্য সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়াই হিন্দু ল' প্রণীত হইয়াছে[৩]।

যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে পাওয়া যায় যে[৪]—স্মৃতি ও সদাচারের বহির্ভূত পথে

---

(১) ব্যবহারমাহ কাত্যায়নঃ—বি নানার্থেঽব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাদ্ ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ ॥
নানাবিবাদবিষয়ঃ সংশয়ো হ্রিয়তেঽনেনেতি ব্যবহারঃ।
ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণায়কত্বং ব্যবহারত্বম্। [ব্যবহারতত্ত্ব, পৃঃ ৪৮১]

(২) মনু ৮।৪-৭।

(৩) Hindu Law of Evidence—By Dr. Amareswar Thakur, P—269.

(৪) স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্ রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ ॥ [যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২।৫]

পরব্যক্তি কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া স্বয়ং রাজার নিকট যদি কেহ আবেদন করে, তবে তাহা ব্যবহারপদবাচ্য হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেই আবেদনীয় বিষয় যদি প্রতিজ্ঞা, উত্তর, সংশয়, হেতু, পরামর্শ, প্রমাণ, নির্ণয় ও প্রয়োজনস্বরূপ হইয়া থাকে, তবেই তাহা ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইবে। সেই ব্যবহারে দুইপ্রকার অভিযোগ হইয়া থাকে। যেমন নারদ বলেন[৫]—শঙ্কাভিযোগ ও তত্ত্বাভিযোগ —এইরূপে অভিযোগ দুই প্রকার। তন্মধ্যে চৌর প্রভৃতি দুষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে যে অভিযোগ উপস্থিত হয় তাহাকে শঙ্কাভিযোগ বলা যায়, আর চৌরাদি দ্বারা অপহৃত ধনের প্রত্যক্ষ দর্শনে এবং সাক্ষাৎচৌরের দর্শনে যে অভিযোগ উপস্থিত হয় তাহাকে তত্ত্বাভিযোগ বলে।

পূর্বে রাজার নিকট যে আবেদন করার কথা বলা আছে উহাতে রঘুনন্দন বলেন[৬]—রাজা বলিতে ব্যবহার-প্রদর্শককে বুঝায়। বৃহস্পতিস্মৃতিতে আছে—রাজা, প্রাড্‌বিবাক বা দ্বিজ ব্যবহারবিষয়ক কার্যসকল প্রদর্শন করিবেন। শূলপাণি বলেন[৭]—এখানে যে রাজার নিকট আবেদন করার কথা আছে উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে রাজা স্বয়ং বিবাদ বিষয় উত্থাপন করিবেন না।

বিবাদকালে যিনি প্রশ্ন করেন এবং অনুরূপ বা যোগ্য সিদ্ধান্তও করেন, প্রিয়পূর্ববাক্য প্রথমে যিনি বলেন, তিনিই প্রাড্‌বিবাক নামে খ্যাত। অর্থাৎ অর্থীর প্রতি 'তোমার ভাষা কিরূপ' এবং প্রত্যর্থীর প্রতি 'তোমার উত্তরই বা কিরূপ' এইরূপ প্রশ্ন যিনি জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহা শুনিয়া যিনি যুক্তিযুক্তরূপে জয় বা পরাজয় নিরূপণ করেন, তিনিই প্রাড্‌বিবাক নামে খ্যাত হন। এই প্রাড্‌বিবাকই বর্তমানে বিচারপতিকে বুঝায়। রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে দ্বিজাতিগণ হইতেই এই প্রাড্‌বিবাক নিযুক্ত হইবেন। শূদ্র কখনও এই পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। এমনকি বচনে আছে যে দুঃশীল দ্বিজও এই বিষয়ে পূজ্য হইবে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় হইলেও শূদ্র বিচারপতিরূপে গৃহীত হইবে না[৮]।

প্রাড্‌বিবাক

---

(৫) দ্ব্যভিযোগস্তু বিজ্ঞেয়ঃ শঙ্কাতত্ত্বাভিযোগতঃ।
শঙ্কাসতাং তু সংসর্গাত্তত্ত্বং হোঢ়াদিদর্শনাৎ॥ [নারদস্মৃতি ১।২৭]

(৬) রাজ্ঞীতি ব্যবহারপ্রদর্শকপরম্। তথাচ বৃহস্পতিঃ—রাজা কার্যাণি সংপশ্যেৎ প্রাড্‌বিবাকোঽথবা দ্বিজঃ। [ব্যবহারতত্ত্ব, পৃঃ ৪৮১]

(৭) আবেদয়তি চেদিত্যনেন স্বয়ং বিবাদোত্থাপনং ন কার্যম্। [দীপকলিকা, পৃঃ ৩৬]

(৮) দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। [ব্যবহারতত্ত্ব, পৃঃ ৪৮১]

ব্যবহার বিষয়ে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র—এই দুই শাস্ত্রই অনুসরণ করা কর্তব্য। ধর্মশাস্ত্র অদৃষ্টজনক শাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র লোকপ্রয়োজনসাধক শাস্ত্র। উক্ত উভয়বিধ শাস্ত্রের যাহাতে বিরোধ না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে হয়। এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ধর্মশাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহা লোক—ব্যবহারসিদ্ধ এবং যুক্তিযুক্ত তাহাই বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ শিষ্ট লোকের আচারই ধর্মনির্ণয়ে প্রধান প্রমাণ, উহার দ্বারাই ধর্ম জ্ঞাত হওয়া যায়[৯]। ব্যবহার-মাতৃকায়[১০] জীমূতবাহন যুক্তি বলিতে 'লোকব্যবহার' বুঝাইয়াছেন।

এই ব্যবহার কার্যে যিনি প্রথমে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন তাঁহাকে বাদী বলে। আর যিনি পরে অভিযোগের উত্তর দান করেন তাঁহাকে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদী বলে। সন্দিগ্ধ বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদকারী বাদী ও প্রতিবাদী কাহার কথা সত্য—ইহা নির্ণয়ের উপায় হইতেছে দুইটি—একটি লিখিতপত্র অর্থাৎ দলিল ইত্যাদি, অপরটি হইতেছে সাক্ষী। বিচার বিষয়ে লিখিতপত্র, সাক্ষী ও ভুক্তি—এই তিনটি বিষয়ে মানুষ প্রমাণ। এইরূপ প্রমাণ ছাড়া অন্য প্রমাণকে বলে দিব্যপ্রমাণ। এই দিব্য কেবলমাত্র ভাবৈকগোচর বিষয়ই নহে, কিন্তু ভাবাভাববিশেষণ দ্বারা ইহা গোচরীভূত হয়[১১]।

ব্যবহার দুই প্রকার—সোত্তর ও অনুত্তর। ঐরূপ ভেদের কারণ হইতেছে—যে বিচার্য বিষয়ে বাদী বা প্রতিবাদী 'আমি বলিতেছি যদি ইহা আমার বলিয়া প্রমাণ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমি বিচার্যবিষয় ভিন্ন আরও অধিক এত মুদ্রা দিব'—এইরূপ পণ বা বাজি রাখা হয় তাহাকে সোত্তর বলে। আর ঐরূপ পণ না থাকিলে তাহাকে অনুত্তর বলে। ঐরূপ পণ রাখিয়া যে বিচার হইয়া থাকে সেইস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে ব্যক্তি পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে ঐ পণ দিতে হইবে এবং অর্থদণ্ডও গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবহার অভিযোগ-

---

(৯) ধর্মশাস্ত্রয়োক্ত বিরোধে লোকব্যবহার এবাদরণীয় ইত্যাহ স এব।

ধর্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।
ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্মস্তেনাবহীয়তে॥ [ব্যবহারতত্ত্ব, পৃঃ ৪৮২]

(১০) ব্যবহারমাতৃকা, পৃঃ ২৮৩।

(১১) অতএব লিখিতসাক্ষিভুক্তিলক্ষণত্রিবিধমানুষপ্রমাণভিন্নপ্রমাণং দিব্যম্। তচ্চ ন কেবলং ভাবৈকগোচরং কিন্তু ভাবাভাববিশেষেণ গোচরয়তীতি। [দিব্যতত্ত্ব, পৃঃ ৪১৩]

উপস্থাপক কর্তৃক ভাষাপত্রে লিখিত বিষয়গুলির সার অংশস্বরূপ এবং ইহাকে প্রতিজ্ঞা বলে। তাহাতে লিখিত বিষয় প্রমাণিত না করিতে পারিলে বাদী অর্থাৎ অভিযোগকারী পরাজিত হন, আর প্রমাণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করিলে তিনি জয়ী হইয়া থাকেন।

ব্যবহারে চারটি পাদ বর্তমান, যথা[১২]—ভাষা, উত্তর, ক্রিয়া বা প্রমাণ এবং নির্ণয়। তন্মধ্যে প্রতিবাদীর অগ্রে আবেদনপত্রে লিখনরূপ ভাষাপাদ প্রথম, বাদীর নিকটে প্রতিবাদীর উত্তর লিখনরূপ উত্তরপাদ দ্বিতীয়, তাহার পরে বিচার্যবিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শনরূপে ক্রিয়াপাদ তৃতীয় এবং সেই প্রমাণ সিদ্ধ হইলে জয় ও অসিদ্ধিতে পরাজয় ইত্যাদিরূপ সাধ্যসিদ্ধপাদ চতুর্থ। এইরূপে ব্যবহার আবেদনপত্র, উত্তরপত্র, প্রমাণ প্রদর্শন ও সাধ্যসিদ্ধরূপনির্ণয় ক্রমবৃত্তি দ্বারা চার অংশে বিভক্ত হওয়ায় চতুষ্পাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জীমূতবাহনের ব্যবহারমাতৃকায়ও বিচারপদ্ধতিতে সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে এইরূপ চারিভাগে বিভক্ত করতঃ একই প্রকারে আলোচনা করা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বিষয়ে পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ অপেক্ষা রঘুনন্দনের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইল না। ব্যবহারের একটি প্রধান বিষয় হইল 'দায়'। সেই দায়সম্বন্ধে রঘুনন্দনের মতের সহিত প্রাচীন মতের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য দায়সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

২। দায়

পূর্বস্বামীর স্বত্বনাশ হইলে তৎসম্বন্ধাধীন যে দ্রব্যে স্বত্ব হয়, সেই ধনে দায়শব্দটি প্রসিদ্ধ। দান করা হয় যাহা এই প্রকার ব্যুৎপত্তিতে যে দায়শব্দ ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে তাহা মৃতপ্রভৃতির ধনে প্রযুক্ত নহে, সুতরাং 'দা' ধাতুর প্রয়োগ এখানে গৌণরূপে করা হইয়াছে। অর্থাৎ দানে যেমন ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ দ্বারা স্বত্বনাশ ও পরস্বত্বোৎপত্তি জন্মায়, কিন্তু মৃত প্রভৃতিতে সেইরূপ ইচ্ছপূর্বক ত্যাগ দেখা যায় না। মৃত্যু হইলে বা পতিত হইলে কিংবা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলে সেই ধনে সেই ব্যক্তির স্বত্ব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র প্রভৃতির স্বত্ব জন্মে, সুতরাং মৃত, প্রব্রজ্যা-গ্রহণকারী প্রভৃতির স্বত্বনিবৃত্তিপূর্বক পরস্বত্বোৎ-

দায়-নিরূপণ

(১২) অথ ব্যবহারপাদনির্ণয়ঃ—তত্র বৃহস্পতিঃ—
পূর্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথা চান্যশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥ [ব্যবহারতত্ত্ব, পৃঃ ৪৮৩]

পত্তিরূপ ফলের সাম্য ধরিয়া গৌণী লক্ষণা করা হইয়াছে। কারণ মরণ প্রভৃতি স্থলে 'ইহা আমার নয়, অমুকের হউক'—এইরূপ সঙ্কল্পপূর্বক ত্যাগ হয় না। এই দায় লক্ষণে সম্বন্ধশব্দে শাস্ত্রপ্রাপ্ত পুত্রত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে, ক্রেতৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ নহে, আর পতির স্বত্ব বিদ্যমান থাকিলে পত্নীর দাম্পত্য সম্বন্ধাধীন স্বত্ব পতির ধনে জন্মে, তাহাকে দায় বলা যাইবে না।

দায় বিষয়ে দুইটি মত বিদ্যমান—উপরমস্বত্ববাদ ও জন্মস্বত্ববাদ। পূর্বস্বামীর মৃত্যুর পর তৎপুত্রাদির যে স্বত্ব হয় তাহা উপরমস্বত্ববাদ এবং পুত্র জন্মিবামাত্রই পিতার ধনে অধিকার জন্মে—ইহা জন্মস্বত্ববাদ। ইহা ছাড়াও আছে প্রাদেশিক-স্বত্ববাদ ও সামুদায়িক স্বত্ববাদ। প্রাদেশিক স্বত্ব বলিতে বুঝায় প্রদেশে অর্থাৎ সমস্ত ধনের এক অংশে স্বত্ব। আর সামুদায়িক স্বত্ব বলিতে বুঝায় সমুদায়ে অর্থাৎ সমস্ত ধনে স্বত্ব।

উপরমস্বত্ববাদ

রঘুনন্দন উপরমস্বত্ববাদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্বসম্বন্ধাধীন স্বত্ব নষ্ট হওয়ায় উহা পরসম্বন্ধাধীন হইতেছে অর্থাৎ পিতৃসম্বন্ধাধীন স্বত্ব পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের অধীন হইতেছে। এই বিষয়ে রঘুনন্দন নারদবচন উত্থাপনপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে[১৩]পিতৃত্ব সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত যে ধন পুত্রগণ কর্তৃক বিভক্ত হয় তাহা দায়ভাগ এবং সেই বিভাগ ব্যাপার যে ধনে ঘটিয়া থাকে পণ্ডিতগণ তাহাকে বিবাদপদ বলিয়া থাকেন।

উপরমস্বত্ববাদ প্রতিপন্ন করিতে রঘুনন্দন জীমূতবাহনের মতের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। জীমূতবাহনের যে যুক্তি, প্রমাণ ও রীতির আশ্রয়ে এই উপরমস্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, রঘুনন্দনও তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু মিতাক্ষরায় যে জন্মস্বত্ববাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা রঘুনন্দন খণ্ডন করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় (পৃঃ ১৯১) বিজ্ঞানেশ্বর 'উৎপত্ত্যৈবার্থস্বামিত্বং লভেত' এই গৌতম-বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া জন্মস্বত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা রঘুনন্দনের প্রতিভা ও বিচারনৈপুণ্যে নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে।

মিতাক্ষরাকার ও রঘুনন্দনের মতপার্থক্য

রঘুনন্দন বলেন—জন্ম স্বত্বের কারণ নহে, গৌতমবচনে যে জন্মকে স্বত্বের কারণরূপে ধরা হইয়াছে, সেই জন্ম সম্বন্ধের হেতু। সেই সম্বন্ধই পূর্বস্বামীর মরণ প্রভৃতির জন্য স্বত্বের নাশকালে স্বত্বের হেতু হইয়া থাকে।

(১৩) তত্র নারদঃ—বিভাগোঽর্থস্য পিত্র্যস্য পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে।
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ॥ [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩২]

উল্লেখ করিয়াছেন[১৪]
করিয়া লইবে, যেহে
দেবলবচন দ্বারা জ
বিদ্যমান থাকিলে পু
ধনলাভ করা যায় তা
করে বলিয়া সিদ্ধ হ
তাহা নহে। পিতাপু
বলিয়া পরম্পরায় জন্ম
রঘুনন্দন জীমূতব

রঘুনন্দনের সামুদায়িক স্বত্ব স্বীকার

সমীচীন নহে বলিয়া উ
জীমূতবাহনের মে
দ্রব্যবিশেষে যে ব্যবস্থা
একের সামুদায়িক স্ব
প্রতিবন্ধক হওয়া সম্ভবপ
পরে বিভাগই তাহার
স্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ
ফলের অভাবযুক্ত স
জীমূতবাহন সাধারণভা
স্বর্ণ প্রভৃতি ধনে একদে
অমুকের নহে এইরূপ

(১৪) ন চ পিতৃস্বত্বে বি
তদ্ যথা—পিতর্যুপরতে পুত্রা
অস্বাম্যং হি ভবেদে
তস্মাৎ দেবলবচনে পিতরি
ইতি গৌতমবচনং পিতৃস্বত্বে
লভেতেত্যেতৎপরং ন তু পিতৃস্ব

… জন্য রঘুনন্দন দেবলের বচন উল্লেখ করিয়াছেন[১৪]। যথা পিতা লোকান্তরিত হইলে পর পুত্রেরা পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু নির্দোষ পিতা থাকিতে ইহাদের স্বামিত্বের অভাব হয়। এই দেবলবচন দ্বারা জন্মস্বত্ববাদ খণ্ডিত হইতেছে। কারণ এই মতে নির্দোষ পিতা বিদ্যমান থাকিলে পুত্রের স্বত্ব হয় না। কিন্তু গৌতমবচনে যে উৎপত্তি দ্বারাই ধনলাভ করা যায় তাহা পিতৃস্বত্বের নাশের পর পুত্র জন্মই স্বত্বহেতু স্বামিত্ব সম্পাদন করে বলিয়া সিদ্ধ হয়। কিন্তু পিতৃস্বত্বকালে জন্ম দ্বারা যে পুত্রের স্বত্ব হইবে—তাহা নহে। পিতাপুত্র সম্বন্ধ স্বত্বের হেতু, এই সম্বন্ধ জন্মনিবন্ধন হইয়া থাকে বলিয়া পরম্পরায় জন্ম স্বত্বের কারণ—এই মাত্র অর্থ।

রঘুনন্দনের সামুদায়িক স্বত্ব স্বীকার

রঘুনন্দন জীমূতবাহনের মতানুকরণে উপরমস্বত্ববাদ গ্রহণ করিলেও প্রাদেশিক-স্বত্ববাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে সামুদায়িক-স্বত্ব গৃহীত হইয়াছে। সামুদায়িক-স্বত্ব স্বীকার করিবার জন্য রঘুনন্দন বিভাগের লক্ষণ নির্দেশপূর্বক প্রাদেশিকস্বত্ব সমীচীন নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জীমূতবাহনের মতে সমগ্র ধনে সকলের সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিলে পর ঐ স্বত্বের দ্রব্যবিশেষে যে ব্যবস্থাপন তাহার নাম বিভাগ, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই সম্বন্ধ একের সামুদায়িক স্বত্ব জন্মাইয়া দিতে গেলে আর এক তুল্যবলসম্বন্ধ তাঁহার প্রতিবন্ধক হওয়া সম্ভবপর; সুতরাং তাহা না হইয়া একটি অংশে স্বত্ব জন্মাইয়া দেয়, পরে বিভাগই তাহার ব্যঞ্জক হয়। আর সমগ্র পিতৃধনে সকল পুত্রের সামুদায়িক স্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনায় কেবল গৌরবমাত্র হয়, যথেষ্ট ব্যবহাররূপ স্বত্বের ফলের অভাবযুক্ত সামুদায়িকস্বত্বের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। এইভাবে জীমূতবাহন সাধারণভাবে সামুদায়িক স্বত্বে গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি ধনে একদেশোপাত্ত অর্থাৎ তত্তদংশে উৎপন্ন স্বত্বের ইহা অমুকের, উহা অমুকের নহে এইরূপ অবধারণ অবিভক্ত অবস্থায় না থাকায় বৈশেষিক ব্যবহারে

(১৪) ন চ পিতৃস্বত্বে বিদ্যমানেঽপি জন্মনা তদ্ধনে পুত্রস্বত্বমিতি বাচ্যং দেবলবচনবিরোধাৎ। তদ্ যথা—পিতর্যুপরতে পুত্রা বিভজেয়ুর্ধনং পিতুঃ।
অস্বাম্যং হি ভবেদেষাং নির্দোষে পিতরি স্থিতে॥………
তস্মাৎ দেবলবচনে পিতরি বিদ্যমানে তদ্ধনে পুত্রাণামস্বাম্যশ্রুতেরুৎপত্ত্যৈবার্থং লভেত ইত্যাচার্যা ইতি গৌতমবচনং পিতৃস্বত্বোপরমানন্তরমেব জন্মনা পুত্রস্বত্বসম্পাদনাৎ স্বামিত্বেন তদ্ধনং পুত্রো লভেতেত্যেতৎপরং ন তু পিতৃস্বত্বকালে জন্মানন্তরম্। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩২]

অনুপযুক্ততা থাকায় সেই ধন না থাকার তুল্য হয়। আংশিক স্বত্বের গুটিকাপাতাদি দ্বারা যে ব্যক্তীকরণ তাহাকে বিভাগ বলা যায়, অথবা বিভাগ শব্দের যৌগিক অর্থ বিশেষরূপে ভাগ অর্থাৎ স্বত্বজ্ঞাপন, ইহারই নাম বিভাগ।

জীমূতবাহন যে প্রাদেশিকস্বত্ব গ্রহণ করেন তাহাতে ব্যাসবচন আছে যে[১৫] সাধারণ অর্থাৎ অবিভক্ত বাহন বা অশ্বাদি এবং আয়ুধ বা অস্ত্রাদির সহযোগে বলের দ্বারা যে ধন পাওয়া যায় তাহাতে সাধারণ বাহন ও অস্ত্রাদি দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া অর্জকের ভ্রাতারা অংশভাগী হইবে। অর্জক শৌর্যাদি দ্বারা অর্জিত বলিয়া দুইভাগ পাইবে এবং অপর ভ্রাতৃগণ সমান সমান ভাগ পাইবে। প্রাদেশিক স্বত্ববাদী জীমূতবাহন ব্যাসবচনে কথিত বিষয়ই স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যাসবচনস্থিত সাধারণ অর্থে অবিভক্ত ধন বুঝায় বলিয়া প্রাদেশিক স্বত্ববাদিমতে অবিভক্ত ধন সাধারণরূপে পরিগণিত হয়।

কিন্তু রঘুনন্দন সামুদায়িকস্বত্ববাদী, এইজন্য প্রাদেশিকস্বত্ববাদী জীমূতবাহনের মত পরিত্যাগপূর্বক স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য জীমূতবাহন যেখানে সামুদায়িক স্বত্বে দোষ দিয়াছেন রঘুনন্দন দায়ভাগের টীকা করিতে গিয়া তথায় সকলেরই সমস্তধনে স্বত্ব হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১৬]। আর শ্রীনাথও ইহাকে সাধারণ ধন বলিয়া লিখিয়াছেন[১৭]।

রঘুনন্দনের মতে[১৮] যে দ্রব্যে যাহার স্বত্ব হয়, তাহাতেই গুটিকাপাত হইবে— এইরূপ কোন বচন নাই। আর অবিভক্ত বাহন ও অস্ত্রাদি দ্বারা অর্জিত বলিয়া

---

(১৫) তথা ব্যাসঃ—সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধম্।
শৌর্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ॥
তস্য ভাগদ্বয়ং দেয়ং শেষাস্তু সমভাগিনঃ॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ১০৭]

(১৬) পুত্রত্বং হি স্বত্বাপাদকং তচ্চ জ্যেষ্ঠমধ্যমকনীয়স্ত্বাবিশিষ্টমিতি, সর্বেষামেব সর্বধনে স্বত্বমুৎপাদয়তি। [দায়ভাগের রঘুনন্দনকৃত টীকা, পৃঃ ১৩]

(১৭) স্বত্বং হি যথেষ্টবিনিয়োগযোগ্যতা তস্যাশ্চ তস্য ফলস্য কদাচিদপ্যনুপপত্তেঃ সাধারণধন ইত্যাশয়ঃ। [দায়ভাগের শ্রীনাথকৃত টীকা পৃঃ ১২]

(১৮) গুটিকাপাতাদিনা অমুকস্যেদমিতি বিশেষেণ ভজনং স্বত্বজ্ঞাপনমিতি বদন্তি, তন্ন সমীচীনং যত্র দ্রব্যেঽস্য স্বত্বং তত্রৈব গুটিকাপাত ইতি বচনাভাবাৎ কথং নিশ্চেতব্যম্। যত্র বা পিতুর্নিধনানন্তরং তদীয়াশ্বয়োরেকতরমাদায় ভ্রাত্রা যদর্জিতং তত্রার্জকস্য দ্বাবংশাবপরস্যৈকঃ সর্বসম্মতঃ, তত্র যদি প্রাচীনধনবিভাগে গুটিকাপাতাদর্জকেন স এবাশ্বঃ পশ্চাল্লব্ধস্তদা প্রাদেশিকস্বত্ববাদিমতে প্রাগর্জকস্যৈব সোঽশ্ব ইতি তেনার্জিতধনে কথং ভ্রাত্রন্তরস্য ভাগঃ যদি চার্জকেতরেণ সোঽশ্বো লব্ধস্তদা তেনার্জিতধনস্য সমভাগো যুক্ত একস্য স্বায়াসেনাপরস্যায়াসেনার্জিতত্বাদিতি। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩৩]

উহার অংশ সকল ভ্রাতাই পাইবে—এই মত প্রাদেশিকস্বত্ববাদী স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ পিতৃধনের বিভাগের পূর্বে সাধারণ বা অবিভক্তধনে কাহারও স্বত্ব নাই। পিত্রাদির মরণ প্রভৃতি দ্বারা পিতৃস্বত্ব নষ্ট হইলে যে যে অংশে যাহার স্বত্ব বিভাগ দ্বারা নির্ণীত হইবে, সেই অংশই তাহার হইবে, পিতার সমুদায়ধনে হইবে না। প্রাদেশিকস্বত্ববাদিমতে এইরূপ স্থির থাকিলে বিভাগের পূর্বে যে অশ্বাদি বা অস্ত্রাদির সাহায্যে শৌর্যাদি দ্বারা যে ধন অর্জিত হইবে অর্জক বিভাগের পর যদি সেই অশ্বাদি বা অস্ত্রাদি পায়, তাহা হইলে সেই অর্জিতধন শুধু অর্জকেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। কারণ বিভাগের পরে সেই অশ্বাদি বা অস্ত্রাদি অর্জকেরই অংশে পড়িয়াছে এবং শৌর্যাদি শারীরব্যাপার অর্জকই ধনপ্রাপ্তিবিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। আবার যদি বিভাগের পর সেই অশ্বাদি বা অস্ত্রাদি অন্য কোন ভ্রাতার অংশে পড়ে, তাহা হইলে অর্জক এবং সেই অশ্বাদির মালিক সমান ভাগ পাইবে, অন্য ভ্রাতৃগণের অংশলাভে কোন অধিকার নাই। কারণ অর্জকের কায়িক পরিশ্রম এবং অন্যজনের অশ্বাদি মূলধন রহিয়াছে। কিন্তু অন্য ভ্রাতৃগণের কোন বিষয়ই তাহাতে নাই, এইজন্য অন্য ভ্রাতৃগণ কোন অংশই ভোগ করিতে পারিবেন না। কিন্তু পূর্বোক্তব্যাসবচনে অর্জকের দুইভাগ এবং অন্য ভ্রাতৃগণের সমান সমান ভাগ কথিত থাকায় সামুদায়িকস্বত্বই ব্যাসবচনের অভিপ্রায়—ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এইজন্যই রঘুনন্দন সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার করিতে হইলে বিভাগ দ্বারা সেই স্বত্বের নাশ হইবে এবং প্রদেশে স্বত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি এই সামুদায়িকস্বত্ব ঋষিবচন অভিপ্রেত বলিয়া রঘুনন্দন ইহাই স্বীকার করেন।

রঘুনন্দনের সামুদায়িক স্বত্ব স্বীকারে যুক্তি

দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার রঘুনন্দনের এই দোষকে খণ্ডন করিয়াছেন[১৯]। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতে রঘুনন্দনের যুক্তিতে গৌরব হয়। কারণ সামুদায়িকস্বত্বে সমুদয় ধনে যে স্বত্ব হয় তাহা বিভাগ দ্বারা নাশ এবং ব্যক্তিতে পৃথক্ প্রদেশস্বত্বের উৎপত্তি—এইরূপ গৌরব স্বীকার করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

রঘুনন্দন যে বলেন প্রমাণ থাকিলে গৌরব দোষজনক হয় না অর্থাৎ সামুদায়িকস্বত্ব গৌরব হইলেও ঋষিবচন অভিপ্রেত, প্রাদেশিকস্বত্ব ঋষিবচনমূলক নহে—

(১৯) সকলপিত্রাদিধনগতসম্বন্ধিসমসংখ্যসামুদায়িকস্বত্বানি তেষাঞ্চৎপাদবিনাশশ্চ এতাবদনন্ত-পদার্থকল্পনাপেক্ষয়া প্রতিবন্ধককল্পনস্যৈব লঘুত্বাদিতি ভাবঃ।

[দায়ভাগের শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃত টীকা, পৃঃ ৮]

অতএব তাহা স্বীকার্যও নহে। রঘুনন্দনের এই যুক্তি নিরসনের জন্য শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন[২০]—যথেচ্ছরূপে ব্যবহার্যতাই স্বত্বের ফল। সামুদায়িকস্বত্বে অবিভক্ত অবস্থায় সমুদয় ধন যথেষ্ট ব্যবহার করিতে কোন অংশীই পারিবে না। অতএব স্বত্বের ফল যে ইচ্ছামত দ্রব্যব্যবহার তাহা সামুদায়িকস্বত্বে সম্ভব নহে। কারণ সামুদায়িক ধনে কাহারও পৃথক্ স্বত্ব নাই। অতএব জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতে প্রাদেশিকস্বত্ব অধিক যুক্তিগ্রাহ্য।

কিন্তু তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে প্রাদেশিকস্বত্বমতে বিধ্যন্তর স্বীকার করিতে হয় বলিয়া গৌরব হয়। কারণ যাহাদের অর্জনের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগকেও অর্জিতধনের অংশ দিতে হইবেবলিয়া অপূর্ববিধি স্বীকার করিতে হয়।

এইজন্য জীমূতবাহন ব্যাসবচনের ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধনসম্বন্ধে অর্জক উপার্জিত ধনের দুইভাগ পাইবে, ইহা নির্বিবাদে স্থির হইয়াছে। ব্যাসবচনে উক্ত হইয়াছে—সাধারণ বাহন ও অস্ত্র আশ্রয় করিয়া শৌর্যাদি দ্বারা যদি এক ভ্রাতা অর্থোপার্জন করে তাহাতে অপর ভ্রাতৃগণও অংশী হইবে, কিন্তু অর্জক ভ্রাতা দুইভাগ গ্রহণ করিবে এবং অপর ভ্রাতৃগণ সমান অংশ পাইবে। এই বচনে উপঘাত বিষয়ে দুইভাগের ব্যবস্থা নিবন্ধন অসাধারণ ধন ও শারীরিক পরিশ্রমার্জিত ধনবিষয়ে দুইভাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। পরন্তু তদপেক্ষা অধিক ধন প্রাপ্য হইয়া উচিত, সেই অধিকটি কি, সমস্ত কিংবা কিছু কম ইহা বিচারপূর্বক দেখিতে গেলে মুনিগণ এবং নিবন্ধকারগণ কেহই কিছু ন্যূন অংশের ব্যবস্থা করেন নাই, এইজন্য সাধারণ উপঘাতার্জন স্থলে অপর ভ্রাতার অংশ প্রাপ্তি দর্শনে যে স্থলে উপঘাত না হয় সেখানে অন্য ভ্রাতার ভাগপ্রাপ্তি হয় না ইহাই সুব্যবস্থা।

উপার্জকের দুইভাগ প্রতিপাদক বচনের ন্যায়মূলক অর্থাৎ একজনের ধনব্যাপার এবং উপার্জকের ধন ও শরীর এই দুইয়ের বিষয় লইয়া মীমাংসা করাই ন্যায়সঙ্গত, তাহা না করিয়া শ্রুতিকল্পনা করায় পিত্রাদিস্থলে অর্জক শব্দ লইয়া শ্রুতি কল্পনা করিতে হয়, অথবা কেবল পৃথক্ উপার্জক পদদ্বারা শ্রুতিকল্পনা করিতে হইবে। এতদুভয় প্রকার ব্যবস্থারই গৌরব দোষ ঘটে, সুতরাং সাধারণ ধনসম্বন্ধ না ধরিয়া যে ধন অর্জিত হইবে তাহা শুধু অর্জকই পাইবে, অন্য ভ্রাতার তাহাতে কোন

---

(২০) প্রমাণসত্ত্বে গৌরবমপ্যকিঞ্চিৎকরং কথমন্যথাদৃষ্টকল্পনমতঃ প্রমাণাভাবমাহ যথেষ্টেতি। যথেষ্টবিনিয়োগরূপফলানুমেয়মিহ স্বত্বং সমুদায়ে কস্যাপি সম্বন্ধিনস্তদভাবেন কথং তৎকল্পনমিতি ভাবঃ।

[দায়ভাগের শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃতটীকা, পৃঃ ৮]

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার
সামুদায়িকস্বত্বে
ংশীই পারিবে না।
ত্বে সম্ভব নহে।
র জীমূতবাহন ও

বিধ্যন্তর স্বীকার
কোন সম্বন্ধ নাই,
াকার করিতে হয়।
ছেন। সাধারণতঃ
াদে স্থির হইয়াছে।
শৌর্যাদি দ্বারা যদি
, কিন্তু অর্জক ভ্রাতা
এই বচনে উপঘাত
শ্রমার্জিত ধনবিষয়ে
প্রাপ্য হইয়া উচিত,
খতে গেলে মুনিগণ
, এইজন্য সাধারণ
াত না হয় সেখানে

কজনের ধনব্যাপার
করাই ন্যায়সঙ্গত,
লইয়া শ্রুতি কল্পনা
না করিতে হইবে।
ধনসম্বন্ধ না ধরিয়া
র তাহাতে কোন

াভাবমাহ যথেষ্টেতি।
তৎকল্পনমিতি ভাবঃ।
লঙ্কারকৃতটীকা, পৃঃ ৮]

অধিকার নাই, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হইবে[২১]।

এই প্রকারে ভিন্নভাবে ব্যাসের বচন আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন। কিন্তু এই বচন যে সামুদায়িকস্বত্বের সাধন হইতে পারে তাহার কোন আভাস তিনি প্রকাশ করেন নাই।

কিন্তু বিভাগকালে যে ধন গুপ্তভাবে রাখা হয় তাহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইলে সেই সাধারণ ধনবিভাগ বিষয়ে যে সামুদায়িকস্বত্ব অবশ্য স্বীকার্য তাহা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পিতার মৃত্যুর পর ধন বিভাগ করা হইলে তারপর কোন অংশীর নিকট হইতে যদি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে প্রচ্ছাদিত ধন পাওয়া যায় এবং তাহা সাধারণ ধন বলিয়া প্রকাশ পায়, তবে তাহার বিভাগ করিতে হয় এবং সাধারণ ধন-প্রচ্ছাদনকারীও সেই ধনের অংশ পাইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্র যদি স্বর্ণ প্রচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহা হইলে সেই স্বর্ণের মধ্যে অপর ব্রাহ্মণপুত্রেরও অংশ থাকায় অপহরণকারী ব্রাহ্মণপুত্র ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহারক বলিয়া পতিত হইতেছে। পতিত হইলে সেই ব্যক্তি পিতার ধনের অংশভাগী হইতে পারে না। এখানে ধন-প্রচ্ছাদনকারী ব্রাহ্মণপুত্রও সেই প্রচ্ছাদিতধনের অংশভাগী হয় বলিয়া প্রাদেশিকস্বত্ববাদিমতে কিছুতেই বিরোধের মীমাংসা হয় না। কিন্তু সামুদায়িকস্বত্বে পিতার ধনে সকল পুত্রেরই সমান ভাগ থাকে বলিয়া ধনপ্রচ্ছাদন করিলে ও পরে তাহা জ্ঞাত হইলেও সেই প্রচ্ছাদনকারী পুত্র অপহারক বলিয়া পতিত হয় না এবং তাহাকে অপহরণরূপ দোষের জন্য বঞ্চিত করার প্রশ্নই আসে না। এইজন্য এই বিরোধের অবসান করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই বিষয় সামুদায়িক স্বত্ববাদীর মতকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু স্বকীয়মতে স্বত্ব প্রাদেশিক বলিয়া তাঁহার এতপ্রকার প্রয়াস দ্বারাও স্তেয়নিষ্পত্তি হয় না। পরকীয়স্বত্বের মত অপহৃত দ্রব্য ধনসমুদয়ের মধ্যে গণ্য হইবে[২২]।

(২১) উপঘাত এব ভাগদ্বয়স্য বিধানাৎ অসাধারণধনশরীরব্যাপারার্জিতে তু ন ভাগদ্বয়ং ন্যায্যং, কিন্ত্বধিকং, সর্বমেব বা কিঞ্চিদূনং বা, তত্র কিঞ্চিদূনস্য মুনিভি র্নিবদ্ধ,ভিশ্চানুক্তত্বাৎ। সাধারণ-ধনব্যাপারেণ ভ্রাত্রন্তরস্য ভাগদর্শনাৎ তদভাবে ভাগাভাব এব যুক্তঃ।

দ্বিরর্জয়িতুরিত্যেতস্য চ ন্যায়মূলত্বমেব যুক্তম্, অন্যথা শ্রুতিকল্পনে অর্জকত্বানুপ্রবেশো বা পৃথগধিকারী কল্পনীয়ঃ স্যাৎ।

তস্মাদনুপঘাতার্জিতমর্জকস্যৈব নেতরেষামিতি সিদ্ধম্। [দায়ভাগ, পৃঃ ১১১]

(২২) ইদঞ্চ সামুদায়িকস্বত্ববাদিমতমাশ্রিত্য সমাহিতং, স্বমতে তু স্বত্বস্য প্রাদেশিকত্বাৎ এতাবতা প্রয়াসেনাপ্যত্র স্তেয়নিষ্পত্তি দুর্বারৈব পরমাত্রস্বত্ববদ্ দ্রব্যস্যাপহৃতসমুদায়মধ্যে সত্ত্বাদিতি বোধ্যম্।
[দায়ভাগের শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃতটীকা, পৃঃ ২২৭]

অতএব রঘুনন্দন যে কেবল ব্যাসবচনকে ভিত্তি করিয়াই সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, এই ব্যাসবচনই যে একমাত্র পিতার অবিভক্ত ধনকে সাধারণরূপে ধার্য করিয়াছে বলিয়া সামুদায়িকস্বত্বের জ্ঞাপক হইতেছে তাহা নহে, প্রচ্ছাদিত ধনের পুনর্বিভাগ এবং প্রচ্ছাদনকারীর অংশদানেও এই সামুদায়িকস্বত্ব ঋষিবাক্য সম্মত তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা আছে—অবিভক্ত ধন প্রচ্ছাদন করিবার পরে ঐ ধন যদি সাধারণ বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই সাধারণ ধনপ্রচ্ছাদনকারীও ঐ অপহরণরূপ দোষের জন্য বঞ্চিত হয় না। এমনকি ঐ ধন বলপূর্বক গ্রহণ করিতেও নিষেধ করা আছে। আবার প্রচ্ছাদিত ধন হইতে যদি ঐ প্রচ্ছাদনকারী ভোগ করতঃ কিছু অংশ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাও গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া সাধারণ ধনে যে সামুদায়িকস্বত্ব আছে এবং সামুদায়িক-স্বত্বের জন্যই অপহরণের নিমিত্ত চৌর্যদোষ হয় না—তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে।

এই বিষয়ে জীমূতবাহন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নের মতকে প্রামাণ্যরূপে আলোচনা করিয়াছেন[২৩]। মনু বলেন—ঋণ ও ধনসমুদয় যথাবিধি বিভাগ করার পরে যদি কিছু অবিভক্ত ধন দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই দ্রব্য পূর্বের ন্যায় সকলেই সমান বিভাগ করিয়া লইবে। এখানে সাধারণ দ্রব্য গোপন করিয়াছে বলিয়া অপহর্তাকে অল্পভাগ অথবা অপহৃত দ্রব্যের কিছুই দিবে না—এইরূপ কথা বলা হয় নাই, বরং সমান ভাগ পাইবে বলা আছে। যাজ্ঞবল্ক্যবচনের অর্থ এইরূপ—বিভক্ত ব্যক্তিগণ বিভাগের পর পরস্পর অপহৃত যে সকল দ্রব্য দেখিতে পান তাহা সকলেই পূর্বের ন্যায় বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা।

আবার কাত্যায়ন বলেন—বিভাগকালীন কোন দ্রব্য কোন ভ্রাতা কর্তৃক প্রচ্ছাদিত থাকিলে তাহার সহিত পরে সকল ভ্রাতৃগণই ঐ দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইবে, আর প্রচ্ছাদিত দ্রব্য বিভাগের পূর্বে যদি প্রচ্ছাদক ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তবে ঐ ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র প্রভৃতিও ভাগ পাইবে। পরস্পর কর্তৃক অপহৃত অথবা

(২৩) তত্র মনুঃ—ঋণে ধনে চ সর্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথাবিধি ॥
পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎ কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং সমতাং নয়েৎ ॥·········
তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং বিভক্তে যত্র দৃশ্যতে।
তৎপুনস্তে সমৈরংশৈ র্বিভজেরন্নিতি স্থিতিঃ ॥
তথা কাত্যায়নঃ—প্রচ্ছাদিতন্তু যদ্ যেন পুনরাগত্য তৎসমম্।
ভজেরন্ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমভাবেঽপি হি তৎসুতাঃ ॥
অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং দুর্বিভক্তঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পশ্চাৎ প্রাপ্তং বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ ভৃগুঃ ॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ২২১]

অসম্যগ্‌রূপে যে দ্রব্য বিভক্ত হইয়াছে তাহা পুনর্বার পূর্বের ন্যায় বিভাগ করিবে—ইহা ভৃগুমুনির মত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন—এই ঋষিবচনগুলি হইতে সামুদায়িক স্বত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

জীমূতবাহন লিখিয়াছেন[২৪]—অবিভক্তধনে কাহারও অধিকার না থাকায় চৌর্যদোষ হয় না। এই উক্তি দ্বারা ফলতঃ সামুদায়িকস্বত্ব প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ অবিভক্তধনে সকল পুত্রের অধিকার থাকায় স্তেয়দোষ হয় না, কিন্তু প্রাদেশিক স্বত্বে অবিভক্ত ধনে পুত্রদের কাহারও অধিকার না থাকায় পরস্বামিকধন অপহরণে চৌর্যদোষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য রঘুনন্দন সামুদায়িক স্বত্বই স্বীকার করিয়াছেন। কোন অংশী অবিভক্ত অবস্থায় সমুদয় ধন যথেষ্ট ব্যবহার করিতে না পারিলেও রঘুনন্দনের মতে ঋষিবচন অভিপ্রেত বলিয়া সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার্য। তাঁহার মতে যথেষ্ট ব্যবহার্যতাই স্বত্বের একমাত্র ফল নহে। সামুদায়িকস্বত্বে অবিভক্তধনে প্রত্যেকেরই স্বত্ব থাকে এবং বিভাগ তাহার জ্ঞাপক। এই বিভাগ দ্বারা সমুদয়ধনে পূর্বে উৎপন্ন স্বত্বের নাশ এবং ঐ ধনের অংশী প্রত্যেক ব্যক্তির দানবিক্রয়াদিস্বরূপ যথেষ্ট ব্যবহারহেতু স্বত্ব উৎপন্ন হয়।

মিতাক্ষরামতে জন্মই স্বত্বের কারণ। এই জন্মস্বত্ববাদে কার্য এবং কারণের সামানাধিকরণ্য বজায় থাকে বলিয়া কোন দোষ হয় না, অর্থাৎ জন্ম পুত্রের অধীন, আবার স্বত্বও পুত্রেরই হয়, সুতরাং স্বত্বও পুত্রেরই অধীন—এইভাবে কার্যকারণের সামানাধিকরণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু জীমূতবাহনের মতে স্বত্বনাশই স্বত্বোৎপত্তির কারণ। তাহাতে স্বত্বনাশ ধনের অধীন, কিন্তু স্বত্বোৎপত্তি পুত্রের অধীন—অতএব কার্যকারণের বৈয়ধিকরণ্য হয় বলিয়া দোষ হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য জীমূতবাহনকে বিকল্প স্বত্বের হেতু কল্পনা করিতে হইয়াছে। তাহা হইতেছে—পিতৃমরণকালীন পুত্রের জীবনই পুত্রের অর্জন হইবে[২৫]। পিতার স্বত্বনাশের পর পুত্রের যে স্বত্ব হইতেছে পূর্বস্বামীর মরণাদিকালীন পুত্রের জীবনই স্বত্বের হেতু—এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষ কল্পনা করা হইতেছে। ইহাতে কার্যকারণের বৈয়ধিকরণ্য দোষ পরিহৃত হইয়াছে এবং সামানাধিকরণ্যও প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু রঘুনন্দন এই দ্বিতীয় পক্ষ কল্পনা না করিয়া বলেন[২৬]—পিতৃস্বত্ব নাশ

---

(২৪) ন সাধারণধনাপহারে স্তেয়নিষ্পত্তিঃ। [দায়ভাগ, পৃঃ ২২৩]

(২৫) পিতৃনিধনকালীনং বা জীবনমেব পুত্রস্যার্জনং ভবিষ্যতি। [দায়ভাগ, পৃঃ ১৬]

(২৬) পিতৃস্বত্বোপরমে পুত্রেষু বিদ্যমানেষু পুত্রগতং তৎ স্বত্বাস্পদং ধনং ভবতীত্যর্থঃ। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩২]

হইলে পিতৃস্বত্বযুক্ত ধন বিদ্যমান পুত্রের অধীন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জীমূতবাহনের মতে স্বত্বনাশ ও পুত্রের জীবন—দুইই একসঙ্গে উল্লেখ করতঃ রঘুনন্দন উপরমস্বত্ববাদ ও কার্যকারণের সামানাধিকরণ্য বজায় রাখিয়াছেন।

জন্ম দ্বারা যে স্বত্ব হইতে পারে না তাহা জীমূতবাহন আরও দেখাইয়াছেন। যথা, পিতা জীবিত থাকিলে এবং তদ্ধনে পুত্রের স্বামিত্ব হইলে পর পুত্রগণ পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু নির্দোষ পিতা বর্তমান থাকিতে পুত্রগণের ধনবিভাগের অধিকার নাই। পিতা জীবিত থাকিলেও তদ্ধনে পুত্রের স্বামিত্ব হইলে পিতার অনিচ্ছায়ও বিভাগ হইতে পারে। জন্মাধীন স্বত্ব হয় এবিষয়ে প্রমাণ নাই, আর কোন গ্রন্থকার জন্মকেই অর্জন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; তবে যে কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে জন্মই স্বত্বের কারণ বলিয়া বর্ণনা আছে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। পিতার মরণ পুত্রের স্বত্বের প্রতি কারণ। পিতাপুত্রত্ব সম্বন্ধের প্রতি পুত্রের জন্মই কারণ—এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অন্যের ক্রিয়ার দ্বারা অন্যের স্বত্ব শাস্ত্রে প্রমাণিত হইলে বিরুদ্ধ হয় না। লোকতঃ দানস্থলেও চেতনোদ্দেশ্যে দাতার ত্যাগক্রিয়া দ্বারা ব্রাহ্মণাদির স্বত্ব দৃষ্ট হয়।

যে গৌতমবচনকে প্রমাণরূপে ধরিয়া জন্মস্বত্ববাদ স্বীকৃত হইয়াছে, সেই বচনকে শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার অপ্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাকে প্রামাণ্যরূপে ধরিলে একমাত্র গর্ভস্থ পুত্রের পিতার মৃত্যু হইলে সেই পুত্রের জন্ম দ্বারা স্বত্বের কারণ হইয়া থাকে, অন্যস্থলে ইহা নিষ্প্রমাণ। তাহা না হইলে পিতার স্বধনে পুত্রের জন্মমাত্রেই পিতৃস্বাতন্ত্র্য বর্তমান থাকে না। অতএব উৎপত্তি বা জন্ম স্বত্বের প্রযোজক, কিন্তু স্বত্বের জনক নহে। উৎপত্তিসম্বন্ধ পিতার মৃত্যুর পর পিতৃধনে স্বত্বসম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়—ইহাই শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের অভিপ্রায়[২৭]।

জীমূতবাহনের মতে পিণ্ডদানের দ্বারা ধনাধিকার নির্ণীত হয়। কারণ পুত্র ও মৃতপিতৃক পৌত্র এবং প্রপৌত্র—এই তিনজনের একসঙ্গে অধিকারের বচন নাই বটে, কিন্তু উহাদের উপকারকত্ব নির্বিশেষে ধরিয়া সমান ধনাধিকার নির্ণীত হইয়াছে এবং সর্বত্রই উক্ত রীতিক্রমে মৃতের ধন মৃতব্যক্তির পারত্রিক উপকারোপ-

(২৭) ততশ্চ উৎপত্ত্যৈবার্থং স্বামিত্বাল্লভেতেত্যাচার্যা মন্যন্তে ইতি মিতাক্ষরাধৃতগৌতমবচনমমূলং সমূলত্বে বা যস্মিন্ গর্ভস্থে পিত্রাদি মৃ'তঃ তৎপরমন্যথা পুত্রবতঃ পিতুঃ স্বধনেঽপ্যস্বাতন্ত্র্যাপত্তেরিত্যাশয়ঃ। বস্তুতস্তু উৎপত্ত্যৈবেতি তৃতীয়া প্রযোজকতায়াং ন তু জনকতায়াং, তথাচোৎপত্তিসম্বন্ধস্য সম্বন্ধান্তরাদধিকতয়া তৎপ্রযুক্তো জনকধনে তৎস্বত্বাপগমানন্তরং পুত্রোঽধিকারীত্যেতৎ তাৎপর্যমিতি বোধ্যম্। [দায়ভাগের শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃতটীকা, পৃঃ ১৪]

যোগী হয়। আর দায়ভাগপ্রকরণে পুত্রাদির উপকারকতা কথনের আর অন্য প্রয়োজন নাই এবং ঋণ হইতে মুক্ত করাকে ধনলাভের কারণ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। আবার ইহলোক হইতে উদ্ধারকার্য ধনাধিকারের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের পিতা প্রভৃতিকে ইহলোক হইতে সন্তারণই একমাত্র কাম্য। অন্যথা 'ত্রয়াণামুদকং কার্যং' ইত্যাদি বচনের আনর্থক্য ঘটে। এইজন্য ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপকারকত্বের অভাবই ধনের অংশ হইতে বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে, আর অন্য অধিকারী প্রতিপাদনের জন্য বচনকল্পনায় গৌরব দোষের সম্ভাবনা হয় এবং তৎকর্তৃক উপার্জিত ধনের তদীয় উপকারের তারতম্য অনুসারে তদভীষ্ট সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে—উপকারকর্তৃত্ব হেতু ধনাধিকার ন্যায়প্রাপ্ত—ইহা মনু প্রভৃতি মুনিগণের অভিমত বলিয়া বুঝা যাইতেছে[২৮]।

রঘুনন্দনও পার্বণপিণ্ডদাতৃত্বসম্বন্ধে ধনাধিকারী নিরূপিত করিয়াছেন[২৯]। পিণ্ডদানকারী পিতৃধনের অধিকারী—ইহা রঘুনন্দনের মতেও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইজন্য তিনি বৃহস্পতির বচন উল্লেখপূর্বক দেখাইয়াছেন—সবর্ণজাত হইয়াও গুণহীন হইলে পুত্রগণ পৈতৃকধনে অধিকারী হইবে না। যাঁহারা ধনশীল ব্যক্তির পিণ্ডদানকারী শ্রোত্রিয়, তাঁহারাই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। সুতরাং এই মতেও ব্যক্তির পিণ্ডদাতৃত্বসম্বন্ধই অধিকার প্রতিপাদন করিতেছে[৩০]।

রঘুনন্দন শুধু পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধই ধনাধিকারের হেতু বলেন নাই, সন্ততিকারকত্বসম্বন্ধও ধনাধিকারে উপযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৩১]। এইজন্য তিনি বলেন—ধনাধিকারে পুত্রের অভাবে প্রথমে পুত্রিকাপুত্রের অধিকার, তারপর দত্তকপুত্রের অধিকার। গোত্র ও ধনভাগীদের ক্রমশঃ পূর্বপূর্বের অভাবে পর পর অধিকার নিরূপিত হইয়াছে। তাঁহার মতে অধিকারী নিরূপণে যাজ্ঞবল্ক্য বচন প্রমাণ। তাহাতে আছে—পুত্র, পৌত্র এবং

ধনাধিকার নিরূপণ

(২৮) উপকারকত্বেনৈব ধনসম্বন্ধো ন্যায়প্রাপ্তো মন্বাদীনামভিমত ইতি মন্যতে। [দায়ভাগ, পৃঃ ২১৬]

(২৯) পিতুর্যথা পার্বণপিণ্ডদাতৃত্বেন তৎপিতৃধনে স্বত্বং তথা তন্মরণাদিনা তৎস্বত্বোপরমে তৎপুত্রাণাং পিতুঃযোগ্যাংশে সত্যপি পিতৃব্যোহংশিতা। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩৪]

(৩০) বৃহস্পতিঃ—সবর্ণাজোঽপ্যগুণবান্ নার্হঃ স্যাৎপৈতৃকে ধনে।

তৎপিণ্ডদাঃ শ্রোত্রিয়া যে তেষাং তদভিধীয়তে॥

তৎপিণ্ডদা ধনিপিণ্ডদাতারঃ, অতএব শ্রোত্রিয়া ইত্যুক্তম্।..........

এতন্মতে সুতরাং ধনিপিণ্ডদাতৃত্বং প্রতীয়তে। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩৬]

(৩১) সন্ততিকারকত্বেন ধনিদেয়পিণ্ডদাতৃত্বেন চ প্রথমং পুত্রিকাপুত্রস্য তদনন্তরং দত্তকপুত্রস্য গোত্ররিক্থয়োর্ভাগিত্বং পূর্বপূর্বাভাবে পরঃ পর ইত্যেবংক্রমেণ গোত্রধনয়োর্ভাগিনঃ। [ঐ, পৃঃ ৩৩৫]

প্রপৌত্রের অভাবে মৃতব্যক্তির ধনে পত্নীর অধিকার, পত্নীর অভাবে দুহিতার অধিকার। কন্যাদের মধ্যে প্রথমে অবিবাহিতা ও পরে বিবাহিতা কন্যার অধিকার, ইহাদের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার, ইহার অভাবে পিতা, পরে মাতার অধিকার, তদভাবে ভ্রাতৃগণের অধিকার। এখানেও সোদর, অসোদর, সংসৃষ্টভেদে অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণের অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, ইহাদের মধ্যেও প্রথমে সোদরপুত্র তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে সগোত্র, সপিণ্ড, সকুল্য ইত্যাদির অধিকার[৩২]। এখানে রঘুনন্দন পিণ্ডদান ছাড়াও সগোত্র, সপিণ্ড, সকুল্য ইত্যাদির মধ্যে আসন্নজননতারতম্য দ্বারা অর্থাৎ নিকটবর্তী সম্বন্ধে জন্ম দ্বারা ধনে অধিকারী নিরূপণ করিয়াছেন[৩৩]।

ভারতবর্ষে ধনাধিকার বিষয়ে দুইটি মত প্রচলিত আছে—মিতাক্ষরামত ও দায়ভাগমত। মিতাক্ষরামত বাংলাদেশ ব্যতিরেকে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আর দায়ভাগমত নিজস্ব মৌলিক রীতির জন্যই বঙ্গদেশে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। দায়ভাগমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন এবং দায়ভাগের টীকাকার ও দায়ক্রমসংগ্রহলেখক শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার সম্যক্ প্রসিদ্ধ। মনু, নারদ, দেবল, উদ্যোত, ধারেশ্বর, ভোজরাজ প্রভৃতি লেখকগণও দায়ভাগের মতকে স্বীকার করেন।

ধনাধিকারবিষয়ে দুইটি মতবাদ

আর মিতারক্ষরামতে চারটি ভাগ আছে[৩৪]—যথা, বেনারস-সম্প্রদায়, মিথিলা-সম্প্রদায়, বোম্বেসম্প্রদায় ও মাদ্রাজসম্প্রদায়। এই বেনারস-সম্প্রদায়ে বীরমিত্রোদয় গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মিথিলাসম্প্রদায়ে বিবাদরত্নাকর, বিবাদচন্দ্র, বিবাদ-চিন্তামণি বিখ্যাত। আর বোম্বেসম্প্রদায়ে ব্যবহারময়ূখ, মিতাক্ষরা, নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি এবং মাদ্রাজসম্প্রদায়ে স্মৃতিচন্দ্রিকা, ব্যবহারনির্ণয়, পরাশরমাধব, সরস্বতী-বিলাস প্রসিদ্ধ। আবার সংহিতাগুলির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বৃহস্পতি প্রভৃতিও মিতাক্ষরার জন্মস্বত্ববাদকে স্বীকার করিয়াছেন।

মিতাক্ষরাসম্প্রদায় জন্মস্বত্ববাদ ও সামুদায়িকস্বত্ববাদ স্বীকার করিয়াছেন।

---

(৩২) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ।
এষামভাবে পূর্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥ [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৪১]

(৩৩) পিণ্ডদানতারতম্যেন আসন্নজননতারতম্যেন চ ধনেষধিকারী। [ঐ, পৃঃ ৩৪৪]

(৩৪) Hist. of Dharma Sastra, Vol I, P-544.

জন্মস্বত্ববাদ স্বীকার করিলে সামুদায়িকস্বত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ জন্মমাত্রই পুত্র পিতার সমস্ত ধনে অধিকারী হয়। অতএব প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর কতগুলি পুত্র পরে জন্মগ্রহণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রের প্রাপ্য অংশের প্রদেশনির্ণয় করা কখনই সম্ভব নয়। কারণ স্বত্বোৎপত্তির প্রতিবন্ধক নাই। অতএব পুত্রেরও জন্মমাত্রই পিতার সমস্ত ধনে অধিকার নিরূপিত হয়। এইজন্যই জন্মস্বত্ববাদে সামুদায়িকস্বত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

জীমূতবাহন, রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতে উপরমস্বত্ববাদ প্রাধান্য পাইয়াছে। জীমূতবাহন স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে জন্মস্বত্ববাদের কোন প্রামাণ্য শাস্ত্রে নাই। যাঁহারা একমাত্র গৌতমের বচনকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মত ঠিক নহে। কারণ গৌতমের বচন অনুসারে জন্মস্বত্ববাদ প্রমাণিত হয় না। দায়ভাগমতে স্বত্বের কারণ যে জন্ম তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে, পরম্পরাসম্বন্ধে। অর্থাৎ পিতার মরণ পুত্রের স্বত্বের প্রতি কারণ, পিতাপুত্রত্ব সম্বন্ধের প্রতি পুত্রের জন্মই কারণ—এই প্রকার পরম্পরাসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। জীমূতবাহনের স্বপ্রতিভায় যুক্তি প্রমাণ সাহায্যে উপরমস্বত্ববাদ প্রমাণিত করিবার কুশলী রীতি সত্যই অভিনব। আবার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার উপরমস্বত্ববাদ প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন যে জন্ম স্বত্বের প্রযোজক, কিন্তু তাহা কখনই স্বত্বের জনক নহে। কারণ তাহা স্বত্বের জনক হইলে পুত্র জন্মমাত্রই পিতৃধনে অধিকারী হয় বলিয়া পিতৃধনে পিতৃস্বাতন্ত্র্য থাকে না।

রঘুনন্দন বঙ্গদেশের নিবন্ধকারগণের মধ্যে স্বপ্রতিভা, কুশলী রচনাশক্তি, তীক্ষ্মবুদ্ধি এবং অসাধারণ বিচারনৈপুণ্য দ্বারা পূর্বাচার্যগণের মতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক স্বীয়মত স্থাপন ইত্যাদির জন্য প্রদীপ্ত ভাস্কররূপে বিরাজিত আছেন। তিনি জীমূতবাহনের উপরমস্বত্ববাদ স্বীকার করিলেও প্রাদেশিকস্বত্ববাদকে মোটেই প্রাধান্য দেন নাই। বরং প্রাদেশিকস্বত্ববাদে দোষ বাহির করিয়া তাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব দেখা যায় যে রঘুনন্দন নির্বিবাদে জীমূতবাহনের মত বা মিতাক্ষরার মত গ্রহণ করেন নাই। ঋষিবচন প্রভৃতি সম্যক্ আলোচনা করিয়া যাহা তাঁহার নিকট যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

রঘুনন্দন উপরমস্বত্ববাদ স্বীকারপূর্বক জন্মকে বলিয়াছেন সম্বন্ধের হেতু। সেই সম্বন্ধই পূর্বস্বামীর মরণ প্রভৃতির জন্য স্বত্বের নাশকালে স্বত্বের হেতু হইয়া থাকে। ব্যাসবচনের আলোচনাপূর্বক তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই বচনের

দ্বারা প্রাদেশিকস্বত্ব কখনই গ্রাহ্য নহে। আবার বিভাগ করিবার পর কোন অংশীর নিকট হইতে যদি কিছু প্রচ্ছাদিত সাধারণ ধন পাওয়া যায় তাহা পুনরায় অংশিগণ ভাগ করিয়া লইবেন এবং সেই প্রচ্ছাদনকারীও ভাগ পাইবেন। ব্রাহ্মণ ধনস্তেয়কারী বলিয়া পতিত হইলেও কিন্তু সেই ধনের অংশ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। রঘুনন্দন প্রমাণিত করিয়াছেন যে প্রাদেশিক স্বত্ববাদী এই বচনকে কখনই স্বযুক্তিতে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু জীমূতবাহন এই বচনগুলিকে অত্যন্ত সাধারণভাবে যথাশ্রুত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইগুলি যে সামুদায়িকস্বত্বের সাধক হইতে পারে তাহার ইঙ্গিতমাত্রও করেন নাই। রঘুনন্দনের মতে সামুদায়িকস্বত্বে বিভাগ দ্বারা স্বত্বনাশ এবং পৃথগ্ ব্যক্তিতে প্রদেশস্বত্ব উৎপন্নরূপ গৌরব স্বীকার করিতে হইলেও প্রমাণ থাকিলে গৌরব দোষজনক নহে বলিয়া ঋষিবচন-মূলক মতেই প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব দেখা যায় রঘুনন্দন বচনমূলক মতকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর জীমূতবাহন লোকব্যবহারমূলক মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অর্থাৎ লোকব্যবহারে প্রাদেশিকস্বত্বই অত্যধিক যুক্তিগ্রাহ্য। স্বত্বের ফল হইতেছে যথেচ্ছ ব্যবহার্যতা। পিতৃধনে সকলের সমান অধিকার থাকিলে কেহই সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাগ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন না। প্রাদেশিক-স্বত্বে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর।

জীমূতবাহন আবার বলেন, যে ধনে একের স্বত্ব থাকে অপরেরও সেই ধনে স্বত্ব থাকিলে তাহার বিভাগ সম্ভব নয়। কারণ আমরা দেখি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যগ-ধনে বিভাগ হয় না। জীমূতবাহনও সামুদায়িকধনকে মধ্যগ-ধনরূপে অভিহিত করতঃ কল্পনা করিয়াছেন যে যেমন স্ত্রীপুরুষের বিভাগ হয় না তেমনই ঐ সামুদায়িক ধনেরও বিভাগ সম্ভব নয়[৩৫]। আবার সামুদায়িকস্বত্বে সকল পুত্রের অধিকার থাকে বলিয়া কেহ তাহা ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে না। আমার ধন অথচ আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিব না—এইরূপ কল্পনা লোকব্যবহার-ক্ষেত্রে উদ্ভট ব্যাপার। সুতরাং লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক-স্বত্ববাদে সামুদায়িকস্বত্বের বিনাশ এবং প্রাদেশিকস্বত্বের উৎপত্তিরূপ গৌরব স্বীকার করিতে

(৩৫) কিঞ্চ পৈতামহধনে পিতাপুত্রয়োঃ সমভাগিত্বে যাবদ্ধনং পিতুস্তাবদেব পুত্রস্যাপীতি বাচ্যং ন তু যাবদেব যদেবং ধনং, তাবদেব তদেব পুত্রস্যাপীতি, মধ্যগত্বাপত্তেঃ জায়াপত্যোরিব বিভাগাভাব-প্রসঙ্গাৎ। [দায়ভাগ, পৃঃ ৪৪]

হয় না বলিয়া জীমূতবাহন প্রাদেশিকস্বত্বই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঋষিবচন অভিপ্রেত বলিয়া রঘুনন্দন সামুদায়িকস্বত্বকেই স্বীকার করিয়াছেন। আবার জীমূতবাহন কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যের জন্য দ্বিতীয় কল্প স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন দ্বিতীয় কল্প উল্লেখ না করিয়া পিতৃস্বত্বনাশ-কালীন বিদ্যমান পুত্রের অধীন হয় পিতৃস্বত্বগতধন—এইরূপভাবে শাস্ত্রীয় মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। অতএব এইরূপ আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে রঘুনন্দনের মতই শ্রেষ্ঠ।

৩। স্ত্রীধন

স্ত্রীলোকের যে কোন ধনই স্ত্রীধনরূপে গণ্য হইবে না। স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের দান, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই ধনে স্বামীর বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যদি কেহ বলপূর্বক স্ত্রীধন ভোগ করে, তাহা হইলে সে সেই অপরাধে রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি কেহ প্রণয়পূর্বক অনুমতি লইয়া স্ত্রীধন ভোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি যখন সঙ্গতিপন্ন হইবে তখন রাজা সেই স্ত্রীধন তাহাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য করিবেন। অতএব স্ত্রীধনে একমাত্র স্ত্রীরই সম্পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীধনের লক্ষণ হইতেছে—স্ত্রীলোকেরা ভর্তা বা অপর কোন ব্যক্তির অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং যে ধন দান, বিক্রয় ও ভোগ করিতে পারে সেই ধনকে স্ত্রীধন বলা হয়।

স্ত্রীধন নিরূপণ

পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধ্যগ্নি হইতে আগত অর্থাৎ যৌতুকধন, অধিবেদনলব্ধ, মাতুল প্রভৃতি দ্বারা প্রদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় ধন—ইহাদিগকে স্ত্রীধন বলে। অন্বাধেয় ধন যথা—বিবাহের পর ভর্তৃকুল ও পিতৃমাতৃকুল হইতে এবং ভর্তা ও তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে স্ত্রীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয় সেই ধনকে অন্বাধেয় বলা হয়[৩৬]।

মনু ও কাত্যায়ন স্ত্রীধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা[৩৭]—অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক ও প্রণয়পূর্বক আত্মীয়েরা স্ত্রীলোককে যাহা দেন এবং ভ্রাতা, মাতা ও পিতা হইতে

---

(৩৬) বিবাহাৎ পরতো যত্তু লব্ধং ভর্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া।
অন্বাধেয়ং তদ্ভুক্তন্ত লব্ধং বন্ধুকুলাত্তথা॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ৯৩]

(৩৭) স্ত্রীধনমাহতু র্মনুকাত্যায়নৌ—
অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌ বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ৭২]

প্রাপ্ত—এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন কথিত হয়। বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে স্ত্রীলোককে যাহা দান করা হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে অধ্যগ্নি নামক স্ত্রীধন বলিয়াছেন। আর কন্যাকে যখন পিত্রালয় হইতে পতির গৃহে লইয়া যাওয়া হয় তখন ঐ কন্যা পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে অধ্যাবাহনিক নামক স্ত্রীধন বলা যায়[৩৮]। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিবার নিমিত্ত স্বামী প্রথম স্ত্রীকে যাহা পারিতোষিক দেন তাহার নাম আধিবেদনিক। আধিবেদন শব্দের অর্থ অধিক বিবাহ, তদুপলক্ষে যাহা দত্ত এই ব্যুৎপত্তিতে আধিবেদনিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে[৩৯]। আবার বৃত্তি অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনবিশিষ্ট ধন, অলঙ্কার শুল্ক ও সুদ—এই সকল স্ত্রীধন সেই স্ত্রীই স্বয়ং ভোগ করিবে, স্বামী আপৎভিন্ন কালে তাহা লইতে পারেন না। বিবাহসময়ে কন্যার উদ্দেশে অর্থাৎ এই ধন কন্যার—এই উদ্দেশ করিয়া বরের হস্তে যাহা কিছু দেওয়া হয় সে সমস্তই কন্যার ধন হইবে তাহা কেহ ভাগ করিয়া লইতে পারিবে না। কন্যার ইহা হউক—এইরূপ উদ্দেশ না থাকিলে স্ত্রীধন হইবে না। অতএব বিবাহকাল উপলক্ষমাত্র। যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে দান করিলেই গ্রহীতার স্বত্ব হইবে, স্বত্বের প্রতি দাতার অভিসন্ধিই কারণ। যেহেতু প্রমাণ আছে[৪০]—কন্যার স্বামীর হস্তে যাহা দেওয়া হয় তাহা সেই কন্যাকেই দেওয়া হইবে এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহাতে সেই স্ত্রীর কন্যাপুত্রাদির অধিকার হইবে। এই বচনে বিবাহকালের কোন উল্লেখ নাই এবং পতির হস্তে সমর্পিত ধন কন্যা পাইবে বলাতে কন্যার উদ্দেশেই দান বোধ হইয়া থাকে, এইজন্য উদ্দেশের কথা বলা হয় নাই।

---

(৩৮) বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যো দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ।
তদধ্যগ্নিকৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রী ধনং পরিকীর্তিতম্ ॥
যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা হি পৈতৃকাৎ।
অধ্যাবাহনিকং নাম তৎ স্ত্রীধনমুদাহৃতম্ ॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ৭২]

(৩৯) যচ্চ দ্বিতীয়স্ত্রীবিবাহার্থিনা পূর্বস্ত্রিয়ৈ পারিতোষিকং ধনং দত্তং তদাধিবেদনিকম্ অধিকস্ত্রীলাভার্থত্বাত্তস্য। [দায়ভাগ, পৃঃ ৭৫]

(৪০) তথাচ প্রামাণিকং বচনম্—
যদ্দত্তং দুহিতুঃ পত্যে স্ত্রিয়মেব তদর্পিতং।
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ তদপত্যমৃতে স্ত্রিয়াঃ ॥
বিবাহকাল ইতি ন বিশিনষ্টি। অভিসন্ধিস্তু দুহিতৃস্বত্বাভিপ্রায়াদেব লভ্যতে।
[দায়ভাগ, পৃঃ ৭৫]

কাত্যায়নের বচনে আছে[৪১]—স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম-কারয়া যাহা প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃমাতৃভর্তৃকুল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা পায়—এই দুইপ্রকার স্ত্রীধনে ভর্তার স্বামিত্ব হয়, অর্থাৎ স্বামী ইচ্ছা করিলে আপৎকাল ব্যতিরেকেও ঐ দুই স্ত্রীধন লইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীধন আপৎকাল ভিন্ন লইতে পারেন না। এই বচনে অন্যতঃ এই পদ থাকায় পিতৃ, মাতৃ ও ভর্তৃকুল ব্যতিরিক্ত অন্য লোকের নিকট প্রাপ্ত অথবা শিল্পকর্ম দ্বারা যে ধন উপার্জিত হয় সেই ধন ভর্তার প্রভুত্ব অর্থাৎ আপৎভিন্নকালেও ভর্তা উহা গ্রহণ করিতে পারেন। এইজন্য উক্ত দুই ধন স্ত্রীর স্বত্বযুক্ত হইলেও স্বামীর পারতন্ত্র্য প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে স্ত্রীধন পদবাচ্য হইতে পারে না, এই দুইটি ভিন্ন আর সমস্ত স্ত্রীধনেই স্ত্রীলোকের দান, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সেইরূপ কাত্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন[৪২]—বিবাহিতা হউক আর কুমারীই হউক, পতির গৃহে হউক বা পিতার বাটীতে হউক, ভর্তার নিকটেই হউক বা পিতামাতার নিকটেই হউক স্ত্রী যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে সৌদায়িক নামক স্ত্রীধন বলা যায়। সৌদায়িক ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। যেহেতু আত্মীয়েরা কৃপা বশতঃ জীবিকার্থ সেই ধন তাঁহাকে দিয়াছেন বলিয়া সেই সৌদায়িক ধন স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক সর্বত্র ইচ্ছানুসারে দান ও বিক্রয় করিতে স্ত্রীলোকের সর্বতোভাবে প্রভুত্ব আছে। সৌদায়িক শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে 'সুদায়' শব্দে যাহাদের সঙ্গে ধনাধিকার সম্বন্ধ ঘটে এমত আত্মীয় লোকদের নিকট হইতে স্ত্রীলোক যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা 'সৌদায়িক' পদবাচ্য। সৌদায়িকের মধ্যে কেবল ভর্তৃদত্ত স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর দান, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে অধিকার নাই। ভর্তা প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দান করেন তাহা স্বামীর মৃত্যুর পর সেই স্ত্রী আপন ইচ্ছানুসারে ভোগ করিবে। আর স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন স্বামীদত্ত অন্য ধন স্ত্রী দান করিতেও পারে। বচনে স্বামিদত্ত স্থাবর ভিন্ন বিশেষণহেতু ভর্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্য স্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীলোকে দান বিক্রয় করিতে পারে ইহা অবশ্য কর্তব্য, নতুবা

---

(৪১) তত্র কাত্যায়নঃ—প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ।
ভর্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥

অন্যতঃ পিতৃমাতৃভর্তৃকুলব্যতিরিক্তাদ্ যল্লব্ধং শিল্পেন বা যদর্জিতং তত্র ভর্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং তেন স্ত্রিয়া অপি ধনং ন স্ত্রীধনমস্বাতন্ত্র্যাৎ এতদ্দ্বয়াতিরিক্তধনে স্বত্বং স্ত্রিয়া এব দানাদ্যধিকারাৎ। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৪০]

(৪২) কাত্যায়নঃ—ঊঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেঽথবা।
ভর্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতম্॥
সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৪০]

সৌদায়িক স্থাবর ও অস্থাবর সর্বত্রই স্ত্রীলোকের দান বিক্রয়াধিকারের বচন বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

কিন্তু ভর্তা যদি দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সঙ্কটে পড়িয়া স্ত্রীধন ব্যয় না করিয়া অন্য কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ না হন তবে স্ত্রীধন লইতে পারেন, অন্যথা পারেন না। যথা যাজ্ঞবল্ক্যবচন[৪৩]—দুর্ভিক্ষসময়ে, অবশ্যধর্মকার্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে এবং উত্তমর্ণ ঋণ আদায় জন্য অবরুদ্ধ হইলে পর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া স্বামী যে স্ত্রীধন গ্রহণ করেন তাহা পুনর্বার স্ত্রীকে না দিলেও না দিতে পারেন। কিন্তু পূর্বোক্ত দুর্ঘটনা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে স্ত্রীধনে স্বামী হস্তপ্রদান করিতে পারেন না। যদি স্বামী আর একটি বিবাহ করিয়া ঐ প্রথমা স্ত্রীকে ভাল না বাসেন, তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত হইলেও স্ত্রীধন রাজা বলপূর্বক প্রথমা স্ত্রীকে দিতে বাধ্য করিবেন। আর উক্ত নিরুপায় স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে আপনার পতিযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন। স্বামী স্ত্রীধন লইয়া যদি অন্য স্ত্রীর সহিত পৃথগ্‌ভাবে বাস করেন এবং তাহাকে অবজ্ঞা করেন তাহা হইলে গৃহীত স্ত্রীধন রাজা বলপূর্বক প্রথমা স্ত্রীকে দেওয়াইবেন এবং ভর্তা যদি অন্নাচ্ছাদনাদি না দেন তবে তাহাও স্ত্রী রাজদ্বারে অভিযোগ করতঃ আদায় করিয়া লইবে।

স্ত্রীধনের বিভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে মনুবচনে আছে[৪৪]—জননী পরলোকগত হইলে সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং অদত্তা ভগিনীরা সকলে মিলিয়া মাতার অযৌতুক ধন সমানভাগ করিয়া লইবে। এই বচনে দ্বন্দ্বসমাস না থাকিলেও দ্বন্দ্বের সমানার্থক চ-কার দ্বারা ভ্রাতৃভগিনী উভয়ের মিলিতরূপে বিভাগ প্রতিপাদন করায় ভগিনাগণ ও সহোদর অর্থাৎ দত্তকাদি ভিন্ন ভ্রাতারা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইবে—

স্ত্রীধন বিভাগ

(৪৩) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—দুর্ভিক্ষে ধর্মকার্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্তা নাকামো দাতুমর্হতি॥ [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৪০]

(৪৪) তত্র মনুঃ—জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্ মাতৃকং রিক্থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ॥

দ্বন্দ্বাশ্রবণেঽপি তত্তুল্যার্থচকারেণ ভ্রাতৃভগিন্যোরিতরেতরযুক্তয়োঃ বিভাগপ্রতিপাদনাৎ ভগিন্যঃ সহোদরাশ্চ বিভজেরন্ ইত্যয়মেবাস্য বচনস্যার্থঃ।

বৃহস্পতিরপি চকারাৎ সমুচ্চয়মাহ—
স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়া তু ন লভেন্ মাতৃকং ধনম্॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ৭৯]

বচনের অর্থ করা কর্তব্য। বৃহস্পতিও চ-কার দ্বারা কন্যাপুত্রের মিলিত অধিকার হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন—যথা, স্ত্রীধনে তদীয় অপত্যগণের অধিকার এবং কন্যাও তাহার অংশভাগিনী হয়, অবিবাহিতা কন্যা যদি থাকে তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যার অধিকার হইবে না।

এই বচনগুলিতে চ-কার শ্রুতি থাকায় কন্যাপুত্রের যুগপৎ অধিকার যুক্তিযুক্ত ইহা বলিয়া যাঁহারা ঐ বচনে চ-কার শ্রুতি থাকিলেও কন্যাপুত্রের যুগপৎ অধিকার হইবে না বলেন, তাঁহাদিগের মত নিরাকরণের জন্য পুনরায় দেবলবচন উল্লেখ পূর্বক জীমূতবাহন বলেন[৪৫]—পুত্র ও কন্যার মাতৃধন সাধারণ হইবে অর্থাৎ উভয়েই এককালে ঐধনে অধিকারী হইবে, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ আছে। সুতরাং স্ত্রীধনে পুত্র ও কন্যার যুগপৎ অধিকারই সঙ্গত ; যাঁহারা তাহা না বলেন তাঁহাদিগের কথা অসঙ্গত—এইরূপ স্পষ্টতঃ উহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর অপ্রজঃ স্ত্রীধনে ভর্তা, মাতা, ভ্রাতা ও পিতার ক্রমে অধিকার হইবে, এই মত তাৎপর্যতঃ তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ জীমূতবাহন অপ্রজঃস্ত্রীধনপ্রকরণে সাধারণ স্ত্রীধনবিষয়ে অধিকারিক্রমনির্দেশক অন্য কোন বচনের উল্লেখ করেন নাই। কেবলমাত্র কন্যাধন, যৌতুক, পিতৃমাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় এই কয়েকটি ধনের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন[৪৬]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কন্যা ও পুত্রের একের অভাবে অন্যতরের অধিকার হইবে। এই সকল বিষয়ে জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মতের পার্থক্য নাই। তবে সাধারণ স্ত্রীধনে রঘুনন্দন দৌহিত্রের অধিকারের পরে মৃতা ধনস্বামিনীর পিণ্ডদানরূপ উপকার করে বলিয়া প্রপৌত্রের অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন[৪৭]। কিন্তু জীমূতবাহন ইহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে দৌহিত্রের অভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার অধিকার[৪৮]। কিন্তু রঘুনন্দন দায়ভাগের টীকাপ্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে

---

(৪৫) যথা দেবলবচনং—সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াম্।
অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা॥
ইহ পুত্রকন্যয়োঃ সাধারণং মাতৃধনমিতি সুব্যক্তম্। [দায়ভাগ, পৃঃ ৭৯]

(৪৬) হিন্দু-স্ত্রীধনাধিকার, পৃঃ ১৫২-১৫৩।

(৪৭) পুত্রেণ পরিণীতদুহিতুর্বাধাদ্বাধকপুত্রেণ বাধ্যদুহিতৃপুত্রবাধস্য ন্যায্যত্বাচ্চ তদভাবে প্রপৌত্রস্তদ্ভোগ্যপিণ্ডদাতৃত্বাৎ। [দায়ভাগ, পৃঃ ৩৪০]

(৪৮) উক্তানান্তু সর্বেষাং দৌহিত্রপর্যন্তানামভাবে বন্ধ্যাবিধবয়োরপি মাতৃধনাধিকারিতা, তয়োরপি তৎপ্রজাত্বাৎ প্রজাভাবে চাস্যেষামধিকারাৎ। [দায়ভাগ, পৃঃ ৮১]

কোন মত দেন নাই[৪৯]। তাঁহার মতে ধনাধিকারে পিণ্ডদানরূপ উপকারই হেতু। বন্ধ্যা ও বিধবাগণের সেইরূপ উপকারকতা নাই বলিয়া দৌহিত্রের পূর্বে ইহাদের অধিকার নাই। তবে এই টীকায় রঘুনন্দন দৌহিত্রের পর প্রপৌত্রের অধিকার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। কেবল দায়তত্ত্বে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। দায়ভাগের টীকাপ্রসঙ্গে শ্রীনাথও এই সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই[৫০]। আরও দেখা যায় রঘুনন্দন দায়তত্ত্বে লিখিয়াছেন[৫১]—দৌহিত্র পর্যন্ত অধিকারীর পরই সপত্নীপুত্র এবং সপত্নীপৌত্রের অধিকার হইবে। কিন্তু দায়ভাগে দৌহিত্রের পূর্বে সপত্নীপুত্রের অধিকার নির্দেশ করা হইয়াছে[৫২]। এই প্রকার অধিকারিক্রমে রঘুনন্দন সম্পূর্ণ দায়ভাগমত অনুসরণ না করিয়া কিছু কিছু স্বকীয় মতও প্রচার করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গদেশে বর্তমানে কেবলমাত্র জীমূতবাহনের দায়ভাগকৃত স্বকীয়মতই যে প্রচলিত আছে তাহা নহে, বর্তমানে দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মত, তাহার টীকাকার রঘুনন্দনের মত ও তৎকৃত দায়তত্ত্বোক্ত মত এবং টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মত—এই তিনজনের মতের মিশ্রণে যে অপূর্ব অভিনব মত দায়ভাগের মত বলিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে এবং যাহার অবলম্বনে বর্তমান আইন গঠিত হইয়াছে, তাহাকে একটি নূতন মিশ্রিত মত বলা চলে[৫৩]।

---

(৪৯) ন তু বন্ধ্যাবিধবয়োরিতি, ন চ সংস্বঙ্গজেষিতি বাক্যেন দৌহিত্রাৎ প্রাগেব তয়োরধিকারঃ সিধ্যতি অঙ্গজাধিকারেঽপ্যুপকারস্য হেতুত্বাৎ তয়োস্তূপকারকত্বাভাবাৎ।
[দায়ভাগের রঘুনন্দনকৃতটীকা, পৃঃ ১৪৬]

(৫০) দায়ভাগের শ্রীনাথকৃতটীকা, পৃঃ ১৪৬।

(৫১) দৌহিত্রপর্যন্তানন্তরমেব সপত্নীপুত্রতৎপুত্রয়োরধিকারঃ। [দায়তত্ত্ব, পৃঃ ৩৪১]

(৫২) ঔরসপুত্রকন্যয়োঃ সপত্নীপুত্রস্য চাভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারিতা। [দায়ভাগ, পৃঃ ৯৬]

(৫৩) হিন্দু-স্ত্রীধনাধিকার, পৃঃ ১০৯।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। সামাজিক বিধিনিষেধ পালন না করিলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্খলন বা পাপাচরণ মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম। রঘুনন্দন যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন[১]—বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান, নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়াদির অসংযম হেতু লোকে পতিত হয়। যে সব কর্মের দ্বারা মনুষ্যদিগের ঐহিক ও জন্মান্তরীণ পাপের ক্ষয় হয় তাহাকেই বলে প্রায়শ্চিত্ত। ঈদৃশ শুদ্ধিলাভের জন্য তপঃ প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠানও শাস্ত্রে বিহিত আছে। এইরূপ কর্মের দ্বারা সঞ্চিত পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়। এই সকল কর্মানুষ্ঠানে অনুষ্ঠানকারীর যে শুদ্ধি হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ক্ষারের সংযোগ, অগ্নির উত্তাপ, সজোরে আঘাত ও প্রক্ষালন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বস্ত্র সকল শুদ্ধ বা মলমুক্ত হয়, সেইরূপ তপস্যা, দান এবং যজ্ঞ দ্বারা পাপকারীরা শুদ্ধিলাভ করে। এইজন্য রঘুনন্দন সিদ্ধান্ত করেন—যাহা কেবলমাত্র পাপেরই ক্ষয়সাধক, এতাদৃশ বিধিবোধিত কর্মের নাম প্রায়শ্চিত্ত[২]। এখানে কেবলমাত্র পাপনাশক কর্মের নামই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তিকামনায় কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আবার পাপক্ষয়কামনা ও স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা—এই উভয় কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত সংজ্ঞা হইবে না। কিন্তু গোবিন্দানন্দ প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে[৩] অশ্বমেধযজ্ঞ যদি কেবল ব্রহ্মহত্যা পাপ অপনোদন করিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাও প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আবার গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কর্ম পাপক্ষয়মাত্র সাধন করিতে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাও প্রায়শ্চিত্তরূপে গণ্য হয়।

প্রায়শ্চিত্তের সংজ্ঞা

---

(১) যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।

অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৭২]

(২) তেন পাপক্ষয়মাত্রসাধনত্বেন বিধিবোধিতং কর্ম প্রায়শ্চিত্তম্। [ঐ, পৃঃ ১৬৮]

(৩) যদা তু ব্রহ্মহত্যাপাপাপনোদনায়াশ্বমেধঃ ক্রিয়তে তদা সোঽপি প্রায়শ্চিত্তমেবেতি। এবং গঙ্গাস্নানাদেরপি কদাচিৎ স্বর্গজনকত্বেঽপি কদাচিৎ পাপক্ষয়মাত্রসাধনতয়া প্রায়শ্চিত্তত্বমস্তীতি।

[প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকা, পৃঃ ২]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শূলপাণিই সর্বপ্রথমে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। রঘুনন্দন শূলপাণির মতানুসারেই প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ দিয়াছেন। ভবদেবভট্ট এই সম্বন্ধে কেবল একটি বচন উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই[৪]।

রঘুনন্দন বলেন পাপের দুইটি শক্তি—নরকজনিকা ও ব্যবহারবিরোধিকা[৫], অর্থাৎ পাপ করিলে নরকপ্রাপ্তি হয় ও সমাজে পাপীর সহিত কেহ মেলামেশা করে না, সে সমাজে অব্যবহার্য হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরকজনিকা শক্তির নাশ হইলেও কোথায়ও কোথায়ও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়ে মিতাক্ষরাধৃত আপস্তম্ববচন প্রমাণ যথা[৬]—পাপকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ইহলোকে ব্যবহার্যতা থাকে না, কিন্তু পাপ নাশ হয়। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য পাপেও অব্যবহার্যতার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে[৭]—শরণাগত, শিশু ও নারী হত্যাকারী, সঙ্কল্পপূর্বক গৃহীত ব্রতভঙ্গকারী এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কদাপি ইহাদের সহিত বাস করিবে না।

পাপের শক্তিনিরূপণ

পূর্বোক্ত বচন সম্বন্ধে রঘুনন্দনের মত এই যে—শাস্ত্রে ইচ্ছাপূর্বক মহাপাতক প্রভৃতি গুরুতর পাপকারীর অব্যবহার্যতা নির্দেশ হেতু জ্ঞানপূর্বক বহুতর গুণযুক্ত শরণাগত প্রভৃতির হিংসাকারীদিগেরও অব্যবহার্যতা নিরূপিত হইতেছে। কিন্তু হীনতরের হন্তাদিগের অব্যবহার্যতা হইবে না। পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ এবং রঘুনন্দন সকলেই দেখাইয়াছেন যে জ্ঞানকৃত পাপেই গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়, কিন্তু অজ্ঞানকৃত পাপে লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

---

(৪) প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিয়ম উচ্যতে।
তপো নিয়মমাত্রেণ প্রায়শ্চিত্তং প্রচক্ষতে॥ [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৮]

(৫) পাপস্য দ্বে শক্তী নরকোৎপাদিকা ব্যবহারবিরোধিকা চেতি। তত্রৈকতরশক্তিবিনাশে ব্যবহারবিরোধিকা শক্তিরস্তীতি ভাবঃ। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৪]

(৬) তথাচ মিতাক্ষরায়ামাপস্তম্বঃ—
নাস্যাস্মিন্ লোকে প্রত্যাপত্তির্বিদ্যতে কল্মষন্তু নিহন্যতে। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৪]

(৭) অতএব পাপান্তরেঽপ্যব্যবহার্যত্বং যাজ্ঞবল্ক্যোক্তম্—
যথা—শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্ন তু।
চীর্ণব্রতানপি যদা কৃতঘ্নসহিতানিমান্॥

অত্র চ কামতো মহাপাতকাদিবৃহৎপাপকর্তুরব্যবহার্যত্বদর্শনাৎ কামতো বহুগুণযুক্তশরণাগতাদিহন্তৄণামব্যবহার্যত্বং ন তু হীনতরহন্তৄণাম্, অন্যথা বিষমশিষ্টতাপত্তিঃ স্যাৎ। [ঐ, পৃঃ ১৯৪]

শূলপাণি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের উপর নির্ভর করিয়া বলেন[৮]—অজ্ঞানকৃত পাপই শুধু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপগত হয়। কিন্তু পাপ জ্ঞানকৃত হইলে উহা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপসৃত হয় না, তবে পাপী সমাজে ব্যবহার্য হয়। বচনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায়। কারণ অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অর্দ্ধপাপ ক্ষয় হয় বলিয়া সেই ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ, স্পর্শন, দর্শন প্রভৃতি লঘুব্যবহারে দোষ হয় না। কিন্তু পাপীর সহিত ভোজন, পরিণয় সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রধান সামাজিক ব্যবহার অবশ্যই নিষিদ্ধ। কারণ কুনখী, দুশ্চর্মা প্রভৃতি মহাব্যাধি সূচিত মহাপাপের শেষ অবস্থিত থাকিলেও সমাজে তাহার ব্যবহার্যতা দেখা যায়।

কিন্তু শূলপাণির মতে পূর্ববর্তী যাজ্ঞবল্ক্যমতের ব্যাখ্যায় জ্ঞানকৃত পাপে অজ্ঞানকৃত প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয় না বলিয়া তাহাতে কোন লোকেরই প্রবৃত্তি হয় না। অতএব এই মত দোষদুষ্ট। তাহা নিরসনের জন্য শূলপাণি স্বকীয় মত স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া বচনে 'ব্যবহার্য' শব্দটির পরিবর্তে 'অব্যবহার্য' পাঠ ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন—অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূরীভূত হইবে। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের ফলে অপগত হইলেও যিনি পাপ কর্মটি করিয়াছেন, তিনি সমাজে অব্যবহার্য হইবেন। ইহাই শূলপাণির সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ভবদেবের মতে[৯] অজ্ঞানকৃত পাপই নহে, জ্ঞানকৃত পাপও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূরীভূত হয় এবং সমাজে প্রায়শ্চিত্তকারীর ব্যবহার্যতা থাকে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে যে 'অব্যবহার্য' শব্দ আছে তাহা পাপকামনায় পাপপ্রবৃত্তির নিন্দার্থেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় ভবদেবের মতে জ্ঞানকৃত পাপে লিপ্ত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ দূর হয় এবং সমাজে তাহার ব্যবহার্যতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শূলপাণি ও রঘুনন্দন জ্ঞানকৃত পাপী ব্যক্তির ব্যবহার্যতা সমাজে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন যে সময়ে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া শাস্ত্র আলোচনায় মনোনিবেশ

---

(৮) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥"

কামত ইত্যজ্ঞানকৃতপ্রায়শ্চিত্তেন জ্ঞানকৃতপাপাপগমো ন ভবতি কিন্তু ব্যবহার্যতামাত্রম্।……… অথবা অকারপ্রশ্লেষাৎ যথোক্তপ্রায়শ্চিত্তেন কামতোঽপি পাপক্ষয়ো ভবত্যেব কিন্ত্বব্যবহার্যঃ পাপাভাবেঽপি বচনাৎ। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ১৯]

(৯) কামতোঽব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥…………

যত্তু 'কামতোঽব্যবহার্যস্তু………' ইত্যানেন জ্ঞানকৃতপাপস্য প্রায়শ্চিত্তেনাপ্যনপগম ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তং তৎকামনয়া পাপপ্রবৃত্তিনিন্দার্থমেবেতি। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ১০]

করেন, তখন বঙ্গদেশের অত্যন্ত দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। দেশীয় বেদবিরুদ্ধ ধর্মের প্রচার ও যবনদের ধর্মের ব্যাপক প্রসারে বঙ্গদেশ তখন উপদ্রুত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত ধর্মের বিস্তৃতিতে অত্যাচারিত বঙ্গদেশের সমাজে ব্যভিচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ স্ত্রীপুরুষ অবাধে মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজে শাস্ত্রীয় বন্ধনও শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য রঘুনন্দন কঠোর হস্তে এই সব ব্যভিচার ও উচ্চ-নীচ-বর্ণের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অবাধ আহার-বিহার, মেলা-মেশা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, অন্ত্যজ পুরুষগামিনী স্ত্রীর ও অন্ত্যজ স্ত্রীগামী পুরুষের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। এই বিষয়ে অঙ্গিরা বলিয়াছেন[১০]—পতিত স্ত্রীসেবায় পুরুষগণের যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, পতিত পুরুষগামিনী মূঢ়া স্ত্রীরও সেই প্রায়শ্চিত্ত করাইবে। এই পাপ জ্ঞানকৃত হইলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া দ্বিগুণ ব্রতাচরণ করিলেও ঐ স্ত্রী সমাজে ব্যবহার্য হইবে না। কারণ যাহা অজ্ঞানকৃত পাপ, তাহা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর হয় এবং প্রায়শ্চিত্তকারী সমাজে ব্যবহার্যও হয়। কিন্তু জ্ঞানকৃত হইলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ যায় বটে, কিন্তু পাপীর ব্যবহার্যতা হয় না। এই আলোচনায় রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে, কোন উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোক যদি ইচ্ছাপূর্বক অন্ত্যজ পুরুষ সংসর্গে যায়, তবে সমাজে তাহার আর স্থান হইবে না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পাপক্ষালন হইতে পারে, তবুও সমাজে তাহার আর ব্যবহার্যতা থাকিবে না। কিন্তু আবার এই পাপের অনুষ্ঠান অজ্ঞানকৃত হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই তাহার শুদ্ধি ঘটে এবং সমাজে সে গ্রহণীয় হয়।

জ্ঞানকৃত পাপে ব্যবহার্যতা নিষিদ্ধ

রঘুনন্দন আরও বলেন—যে স্ত্রী হীনবর্ণ কর্তৃক উপভুক্ত হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে অথবা বধ করিতে হইবে। আবার প্রমাণ আছে অজ্ঞানপূর্বক ব্রাহ্মণ-জাতীয়া স্ত্রী হত্যা করিয়া বৈশ্যবৎ ব্রত পালন করিতে হইবে। আর জ্ঞানপূর্বক করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত আছে। কিন্তু হীনবর্ণোপভুক্তা দুষ্টা স্ত্রীবধে কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই।

কিন্তু মিতাক্ষরাতে বলা আছে যে[১১]—যদিও দুষ্টা স্ত্রীবধে অল্প প্রায়শ্চিত্ত,

(১০) ব্রতং যচ্চোদিতং পুংসাং পতিতস্ত্রীনিষেবণাৎ
তচ্চাপি কারয়েৎ মূঢ়াং পতিতাসেবনাৎ স্ত্রিয়ম্ ॥
জ্ঞানে তু তৎতুল্যতয়া দ্বিগুণব্রতাচরণেঽপি ন ব্যবহার্যঃ। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৪]

(১১) তত্র প্রায়শ্চিত্তবিধায়কবচনবলাদিহ লোকে ব্যবহার্যো জায়তে।........
তত্রেতরশক্ত্যাবিনাশেঽপি ব্যবহারনিরোধিকায়াঃ শক্তের্বিনাশো নানুপপন্নস্তস্মাৎ পাপানপগমেঽপি ব্যবহার্যত্বং নানুপপন্নম্। [মিতাক্ষরা, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯]

তথাপি সমাজে সেই স্ত্রীর ব্যবহার্যতা বিদ্যমান। বচনে যে ব্যবহারপ্রতিষেধ বিধান আছে তাহা বাচনিক। রঘুনন্দন মিতাক্ষরার এই মতকে যুক্তিগ্রাহ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১২]। মিতাক্ষরামতে প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরকজনিকা শক্তি ও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তি দুইয়েরই নাশ হয়। তবে ব্যবহারবিরোধিকা শক্তির প্রতি যেসব প্রমাণমূলক বচন পাওয়া যায় তাহাকে তিনি বাচনিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আবার ভবদেবভট্টও হীনবর্ণোপভুক্তা স্ত্রীর ব্যবহার্যতা স্বীকার করেন।

এখানে আলোচ্য যে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এবং ভবদেবভট্টের সময়ে সমাজে শাস্ত্রীয় বিধান অত্যধিক কঠোরতাপূর্ণ ছিল না। কারণ তখন বেদবিরুদ্ধ ধর্মগুলির ব্যাপক প্রসার ও বৈদেশিক আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু রঘুনন্দনের সময়ে সমাজে তান্ত্রিকতার নামে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা চলিতেছিল এবং মুসলমানদের অত্যাচারে সামাজিক কাঠামোও দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে এই সমস্ত হীনবর্ণোপভোগী স্ত্রী ও পুরুষের সংস্পর্শে ও সাহচর্যে অপর ব্যক্তিগণও প্রভাবিত হইয়া সেই পথে চলিতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই যদি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক হীনকর্মে লিপ্ত স্ত্রীপুরুষকে সাদরে গ্রহণ করে তাহা হইলে সমগ্র সমাজই হয়ত তাহাদের অনুসরণ করিবে। সুতরাং সমাজ তাহাকে যদি পূর্বমর্যাদা না দেয় এবং তাহার সহিত কেহ মেলা-মেশা, আচার-বিচার ইত্যাদি না করে, তবে তখন তাহার পক্ষে সমাজে বাস করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজের এই কঠোর শাস্তির ভয়েই লোকে আর ঐরূপ দুষ্কর্ম করিতে প্রয়াসী হইবে না—এই অভিপ্রায় লইয়াই রঘুনন্দন এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের সমাজে অব্যবহার্যতার বিধান দিয়াছেন। অবশ্য শূলপাণিও এই মতই দিয়াছেন। আর রঘুনন্দন সমাজরক্ষার প্রয়োজনে এই কঠোর ব্যবস্থাতে আরও বেশী জোর দিয়াছেন।

এই অব্যবহার্যতার কারণ

এইজন্য রঘুনন্দন বৃহস্পতির বচন উল্লেখপূর্বক বলেন—কেবলমাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া বিচার কর্তব্য নহে, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ বলিয়াছেন গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং অল্পপাপে অল্প প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। এইরূপ হীনবর্ণোপভুক্তার একান্ত পাতিত্যবশতঃ পরিত্যাগ বিধানহেতু জ্ঞানপূর্বক তথাবিধ স্ত্রীভোক্তা পতিরও গুরুপাপ সংসর্গহেতু সদ্যই পাতিত্য হইবে।

রঘুনন্দন জ্ঞানকৃত পাপে কঠোরতা প্রদর্শন করিলেও দেশের সামাজিক

(১২) যদ্যপি ব্যভিচারিস্ত্রীবধে অল্পীয় এব প্রায়শ্চিত্তং তথাপি বাচনিকোঽয়ং ব্যবহারপ্রতিষেধ ইতি মিতাক্ষরোক্তং ন যুক্তিসহম্। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৪]

অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়া উদারতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বলপূর্বক কাহাকেও পাপে প্রবৃত্ত করিলে সেই পাপীর অল্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া সমাজে তাহাকে গ্রহণের নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। দেবলবচনে আছে[১৩]—যে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডালাদি দস্যুগণ কর্তৃক দাসরূপে পরিণত হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা ঐ সকল দস্যুগণ বলপ্রয়োগপূর্বক গবাদি পশুর প্রাণহিংসারূপ অশুভ কর্ম করাইয়াছে, যাহাদিগকে উহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জন এবং ঐ উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করাইয়াছে, গর্দভ, উষ্ট্র, বিষ্ঠাভোগী শূকরের মাংস এবং নিষিদ্ধ আমিষ ভক্ষণ করাইয়াছে, আর যাহাদিগকে ঐ সকল ম্লেচ্ছজাতির স্ত্রীদিগের সহিত সহবাস এবং তাহাদিগের সহিত একত্র ভোজনও করাইয়াছে—যে কোন কারণেই হউক ঐ ব্রাহ্মণের সহবাস যদি উক্তপ্রকার চাণ্ডালাদির সহিত একমাস ব্যাপী হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাজাপত্যরূপ প্রায়শ্চিত্তই তাহাদিগের শুদ্ধি সম্পাদন করিবে এবং তাদৃশ সহবাস এক বৎসর ব্যাপী হইয়া থাকিলে তিনি চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবেন। এখানে পুংলিঙ্গ অবিবক্ষিত ধরিয়া স্ত্রীলিঙ্গও গ্রহণীয়।

রঘুনন্দনের উদারতা

রঘুনন্দন এই দেবলবচন দ্বারা দেখাইয়াছেন যে তখনকার সমাজে যবন বা অন্যান্য দস্যুগণ কর্তৃক কোন স্ত্রী বা পুরুষ বলপূর্বক ধৃত হইয়া যদি দাসত্বে পরিণত হয় অথবা তাহারা ঐ যবন বা দস্যুগণের স্ত্রী বা পুরুষ কর্তৃক উপভুক্ত হয়, তাহা হইলেও তাহারা স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই সমাজে গ্রহণীয় হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তখনকার সমাজের দুর্বলতার সুযোগে যে অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা চলিতেছিল তাহার ফলে জনগণের অনেকে বিরুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ হিন্দুনারীগণকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া স্বগৃহে রাখিয়াছিল, তাহারা যাহাতে পরিত্যক্ত না হয় সেই জন্যই

বলপূর্বক অপহৃতা স্ত্রীদের অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি

---

(১৩) দেবলঃ—দাসীকৃতো বলান্ ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অশুভং কারিতং কর্ম গবাদেঃ প্রাণহিংসনম্ ॥
উচ্ছিষ্টমার্জনঞ্চৈব তথা তস্যৈব ভক্ষণম্।
খরোষ্ট্রবিড়্‌বরাহাণামামিষস্য চ ভক্ষণম্ ॥
তৎস্ত্রীণাঞ্চ তথা সঙ্গস্তাভিশ্চ সহ ভোজনম্।
মাসোষিতে দ্বিজাতৌ চ প্রাজাপত্যং বিশোধনম্ ॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৬]

এই সব লঘু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজে ব্যবহার্য বলিয়া রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণ অনুরূপ বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই।

প্রাচীন হিন্দুযুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও পরিণয়সম্বন্ধ বিষয়ে কঠোরতা বর্তমানযুগের মত এত বেশী ছিল না। সমান জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি থাকিলেও উচ্চবর্ণের পাত্রের সহিত নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহও শাস্ত্র-অনুমোদিত ছিল। কারণ আমরা দেখি জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগ

বিভিন্ন বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণ

গ্রন্থে[১৪] অনুলোমপরিণীত [১৫] স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের ধনবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার মনুর বচন উত্থাপন করিয়া তিনি সবর্ণা স্ত্রী ও অনুলোম স্ত্রী গ্রহণের বিষয়ও বলিয়াছেন। যেমন—দ্বিজাতিগণের মধ্যে প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। কামাধীন হইয়া পুনর্বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বর্ণক্রমে স্ত্রীই পর পর শ্রেষ্ঠ। শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে এবং ব্রাহ্মণ চারবর্ণ হইতেই ভার্যা সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু জীমূতবাহন পরে বলিয়াছেন—অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। অর্থাৎ পুরুষ বর্ণক্রমে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিলেও স্ত্রী কখনই নীচ জাতি হইতে পতি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

জীমূতবাহন এই প্রকার ব্যবস্থা দিলেও ক্রমশঃ দ্বিজাতির শূদ্রকন্যা বিবাহ নিন্দনীয় হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যই জীমূতবাহন মনুবচনের 'কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্'

কালভেদে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

এই অংশের ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে কামাধীন হইয়া এই বিবাহ করিলে বিবাহকারী অল্পদোষের ভাগী হইবে, একেবারে যে দোষের অভাব তাহা বুঝাইতেছে না[১৬]। তিনি আবার শঙ্খলিখিতের বচন উল্লেখপূর্বক বলেন যে সজাতীয়া ভার্যাই

(১৪) অস্তি চ সবর্ণানুলোমস্ত্রীপরিণয়নম্। তথাচ মনুঃ—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতেঃ।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

........প্রতিলোমপরিণয়নং সর্বথৈব ন কার্যমিত্যর্থঃ। [দায়ভাগ, পৃঃ ১৩৪]

(১৫) এখানে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণা স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। আর নিম্নবর্ণ পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণা স্ত্রীর বিবাহ হইলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে।

(১৬) কামতস্তু প্রবৃত্তানামিতি দোষাল্পত্বখ্যাপনার্থং ন তু দোষাভাব এব। [দায়ভাগ, পৃঃ ১৩৪]

শ্রেয়সী হয় এবং ইহাই পূর্বকল্প[১৭]। অপরজাতীয়া ভার্যা গ্রহণ অনুকল্প, দায়ভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার বলিয়াছেন যে[১৮]—এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিজাতীয় বিবাহ অনুকল্প হওয়ায় মুখ্যকল্প সবর্ণা স্ত্রীলাভসম্ভবে অনুকল্প অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীগ্রহণ করিলে প্রত্যবায় হয় ইহা সূচিত হইয়াছে।

দ্বিজাতির অনুলোম বিবাহ স্বীকৃত হইলেও জীমূতবাহন দ্বিজাতির শূদ্রা কন্যা বিবাহে দোষ প্রদর্শনে মনু ও বিষ্ণুর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহাতে আছে যে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করেন, তবে তাঁহারা পতিত হন। সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্রথমে বিবাহ করতঃ তাহাতে উপগত হইলে ব্রাহ্মণ নরকে গমন করেন এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য লোপ হয়[১৯]। ইহার পর জীমূতবাহন হারীতবচন উত্থাপন করিয়া শূদ্রা কন্যা পরিত্যাগপূর্বক অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহের নির্দেশ দিয়াছেন[২০]।

কিন্তু পরে জীমূতবাহন বলেন[২১]—শূদ্রা কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া সেই শূদ্রা কন্যাতে সন্তান উৎপাদন করিলে অত্যন্ত বেশী দোষ হইবে না। ইহাতে স্বল্পদোষ এবং প্রায়শ্চিত্তও অল্প। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে জীমূতবাহনের মতে শূদ্রা কন্যাকে বিবাহ করা বেশী দোষাবহ। কিন্তু ব্যভিচারে তত বেশী দোষ হয় না।

আবার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার এই বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে[২২]—শূদ্রা স্ত্রী পরিণয় ও তাহাতে অপত্য উৎপাদন—এই উভয় ব্যাপারই দোষাবহ। কিন্তু শূদ্রা কন্যাকে ব্রাহ্মণের স্বয়ং বিবাহ করা দোষ হইলেও অন্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিণীতা

---

(১৭) তদাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ—ভার্যাঃ কার্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেয়স্যঃ সর্বেষাং স্যুরিতি পূর্বঃ কল্পঃ ততোঽনুকল্পঃ। [ঐ, পৃঃ ১৩৪]

(১৮) অত্রানুকল্পত্বকথনেন সবর্ণাপরিণয়নসম্ভবে তথাচরণস্যাবৈধত্বেন তদভিগমে প্রত্যবায়ঃ প্রতিপাদিত ইতি বোধ্যম্। [দায়ভাগের শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃতটীকা, পৃঃ ১৩৫]

(১৯) আনুলোম্যেঽপি দ্বিজাতেঃ শূদ্রায়াং বহুদোষমাহতুর্মনুবিষ্ণু—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্। [দায়ভাগ, পৃঃ ১৩৫]

(২০) অতএব শূদ্রাবর্জং দ্বিজাতিভার্যামাহ শঙ্খঃ। [দায়ভাগ, পৃঃ ১৩৬]

(২১) অতঃ স্বয়মনূঢায়াং শূদ্রায়ামপত্যজননে নৈতে দোষাঃ, কিন্তু স্বল্পদোষঃ প্রায়শ্চিত্তঞ্চাল্পমিতি বক্ষ্যতি। [ঐ, পৃঃ ১৩৬]

(২২) স্বয়মনূঢায়ামিতি। অন্যেনোঢায়ামিত্যর্থঃ, তেন তদপরিণীতশূদ্রাসুতাভিপ্রায়মিতি ন বিরোধঃ। [দায়ভাগটীকা, পৃঃ ১৩৬]

স্ত্রীতে সন্তান উৎপন্ন করিলে অল্প দোষ হয়। সুতরাং তাঁহার মতেও শূদ্রা কন্যাকে বিবাহ করা অপেক্ষা ব্যভিচার করা বরং অল্প দোষের বিষয় হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীমূতবাহন ধনবিভাগের সময় শূদ্রাপুত্রকেও ধনের একভাগ দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। জীমূতবাহনের এই সব ব্যবস্থা দেখিয়া প্রতীতি হয় যে তাঁহার সময়ে সমাজে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্যবর্ণের স্ত্রীগ্রহণ করার রীতি শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল। এই বিবাহের বৈধত্বও সমাজে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু জীমূতবাহনের সময়ে শূদ্রা কন্যা বিবাহের প্রচলন অনেক কমিয়া যাওয়ায় এই বিবাহ দ্বিজাতির পক্ষে দুষ্ট বলিয়া জীমূতবাহন উল্লেখ করিলেও তখন ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। এইজন্য তিনি ইহার বিরুদ্ধ বচনগুলি উত্থাপন করিলেও শূদ্রা স্ত্রীতে জাতপুত্রের ধনাধিকার স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্বযুগে এই প্রথা বিশেষভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় ভবদেবভট্টের বিবরণে। ভবদেবভট্ট তাঁহার শবসূতকাশৌচপ্রকরণে উল্লেখ করেন যে[২৩] ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যাতে জাত পুত্রদের মৃত্যুতে যথাক্রমে ছয় রাত্রি, তিনরাত্রি ও এক রাত্রি অশৌচভোগ করিতে হইবে। সপিণ্ডদেরও এইরূপ অশৌচ হইবে। আবার সেই পুত্রগণ যদি পিতৃগৃহে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে পিতার সাত, পাঁচ ও তিন রাত্রি অশৌচ হইবে। ভবদেবের এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে পূর্বে সমাজে অনুলোম বিবাহ বিশেষ প্রচলিত ছিল ও সমাজে তাহা স্বীকৃতও ছিল। কিন্তু ভবদেব প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে নিন্দিত বিবাহের তালিকায় ব্রাহ্মণজাতির শূদ্রাকন্যাবিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই[২৪]।

এই প্রকার বিবাহ যে সমাজে সম্যক্ প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আরও পাওয়া যায় জীমূতবাহন কর্তৃক উল্লিখিত বচনগুলি দ্বারা। তবে এই শূদ্রা স্ত্রী ব্রাহ্মণের ধর্মকার্যের সঙ্গিনী হইতে পারিবে না। কারণ মনুবচনে আছে—যদি দ্বিজগণ সবর্ণা বা অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করেন, তবে সেই সবর্ণা ও

---

(২৩) 'ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রেষু সপিণ্ডেষু ষড্রাত্রত্রিরাত্রৈকরাত্রৈঃ' ইতি। অত্র বিশেষানভিধানাৎ পিতুরপ্যেতদেব। তথা চাঙ্গিরাঃ—দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো জন্মহানৌ স্বযোনিষু।
ষড্ভিস্ত্রিভিরথৈকেন ক্ষত্রবিট্শূদ্রযোনিষু ॥
[শবসূতকাশৌচপ্রকরণ; পৃঃ ১৮]

(২৪) প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ১১৭।

অসবর্ণা স্ত্রীদিগের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে সম্মান ও আবাসগৃহ দিবেন। বিবাহানুসারে বা বয়ঃক্রম অনুসারে জ্যেষ্ঠত্ব ধর্তব্য হইবে না। বিবাহানুসারে কনিষ্ঠা হইলেও সবর্ণা পত্নীই জ্যেষ্ঠা বলিয়া গণনীয়া হইবে, যেহেতু সেই সজাতীয়ারই যজ্ঞাদিতে অধিকারপ্রযুক্ত পত্নীত্ব হইবে। মনুবচনে আরও আছে—স্বামীর দেহশুশ্রূষা এবং নিত্য ধর্মানুষ্ঠেয় কার্যসমূহ তাঁহার সজাতীয়া স্ত্রীই করিবে, কদাপি ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী তাহা করিবে না[২৫]।

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে শূদ্রা কন্যাকে ব্রাহ্মণ যদিও বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু সহধর্মিণীর মর্যাদা শূদ্রা স্ত্রী কখনই পাইবে না। এইজন্যই জীমূতবাহন নারদ বচন উল্লেখপূর্বক দেখাইয়াছেন যে, এই শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী পরিণীতা হইলেও পত্নীর পর্যায়ে উঠিবে না[২৬]। অর্থাৎ 'পত্যু র্নো যজ্ঞসংযোগে' এই সূত্র দ্বারা যজ্ঞকার্যে সহকারিণী হইলেই পত্নীবাচ্য হয়। কিন্তু শূদ্রা কন্যা স্ত্রী হইলেও পত্নী নহে—ইহাই জীমূতবাহনের অভিপ্রায়। তবে শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও তাহার অপত্নীত্ব কথনহেতু তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে বা স্বামী সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলে ঐ শূদ্রা স্ত্রী যদি স্বধর্মে থাকে, তবেউহার মৃত্যুপর্যন্ত ভরণপোষণ করা হইবে। অতএব এই শূদ্রা স্ত্রীর ভরণপোষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই এবং শূদ্রা স্ত্রীর বিবাহ সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ এই বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কারণ আমরা দেখি পরবর্তী নিবন্ধকার শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি যদিও এই কামকৃত বিবাহ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এই বিবাহে যে গার্হস্থ্য ধর্ম পালিত হয় না, কিন্তু কামনা চরিতার্থ হয় তাহা লিখিয়াছেন। এইজন্য শঙ্খলিখিত এইরূপ বিবাহকে অনুকল্প বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আর সজাতীয়া কন্যাকে বিবাহের নাম পূর্বকল্প বলিয়াছেন[২৭]।

---

(২৫) অতঃ পরিণয়নকনিষ্ঠাপি সবর্ণা জ্যেষ্ঠৈব তস্যা এব যজ্ঞাদিষু ব্যাপারাধিকারাৎ পত্নীত্বম্। তথাচ মনুঃ—ভর্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্মকার্যঞ্চ নৈত্যিকম্।

স্বা স্বৈব কুর্যাৎ সর্বেষাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন ॥ [দায়ভাগ, পৃঃ ১৬৭]

(২৬) অতঃ পরিণীতস্ত্রীণামপ্যপত্নীত্বাৎ তদভিপ্রায়কমেব নারদবচনম্। [ঐ, পৃঃ ১৬৮]

(২৭) কামতস্তু প্রবৃত্তানামিত্যাদি, এতেন সোঽপি বিবাহো ভবতি কিন্তু তত্র গার্হস্থ্যধর্মো ন প্রবর্তকঃ, কিন্তু কাম এব, অতএব শঙ্খলিখিতাভ্যাং তদ্বিবাহানামনুকল্পত্বম্।......

বিবাহত্বে সিদ্ধ এব কামস্য হেতুতা কথ্যতে তথাপি পুংসঃ কামোঽস্তি স চ বিবাহমন্তরেণ কন্যায়াং পরস্ত্রিয়াং বা উপজায়মানঃ প্রত্যবায়জনক ইতি তদভাবে বিবাহো ভবতীতি কামস্য বিবাহহেতুত্বাৎ তদ্বিবাহস্য ন ধর্ম্যত্বং ন তু বিবাহত্বাভাবঃ, অন্যথা তদুৎপন্নপুত্রাণামপরিণীতাপুত্রত্বেনাবিভাগার্হত্বাপত্তেঃ।

[দায়ভাগের শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকৃতটীকা, পৃঃ ২২৬]

র। বিবাহানু-
নুসারে কনিষ্ঠা
় সজাতীয়ারই
আছে—স্বামীর
করিবে, কদাপি

বিবাহ করিতে
না। এইজন্যই
শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী
রসংযোগে' এই
শূদ্রা কন্যা স্ত্রী
াহিতা হইলেও
সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ
ণ করা হইবে।
ই এবং শূদ্রা
বিবাহ সমাজে
কার শ্রীনাথা-
পি এই বিবাহে
লিখিয়াছেন।
করিয়াছেন,

ংকারাং পত্নীত্বম্।

ঃ ১৬৮]
ত্র গার্হস্থ্যধর্মো ন

মেন্তরেণ কন্যায়াং
স্থে বিবাহহেতুত্বাৎ
বভাগার্হত্বাপত্তেঃ।
তটীকা, পৃঃ ২২৬]

... বিবাহ অনুকল্প বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাদের বৈধত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তবে এই প্রবৃত্তি যে ধর্মীয় বিষয় নহে তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং সকলের পক্ষেই সবর্ণা ভার্যা শ্রেষ্ঠ এবং অসবর্ণা ভার্যা প্রশস্ত নহে বলিয়া শ্রীনাথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন[২৮]। কিন্তু শূলপাণি অনুলোমবিবাহ স্বীকার করেন।

শূলপাণি ব্রাহ্মণের বর্ণচতুষ্টয় হইতে ভার্যাগ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে শূদ্রা কন্যা বিবাহও শাস্ত্রসিদ্ধ। তবে মনুবচনে যে পাওয়া যায়—শূদ্রাকে বিবাহ করিলে দ্বিজাতি পতিত হয়, আর শৌনকের মতে তাহাতে সুতোৎপাদন করিলেও ব্রাহ্মণাদি জাতি পতিত হয়। কারণ পুত্রোৎপাদন করিলেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়। আবার শঙ্খের মতে আপৎকালেও দ্বিজগণ শূদ্রা ভার্যা গ্রহণ করিবে না। সুতরাং সর্বপ্রকারে শূদ্রা ভার্যাকে ত্যাগ করিবে। শূলপাণি এই সমস্ত উক্তিগুলিকে দ্বিজাতির ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা—এই ক্রম অনুসারে বিবাহ না হইলেই শূদ্রা ভার্যা পরিত্যাগবিষয়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[২৯]। তাঁহার মতে শূদ্রাকন্যাকে বিবাহ করিলে এবং বিবাহিতা শূদ্রা ভার্যাতে অপত্য উৎপাদন করিলে দোষ হয় না।

কিন্তু গোবিন্দানন্দ দ্বিজাতির শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণকে অনুমোদন করেন নাই[৩০]। এমনকি আপৎকালেও শূদ্রা ভার্যা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নিষিদ্ধ শূদ্রাপরিণয় দ্বারা তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিলে সর্বপাপক্ষয়কর চান্দ্রায়ণ ব্রত কর্তব্য। আর কেবল শূদ্রাকে পরিণয় মাত্র করিলে তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক চান্দ্রায়ণ করিবে। গোবিন্দানন্দ তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদীতে[৩১] শ্রাদ্ধের অধিকারী নিরূপণে দ্বিজাতির চার বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানদের শ্রাদ্ধে অধিকারিতা স্বীকার করেন নাই।

---

(২৮) অতএব সজাতীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুরিতি অসবর্ণানামপ্রাশস্ত্যমেবোক্তম্।
[দায়ভাগের শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকৃতটীকা, পৃঃ ২২৬]

(২৯) এতদ্‌ব্যুৎক্রমশূদ্রাবিবাহনিন্দার্থম্। শূদ্রাবেদীতি শূদ্রাং ভার্যাং বিবর্জয়েদিতি বচনাৎ ভার্যাত্বস্য পরিণয়নজন্যত্বাৎ। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮]

(৩০) বস্তুতস্তু যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রদারোপসংগ্রহঃ, ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়মিতি যাজ্ঞবল্ক্যানুসারাৎ নানামুনিমতদ্বৈধে যাজ্ঞবল্ক্যাদীনাং শূদ্রাপরিণয়ননিষেধনিশ্চয় এব প্রতীয়তে। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০]

(৩১) অত্র পরিণয়ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাণামৌরসত্বেঽপি নাধিকারঃ। সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু ময়া বিধিঃ। যত্তু—পুত্রাঃ কুর্বন্তি বিপ্রায় ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনয় ইত্যাদিপুরাণবচনং তৎসপিণ্ডাদ্যভাবে-ত্যন্তাপদ্বিষয়ম্। [শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪০৪]

রঘুনন্দন এই বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। কারণ ইদানীন্তনকালে

সমাজোপযোগী রঘুনন্দনের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা

এই অনুলোমবিবাহ অত্যন্ত গর্হিত কার্য বলিয়া রঘুনন্দন ইহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। তিনি দায়ভাগের টীকা রচনার সময়েও এই প্রসঙ্গে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই[৩২]।

আবার জীমূতবাহনের মতে—শূদ্রা কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিলে তাহাকে বিবাহ করা অপেক্ষা কম পাপ হইবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও অল্প। কিন্তু শূলপাণি অবিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন নিন্দিত কার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৩৩]।

শ্রীনাথ অপর ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে অপত্য উৎপাদন বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীনাথ এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন না[৩৪]। গোবিন্দানন্দ এই রীতির নিন্দা করিয়াছেন[৩৫]। আর রঘুনন্দন বর্তমানকালে এই প্রথা অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া ইহা বর্জন করিয়াছেন[৩৬]। শ্রীনাথ যদিও ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীর সহিত পরিণয় বৈধ এবং শূদ্রা ব্যতীত পরিণীতা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়গুলি সমাজে নিন্দিত ও বর্তমানকালে এই প্রথা আর প্রচলিত নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা রঘুনন্দনের অভিপ্রেত নহে।

অসবর্ণ বিবাহের ন্যায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান ও ভোজন সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের কঠোরতা পূর্ববর্তী যুগ অপেক্ষা পরবর্তী যুগে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্বকালে এই বিধি-নিষেধ অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে প্রতিপালিত হইত না। ইহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা দেখি পূর্বকালে ভবদেবভট্ট যাহা নিষেধ করেন নাই, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তাহাই অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

চণ্ডাল, অন্ত্যজ প্রভৃতির সহিত সর্বদা মেলামেশায় তাহাদের কোন প্রভাব যাহাতে হিন্দুধর্মে না পড়ে এবং তাহাদের যথেচ্ছাচারে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্যই নিবন্ধকারগণ চণ্ডালাদি হীনজাতির

---

(৩২) রঘুনন্দনকৃতটীকা, পৃঃ ২২৭।

(৩৩) তদনূঢ়শূদ্রাগমনাপত্যোৎপাদননিন্দার্থং তেন সকৃৎ ব্রাহ্মণস্যানূঢ়াশূদ্রাপত্যোৎপাদনে পাপগৌরবাচ্চান্দ্রায়ণম্। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮]

(৩৪) দায়ভাগের শ্রীনাথকৃতটীকা, পৃঃ ২২৮।

(৩৫) অনূঢ়া অন্যপরিণীতেত্যর্থঃ নিন্দার্থমিতি ন তু বাস্তবমিত্যর্থঃ।
[প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকা, পৃঃ ৩৪৯]

(৩৬) দায়ভাগের রঘুনন্দনকৃতটীকা, পৃঃ ২২৯।

ীন্তনকালে
য় রঘুনন্দন
ই। তিনি
নাই৩২।
অন্য ব্যক্তি
অপেক্ষা কম
শূদ্রা স্ত্রীতে

বিষয়ে কোন
পাতী ছিলেন
রঘুনন্দন
'। শ্রীনাথ
শূদ্রা ব্যতীত
গুলি সমাজে
সম্বন্ধে কোন

সম্বন্ধে বিধি-
পাইয়াছিল।
হইত না।
করেন নাই,

াদের কোন
র ব্রাহ্মণের
হীনজাতির

াপত্যোৎপাদনে

কা, পৃঃ ৩৪৯]

অন্নভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তীযুগে এই শিথিলতা লক্ষণীয়। রঘুনন্দনের সময়ে এই হীন জাতির প্রভাব সমাজে অত্যন্ত অধিক হওয়ায় রঘুনন্দন অত্যন্ত বেশী কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রঘুনন্দন বলেন—দ্রবদ্রব্যের কণ্ঠদেশ হইতে অধঃকরণ মাত্রই 'পান' অর্থ হইয়া থাকে। যদিও সেই পানব্যাপার সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধক করিতে হইলে অনেকবার পান করিতে হয়, তথাপি পান বলিতে অসম্পূর্ণ পানের গ্রহণ হইবে না। কারণ 'পিবতি' এই ধাত্বর্থের বারবার অনুষ্ঠানের নামই অভ্যাস। একবারে 'পিবতি' ক্রিয়ার অন্তর্গত অনেকবার দ্রবদ্রব্যের কণ্ঠাধঃকরণ হইলেও, উহাতে পানের অভ্যাস বলা হইবে না; উহাকে একটি মাত্র পান বলিয়াই গণ্য করা হইবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন বারের তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ প্রয়োগ-ভেদে এক পানব্যাপারের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করিলে উহাকে পানের অভ্যাস বলা যাইবে। সুরাপানস্থলে ভবদেবভট্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় চণ্ডালাদির অন্ন-ভক্ষণ এবং বারংবার ভক্ষণের পদ্ধতিতে বিচার করিতে হইবে।

যদিও অন্নাদি খাদ্যবস্তুর গলাধঃকরণের নামই ভক্ষণ, থুথু ফেলার জন্য শুণ্ঠাদি ঔষধবিশেষের মত ধারণ করাকে ভক্ষণ বলা হয় না এবং সেরূপস্থলে ভক্ষ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় না, তথাপি পানবিষয়ে

অবাধ পানভোজন নিষিদ্ধ

সম্পূর্ণরূপ গলাধঃকরণ না করিয়া চণ্ডালাদির অন্ন গণ্ডদেশে রাখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মবধস্থলে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। এই সম্বন্ধে উক্তি আছে, যথা—ব্রাহ্মণকে প্রহার না করিয়াও যদি কেহ প্রহার করিতে উদ্যত হয়, এরূপ ব্যক্তিকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

এস্থলে যেমন একমাত্র ব্রহ্মহত্যা ক্রিয়া প্রতিষিদ্ধ হইলেও উহার অঙ্গীভূত সমুদয় চেষ্টাদিকে প্রতিষিদ্ধরূপে ধরা হইয়াছে এবং তাহাদের অনুষ্ঠান জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ এইস্থলেও ভোজন ক্রিয়া নিষিদ্ধ বলিয়া উহার অঙ্গীভূত অর্থাৎ নিষিদ্ধ অন্নাদিকে মুখের মধ্যে প্রবেশ করান প্রতিষিদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে তথাবিধ অন্ন গলাধঃকরণ না করিলেও মুখের সহিত উহার সংযোগমাত্র হইলেই পাপ হইবে এবং সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মিতাক্ষরাতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

এইজন্য উক্ত আছে—যদি কেহ সুরার আঘ্রাণমাত্র করে, তাহাকে সুরাপান করিতেছে বলিয়া নির্দেশ করা যায় না এবং যে পর্যন্ত সে মুখের মধ্যে মদ্যের গণ্ডূষ প্রবেশ না করায়, সে পর্যন্ত তাহাকে সুরাপান করিতেছে বলা যাইতে পারে

না। এইরূপ উক্তিতে যেমন মুখের মধ্যে সুরাগণ্ডূষের প্রবেশমাত্রই গলাধঃকরণ না হইলেও পানক্রিয়ার অতিদেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ চণ্ডালাদি নিষিদ্ধ জাতির অন্নভক্ষণ নিমিত্ত উদ্যমকেই ভক্ষণ বলিয়া গণনা করা কর্তব্য। ভক্ষণোদ্যমই ভক্ষণের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় 'ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবার নিমিত্ত উদ্যমমাত্র করিলেই কৃচ্ছ্রব্রতের আচরণ করিবে এবং তাঁহার শরীরে দণ্ড নিপাতন করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রতের আচরণ করিবে' এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা আঘাতের উদ্যম-মাত্রেই অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হওয়ায় ভক্ষণের উদ্যমেও অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। ইহাতে দেখা যায় রঘুনন্দন চণ্ডালাদির অন্ন ভক্ষণের প্রচেষ্টাকেও পাপ বলিয়া আখ্যা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন[৩৭]। শূলপাণিও এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু ভবদেবভট্ট এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই, কেবল সম্পূর্ণ চণ্ডালাদির অন্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন।

অন্ত্যাবসায়ী বা চণ্ডালদের অন্নভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা সকলেই করিয়াছেন। তবে ভবদেবভট্ট কাহারা অন্ত্যাবসায়ী তাহা নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু শূলপাণি ও রঘুনন্দন ইহা আলোচনা করিয়াছেন। আবার চণ্ডালাদির উদ্ভব সমাজে অত্যন্ত বেশী হওয়ায় রঘুনন্দন এই সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু শূলপাণি তাহা বলেন নাই। রঘুনন্দন বলেন—চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহ, মাগধ এবং আয়োগব—এই সাতটি সঙ্করজাতিকে অন্ত্যাবসায়ী বলা হয়। চণ্ডালাদি জাতির উৎপত্তি যথা—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র 'সূত' জাতির মধ্যে পরিগণিত হয়, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র 'মাগধ', আর বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে 'বৈদেহ' বলা হয়। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে 'আয়োগব', শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে 'ক্ষত্তা' এবং শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে 'চণ্ডাল' বলা হয়, এই চণ্ডাল সকল প্রকার মনুষ্যের মধ্যে অধম। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্তার ঔরসে উগ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে 'শ্বপাক' বলা হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে ক্রূরাচার, ক্রূরকর্মপরায়ণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র, এই উভয় জাতির অনুকরণকারী পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে 'উগ্র' বলা হয়—এই দুই প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতিও শাস্ত্রে লক্ষিত হয়। এই বর্ণনা

(৩৭) অত্র বক্ত্রে গণ্ডূষস্য প্রবেশনেন পানাতিদেশবদ্ভক্ষণোদ্যমেঽপি ভক্ষণাতিদেশঃ। ততশ্চ 'বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদণ্ডোদ্যমে দণ্ডনিপাতনপ্রায়শ্চিত্তার্দ্ধবৎ ভক্ষণোদ্যমে কণ্ঠাদধোনয়নসম্ভাবনারহিতে অর্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তং জ্ঞেয়ম্। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯২]

সঙ্করজাতির উদ্ভব
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি
তাহাতে পূর্বযুগ
ভবদেবভট্ট আপৎ
অথবা শুষ্কমাংস
ভক্ষণ করিলে কৃ
যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যা
গ্রহণ করিলে অ
কম এবং বৈশ্যান্ন
অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বি
এখানে উল্লেখ
কোন প্রমাণ উল্লেখ
ব্যতীত অপরজাতির
অন্নগ্রহণে বিশেষ ব
তিনি যে ক্ষত্রিয় ও
পক্ষে কোন প্রমাণই
সময় হইতেই কিছু
ব্যাপক আকারে পরি
শূলপাণি শূদ্রদে
ইত্যাদি অত্যন্ত কঠো
ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে
শূলপাণি সর্বতোভা
ব্যবস্থায় শূলপাণি মনু

(৩৮) শূদ্রাদ্যন্নভক্ষণে
শূদ্রস্য
ভুক্ত্বা
ব্রাহ্মণস্য তু বৈশ্যান্নে
ক্ষত্রিয়স্য শূদ্রান্নভোজনে
শূদ্রান্নভোজনে দ্বিপাদহীনমি

... বিপ্লবের ফলে প্রচুর চণ্ডালাদি সঙ্করজাতির উদ্ভব হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতির শূদ্রান্নভোজনে যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে তাহাতে পূর্বযুগ অপেক্ষা পরবর্তী যুগে অনেক বেশী কঠোরতা লক্ষ্য করা যায়। ভবদেবভট্ট আপস্তম্বের বচন উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন—অজ্ঞানতঃ শূদ্রের অন্ন অথবা শুষ্কমাংস ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে, জ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে কৃচ্ছ্রদ্বয় করিবে। এই বচন উল্লেখপূর্বক ভবদেব নির্দেশ দিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম এবং ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ। ক্ষত্রিয় শূদ্রান্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম এবং বৈশ্যান্ন ভোজন করিলে অর্দ্ধ। আর বৈশ্য শূদ্রান্ন ভোজন করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়[৩৮]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভবদেব কেবলমাত্র আপস্তম্ববচন ব্যতীত অপর কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে মনে হয় যে পূর্বযুগে শূদ্র ও অন্ত্যজজাতি ব্যতীত অপরজাতির অন্নগ্রহণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। অপর জাতির অন্নগ্রহণে বিশেষ কঠোরতা থাকিলে ভবদেব নিশ্চয়ই তাহা উল্লেখ করিতেন। তিনি যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহার পক্ষে কোন প্রমাণই উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং বুঝা যায় যে এই নিষেধ তাঁহার সময় হইতেই কিছু কিছু আরম্ভ হইয়া শূলপাণি ও রঘুনন্দনের সময়ে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক আকারে পরিণত হইয়াছে।

শূলপাণি শূদ্রদের অন্নগ্রহণ, শূদ্রসংস্পর্শ, ইহাদের সহিত একত্র আসন গ্রহণ ইত্যাদি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শূদ্রান্ন উদরে গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, সে গর্দভ, উষ্ট্র এবং শূদ্রে পরিণত হয়। এই প্রকারে শূলপাণি সর্বতোভাবে শূদ্রদের সহিত সংস্পর্শ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থায় শূলপাণি মনুবচন উল্লেখপূর্বক বলেন—রাজার অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের তেজ

---

(৩৮) শূদ্রাদ্যন্নভক্ষণে বিশেষমাহাপস্তম্বঃ—

শূদ্রস্যান্নমথর্বান্নং শুষ্কমাংসমকামতঃ।
ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং চরেদ্বিপ্রো জ্ঞানাৎ কৃচ্ছ্রদ্বয়ং তথা।।

ব্রাহ্মণস্য তু বৈশ্যান্নভোজনে এতদেব পাদহীনম্। ক্ষত্রিয়ান্নভোজনে দ্বিপাদহীনম্। এবং ক্ষত্রিয়স্য শূদ্রান্নভোজনে পাদহীনং প্রায়শ্চিত্তম্। বৈশ্যান্নভোজনে দ্বিপাদহীনম্। বৈশ্যস্যাপি শূদ্রান্নভোজনে দ্বিপাদহীনমিত্যাদ্যূহনীয়ম্। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৫৯]

নষ্ট হয়, শূদ্রের পক্বান্নভোজনে বেদাধ্যয়ন জাত তেজ নষ্ট হয়, স্বর্ণকারের অন্নভোজনে আয়ু নষ্ট হয় ইত্যাদি। এই প্রমাণ বচন আলোচনা দ্বারা শূলপাণি নির্দেশ দিয়াছেন যে অজ্ঞানপূর্বক একবার শূদ্রান্ন ভক্ষণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসব্রত, তাহাতে অশক্ত হইলে চতুর্বিংশতি পণলভ্য কাঞ্চনাদি দেয়, জ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ, ক্ষত্রিয়ের তিন পাদ, বৈশ্যের অর্দ্ধ এবং অভ্যাসকৃতস্থলে প্রায়শ্চিত্তের আবৃত্তি হইবে। আমান্ন ভক্ষণ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থাংশ, জ্ঞানকৃত স্থলে দ্বিগুণ হইবে[৩৯]।

রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে শূদ্রের অন্নভক্ষণ করিলে বেদাধ্যয়নজাত তেজ নষ্ট হয়। আবার শঙ্খবচন আলোচনা করিয়া রঘুনন্দন বলেন—ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, ক্রূরদিগের অন্ন, স্ত্রী দ্বারা জীবিকাকারীদিগের অন্ন, রাজার অন্ন প্রভৃতি ভোজন করিয়া একমাস ধরিয়া ব্রতের আচরণ করিবে[৪০]। এখানে লক্ষণীয় যে পূর্বযুগে ও বর্তমানকালে রঘুনন্দন পর্যন্ত রঙ্গালয়ে অভিনয়কারী, নট, নটী, নর্তকী প্রভৃতির অন্নভোজন করা দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন শূদ্রের অন্নভক্ষণ বিষয়ে নিষেধের কঠোরতা আরও বেশী ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্র আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, যে ব্যক্তি শূদ্রান্ন ভোজন না করে, সেই ব্যক্তিই পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্র। কারণ

অন্নভক্ষণ বিষয়ে রঘুনন্দনের কঠোরতা

শুদ্ধিতত্ত্বের মুমূর্ষুপ্রকরণে[৪১] দুই প্রকারে শূদ্রান্ন ভোজনে দোষ বলা হইয়াছে। যথা হারীত-বচনে পাওয়া যায়—শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়া যে ব্যক্তি মৃত হয় সে গর্দভ, উষ্ট্র ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে

---

(৩৯) তত্র প্রায়শ্চিত্তে মনুঃ—রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্মাবকর্ত্তিনঃ ॥
.........তেনাজ্ঞানতঃ সকৃৎ শূদ্রান্নভোজনে ত্রিরাত্রমভোজনম্। তদশক্তৌ চতুর্বিংশতিপণলভ্যং কাঞ্চনাদি দেয়ম্। জ্ঞানতঃ সকৃদশনে প্রাজাপত্যম্।......আমান্নভক্ষণে কৃতপ্রায়শ্চিত্ততুরীয়ভাগঃ।
[প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৩৬-২৩৭]

(৪০) শঙ্খঃ—শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা তথা রঙ্গাবতারিণঃ।
চিকিৎসকস্য ক্রূরস্য তথা স্ত্রীমৃগজীবিনঃ ॥
চাণ্ডালান্নং ভূমিপান্নমজাবিশ্বজীবিনাম্।
শৌণ্ডিকান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৫]

(৪১) হারীতঃ—শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন উদরস্থেন যো মৃতঃ।
স বৈ খরত্বমুষ্ট্রত্বং শূদ্রত্বঞ্চাধিগচ্ছতি ॥
শূদ্রান্নং শূদ্রস্বামিকান্নম্, এতৎ প্রতিগ্রহাদিভিরস্বীকৃতবিষয়ম্। তদ্দত্তমপি ভোজনকালে তদ্গৃহাবস্থিতং যত্তদপি শূদ্রান্নম্।
...................এতেন স্বগৃহমাগতস্যৈব শুদ্ধত্বং তদ্গৃহগতস্যৈব শূদ্রান্নদোষভাগিত্বং প্রতীয়তে। ততশ্চৈতাদৃগপি মুমূর্ষুণা শূদ্রান্নং ন ভোক্তব্যম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬৭]

যে শূদ্রান্ন
অর্থাৎ প্রতি
উহাতে শূ
সে পর্যন্ত শ
প্রদান করি
হয়। কি
দোষ নাই
খাদ্যদ্রব্য স্ব
অর্থ দ্বারা
রঘুনন্দ
প্রদত্ত দ্রব্য
যথাবিধি
প্রতিগ্রহ দ
মুমূর্ষু ব্যক্তি
অতএব
কঠোরতা
মনে হয়
লোক শূদ্রত্ব
জন্যই রঘুনন
তবে
ব্রাহ্মণ আ
রঘুনন্দনের উদ
প্রায়শ্চিত্তের
শূদ্র ব্য
অজ্ঞানপূর্বক
ভোজন করি
হয়। আর
তুলাস্থ প্রাও
চণ্ডালাদির

যে শূদ্রান্ন বলা আছে তাহার অর্থ শূদ্র কর্তৃক পকান্ন নহে, কিন্তু শূদ্রস্বামিকান্ন, অর্থাৎ প্রতিগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা অগৃহীত অন্ন। যদিও ঐ অন্ন দান করিবার পর উহাতে শূদ্রের স্বামিত্ব থাকে না, তথাপি উহা শূদ্রের গৃহে যে পর্যন্ত অবস্থিত হয়, সে পর্যন্ত শূদ্রান্ন বলিয়াই গণ্য হইবে। প্রথমতঃ শূদ্র স্বত্বত্যাগপূর্বক ঘৃত, তণ্ডুলাদি প্রদান করিলেও তাহার বাড়ী বসিয়া ঐরূপ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত অন্নভোজনে দোষ হয়। কিন্তু ঐ দ্রব্য নিজের গৃহে আনয়নপূর্বক রান্না করিয়া খাইলে আর কোন দোষ নাই। দ্বিতীয়তঃ শূদ্র যাহা যথাবিধি স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করে নাই, এরূপ খাদ্যদ্রব্য স্বকীয় গৃহে বসিয়া ভোজন করিলেও দোষ হয়। অবশ্য শূদ্র কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ক্রীত দ্রব্য গ্রহণ করিলে দোষভাগিতা হয়।

রঘুনন্দন ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়া বলেন—শূদ্র প্রদত্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিগৃহীত হইলে তাহা হবির ন্যায় হয়। ব্রাহ্মণ তাহা যথাবিধি প্রতিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত না হইলে ঐ দ্রব্য শূদ্রান্ন বলিয়া পরিত্যাজ্য। প্রতিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্য স্বগৃহে আনয়ন করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তিও শূদ্রগৃহে অন্ন ইত্যাদি গ্রহণ করিবে না।

অতএব দেখা যায় শূলপাণি ও রঘুনন্দনের সময়ে শূদ্রান্নভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা বিদ্যমান। এই যে কঠোর ব্যবস্থা রঘুনন্দন করিয়াছেন ইহার দ্বারা মনে হয় তখন সমাজে বৈদেশিক এবং ধর্মীয় আন্দোলন ও উৎপীড়নে অধিকাংশ লোক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহাদের প্রভাব হইতে ব্রাহ্মণজাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই রঘুনন্দন এত কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের উদারতা

তবে রঘুনন্দনের কঠোরতার মধ্যে উদারতাও সমধিক লক্ষণীয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ আপৎকালে শূদ্রগৃহে ভোজন করে, তাহা হইলে মনস্তাপ করিবে অথবা 'দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ' এই মন্ত্রের জপ করিবে। আপৎকাল ভিন্ন অন্যসময়ে হীনজাতির অন্নভোজন করিলে মনু যে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য বিধান করিয়াছেন তদনুসারেই কার্য করিতে হইবে।

শূদ্র ব্যতীত অন্ত্যজাতীয়দের অন্নভোজনেও দোষ হয়। রঘুনন্দন বলেন—অজ্ঞানপূর্বক চণ্ডাল এবং অন্ত্যজাতীয়দিগের স্ত্রীতে গমন করিয়া তাহাদের অন্ন-ভোজন করিয়া এবং তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ পতিত হয়। আর জ্ঞানপূর্বক ঐ সকল কর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ সেই সকল জাতিদের তুল্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে যে পতিত হয় বলা আছে, তাহা দ্বারা তথাবিধ চণ্ডালাদির নিকট হইতে প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন অপর সকল প্রকার

বৈদিককর্মে অনধিকারী হইয়া নরকভাগী হয়। আবার যে 'অন্ত্য' শব্দ আছে উহার অর্থ ম্লেচ্ছ, যবন এবং শ্বপচাদি নিকৃষ্ট জাতি। শূলপাণিও অন্ত্যশব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্তে অর্থাৎ সকলের নীচে অবস্থিতদিগকে অন্ত্য বলা হয় অর্থাৎ যাহাদের অপেক্ষা নীচজাতি আর নাই তাহারাই 'অন্ত্য'। ঐ সকল নীচ জাতীয় ব্যক্তি কোন প্রকার অদৃষ্টার্থে যদি কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া থাকে, উহা সর্বপ্রকার বৈদিককর্মে অব্যবহার্য হয়, অর্থাৎ তাদৃশ বস্তু-গ্রহীতারই যে পাতিত্য হয় এমন নহে, ঐ বস্তুকে কোনপ্রকার বৈধকর্মে লাগাইয়া উহার সদ্ব্যবহার করাও যাইতে পারিবে না। এবিষয়ে প্রমাণ আছে—যথা, পতিত ও দুষ্কর্মকারীদিগের নিকট হইতে প্রতিগৃহীত বস্তু কোনপ্রকার পারলৌকিক কর্মের যোগ্য নহে, যজ্ঞের উপযোগীও নহে, অতএব উহা পুণ্যকর্মের সাধক বলিয়া গণ্য হইবে না। মিতাক্ষরাতেও এইরূপ উক্তি আছে—যে ব্রাহ্মণ যাজন তো দূরের কথা অধ্যাপন কর্ম দ্বারাও অদত্তাদায়ী বা চৌরদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করে, সেই ব্রাহ্মণও ঐ চৌরের সদৃশত্ব প্রাপ্ত হয়। গৌতমের বচনে পাওয়া যায়—ঐরূপ অসৎ প্রতিগ্রহকারীর দ্বিজাতিকর্তব্যরূপে বিহিত কর্মনিচয় হইতে অধিকার-চ্যুতি, পাতিত্য এবং পরলোকে অসিদ্ধি অর্থাৎ নরকপ্রাপ্তি ঘটে[৪২]।

চণ্ডালান্ন ভোজনকে নিন্দিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণ দ্বারা মনু উপপাতকের মধ্যে গণ্য করায় উহার বারংবার অনুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্তের বৃদ্ধি হইবে, যতবার ঐ কার্য করিবে, ততবারই সেই পাপক্ষয়ার্থে এক একটি তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। কারণ উক্ত হইয়াছে—যে কোন প্রকার উপপাতককারীর পক্ষে গোহত্যাকারীর ন্যায় প্রায়শ্চিত্তই কর্তব্যরূপে বিহিত, অথবা চান্দ্রায়ণরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। অর্থাৎ ঐ উপপাতকের বারংবার অনুষ্ঠান ঘটিলে যতবার অনুষ্ঠান ঘটিবে, ততবার ঐ দ্বিবিধের মধ্যে একবিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই পাপকারী শুদ্ধি লাভ করিবে। সুতরাং এস্থলে তন্ত্রতার অবসর হইবে না। শূলপাণিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

ভবদেবভট্ট চণ্ডালস্পৃষ্ট অন্ন, কাপালিকান্ন, রজকাদি অন্ন, তক্ষণ, চর্মকার, স্বর্ণকার, নট ইত্যাদির অন্নভক্ষণেও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। শূদ্রদের পাত্রস্থ অন্নভক্ষণ করিলেও তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন।

কিন্তু শূলপাণি এইগুলি ছাড়াও শূদ্রাদির দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভোজনেও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন[৪৩]। রঘুনন্দনও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভবদেবভট্ট এ সম্বন্ধে কিছু মতপ্রকাশ করেন নাই।

(৪২) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৩।

(৪৩) কেশকীটাবপন্নঞ্চ স্ত্রীভিঃ স্পৃষ্টং তথৈব চ।
শ্বোদক্যাশূদ্রসংস্পৃষ্টং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৫৭]

... চণ্ডাল স্পৃষ্ট ও চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতির পাত্রে রক্ষিত জলপান করিলে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা অত্যন্ত বেশী লক্ষ্য করা যায়। কারণ আমরা দেখি ভবদেবভট্টের তৎকালীন সমাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে চণ্ডালস্পৃষ্ট জল, চণ্ডাল পাত্রস্থ জল, চণ্ডালাদি অন্ত্যজদের নিকট হইতে জল, চণ্ডালকৃত কূপস্থ জল প্রভৃতি পান করিলে চারবর্ণের পক্ষেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। আবার রজকাদিভাণ্ডস্থ জল, অন্ত্যজসম্বন্ধি জলপানেও চারবর্ণের প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শূদ্রের জল পান করিলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। শূদ্রের জলপানের শেষ অংশ পান করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে[৪৪]। শূলপাণিও ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রোদকপানে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু শূলপাণি নির্দেশ দিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, ইক্ষুরস, গুড়, ঘোল ও মধু—এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণের কোন দোষ হয় না। রঘুনন্দনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু ভবদেবভট্ট কেবল ব্রাহ্মণদের পক্ষেই শূদ্রস্পৃষ্ট জলপান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের পক্ষে শূদ্রস্পৃষ্ট জলপানে কোন নিষেধের ব্যবস্থা দেন নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভবদেব চণ্ডালস্পৃষ্ট জলপানে অঙ্গিরার বচন উল্লেখ পূর্বক বলেন, যে ব্যক্তি চণ্ডালসংস্পৃষ্ট জল অজ্ঞানতঃ পান করে, সে ব্যক্তি আত্মার শুদ্ধির জন্য সান্তপন কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে[৪৫]। কিন্তু শূলপাণি এখানে 'পিবেৎ কিঞ্চিদকামতঃ' এই পাঠ ধরিয়া 'কিঞ্চিৎ' স্থলে জলক্ষীরাদি অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শুধুমাত্র জল নহে, ক্ষীর প্রভৃতি ভক্ষণেও প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য[৪৬]। আবার রঘুনন্দন ভবদেবসম্মত পাঠ ধরিয়া চণ্ডালসংস্পৃষ্ট জলপানেই এই প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়াছেন[৪৭]।

সুরাপান সম্বন্ধে দেখা যায় ইহা পূর্বকালেও নিষিদ্ধ ছিল। ভবদেবভট্ট

---

(৪৪) শূদ্রোদকপানে তু বিশেষমাহ শাতাতপঃ—

যদি বিপ্রঃ প্রমাদেন শূদ্রতোয়ং পিবেৎ স্বয়ম্।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তত্র যেন শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
উপোষ্য বিল্বপদ্মানাং পলাশস্য কুশস্য চ।
এতেষামুদকং পীত্বা তেন শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৫৩]

(৪৫) যস্তু চাণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
স তু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুধ্যর্থমাত্মনঃ॥ [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৫২]

(৪৬) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৩১২।

(৪৭) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৭।

সুরাপান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে 'সুরা' শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়া সুরাপানে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুরা বলিতে সাধারণতঃ মদ্যকেই বুঝায়। কিন্তু মনুবচন উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে অন্নের বিকারকেই সুরা বলা হয়। এই সুরাপান দ্বিজাতিগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ[৪৮]। আবার দেখা যায় সুরা তিন প্রকার[৪৯]—গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। এইগুলি গুড়, পিষ্ট ও মধুর বিকার হইতেই প্রস্তুত হয়। অবশ্য পৈষ্টী সুরাই মুখ্য। অতএব সুরা ও মদ্য একার্থক নহে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ অন্নের বিকারই মুখ্য সুরাশব্দার্থ। অন্ন শব্দ হইতেছে ব্রীহিবিকার, তাহা ওদনপিষ্টাদিতে প্রসিদ্ধ। ইহা গৌড়ী ও মাধ্বী সুরার মধ্যে পাওয়া যায় না। এইগুলির মধ্যে মদকারিত্ব গুণ থাকার জন্যই এই গৌড়ী মাধ্বী সুরা গৌণ। ভবদেব সিদ্ধান্ত করেন[৫০]—গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী সুরাপানে ব্রাহ্মণের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে পৈষ্টী সুরাপানে পাপ হয়, কিন্তু গৌড়ী ও মাধ্বী সুরাপানে কোন দোষ হয় না। স্ত্রীলোকের পক্ষেও সুরাপানে মহাপাতক হয়।

ভবদেবের মতে কণ্ঠদেশ হইতে অধোনয়ন হইলেই তাহাকে পান বলা হয়। কেবলমাত্র ওষ্ঠসংযোগ হইলেই পান অর্থ ধরা হয় না। কিন্তু নিবন্ধকার বালকের মতে কেবলমাত্র মুখে প্রবেশমাত্রই পান অর্থ নির্ধারিত হয়, তাহা খণ্ডন করিয়া ভবদেব বলেন কণ্ঠদেশ হইতে উদরে প্রবেশ করিলেই হয় পান[৫১]।

ভবদেব অজ্ঞানতঃ সুরাপানে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানতঃ সুরাপানে বা বলপূর্বক সুরাপান করাইলে অথবা ভ্রমবশতঃ সুরাপান করিলে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না দিয়া দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিধান দিয়াছেন।

---

(৪৮) মনুঃ—সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
অত্রান্নবিকারস্যৈব সুরাত্বমবগম্যতে। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৪০]

(৪৯) গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈরিতি॥
অত্র গুড়পিষ্টমধুবিকারাণাং ত্রয়াণামেব সুরাত্বং পরিস্ফুরতি। [ঐ, পৃঃ ৪০]

(৫০) পৈষ্টীশব্দাভিধেয়ব্রীহ্যন্নবিকার এব মুখ্যসুরাশব্দার্থঃ, তৎপানমেব ত্রৈবর্ণিকস্য মহাপাতকম্। গৌড়ীমাধ্বীসুরাপানে তু ব্রাহ্মণস্য পৈষ্টীপানবদেব প্রায়শ্চিত্তম্। ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োস্তু তৎপানে ন দোষ ইতি। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৪২]

(৫১) ন তু মুখমাত্রপ্রবেশবিষয়মিতি বালকেনাভিহিতমাদরণীয়ম্। তস্য পানশব্দানভিধেয়ত্বাৎ। [ঐ, পৃঃ ৪৪]

আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপানে যে প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা একপাদ কম, বৈশ্যের পক্ষে দুই পাদ কম অর্থাৎ অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু কামতঃ সুরাপানে ক্ষত্রিয়বৈশ্যদের পক্ষেও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।

শূদ্রের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ নহে। অনুপনীত ব্রাহ্মণ ও অপরিণীতা ব্রাহ্মণীর সুরাপানে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য নহে, কেবল দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যদিও গৌতমবচনে পাওয়া যায় যে উপনয়নের পূর্বে ইচ্ছানুসারে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারা যায়, তথাপি কুমারের বিশেষ বচন অনুসারে অনুপনীত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ[৫২]। আবার ভবদেব সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানেও দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ভবদেবের সময়ে সুরাপানের প্রচলন অত্যন্ত বেশী ছিল। এইজন্য তিনি এই সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সুরাপান সমাজে গর্হিত ছিল। জাতি অনুসারে ও দ্বিজসম্বন্ধে এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুরাপানে প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতাও লক্ষণীয়। কারণ দেখা যায় জ্ঞানতঃ সুরাপানে দ্বিজাতির মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, আর অজ্ঞানতঃ ইহা অনুষ্ঠিত হইলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত উদ্‌যাপনীয়। তবে শূদ্রদের পক্ষে এবং অন্যান্য অন্ত্য জাতির পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই দেখা যায় না।

শূলপাণিও সুরাপানসম্বন্ধে নিষেধের কঠোরতা অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, সুরাপান করিলে মহাপাতক হয়। শ্রুতিতে পাওয়া যায় অন্নের বিকারে জাত মদ্যের নাম সুরা, ইহাকে পৈষ্টী সুরা বলে[৫৩]। এই সুরাপান জঘন্যতম পাপের কার্য। শূলপাণি ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী সুরাপান মহাপাতকজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের পক্ষে কেবল পৈষ্টী সুরাপানে মহাপাতক হয়, কিন্তু গৌড়ী ও মাধ্বী সুরাপানে কোন দোষ হয় না[৫৪]।

শূলপাণি পান শব্দে কেবল মুখে প্রবেশমাত্রই বুঝান নাই[৫৫]। দ্রবীভূত

---

(৫২) তথাচ কুমারঃ—'সুরাপাননিষেধস্তু জাত্যাশ্রয় ইতি স্থিতিঃ'। অনেন চ তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ'। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৪৭]

(৫৩) যথা চ শ্রুতিঃ—"সুরা বৈ মলমন্নানামনৃতং পাপ্‌মাতমঃ সুরা" ইতি।

[প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৭৮]

(৫৪) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৮০।

(৫৫) ঐ, পৃঃ ৮২।

বস্তুর কণ্ঠদেশ হইতে অধোভাগে অর্থাৎ উদর মধ্যে প্রবেশ করার নামই পান, শুধুমাত্র মুখমধ্যে ধারণ করিলে পান ব্যবহার হইবে না। শূলপাণির সময়েও সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন জ্ঞানকৃত সুরাপানে দ্বিজাতির পক্ষে মরণ প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লোকেরা ইহলোকে ও পরলোকে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

গোবিন্দানন্দ এখানে বলেন[৫৬] ইহলোকে লোকপ্রশংসা, পুত্রগণ কর্তৃক শ্রাদ্ধাদি দান, আত্মার শুদ্ধি এবং পরলোকে নরকাভাব—এই গুলির জন্যই লোকে সুরাপান করতঃ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে।

পূর্বে সুরাপান সম্বন্ধে নিষেধের কঠোরতা অত্যন্ত বেশী বর্তমান ছিল। ভবদেবের সময়ে এই নিষেধ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। আর শূলপাণির সময়েও আমরা দেখি সুরাপান সম্বন্ধে দ্বিজাতিদের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। শূলপাণিও স্বীকার করিয়াছেন যে সুরাপানে তন্ত্রতার অবসর নাই, যতবার পান হইবে ততবারই প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। আবার সুরাসংসৃষ্ট দ্রব্য, সুরাভাণ্ডস্থিত জলপান প্রভৃতিতেও প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। সুতরাং এই আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে শূলপাণিও সমাজে সুরাপানের বিস্তৃতি কঠোরহস্তে দমন করিতে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ভবদেবভট্ট ও শূলপাণি সুরাপান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলেও রঘুনন্দন সুরাপান সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কারণ রঘুনন্দনের শাস্ত্রজগতে আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে যবনদের অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। দেশে

সমাজের অবস্থানুযায়ী রঘুনন্দনের ব্যবস্থা

উহাদের সংস্পর্শে মানুষের নৈতিক চরিত্রের অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল। লোকে ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভুলিয়া যথেচ্ছাচারে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। তখন আবার তান্ত্রিকধর্মের নামে সমাজে পঞ্চ ম-কারের প্রাধান্য বেশী হওয়ায় লোকে ন্যায়নীতির ধার ধারিত না। সমাজে সুরাপানও পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। তান্ত্রিকধর্মের সারবস্তু গ্রহণ না করিয়া লোকে তন্ত্রের আনুষঙ্গিক মদের নেশায় মত্ত হইয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে রঘুনন্দন শাস্ত্র আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইয়া কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষেই সুরাপান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সুরাপান সম্বন্ধে রঘুনন্দন একখানি মাত্র বচন উত্থাপন করিয়াছেন[৫৭]। সেই

(৫৬) ইহলোকে লোকপ্রশংসা পুত্রাদিভিঃ শ্রাদ্ধাদিদানকাত্মনঃ পাবনং পরলোকে তু নরকাভাব ইত্যর্থঃ। [প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকা, পৃঃ ৮৯]

(৫৭) সুরাপাননিষেধোঽয়ং জাত্যাশ্রয় ইতি স্থিতিঃ।
ন পিবেদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং নিষিদ্ধমপি চাপরম্ ॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৬]

বচনে বলা আছে যে—ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ। এই নিষেধ ব্রাহ্মণজাতিমাত্রাশ্রিতই বলিতে হইবে অর্থাৎ জন্মিবার পর হইতেই ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। আর ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিবে না এবং অপর নিষিদ্ধ বস্তুও পান করিবে না—এইরূপ বচন দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হয় যে মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণের অবশ্যই পাপ হইবে। তবে মদ্য ভিন্ন অপরবিধ নিষিদ্ধ দ্রব্য পান করিলে উপনয়নের পূর্বে পাপ হইবে না। কারণ প্রমাণ আছে—মহাপাতকরূপ সুরাপানাদি ব্যতীত বালকদিগের পক্ষে অপর ভক্ষ্য অভক্ষ্যের কোন বিচার নাই।

রঘুনন্দন পান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদিও দ্রবদ্রব্যের কণ্ঠ হইতে অধোনয়ন অর্থাৎ উদর মধ্যে প্রবেশকেই পান বলিয়া অভিহিত করা হয়, তথাপি এখানে কণ্ঠদেশ হইতে উদরমধ্যে প্রবেশ ব্যতীতও মুখে গণ্ডূষমাত্র প্রবেশেই পানক্রিয়ার অতিদেশ করা হইয়াছে। অতএব বুঝা যায় যে রঘুনন্দন সুরাপান স্থলেও শুধু মুখে প্রবেশমাত্রই পান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন[৫৮]। আবার সেইরূপ চণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির অন্নভক্ষণে উদ্যত ব্যক্তির অন্নভক্ষণ না করিলেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অস্তিত্ব নাই

রঘুনন্দন সুরাপানস্থলে ব্রাহ্মণের ঐ সুরা উদর মধ্যে প্রবেশ না করিলেও পান বলিয়া গ্রহণপূর্বক তাহাতেই সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে রঘুনন্দন ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপানে প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়বৈশ্যদের সুরাপান স্থলে কোন মতই প্রকাশ করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ রঘুনন্দনের স্বকীয় উক্তিতেই পাওয়া যায় যে তাঁহার সময়ে কেবলমাত্র দুইটি জাতি বিদ্যমান—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অস্তিত্ব তখন ছিল না। ইদানীংকালে ক্ষত্রিয়গণেরও যে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব আর নাই—তাহা রঘুনন্দন মনুবচন উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়ার লোপ করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাইয়া শূদ্রধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে[৫৯]।

---

(৫৮) জিঘ্রন্নহি সুরাং কশ্চিৎ পিবতীত্যভিধীয়তে।
যাবন্ন ক্রিয়তে বক্ত্রে গণ্ডূষস্য প্রবেশনম্ ॥
অত্র বক্ত্রে গণ্ডূষস্য প্রবেশনেন পানাতিদেশবদ্ ভক্ষণোদ্যমেঽপি ভক্ষণাতিদেশঃ।
[প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯২]

(৫৯) ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥..........
[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আবার বিষ্ণুপুরাণেও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে[৬০]। যথা—মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত মহাপদ্ম নন্দ নামে অতিলুব্ধ পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং সেই পুত্র পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ করিবে। তাহার পর হইতে শূদ্রজাতীয়গণই ভূপতি হইবে। বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তিতে জানা যাইতেছে যে মহানন্দী অবধিই ক্ষত্রিয়জাতির সত্তা ছিল। এইরূপ ক্রিয়ালোপনিবন্ধন বৈশ্যদিগের এবং অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরও শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে। তবে অশৌচাদি গ্রহণবিষয়ে যে ক্ষত্রিয়বৈশ্যদিগের কথা রঘুনন্দন বলিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র জাতিপ্রসঙ্গবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি দেওয়া হইয়াছে। শূদ্রদিগের তো সুরাপানে দোষ নাই, এইজন্য রঘুনন্দন সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই।

আবার দেখা যায় শাস্ত্রে ম্লেচ্ছদেশে গমন, ম্লেচ্ছান্নভোজন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘকাল রোগভোগ করার পর যদি আমাদের দেশীয় চিকিৎসায় রোগ উপশম না হয় তাহা হইলে সেই দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য অনন্যোপায় হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গমন এবং বাধ্য হইয়া সেখানকার খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া আরোগ্য লাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সেই ব্যক্তির শুদ্ধির ব্যবস্থা ঋষিগণ করিয়াছেন তাহাই রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন। এই প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির বৈদিক কর্মে অধিকার থাকে এবং সমাজেও তাঁহার ব্যবহার্যতা প্রচলিত আছে বলিয়া রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ তিনি সুমন্তুর বচন উল্লেখপূর্বক দেখাইয়াছেন যে[৬১] রোগার্ত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধাদিতে কয়েকটি নিষিদ্ধ ভোজ্যও গ্রহণীয়। তখন তাঁহার পক্ষে এই নিষিদ্ধ ভোজ্যগুলি ভক্ষণ করিলে দোষ হইবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা রঘুনন্দনের উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ম্লেচ্ছ দেশে গমন ও ম্লেচ্ছান্ন ভোজনে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা

শূলপাণি বৃহস্পতির বচন উল্লেখপূর্বক দেখাইয়াছেন যে[৬২] রোগী ব্রাহ্মণের সুরাপান দ্বারা অপনেয় রোগের শান্তির নিমিত্ত অজ্ঞানপূর্বক গৌড়ী সুরাপানে

তেন মহানন্দিপর্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্। [শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৬]

(৬০) মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি। [বিষ্ণুপুরাণ, পৃঃ ২৯০]

(৬১) এতান্যেব ব্যাধিতস্য ভিষক্‌ক্রিয়ায়ামপ্রতিষিদ্ধানি ভবন্তি, যানি চান্যান্যেবং প্রকারাণি তেষ্বপ্যদোষঃ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ১১]

(৬২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ৮৮-৮৯।

উপনয়ন স
গ্রাকব্রত,
জ্ঞানপূর্বক ক
এই বিষ
চিকিৎসা কা
গৃহীদেরও
এই সূত্র ব্যা
হেতু যারা
নিষিদ্ধ দ্রব
দিয়াছেন[৬৪]
আবার
ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল
বিধেয়। চা
ব্যক্তির ত্যাজ
এই দাসত্বে
প্রায়শ্চিত্তকা
বলার দরুণ
বুঝাইলেও
জ্ঞানপূর্বক
দিয়াছেন।
ভোজনেও
নির্ণীত হয়।
শাস্ত্রান্তরে
করা যায়।
প্রভৃতি দেশে

(৬৩) 'যেনে
(৬৪) 'সর্বত
(৬৫) দাসীকৃ

উপনয়ন সংস্কারপূর্বক তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত, মাধ্বী সুরাপানে উপনয়ন সংস্কারপূর্বক পরাকব্রত, পৈষ্টী সুরাপানে উপনয়ন সংস্কারপূর্বক চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠেয় হইবে, আর জ্ঞানপূর্বক করিলে ঐ সমস্ত ব্রতের দ্বৈগুণ্য হইবে।

এই বিষয়ে বৌধায়নের সূত্র পাওয়া যায়[৬৩] 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিবে, সে চিকিৎসা করিবে'—ইহাতে ব্রতীদেরও চিকিৎসাতে ইচ্ছাবশতঃ অনুজ্ঞাপ্রাপ্তি থাকায় গৃহীদেরও সেই প্রকার ইচ্ছামত চিকিৎসার ব্যবস্থা ন্যায়তঃ সিদ্ধ হয়। বৌধায়নের এই সূত্র ব্যাখ্যাকালে 'সর্বপ্রকারে নিজেকে রক্ষা করিবে' এই স্মৃতিতে আত্মরক্ষার হেতু দ্বারা তাদৃশ চিকিৎসা খ্যাপন করে বলিয়া গত্যন্তর না থাকিলে যে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্যের ভোজন করাও চলিতে পারে বলিয়া গোবিন্দস্বামী নির্দেশ দিয়াছেন[৬৪]।

আবার রঘুনন্দন বলিয়াছেন[৬৫]—দেবলবচনে পাওয়া যায় মাস বা সংবৎসর ব্যাপী ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি দস্যুগণ কর্তৃক বলপূর্বক উপভুক্ত ব্যক্তিগণেরও স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। চার বৎসর পর্যন্ত এই প্রকার দস্যুদের দাসত্ব আচরণ করিলে সেই ব্যক্তির ত্যাজ্যতা এবং অব্যবহার্যতা শাস্ত্রে কথিত থাকিলেও তাহার মধ্যে বলপূর্বক এই দাসত্বে পরিণত করার জন্য ভাগহারে প্রায়শ্চিত্তকল্পনা দেখা যায় এবং প্রায়শ্চিত্তকারীর ব্যবহার্যতাও সমাজে ব্যবস্থিত করা হইয়াছে। এখানে বলপূর্বক বলার দরুণ প্রাণসংশয় প্রতীতি হইতেছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে বলপূর্বক উপভোগ বুঝাইলেও পুরুষের পক্ষে তাহা অসম্ভবহেতু প্রাণসংশয়প্রাপ্ত ম্লেচ্ছ-স্ত্রীগমনকারীর জ্ঞানপূর্বক সেই আচরণেও স্বল্প প্রায়শ্চিত্ততা বিধেয় বলিয়া রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন। এইরূপ সর্বত্র ঔষধ প্রভৃতিতে প্রাণসংশয় উপস্থিত হওয়ার জন্য নিষিদ্ধ ভোজনেও সেই প্রকার স্বল্প প্রায়শ্চিত্ততা ও সমাজে ব্যবহার্যতা বিধেয় বলিয়া নির্ণীত হয়।

শাস্ত্রান্তরে বলা আছে, আত্মরক্ষা করার জন্য যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠিত করা যায়। এখানে আরও আলোচনার বিষয় যে রোগ উপশমের জন্য বিলাত প্রভৃতি দেশে গমন করিতে হইলে নৌযান দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইতে

---

(৬৩) 'যেনেচ্ছেত্তেন চিকিৎসেত'—বৌধায়নধর্মসূত্র ২।১।২৬।

(৬৪) 'সর্বত এবাত্মানং গোপায়েৎ' ইতি স্মৃতেঃ।

[বৌধায়নধর্মসূত্রের গোবিন্দস্বামীকৃতটীকা, পৃঃ ১১৩]

(৬৫) দাসীকৃতো বলান্ ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।............

[প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৬]

হয়। কিন্তু কলিবর্জনপ্রকরণে বলা আছে যে দ্বিজগণের নৌযান ইত্যাদি দ্বারা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। এই সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে আমরা পাই বৌধায়নধর্মসূত্রে[৬৬] 'সমুদ্রসংযানম্' এই সূত্রে ইহাকে পাতক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার টীকায় গোবিন্দস্বামী বলিয়াছেন[৬৭] নৌকা দ্বারা দ্বীপান্তরে বারংবার গমন করিলে তিন বৎসর পাপ থাকে। আবার মনুসংহিতায় 'সমুদ্রযায়ী' এই অংশের অর্থ কুল্লুকভট্ট করিয়াছেন[৬৮]—যে ব্যক্তি নৌকা ইত্যাদি দ্বারা দ্বীপান্তরে গমন করে সেইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে নিমন্ত্রণ করিবে না। অতএব পাওয়া যায় যে সমুদ্রযানে উত্তরণ নিষিদ্ধ। এই প্রকার কথিত হইলেও সেই ব্যক্তির আত্মরক্ষার হেতুস্বরূপ দেশান্তর প্রাপ্তি অপরিহার্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ তাহা না হইলে শরীর রক্ষার হেতুস্বরূপ সেই স্থান প্রাপ্তিরও উপপত্তি হয় না।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে ধনী ব্যক্তির বিমান দ্বারা গমন সম্ভব হয়, কিন্তু অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বিমান গমন সম্ভবপর নহে। তথাপি সেই দেশ-মাত্রেই কেবল রোগের উপশমের ব্যবস্থা থাকায় নৌযান দ্বারা সমুদ্র উত্তরণ-পূর্বক চিকিৎসার নিমিত্ত সেই দেশে অবস্থানকারী রোগীর দেহধারণের জন্য অনন্যোপায় হইয়া ম্লেচ্ছান্নগ্রহণেও গুরুপাপভাগিতা হয় না। আবার প্রায়শ্চিত্ত-কারীর ব্যবহার্যতাও সমাজে প্রচলিত।

এখানে আরও আলোচনার বিষয় যে পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতির অন্যতম একজন সেই প্রকার রোগাক্রান্ত হইলে সেই রোগীর একাকী সেই দেশে গমন অসম্ভবহেতু তাহাকে রক্ষার জন্য তাহার সহযাত্রী হিসাবে পিতা, ভ্রাতা বা পতির ম্লেচ্ছদেশে গমন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও একাকী দূর-দেশে গমন সম্ভব নহে বলিয়া তাহার সঙ্গে অপর ব্যক্তিরও যাইতে হয়। সুতরাং বিবেচ্য যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অল্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহার সহযাত্রীর জ্ঞানপূর্বক এই গমনে কি প্রকার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে এবং পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহার ব্যবহার্যতা সমাজে প্রচলিত হইবে কি না।

রোগীর সহযাত্রীরও অল্প প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা

---

(৬৬) 'অথ পতনীয়ানি—সমুদ্রসংযানম্'। [বৌধায়নধর্মসূত্র ২।১।১-২]

(৬৭) সমুদ্রসংযানং নাবা দ্বীপান্তরগমনম্……………এবমাচরন্ত এতে তৎপাপং ত্রিভিঃ সংবৎসরৈরপহন্তি অপঘ্নন্তীত্যর্থঃ। [বৌধায়নধর্মসূত্রের গোবিন্দস্বামীকৃতটীকা, পৃঃ ১১৭-১১৮]

(৬৮) সমুদ্রে যো বহিত্রাদিনা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি……। [মনুর কুল্লুকভট্টকৃতটীকা, পৃঃ ৭৫]

ইত্যাদি দ্বারা
ধায়নধর্মসূত্রে[৬৩]
ছ এবং ইহার
র গমন করিলে
ই অংশের অর্থ
য়ে গমন করে
পাওয়া যায় যে
নর আত্মরক্ষার
াহা না হইলে

গমন সম্ভব হয়,
পি সেই দেশ-
সমুদ্র উত্তরণ-
হধারণের জন্য
ার প্রায়শ্চিত্ত-

ভৃতির অন্যতম
া সেই দেশে
পিতা, ভ্রাতা
ন্ত প্রয়োজন
একাকী দূর-
রপর ব্যক্তিরও
া প্রায়শ্চিত্তের
প্রকার শাস্ত্রীয়
হইলে তাহার

ংপাপং ত্রিভিঃ
৭-১১৮]
, পৃঃ ৭৫]

বাংলাদেশের ধর্মশাস্ত্রব্যবস্থাপকগণ এবিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন[৬৯]। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে—যে কোন প্রকারেই হউক পুত্র, পত্নী ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে রক্ষা করিবে এবং তাহাদের ভরণ পোষণ করিবে। সুতরাং পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা প্রভৃতির সেইরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি হইলে এই দেশের চিকিৎসায় তাহা নিরাময়ের ব্যবস্থা না থাকায় পত্নী, পুত্র প্রভৃতির অবশ্য রক্ষণীয়তা শাস্ত্রের নির্দেশ বলিয়া ম্লেচ্ছদেশে গমন ঈপ্সিত না হইলেও অনন্যোপায় হইয়া সেই দেশে গমনের পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে জ্ঞানকৃত এই পাপের জন্য তিনভাগে বিভক্ত প্রায়শ্চিত্তের তৃতীয়ভাগেরও কম প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে এবং সমাজে তাহার ব্যবহার্যতাও বিদ্যমান থাকিবে। কারণ আমরা দেখি রঘুনন্দন বলপূর্বক চণ্ডালান্নভোজন বিষয়ে শূলপাণির উক্তি উত্থাপন পূর্বক এই প্রকারই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে পত্নী, পুত্র প্রভৃতির জন্য সহগামী ব্যক্তির ম্লেচ্ছ-দেশে গমন, তথায় তাহাদের সহিত সংস্পর্শ ও নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিলেও অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য হইবে।

যথেচ্ছ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ বিষয়ে দেখা যায় দ্বিজাতির পক্ষে ভবদেবভট্টই সর্বপ্রথম শাস্ত্রীয়বিধি প্রবর্তন করিয়াছেন। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় বলিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম কঠোর শাস্ত্র-আলোচনাকারী ভবদেবভট্ট পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের মৎস্য-মাংসভক্ষণে শাস্ত্রীয়বিধি নির্দেশ করিয়াছেন। তবে পূর্ব হইতেই যে এই প্রথা বঙ্গদেশে কিছু কিছু প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ-স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে—বৃহস্পতি মৎস্যভক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন[৭০]—সকলেই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

মৎস্য-মাংস ভক্ষণে শাস্ত্রীয়বিধি

ভবদেব বলেন মনুবচনে পাওয়া যায়—যাহাদের অন্ন অভোজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট তাহাদের অন্নভোজন করিলে স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্টভক্ষণ করিলে এবং অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য সপ্ত দিবারাত্র যবচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। এই মনুবচন ইচ্ছাবশতঃ অত্যন্ত অভ্যাসস্থলেই বুঝিতে

(৬৯) বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে বাংলার অন্যতম সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান ভাটপাড়া-নিবাসী পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র-অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিবাচস্পতি মহাশয় এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

(৭০) বৃহস্পতিঃ—মৎস্যাদাশ্চ নরাঃ সর্বে ব্যভিচাররতাঃ স্ত্রিয়ঃ। [বিবেকার্ণব পুঁথি, ফোলিও ৬খ].

হইবে। কিন্তু অনিষিদ্ধ মৎস্যমাংস ভক্ষণে অভাববশতঃ দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না[৭১]।

তবে কতকগুলি উক্তি আছে যেমন ছাগলেয় মুনির বচন—বৃথা মাংসভক্ষণ কর্তব্য নহে, শ্রাদ্ধকর্মে মাংসভক্ষণ করা বিধেয়। কিন্তু অন্য কোন ব্যাপারে ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আছে—যদি ব্রাহ্মণ ইচ্ছানুসারে মৎস্যভক্ষণ করেন, তবে তিনি তিনদিন উপবাস করিবেন।

আবার মনু বলিয়াছেন—মাংসভোজনের গুণদোষজ্ঞ দ্বিজাতি আপৎভিন্নকালে কখনও অবৈধমাংস ভোজন করিবে না। অবৈধ মাংসভোজী ব্যক্তি যে জন্তুর মাংস ভোজন করে, পরলোকে সেই জন্তু কর্তৃক সে অবশ্যভাবে ভক্ষিত হয়।

ব্যাসদেব বলেন—পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রীসম্ভোগ এবং তৈল ও মাংস ভক্ষণ করিলে লোকেরা চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধে বিধিপূর্বক প্রদত্ত, দ্বিজাতিগণ কর্তৃক দৈবকার্যে প্রদত্ত এবং মহারোগবশতঃ নির্দিষ্ট মাংস ব্যতীত অন্য ব্যাপারে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ।

এই সমস্ত উক্তিতে যে সাধারণভাবে মৎস্যমাংসভক্ষণে নিষেধ প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে ভবদেব বলেন—এইগুলি কেবল চতুর্দশীতে নিষেধ বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা না হইলে সাধারণভাবে মৎস্যমাংস অভক্ষ্য বুঝাইলে তিথিবিশেষে নিষেধের আনর্থক্য বুঝায়[৭২]। তিনি আরও বলেন—মৎস্য প্রভৃতি পরিত্যাগে ফলশ্রুতি থাকিলেও ভক্ষণ না করিলে কোন ফলশ্রুতি পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—মাংসভক্ষণ বর্জন করিলে ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করতঃ কামনালাভ করে এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়।

ভবদেব কর্তৃক কামতঃ মৎস্য-মাংস ভক্ষণ অনুমোদন

---

(৭১) যচ্চ মনুনা—অভোজ্যানাস্তু ভুক্তান্নং স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব চ।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যঞ্চ সপ্তরাত্রং পয়ঃ পিবেৎ ॥

ইত্যুক্তং তৎকামতোঽত্যন্তাভ্যাসবিষয়ম্। অনিষিদ্ধমৎস্যমাংসভক্ষণে তু দোষাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তাভাবঃ। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৬৭]

(৭২) যত্তু ছাগলেয়েনোক্তং……যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তং,……মনুনোক্তং,……ব্যাসেনোক্তং, তৎ সর্বং নিষিদ্ধচতুর্দশ্যাদিবিষয়ম্। অন্যথা সামান্যেনৈবাভক্ষ্যত্বে সতি তিথিবিশেষে নিষেধস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৬৭-৬৮]

এইজন্য ভবদেব সিদ্ধান্ত করেন যে, সাধারণভাবে মৎস্যমাংসভক্ষণে কোন দোষ হয় না[৭৩]।

ভবদেব ব্রাহ্মণের ইচ্ছাবশতঃ মৎস্য ও মাংসভক্ষণে শাস্ত্রীয়বিধি প্রবর্তন করিলেও পরবর্তী নিবন্ধকার শূলপাণি এই কামতঃ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শূলপাণির মতে কামতঃ ভক্ষণ নিষিদ্ধ

তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে কেবলমাত্র দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত মৎস্য ও মাংস ব্যতীত ইচ্ছানুসারে মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করিলে পাপ হয়। এইজন্য তিনি এই বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। শূলপাণি এইজন্য মনুবচন আলোচনাপূর্বক বলেন—পশুমাংস ক্রয় করিয়া, মৃগয়াদির দ্বারা উহা স্বয়ং আহরণ করিয়া অথবা পরের নিকট হইতে উহা দানপ্রাপ্ত হইয়াও দেবতা ও পিতৃগণকে তদ্দ্বারা অর্চনা করিবে, পরে অবশিষ্ট মাংস ভোজন করিলে তাহাতে পাপ হইবে না[৭৪]।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দ এখানে মাংসস্থলে উপলক্ষণ করিয়া মৎস্যেরও নিষেধ বুঝাইয়াছেন[৭৫]।

অতএব বুঝা যায় যে শূলপাণির মতে পিতা ও দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ ব্যতীত বৃথা মাংসভক্ষণে দোষ হয়। বৃথা মাংস বারংবার ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত বিধেয়।

কিন্তু দেবল ও বৃহস্পতির বচনে পাওয়া যায়—রোগের নিমিত্ত, শ্রাদ্ধাদির অবশিষ্ট, হোমের অবশিষ্ট এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধে—এই চারস্থলে মাংসভোজন করিলে দোষ হইবে না। শূলপাণি সিদ্ধান্ত করেন[৭৬] মনু কর্তৃক সাধারণভাবে

---

(৭৩) কিঞ্চ মৎস্যাদিপরিত্যাগে ফলশ্রুতিরপ্যভক্ষ্যত্বে সতি নোপপদ্যতে। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধফলন্তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসবিবর্জনাৎ॥

অতো মৎস্যমাংসভক্ষণে দোষাভাব এবেত্যবগম্যতে। [প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, পৃঃ ৬৮]

(৭৪) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৫৯।

(৭৫) পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন দেবান্ যজ্ঞেন মাংসমিত্যুপলক্ষণং মৎস্যানপি।
[প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকা, পৃঃ ২৫৯]

(৭৬) এবঞ্চ—"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

ইতি মনুবচনমপি পিতৃদেবার্চনশিষ্টমাংসবিষয়ম্। এবম্ভূতমাংসত্যাগ এব মন্বাদ্যুক্তফলশ্রুতিরপি নিষিদ্ধানাচরণস্য পুণ্যাজনকত্বাৎ। মদ্যঞ্চ যেষাং ন নিষিদ্ধং তেষামেব তন্নিবৃত্তি র্মহাফলা মৈথুনে পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনামনৃতৌ রতিকাম্যয়েতি যন্মনুনোক্তং তত্ত্যাগবিষয়ং মহাফলম্।
[প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৬০-২৬১]

মাংসভোজন, মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগ করিলে দোষ হয় না, পরন্তু ঐ সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিলে মহাফল হয়। এইরূপ উপদেশ কথিত হইলেও শূলপাণি এই সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। যেমন পিতা ও দেবতার পূজাদিতে প্রদত্ত মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না, কিন্তু ঐ স্থলেই লোভ না করিয়া মাংস পরিত্যাগ করিলে মহাফল হয়। এইরূপ যাহাদের মদ্যপান নিষিদ্ধ নহে সেই শূদ্রাদির বিষয়ে মদ্যপান করিলে দোষ হয় না, মদ্য পরিত্যাগ করিলে মহাফল হয় বলিতে হইবে এবং পর্ব ভিন্ন অন্য দিনে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে দোষ হয় না। কিন্তু ঐ দিনে স্ত্রী-সম্ভোগ বর্জন করিলে মহাফল হয়।

শূলপাণি ভবদেবের মত নিরাকরণ করিবার জন্য বলেন[৭৭]—ভবদেব পর্বকালে যে মাংসবর্জনহেতু অন্যসময়ে সাধারণভাবে মাংস ভক্ষণ অনুমোদন করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কারণ যেখানে ভক্ষণপ্রাপ্তি হয়, সেখানেই মাংসত্যাগে ফলশ্রুতি পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ দিন ছাড়া অপরদিনেও নিষিদ্ধ আচরণ না করিলে মহাফল শূলপাণি দেখাইয়াছেন।

শূলপাণি বলেন—শঙ্খ, বৃহস্পতি, ব্রহ্মপুরাণ ও মনুর বচনানুসারে রোগনিমিত্ত কিংবা অন্যনিমিত্তই হোক্ মাংসভোজন ব্যতীত জীবন বিনাশের সম্ভাবনা হইলে মাংসত্যাগে কৃতসঙ্কল্প গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারী ব্যক্তিও মাংসভোজনের দ্বারা জীবনরক্ষা করিবেন; কিন্তু পশ্চাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে[৭৮]।

শূলপাণি ইচ্ছানুসারে মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—জ্ঞানপূর্বক একবার মৎস্য ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস কর্তব্য, অজ্ঞানপূর্বক ভক্ষণে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু বিশেষবচন অনুসারে দেবতা কিংবা পিতার উদ্দেশে প্রদত্ত মৎস্য ভোজন করিলে কোন দোষ হইবে না[৭৯]।

---

(৭৭) পর্বণি মাংসবর্জনাচ্চ সাম গ্যত এব মাংসভক্ষণং প্রতীয়ত ইতি ভবদেবমতং নিরাকরোতি এবম্ভূতেতি যত্রৈব ভক্ষণং প্রাপ্তং তত্রৈব মাংসত্যাগে ফলশ্রুতিঃ ন তু নিষিদ্ধে তদিতরস্থলে তত্র হেতুঃ নিষিদ্ধানাচরণস্যেতি·········প্রসঙ্গাৎ মৈথুনত্যাগস্য মহাফলত্বং ব্যাখ্যায় ভবদেবমতে দোষান্তরমাহ তথেতি নিন্দাম্ অবিধিমাংসভক্ষণনিন্দাম্ অতোঽন্যথা প্রাগুক্তপিতৃদেবার্চনাবশেষাদন্যত্র তাবন্তাবন্তি দিনানি মারণং নরকোপভোগমিত্যর্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যেন তথাভিধানাৎ।

[প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকা, পৃঃ ২৬১]

(৭৮) শঙ্খ-বৃহস্পতীত্যাদিবচনেভ্যঃ শরীরস্যাবশ্যরক্ষণীয়ত্বাদ্ব্যাধিনিমিত্তে হন্যনিমিত্তে বা প্রাণাত্যয়ে পুনস্ত্যক্তমাংসোঽপি ব্রহ্মচারী গৃহী বা ভক্ষয়িত্বা পশ্চাৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্যাতাম্।

[প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ১৬৩]

(৭৯) কামতো মৎস্যভক্ষণপ্রায়শ্চিত্তম্—তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।
ইদং সকৃদশনেঽকামতস্তদর্দ্ধম্। [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৬৭]

... এই বিষয়ে বলেন যে[৮০]—অনিষিদ্ধ মৎস্য ও মাংস দেবতা এবং পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নিষিদ্ধ মৎস্যমাংসভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।

এই মৎস্য ও মাংসভক্ষণের বিধি বহু পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে। তবে ইচ্ছানুসারে এই ভক্ষণ নিষিদ্ধ। দেবতা এবং পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া অনিষিদ্ধ মৎস্য ও মাংস ভোজন শাস্ত্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া কামতঃ ভক্ষণ করিলে পাপ হয়।

এই সম্বন্ধে মনুর মত

কারণ আমরা দেখি মনুসংহিতায় পাওয়া যায় যে[৮১]—মৎস্যভক্ষক জন্তু এবং সর্বপ্রকার মৎস্য ভোজন করিবে না। যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহাকে তন্মাংসাদ অর্থাৎ তাহার মাংস-ভোজী বলে, পরন্তু মৎস্যভোজীকে সর্বমাংসাদ বলা হয়। অতএব মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু পাঠীন (বোয়াল), রোহিত, রাজীব (পদ্মবর্ণ মৎস্য) সিংহের ন্যায় ঠোঁটবিশিষ্ট, শকুল মৎস্য এবং আঁশ বিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য দেবতা এবং পিতৃগণ উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিতে পারা যায়[৮২]।

অতএব বুঝা যায় যে মনুসংহিতায় অনিষিদ্ধ মৎস্য দেবতা এবং পিতার উদ্দেশে ভোজন করিলে কোন দোষ হয় না।

মাংস ভোজন সম্বন্ধে মনু বলেন—যাহারা একাকী চরিয়া বেড়ায় (যথা, সর্প প্রভৃতি), যে সকল পশুপক্ষীর নাম বা জাতি পরিজ্ঞাত নহে এবং যাহারা ভক্ষ্য বলিয়া বিশেষরূপে নির্দিষ্ট নহে তাহারা এবং বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ জীবমাত্রই অভক্ষ্য। আর পঞ্চনখ যুক্ত জীবের মধ্যে শজারু, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার,

(৮০) ইদমবিধিভক্ষণবিষয়ং পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োরিত্যাদিমন্বাদিবচনাৎ নিষিদ্ধমৎস্যানান্ত ভক্ষণে সামান্যোক্তাভক্ষ্যমাংসভক্ষণপ্রায়শ্চিত্তং দ্রষ্টব্যং নিষিদ্ধমৎস্যান্ত শাস্ত্রতো ব্যবহারতশ্চোন্বেয়াঃ।

....

এবমমাবাস্যাষ্টকাদিষু মাংসেন শ্রাদ্ধবিধানানুপপত্ত্যা নিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে দত্তং মাংসং ভুঞ্জীত এবেতি ভাবঃ। এবং যোগিণাম্পি প্রাণরক্ষার্থং নিষিদ্ধতিথিষ্বপি মাংসং ভক্ষ্যমেবেতি।

[প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকা, পৃঃ ২৬৭, ২৭০]

(৮১) মনু ৫।১৫।

(৮২) পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্বশঃ॥ [মনু ৫।১৬]

কূর্ম, শশক—এই কয়টি প্রাণী ভোজন করা যায় এবং একপংক্তি দন্তবিশিষ্ট পশুর মধ্যে উষ্ট্র ভিন্ন পশুর মাংস ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট[৮৩]। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথিও মৎস্যভক্ষণে নিষেধের কথা অনুমোদন করিয়াছেন।

কিন্তু অনিষিদ্ধ মৎস্য যেমন বোয়াল, রোহিত মৎস্য প্রভৃতি দৈব ও পিতৃকর্মে উৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ভক্ষণ করা যাইতে পারে। আর রাজীব, সিংহের মত মুখবিশিষ্ট মৎস্য, আঁশযুক্ত মৎস্যগুলি সর্বপ্রকারে হব্য ও কব্য (অর্থাৎ দৈব ও পিতৃকর্ম) ব্যতীত অন্য সময়েও ভক্ষণের বিধিব্যবস্থা মেধাতিথি নির্দেশ দিয়াছেন[৮৪]।

মাংসভক্ষণ বিষয়ে মেধাতিথি বলেন—পঞ্চনখ প্রাণী যথা বানর, শৃগাল প্রভৃতি ভক্ষণ নিষেধ। কিন্তু পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে শজারু, শল্যক প্রভৃতি ভক্ষণীয়।

অতএব দেখা যায় মেধাতিথির মতে বোয়াল ও রোহিত মৎস্য দেবতা ও পিতৃ-কর্মে প্রযুক্ত হইলে ভক্ষণ বিধেয়। কিন্তু পরে উল্লিখিত মৎস্যগুলি যে-কোন সময়ে ভক্ষণের বিধি মেধাতিথি অনুমোদন করেন। এই বিষয়ে মেধাতিথি অনেকখানি উদারনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। অপর টীকাকার গোবিন্দরাজও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু এই মত কুল্লুকভট্ট স্বীকার করেন নাই। কুল্লুকভট্ট মেধাতিথির এই উদারনীতির কঠোর সমালোচনাপূর্বক কামতঃ মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আর মাংস ভক্ষণ বিষয়ে তিনি মনুনির্দেশিত নীতিই অনুমোদন করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য মাংসভক্ষণেই বিধি দিয়াছেন[৮৫]—কেবল প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ যখন মাংসভক্ষণ ব্যতিরেকে প্রাণরক্ষা হয় না তখন বিধি অনুসারে মাংসভক্ষণ করিবে। আবার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া বিধিমত মাংসভক্ষণ কর্তব্য, কারণ তখন ইহা অভক্ষণে দোষ হয়। আর প্রোক্ষিত পশু অগ্নীষোমীয় প্রভৃতি যাগের

---

(৮৩) শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ॥ [মনু ৫।১৭]

(৮৪) পাঠীনরোহিতৌ মৎস্যজাতিবিশেষৌ তয়োর্হব্যকব্যনিয়োগেন শ্রাদ্ধাদৌ ভক্ষ্যতাভ্যনুজ্ঞায়তে, নাহ্বাহিকে ভোজনে। রাজীবসিংহতুণ্ডশল্কানাং সর্বশঃ হব্যকব্যাভ্যামন্যত্রাপ্যনিবৃত্তি র্ভোজনে।
[ঐ, পৃঃ ৪২৭]

(৮৫) প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্॥ [যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।১৭৯]

হতাবশিষ্ট মাংসভক্ষণে দোষ হয় না এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য বা দৈব ও পিতৃকর্মে উৎসর্গীকৃত মাংসের অবশিষ্ট ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকারী দোষভাগী হয় না।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি তিথি ব্যতীত মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রসিদ্ধ। যথা—

বৃহদ্ধর্মপুরাণের মত

রবিবারে, সূর্যসংক্রান্তিতে, দ্বাদশীতিথিতে এবং সমস্ত পুণ্যাহে মৎস্যমাংস ভোজন করিবে না[৮৬]। আবার বলা আছে—মৎস্য, মাংস, মসুর, মাসকলাই, নিম্ব, আর্দ্রক এবং তৈল রবিবারে গ্রহণ করিবে না[৮৭]। কোন্ মৎস্য ভক্ষণীয় তাহাও ইহাতে নির্দেশ করা আছে। যথা—রোহিত, শকুল, শফর (পুঁটি) প্রভৃতি মৎস্য, সাদা ও আঁসযুক্ত মৎস্য ব্রাহ্মণ ভোজন করিবে[৮৮]। সুতরাং দেখা যায় বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণের মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে শাস্ত্রীয় বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, মনুসংহিতায় বিশেষ কয়েকটি মৎস্য দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে দান করিয়া দ্বিজাতি ইহা ভোজন করিতে অধিকারী হয়। সর্বপ্রকার মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আবার মাংসও বিশেষ কয়েকটি উদ্দেশে ভক্ষণ করা যাইতে পারে এবং সেই মাংসও কয়েকটি বিশেষ প্রাণীর হইতে হইবে।

মনুসংহিতার টীকাকারদের মধ্যে মেধাতিথি মৎস্যভক্ষণ সম্বন্ধে কিছুটা উদারনীতি প্রদর্শন করিলেও কুল্লুকভট্ট তাহা সমালোচনা করিয়া সেই মৎস্য কামতঃ ভোজনে নিষেধ প্রবর্তিত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও কামতঃ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আবার বৃহদ্ধর্মপুরাণে মৎস্যগুলির শ্রেণী নির্দেশ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণের মধ্যে ভবদেবভট্ট সর্বপ্রথম অনিষিদ্ধ মৎস্য ও মাংস ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে ভোজনের বিধি অনুমোদন করেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের নিবন্ধকার শূলপাণি ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত মৎস্যমাংস ভক্ষণের অধিকার স্বীকার করেন নাই। তিনি দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে উৎসর্গ করার পর অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণে দোষ হয় না বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তৎপরবর্তী নিবন্ধকার

---

(৮৬) রবিবারে তথা ভানুসংক্রান্ত্যাং দ্বাদশীতিথৌ।
পুণ্যাহেষু চ সর্বেষু মৎস্যমাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥ [বৃহদ্ধর্মপুরাণ ৩।৪৪]

(৮৭) মৎস্যং মাংসং মসূরঞ্চ মাষং নিম্বং তথার্দ্রকম্।
তৈলঞ্চ রবিবারেষু ন গৃহ্নীত কদাচন ॥ [ঐ, ৩।৪৫]

(৮৮) রোহিতং শকুলঞ্চৈব তথৈব শফরাদিকম্।
শুক্লবর্ণং সশল্কঞ্চ মৎস্যং ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ ॥ [বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ৩।৪৬]

শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি ও গোবিন্দানন্দ এই সমস্ত ভোজনে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। আর সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়া রঘুনন্দন মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে আরও বেশী উদারনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রচুর মৎস্যের উৎপত্তি ও ব্যবহার দেখিয়া রঘুনন্দন হবিষ্যান্ন ব্যতীত সর্বত্র সর্বপ্রকার মৎস্য ভক্ষণেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে বলিয়া শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিয়াছেন।

রঘুনন্দনের মত

বঙ্গদেশে যে প্রভূত মৎস্যের প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে বঙ্গীয় নিবন্ধকার জীমূতবাহন বাংলাদেশের তথাকথিত ইলিশ মৎস্যের তৈলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন[৮৯]।

শ্রীনাথের গ্রন্থে আমরা দেখি যে শ্রীনাথ পর্বদিন ব্যতীত অন্য দিনে মৎস্য-ভোজনে অনুমতি দিয়াছেন। শ্রীনাথ বিষ্ণুপুরাণের দুইটি শ্লোক আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন[৯০]—চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পর্বদিন ও সূর্যসংক্রান্তিকালে স্ত্রী, তৈল ও মাংসসম্ভোগ করিলে লোকে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে। এখানে শ্রীনাথের মতে তিথিগুলিতে এই যে নিষেধ তাহা স্নানাদি বিধির মত পুণ্যকালে হয়, তারপর সেই সমস্ত তিথির অবসানে মৎস্য প্রভৃতির উপভোগ সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে শ্রীনাথ পর্বদিন বাদে অপর দিনে সকলের মৎস্যভক্ষণে বিধি দিয়াছেন।

শ্রীনাথের মত

শ্রীনাথ যে রবিসংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যকাল ব্যতীত অন্য সময়ে সকলের মৎস্যমাংসভোজন অনুমোদন করিয়াছেন[৯১]—এই মতের সমালোচনাপূর্বক গোবিন্দানন্দ বলেন—শ্রীনাথ লোভবশতঃ কুতর্কের বশবর্তী হইয়া শিষ্টাচার বিলোপ করিতে প্রয়াসী হইয়া ইহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ

---

(৮৯) ইল্লিশস্য তৈলমিত্যাদিষু দর্শনাদ্‌........[কালবিবেক, পৃঃ ৩৭৯]

(৯০) বিষ্ণুপুরাণে—চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্বণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥
স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্বস্বেতেষু বৈ পুমান্‌।
বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ॥
অত্রাধুনিকাঃ—নিষেধোঽয়ং স্নানাদিবিধিবৎ পুণ্যকাল এব ততঃ পরং মৎস্যাদীনামুপভোগো নির্বিবাদ এব। [বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২১৬]

(৯১) নিষিদ্ধমপি মাংসতৈলাদি পুণ্যকাল এব। [কৃত্যতত্ত্বার্ণব পুঁথি, ফোলিও ১৯ খ]

[illegible] মতে —[illegible]সংক্রান্তি উপলক্ষিত সম্পূর্ণ দিবরাত্রং গ্রহণীয়। তাহা না হইলে পরদিন দিবার্দ্ধের পুণ্যকাল হওয়ায় রাত্রিতে সূর্যের সঞ্চারক্ষণে স্ত্রীসঙ্গমপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। সেইরূপ অর্দ্ধরাত্রিতে সূর্যের সঞ্চারে পূর্ব ও পর দিনার্দ্ধের পুণ্যকাল হওয়ায় সেখানে দিনদ্বয়ে মাংস প্রভৃতি ভক্ষণের প্রসঙ্গ হয় এবং তাহার মধ্যে রাত্রিতেও মাংসভক্ষণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এই সব আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে গোবিন্দানন্দ নিষিদ্ধ তিথি ব্যতীত অন্য দিনে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে গোবিন্দানন্দ অপেক্ষা শ্রীনাথ অনেক বেশী উদারতা দেখাইয়াছেন।

রঘুনন্দন রবিবার ব্যতীত অন্য সব দিনেই মৎস্য ও মাংসভক্ষণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এমন কি রঘুনন্দন বলিয়াছেন সূর্যের সংক্রমণকালে যে মৎস্য ও মাংস-ভক্ষণের নিষেধ, তাহা কেবলমাত্র সংক্রমণ জন্য পুণ্যকালেই নির্দিষ্ট। পুণ্যকাল না থাকিলে সেই নিষেধ কার্যকর হইবে না। এইজন্য রঘুনন্দন বলেন সংক্রমণ জন্য পুণ্যকালে স্নান, দান প্রভৃতির ন্যায় তৈল ও মাংসভোজন এবং স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ। ইহাতে বুঝা যায় যে সূর্যসংক্রান্তি অর্দ্ধরাত্রে হইলে পূর্বদিবসের অর্দ্ধ ও পরদিবসের অর্দ্ধকাল পুণ্যকাল বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং এই পুণ্যকাল সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ দিনের প্রথমভাগে মৎস্য মাংস ভোজন নিষিদ্ধ হইলেও দিনের শেষভাগে বা রাত্রিতে মৎস্যমাংসভোজনের বিধি রঘুনন্দন অনুমোদন করিয়াছেন। রঘুনন্দনের অধ্যাপক শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন[৯৩]।

রঘুনন্দন পক্কমাংস ভোজনের শাস্ত্রীয়ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রযোজ্য

---

(৯২) অত্রাধুনিকাঃ—নিষেধোঽয়ং স্নানাদিবিধিবৎ..........নির্বিবাদ এবেতি লোভাধ্যাপিত-কুতর্কাঃ শিষ্টাচারং বিলোপয়ন্তি, তন্মন্দম্ ।..................

নিষেধস্তু সঞ্চারোপলক্ষিতদিন এব। অন্যথা পরদিনদিবার্দ্ধস্য পুণ্যকালত্বে রাত্রৌ সঞ্চারক্ষণে স্ত্রীসঙ্গমপ্রসঙ্গঃ, তথার্দ্ধরাত্রসঞ্চারে পূর্বাপরদিবার্দ্ধয়োঃ পুণ্যকালত্বাৎ তত্র দিনদ্বয়ে মাংসাদিবর্জনপ্রসঙ্গঃ তন্মধ্যে চ রাত্রৌ মাংসভক্ষণাদিপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। [বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২১৬]

(৯৩) অত্রৈকস্মিন্নেব কালে পুণ্যপাপফলদানদর্শনাৎ সংক্রমণপুণ্যকাল এব স্নানাদিবত্তৈলাদি-ত্যাগঃ। এবমেব গুরুচরণাঃ। একাদশীপ্রকরণোক্তসংক্রান্ত্যুপবাসস্য ব্রতত্বেন ভাবরূপত্বাদ্ ভাবঘটিত-ত্বাদ্বোভয়থাপি তত্র পূর্জ্যে বিধে রূ ভিরিত্যনেন পুণ্যকালযুক্তাহোরাত্রকর্তব্যতা অষ্টম্যুপবাসবৎ।

[তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৫৯]

আবার তিথিতত্ত্বের কাশীরামবাচস্পতিকৃত টীকায়ও (পৃঃ ২৭৯) ইহা বলা আছে—'ন চ স্ত্রী-তৈলমাংসমিত্যুপলক্ষণং বাচ্যং দেবীপুরাণবচনে—"পুণ্যপাপবিভাগেন ফলং দেবী প্রযচ্ছতি"

ইতি এককাল এব পুণ্যপাপকথনাৎ।

করিয়াছেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তুগুলির মধ্যে হবিষ্যান্ন বিধিবৎ প্রদত্ত হইলে পিতৃগণের একমাস পর্যন্ত কাল পরিতৃপ্তি হয়, পায়স দত্ত হইলে এক বৎসর কাল পর্যন্ত তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হয়। এইরূপ মৎস্যাদি মাংস হরিণমাংস, মেষমাংস, কৃষ্ণমৃগের মাংস, ছাগমাংস প্রভৃতি মাংস প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ এক-বৎসরকাল পরিতৃপ্ত থাকেন। আমমাংস দেবতাদের উদ্দেশে দান বিহিত হইয়াছে, আবার শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতেও এই অপক্কমাংস দান বিহিত। কুল্লুকভট্ট আমমাংসের অর্থ করিয়াছেন—অবিকৃত ও পূতিগন্ধাদি রহিত মাংস। কিন্তু রঘুনন্দন বলেন তাহা ঠিক নহে। অনুপস্কৃত শব্দের অর্থ পাকসংস্কার রহিত মাংস অর্থাৎ আমমাংস। গৌড় ও দাক্ষিণাত্যগণ কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা মান্য না করিয়া শ্রাদ্ধে আমমাংসেরও ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমমাংস শ্রাদ্ধে দেওয়া বিধেয়—এই সিদ্ধান্ত হওয়ায় 'উহা ব্রাহ্মণে খাইবে না'—এই বাক্য দ্বারা উহা যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই নিষেধকে মাংসের ঐ অপক্ক অবস্থাতেই বুঝিতে হইবে। অপক্ক মাংস ভক্ষণ ব্রাহ্মণপক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় রঘুনন্দনের মতে পক্কমাংস যে ব্রাহ্মণে খাইতে পারিবে তাহা সিদ্ধ হইল[৯৪]।

রঘুনন্দনের মতে অষ্টমীর উপবাসের পারণের দিন রবিবার বা পিতৃমরণ প্রভৃতি অশৌচ হইলে মৎস্যমাংস ভোজন নিষিদ্ধ। অতএব অন্যদিন যে মৎস্যমাংস ভোজন শাস্ত্রসিদ্ধ তাহা প্রতীত হয়। তবে রঘুনন্দনের মতে[৯৫] কার্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। আবার রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিয়াছেন যে সম্পূর্ণ মাস ধরিয়া এই ভক্ষণের নিষেধ পালন করিতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ পক্ষে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। এখানেও রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় নিষেধের শিথিলতা অনুমোদন করিয়াছেন।

আবার প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে রঘুনন্দন বলিয়াছেন শঙ্খের উক্তিতে পাওয়া যায়—গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, সকল প্রকার পঞ্চনখবিশিষ্ট জীব, মাংসভোজী জীব এবং

(৯৪) ন চানুপস্কৃতমবিকৃতং পূতিগন্ধাদিরহিতমিতি কুল্লুকভট্টব্যাখ্যানং যুক্তং শব্দানভিধেয়ত্বাদিতি। গৌড়দাক্ষিণাত্যাভ্যাং তথা ব্যবহ্রিয়তে। ইথঞ্চ তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যমিত্যামতাদশায়াম্।
[শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃঃ ৮৭]

(৯৫) ন মৎস্যং ভক্ষয়েন্ মাংসং ন কৌর্মং নান্যদেব হি।
চণ্ডালো জায়তে রাজন্ কার্তিকে মাংসভক্ষণাৎ॥
......ততশ্চ মাংসভক্ষণনিষেধে কার্তিকমাসতচ্ছুক্লপক্ষতদেকাদশ্যাদিপঞ্চদিনানি শক্তাশক্তভেদাৎ পাপতারতম্যাদ্বা নিষিদ্ধানি। [তিথিতত্ত্ব- পৃঃ ৫৮]

গ্রাম্য কুক্কুট, ইহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া একবৎসর ব্যাপী ব্রতের আচরণ করিবে। ইহা আলোচনা করিয়া রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে[৯৬] শঙ্খের এই উক্তিতে পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবার কথা থাকিলেও এখানে উল্লিখিত পঞ্চনখ দ্বারা শাস্ত্রে ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট শশক, গোসাপ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখের অতিরিক্ত পঞ্চনখদিগকেই বুঝিতে হইবে। এখানেও রঘুনন্দন মাংসভক্ষণের বিধি দিয়াছেন।

ইদানীন্তনকালে ছাগমাংসেরই প্রভূত প্রচলন দেখিয়া রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন যে, পশুমাংস অর্থে ছাগমাংসেরই বোধ হইবে। ছাগমাংস ভক্ষণের ব্যবহারই সমাজে বেশী প্রচলিত আছে। রঘুনন্দন বলিয়াছেন—অষ্টকাশ্রাদ্ধে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষে তিনটি অষ্টকা করা কর্তব্য। প্রথম অষ্টকাতে পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, দ্বিতীয়তে মাংস দ্বারা এবং তৃতীয়তে শাকদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

এখানে দ্বিতীয় অষ্টকাতে যে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধের বিধান করা হইয়াছে, ঐস্থলে 'মাংস' বলিতে পশুর মাংস বুঝিতে হইবে। কারণ গোভিল বলিয়াছেন যে সময়েই শ্রাদ্ধের উপকরণের অপ্রাপ্তি বা দুষ্প্রাপ্তি হইবে, সেই সময়ে পশুমাংসেই শ্রাদ্ধ করিবে। পশুশব্দটিও সাধারণতঃ ছাগলেরই বাচক। আবার গৌতম বলিয়াছেন— যে স্থলে কোনরূপ বিশেষ করিয়া বলা না হইবে, কেবল 'পশু' এই কথাটির প্রয়োগ থাকিবে, সেস্থলে পশুশব্দ ছাগেরই বাচক হইবে[৯৭]।

আবার রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে পূর্বে অগস্ত্য মুনি সকল পশুকে প্রোক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া বর্তমানে অরণ্যবাসীর পশুভক্ষণে কোন দোষ হয় না। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'আরণ্যাঃ সর্বদেবত্যাঃ' এই বচনের দ্বারা আরণ্য পশুসকল অগস্ত্য কর্তৃক প্রোক্ষিত হওয়ায় নৃপগণ মৃগয়ার আদর করেন—মৃগয়ার এইরূপ প্রাশস্ত্য বিজ্ঞাত হওয়ায় আরণ্য পশুবধ করাই হইল বিধেয়। সুতরাং আরণ্য এই কথাটি পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ায় এখানে পুংস্ত্ব (অর্থাৎ পুংলিঙ্গত্ব) বিবক্ষিত। এইজন্য স্ত্রীপশু বধ করা উচিত নহে। অতএব হরিবংশেও বলা হইয়াছে—তির্যক্ যোনিতে স্ত্রী অবধ্য। সুতরাং অগস্ত্য কেবল পুরুষ পশুকেই

---

(৯৬) শঙ্খঃ—গামশ্বং কুঞ্জরোষ্ট্রৌ চ সর্বং পঞ্চনখং তথা।
ক্রব্যাদং কুক্কুটং গ্রাম্যং কুর্যাৎ সংবৎসরং ব্রতম্॥
শশকাদিভক্ষ্যপঞ্চনখাতিরিক্তম্। তথেতি ভুক্তে,ত্যর্থঃ। [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, পৃঃ ১৯৭]

(৯৭) মাংসৈঃ পশোঃ। তথাচ গোভিলঃ—যত্ত্বাবাল্লতরসম্ভারঃ স্যাত্তদা পশুনৈব কুর্যাৎ। পশুরিতি ছাগ এব, 'ছাগোঽনাদেশে পশুঃ' ইতি গৌতমাৎ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ২২]

প্রোক্ষিত করিয়াছেন, স্ত্রীপশুকে নহে, কাজেই হরিণী, ছাগী প্রভৃতি স্ত্রীপশু অপ্রোক্ষিত বলিয়া তাহা অভক্ষ্য[৯৮]।

শুধু বঙ্গদেশেই নহে মিথিলাতেও ব্রাহ্মণের মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে অধিকার আছে। কারণ মৈথিল নিবন্ধকারগণও ব্রাহ্মণের মৎস্য এবং মাংস ভক্ষণে শাস্ত্রীয়বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন। মিথিলার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর মৎস্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আঁশযুক্ত মৎস্য ভোজনীয়। আঁশ ব্যতীত অন্যপ্রকার মৎস্য ভোজনের উপযুক্ত নহে[৯৯]। আবার মনুবচনে পাওয়া যায়, বোয়াল ও রোহিত মৎস্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্মে দেয়, তাহাও চণ্ডেশ্বরের মতে ভক্ষণীয়। বৌধায়নের মতে যে ভক্ষণীয় মৎস্যগুলি পাওয়া যায়, সেইগুলিও চণ্ডেশ্বর ভোজন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। যেমন—সহস্রদন্ত-বিশিষ্ট মৎস্য (বোয়াল), স্থলচর (কৈ প্রভৃতি), লোহিতাকার রোহিত সদৃশ মৎস্য, রাজীব, বৃহৎ মুখবিশিষ্ট মৎস্য ইত্যাদি ভক্ষণীয়[১০০]।

মৈথিল মত

মাংস ভক্ষণেও চণ্ডেশ্বর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বচনস্থিত প্রাণসংশয়ে বা ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় বা দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গপূর্বক অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় ছাড়াও মাংসভক্ষণ শাস্ত্রসিদ্ধ। কেবলমাত্র মাংসবর্জন ব্রত ব্যতীত সকল সময়েই মাংস ভোজনীয়[১০১]। মাংস ভক্ষণে যে দোষ হয় না তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন[১০২]।

---

(৯৮) যথা মহাভারতে—আরণ্যাঃ সর্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্বশো মৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে ॥

অত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বেন 'পশুনা যজেত' ইত্যত্রৈকত্ববদ্বিধেয়বিশেষণত্বেনারণ্যা ইত্যাদেঃ পুংস্ত্বং বিবক্ষিতম্। অতএব হরিবংশেঽপি—অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি। ততশ্চ হরিণ্যাদীনামপ্রোক্ষিতত্বেনাভক্ষ্যত্বম্। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩৬]

(৯৯) তথা—শল্কৈর্যুক্তা মৎস্যা ভক্ষ্যাঃ, ইতরে ত্বভক্ষ্যাঃ। [গৃহস্থরত্নাকর, পৃঃ ৩৭৯]

(১০০) ভক্ষ্যমিত্যনুবৃত্তৌ বৌধায়নঃ—
মৎস্যাঃ সহস্রদংষ্ট্রশ্চিলিচিমো বর্মি বৃহচ্ছিরোমশকরি রোহিতরাজীবাঃ।

চিলচিমঃ স্থলচরঃ লোহিতাকারঃ স্থলচরো রোহিতসদৃশঃ। রাজীবঃ সহস্রজম্বিলঃ পাঠীনঃ। বর্মি বাঁয়বো বামুরিতি প্রসিদ্ধঃ। নিষেধস্তু প্রাচ্যোঽস্যাঽপাত্তবিষয়ঃ। [ঐ, পৃঃ ৩৭৯]

(১০১) এবমন্যস্মিন্নপি মাংসভক্ষণাভ্যনুজ্ঞানে যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যুক্তবলবৎপ্রমাণবিষয়ং বিহায় নিয়মে তু বর্জয়েদিতি যোজ্যম্। নিয়মে মাংসবর্জনব্রতে সতি। [ঐ, পৃঃ ৩৮২]

(১০২) দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি ইত্যাদিভি মাংসভক্ষণাভ্যনুজ্ঞানাৎ। [ঐ, পৃঃ ৩৮২]

রঘুনন্দন

সিদ্ধ চাউল ভক্ষণে
রঘুনন্দনের অনুমতি

হওয়ায় রঘুনন্দ
বাধা হইয়াছে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন র
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা
তিনি বলে
নির্দেশ থাকায়
রঘুনন্দন তিথি
অত্যন্ত বিস্তৃতভা
রঘুনন্দন
তিনপ্রকার যথা
বলে কৃত, তৎ
বলে। এখানে
নির্দিষ্ট না থাক
সেই সিদ্ধ ধান্য অ
কোন লোক অ
দোষের অভাবই
করিয়া পুনরায়
পক্ষে কোন দো
অবস্থায় পাক ক
না। এই সিদ্ধান্ত
কোন ব্যক্তি ক

(১০৩) তথ হবিষ্য
মিত্যভিধানাদত্র স্বিন্ন
(১০৪) ধান্যাদৌ যে
তদ্বিবৃতং কাত্যায়নেন-
বিধানতশ্চ। অতো না

রঘুনন্দন যে শুধু মৎস্য মাংস ভক্ষণেই উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নহে, অন্যান্য খাদ্য প্রভৃতি গ্রহণেও শাস্ত্রীয়বিধির শিথিলতা অনুমোদন করিয়াছেন। সমাজে বিভিন্ন মতবাদিগণের প্রভাবে বহু প্রকার খাদ্য গ্রহণ প্রচলিত হওয়ায় রঘুনন্দন সমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রণী হইয়া এই উদারতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সমাজে সিদ্ধ চাউল ভক্ষণ বহুলভাবে প্রচলিত হওয়ায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রঘুনন্দন এই সিদ্ধ চাউল ভক্ষণে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন।

সিদ্ধ চাউল ভক্ষণে রঘুনন্দনের অনুমতি দান

তিনি বলেন[১০৩]—হবিষ্যান্ন খাদ্যের মধ্যে অসিদ্ধ চাউল ভক্ষণীয় বলিয়া নির্দেশ থাকায় হবিষ্যান্ন ব্যতীত অন্যত্র সিদ্ধ চাউল ভক্ষণে দোষ নাই। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে এসম্বন্ধে অনুমতি দান করেন। পুনরায় একাদশীতত্ত্বেও অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে তিনি ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

রঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে ধান্যের তিনপ্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনপ্রকার যথা[১০৪]—কৃত, কৃতাকৃত ও অকৃত। ওদন, শক্তু (ছাতু) প্রভৃতিকে বলে কৃত, তণ্ডুল প্রভৃতিকে কৃতাকৃত এবং ব্রীহি, ধান্য প্রভৃতিকে অকৃত বলে। এখানে ধান্য সিদ্ধ করার বিধান থাকায় এবং সিদ্ধকর্তা বিশেষরূপে নির্দিষ্ট না থাকায় ধান্য অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সিদ্ধ করা হইলে সেই সিদ্ধ ধান্য অশুদ্ধ হয় না। ধান্য অকৃতরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় ধান্য পাক যে কোন লোক অর্থাৎ চণ্ডাল, অন্ত্যজ, যবন, প্রভৃতি করিলেও সেই ধান্য গ্রহণে দোষের অভাবই বুঝাইতেছে। অতএব সেই সিদ্ধ ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া পুনরায় সিদ্ধ করার পর অন্নপ্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন দোষই হইবে না। ধান্য প্রভৃতি সিদ্ধ করার বিধান থাকায় কৃতাকৃত অবস্থায় পাক করা হইলেও তাহা শুদ্ধ। আবার দ্বিঃস্বিন্নতা দোষ অকৃতে হয় না। এই সিদ্ধান্ত হইতে রঘুনন্দন আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, জলযোগে যে-কোন ব্যক্তি কর্তৃক সিদ্ধ করা ধান্য শাস্ত্র-অনুমোদিত হওয়ায় ধান্য ভাজিয়া

---

(১০৩) তথ হবিষ্যান্নং—হৈমন্তিকং স্বিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ।........অত্রাস্বিন্নধান্য-মিত্যভিধানাদন্যত্র স্বিন্নধান্যে ন দোষঃ। [তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৪৩; একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪৫৭]

(১০৪) ধান্যাদৌ স্বেদনবিধানাৎ কৃতাকৃত এব পাকশুদ্ধিবিবেচনম্। দ্বিঃস্বিন্নতাদিদোষশ্চ নাকৃতে। তদ্বিবৃতং কাত্যায়নেন—কৃতমোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতং ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্তমিতি হব্যং বিধানতশ্চ। অতো লাজমোদকাদি যথাতথা পক্বমপি শ্রাদ্ধাদৌ দীয়তে। [একাদশীতত্ত্ব- পৃঃ ৪৫৭]

দৈ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্রব্য শূদ্র প্রভৃতি কর্তৃক প্রস্তুত হইলে তাহাতে দোষ হয় না। এই সমস্ত জিনিষগুলি শ্রাদ্ধ বা দেবপূজায় প্রদান করা যাইতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মধ্যে কেহই সিদ্ধ চাউল ভোজনে শাস্ত্রীয় বিধি দেন নাই। কারণ আমরা দেখি শূলপাণি সিদ্ধ চাউল ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া সেই অন্নভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। শূলপাণি জাবালের বচন উল্লেখপূর্বক বলেন[১০৫]—পর্যুষিত বস্তু, দুইবার সিদ্ধ অন্ন, লশুন প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু জ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করিলে তিনরাত্রি ব্রত আচরণ করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দও দ্বিঃখিন্ন অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন[১০৬]।

অতএব দেখা যায় রঘুনন্দনই প্রথমে সকলের পক্ষে সিদ্ধচাউল ভক্ষণে শাস্ত্রানুমত নির্দেশ দিয়াছেন। রঘুনন্দন যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার মধ্যে কঠোরতার সঙ্গে উদারতার সংমিশ্রণও বর্তমান। তখনকার সময়ে সমাজের বিভিন্ন বিপর্যয়ে এই উদার অথচ কঠোর সমাজব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়াই রঘুনন্দন এইরূপ নির্দেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় সকলের সকল প্রকার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছিল এবং প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধি বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা তাঁহারই মপ্রশংস চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। সমাজের বিভিন্ন সংস্কার করিয়া রঘুনন্দন বহুবিধ ধ্বংসের মুখ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি সমাজসংস্কারকরূপে শাস্ত্রজগতে বিখ্যাত হইয়াছেন।

---

(১০৫) জ্ঞানতস্ত্বাহ জাবালঃ—

পর্য্যুষিতং পুনঃসিদ্ধমভক্ষ্যং লশুনাদিকম্।
শূদ্রকাকগোশ্বোচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা চ ত্র্যহমাচরেৎ॥ [প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃঃ ২৭৩]

(১০৬) পুনঃ সিদ্ধং দ্বিঃস্বিন্নমিত্যর্থঃ।……ত্রিরাত্রম্। [প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকা, পৃঃ ২৭৩]

গ্রন্থ-বিবরণী

সংস্কৃত গ্রন্থ

অদ্ভুতসাগর (বল্লালসেনবিরচিত)—সং মুরলীধর ঝা, বারাণসী, ১৯০৫ ।

অর্থশাস্ত্র (কৌটিল্যকৃত)—সং ডঃ শ্যামশাস্ত্রী, মহীশূর সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০৯ ।

অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব (রঘুনন্দনকৃত)—সং শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, নূতন সংস্করণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ।

[রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব ইত্যাদি ২৮ খানি তত্ত্ব এই সংস্করণের অন্তর্গত বলিয়া এই তত্ত্বগুলি পৃথগ্‌ভাবে গ্রন্থবিবরণীতে উল্লিখিত হইল না ।]

আপস্তম্বধর্মসূত্র—সং পণ্ডিত চিন্নস্বামী শাস্ত্রী এবং এ রামনাথ শাস্ত্রী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস, ১৯৩২ ।

উদ্বাহচন্দ্রালোক (চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কারবিরচিত)—সং হরচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা ১৮৯৭ ।

কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি (ভবদেবভট্টবিরচিত)—সং শ্যামাচরণ কবিরত্ন, কলিকাতা ১৩৪৮ ।

কালবিবেক (জীমূতবাহনকৃত)—বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯০৫, সং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও প্রমথনাথ তর্কভূষণ ।

কালসার (গদাধরকৃত)—বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯০৪, সং পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র ।

কৃত্যকল্পতরু (লক্ষ্মীধরভট্টকৃত)—সং কে বি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, বরোদা ।

কৃত্যরত্নাকর (চণ্ডেশ্বরপ্রণীত)—বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯২৫, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ।

গৌতমধর্মসূত্র—সং আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩১ ।
সং শ্রীনিবাসাচার্য, মহীশূর ১৯১৭ ।

গৃহস্থরত্নাকর (চণ্ডেশ্বরকৃত)—এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯২৮, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ।

গ্রহযাগতত্ত্ব (রঘুনন্দনকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ১০, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ।

তন্ত্রবার্তিক (কুমারিলভট্টবিরচিত)—সং মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী, বারাণসী, ১৯০৩ ।

তর্কসংগ্রহ—সং চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী ।

তাৎপর্যদীপিকা (শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিকৃত)—সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত টেক্স্‌ট্‌ সিরিজ, সংখ্যা ৫, কলিকাতা ১৯৬৪ ।

তিথিতত্ত্বটীকা (কাশীরাম বাচস্পতিকৃত)—সং শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৭ ।

তিথিবিবেক (শূলপাণিবিরচিত)—সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৪ ।

তীর্থচিন্তামণি (বাচস্পতিমিশ্রকৃত)—সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল ।

তীর্থযাত্রাতত্ত্ব (রঘুনন্দনকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ১২, সং বামাচরণ কাব্যতীর্থ ।

তৈত্তিরীয়সংহিতা—বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৮৬৬ ।

তৌতাতিতমততিলক (ভবদেবভট্টকৃত)—সং চিন্নস্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাম শাস্ত্রী, বারাণসী ।

ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব (রঘুনন্দনবিরচিত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা Vol, XXIV, নং ২-৩, জুন-জুলাই, ১৯৪১, সং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ।

দানক্রিয়াকৌমুদী (গোবিন্দানন্দরচিত)—এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯০০, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ ।

দানসাগর (বল্লালসেনবিরচিত)—বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৫৩, সং ডঃ ভবতোষ ভট্টাচার্য ।

দায়ভাগ (জীমূতবাহনকৃত)—সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯৩ ।

দায়ভাগটিপ্পনী (শ্রীনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি ষড়্‌টীকাসমন্বিত)—সং ভরতচন্দ্র শিরোমণি, কলিকাতা, ১৮৬৩ সাল ।

দীপকলিকা (শূলপাণিবিরচিত)—সং জগন্নাথ রঘুনাথ ঘরপুরে, ১৯৩৯ ।

দুর্গাপূজাতত্ত্ব (রঘুনন্দনকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৫, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ।

দুর্গোৎসববিবেক (শূলপাণিকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৭, সং সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ।

[illegible]যাত্রাতত্ত্ব (রঘুনন্দনকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ১৬, সং দ্বারিকানাথ স্যাহিত্যশাস্ত্রী।

দ্বৈতনির্ণয় (বাচস্পতিমিশ্রকৃত)—সং হরিনারায়ণ শর্মা, দ্বারভাঙ্গা রাজধানী শ্রীরামেশ্বর যন্ত্রালয়, শকাব্দ ১৮৩০।

নারদস্মৃতি—সং নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

পদ্মপুরাণ (বেদব্যাসকৃত)—সং বঙ্গবাসী, সম্পাদনা—পঞ্চানন তর্করত্ন।

পিতৃদয়িতা (অনিরুদ্ধভট্টকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৬, সং দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য।

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (ভবদেবভট্টকৃত)—সং গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী ১৯২৭।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক (শূলপাণিপ্রণীত)—সং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ১৮৯৫।

ভামতী—সং অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী।

মৎস্যপুরাণ—সং আনন্দাশ্রম প্রেস, পুণা, ১৯০৭।

মনুসংহিতা—সং শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, নবসংস্করণ।

মলমাসতত্ত্ব (কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃতটীকা)—সং কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কলিকাতা ১৮০৮ শকাব্দ।

মহাভারত—সং বঙ্গবাসী, সম্পাদনা—পঞ্চানন তর্করত্ন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ—বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, বিশপ্ কলেজ প্রেস, কলিকাতা ১৮৬২।

মিতাক্ষরা (বিজ্ঞানেশ্বরবিরচিত)—সং জনার্দন শাস্ত্রী।

মেধাতিথিভাষ্য—মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯৩৯।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (মিতাক্ষরাভাষ্যসহিত)—সং জনার্দন শাস্ত্রী।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (অপরার্কভাষ্যসহিত)—সং আনন্দাশ্রম প্রেস।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (বিশ্বরূপাচার্যভাষ্যসহিত)—সং মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবেন্দ্রাম ১৯২২।

রাসযাত্রাবিবেক (শূলপাণিকৃত)—সং ডঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৪১ কলিকাতা।

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (গোবিন্দানন্দকৃত) বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা ১৯০২।

বাসন্তীবিবেক (শূলপাণিকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৭, সং সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

বিবাহতত্ত্বার্ণব (শ্রীনাথরচিত)—সং ডঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951.

বিবাদরত্নাকর (চণ্ডেশ্বরকৃত)—সং দীননাথ বিদ্যালঙ্কার, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ১৮৮৭।

বিষ্ণুপুরাণ—সং বঙ্গবাসী, সম্পাদক—পঞ্চানন তর্করত্ন (দ্বিতীয় সংস্করণ), সন ১৩৩১।

বীরমিত্রোদয় (মিত্রমিশ্রবিরচিত)—সং চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, সংখ্যা ৮।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ—সং বঙ্গবাসী, সম্পাদনা—পঞ্চানন তর্করত্ন, দ্বিতীয় সংস্করণ।

বেদান্তপরিভাষা—সং শরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বৌধায়নধর্মসূত্র—সং চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

ব্যবহারময়ূখ (নীলকণ্ঠবিরচিত)—সং বিশ্বনাথ, রয়্যাল এসিয়াটিক্ সোসাইটি।

ব্যবহারমাতৃকা (জীমূতবাহন বিরচিত)—সং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

ব্রতকালবিবেক (শূলপাণি)—সং ডঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, Indian Historical Quarterly, Vol XVII, ১৯৪১।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—সং বঙ্গবাসী, সম্পাদনা—পঞ্চানন তর্করত্ন, সন ১৩৩২।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব (হলায়ুধকৃত)—সং দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৯৬০।

শবসূতকাশৌচপ্রকরণ (ভবদেবভট্টকৃত)—সং ডঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা, কলিকাতা ১৯৫৯।

শুদ্ধিকৌমুদী (গোবিন্দানন্দরচিত)—বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা ১৯০৫।

শুদ্ধিচিন্তামণি (বাচস্পতিমিশ্রকৃত)—সং মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, বারাণসী, শকাব্দ ১৮১৪।

শুদ্ধিবিবেক (রুদ্রধরকৃত)—সং গঙ্গাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণদাস লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৪৩ শকাব্দ।

শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী (গোবিন্দানন্দকৃত)—বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা ১৯০৪।

শ্রাদ্ধচিন্তামণি (বাচস্পতিমিশ্রকৃত)—সং মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, বারাণসী, শকাব্দ ১৮১৪।

শ্রাদ্ধবিবেক (শূলপাণিরচিত)—সং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ (তৃতীয় সংস্করণ), কলিকাতা সন ১৩২৭।

শ্রাদ্ধবিবেক (রুদ্রধরকৃত)—সং পণ্ডিত অনন্তরাম ডোগরা বেদাচার্য শাস্ত্রী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস ১৯৩৬।

শ্লোকবার্তিক (কুমারিলভট্ট বিরচিত)—সং তৈলঙ্গরাম শাস্ত্রী।

সম্বন্ধবিবেক (ভবদেবভট্টকৃত)—সং সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, New Indian Antiquary, Vol VI, 1943-44.

সম্বন্ধবিবেক (শূলপাণিরচিত)—সং ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৭২।

সম্বন্ধচিন্তামণি (বাচস্পতিমিশ্রকৃত)—ডঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, Indian Historical Quarterly, Vol XXXII, 1956, No 4.

স্মৃতিচিন্তামণি (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশকৃত)—সং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

স্মৃতিচন্দ্রিকা (দেবণভট্টকৃত)—সং শ্রীনিবাসাচার্য, মহীশূর, ১৯১৪।

স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ—সং আনন্দাশ্রম প্রেস, পুণা, ১৯০৫।

স্মৃত্যর্থসার (শ্রীধরাচার্যরচিত)—সং হরিনারায়ণ গুপ্তে, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১২।

হরিভক্তিবিলাস (গোপালভট্টকৃত)—সং গুরুদয়াল বিদ্যারত্ন।

হারলতা (অনিরুদ্ধভট্টকৃত)—বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, সং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতা ১৯১৮।

বাংলা গ্রন্থ

কুলীনকুলসর্বস্ব (রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত)—সং বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, সন ১৮৫৪।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—সং নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত, সং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা।

তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

নদীয়া কাহিনী—সং কুমুদ নাথ মল্লিক, দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রাচীন বাংলার গৌরব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি।

বাংলা দেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ)—ডঃ সুকুমার সেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রথমভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বৃহৎবঙ্গ—দীনেশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত।

মধ্যযুগে বাংলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী—ডঃ সুকুমার সেন।

মহাভারতের সমাজ—সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, বিশ্বভারতী।

রামায়ণের সমাজ—কেদারনাথ মজুমদার।

সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী—ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৬৮।

ইংরাজী গ্রন্থ

A Glossary of Smriti Literature—Dr. Suresh Chandra Banerjee.

Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature—Dr. Tamonas Chandra Das Gupta.

Dharmasutras—Dr. Suresh Chandra Banerjee.

Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal—Dr. S. K. De, Calcutta, 1942.

Hindu Law of Evidence—Dr. Amareswara Thakur, Calcutta University, 1933.

Hindu Law of Marriage and Stridhana—Gooroodasa Bandyopadhyaya.

Hindu Manners, Customs and Ceremonies—Dubois and Beauchamp, 3rd edition.

... and Manners—P. Thomas (3rd Indian edition).

Hindu rites and rituals—Dr Daksinaranjan Sastri.

History of Ancient Sanskrit Literature— Max Muller.

History of Bengal (Vol. I & II)—Dr. Ramesh Chandra Majumdar.

History of Dharma Sastra (Vol I—V)—Mm. P. V. Kane, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

History of Hindu Law in the Vedic age and Post-Vedic Times down to the Institutes of Manu—Radhabinod Paul, Calcutta University.

History of Indian Literature—M. Winternitz (Vol. I),

History of Sanskrit Literature—A. A Macdonell.

Obscure Religious Cults—Dr. Sasi Bhusana Das Gnpta, Calcutta.

Origin and development of the rituals of ancestor worship in India—Dr. Dakshinaranjan Sastri.

Raghunandana's Indebtedness to his predecessors—Dr. Bhavatosh Bhattacharya, Asiatic Society of Bengal, 1955.

Some Aspects of the Hindu Law of life According to Dharmasastra—K. V. Rangaswami Aiyanger.

Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and customs—Dr. Rajendra Chandra Hazra, Dacca University, 1940.

Studies in Dharmasastra—Dr. Bhavatosh Bhattacharya, Indian Studies, Past and Present, 1964.

Studies in Nibandhas—Dr. Bhavatosh Bhattacharya Indian Studies, Past & Present, 1968.

Studies in some aspects of Hindu Samskaras in Ancient India in the light of Samskaratattva of Raghunandana—Dr. Heramba Chatterjee Sastri.

Tantra-Vartika of Kumarilabhatta—Tr. Ganganatha Jha.

পুঁথির তালিকা

A brief Catalogue of Sanskrit Mss. in the Post-Graduate Department of Sanskrit—University of Calcutta, 1954.

A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III (Smriti Mss.)—By Mm. Haraprasada Sastri, Calcutta, 1925.

A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of Calcutta Sanskrit College, vol. II (Smriti Mss.)—By Hrishikesa Sastri and Siva Chandra Guin, Calcutta., 1896.

A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Library of the India Office, Parts I-VII—By Julius Eggeling, London, 1887-1904.

Catalogus Catalogorum—Aufrescht.

Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Calcutta, 1905.

Catalogue of Sanskrit Mss. in the Private Libraries of the North-West Provinces (Part I) Benares, 1874.

Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Sanskrit College Library, Benares, 1911.

Notices of Sanskrit Mss. Published under Orders of the Government of Bengal—By Rajendra Lal Mitra, Calcutta, 1871-1888.

Notices of Sanskrit Mss. Published under Orders of the Government of Bengal, Vol. X, Cal. 1872.

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

বাসী—১৩৪১।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৮।

ভারতবর্ষ—১৩৪৮।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৯৩৬, ১৯৪১।

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Vol. IX, X, XI, XV, XVI, XXII, XXXII.

Bharatiya Vidya, Vol. XI, XII, XVI.

Cultural Heritage of India—Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, Vol. I-IV.

Indian Culture, Vol I-V.

Indian Historical Quarterly, Vol III, VI, IX, XI, XIII, XXI. XVII, XVIII, XXI XXII, XXVII, XXVIII. XXIX, XXXII.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1906, 1912, 1915, 1938, 1953, 1954.

Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Vol. II,

Journal of the Oriental Research, Madras, Vol. VI, XVIII, XXI.

New Indian Antiquary, Bombay, 1922, 1928, 1929, 1930, 1942, 1943.

Our Heritage, Calcutta Sanskrit College, Vol. I-IV, VI.

Poona Orientalist, Poona, Vol. VI, VII.

হস্তলিখিত পুঁথি

আচারচন্দ্রিকা (শ্রীনাথকৃত)—বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, নং ১৩৪০৭ এবং ১২৪৩৬।

কৃত্যতত্ত্বার্ণব (শ্রীনাথকৃত)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নং ১৫৩৫।
এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, নং জি ৩৬৯০।

ক্রিয়াকৌমুদী (গোবিন্দানন্দকৃত)—এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, নং ১বি ৫৭।

দশকর্মপদ্ধতি (রঘুনন্দনকৃত)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নং ৬৬০।

দানচন্দ্রিকা (শ্রীনাথকৃত)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নং স্মৃ ৮১১।

পর্ণনরদাহবিবেক (শূলপাণিকৃত)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, নং উ ৩৩৯।

বর্ষকৃত্য (বাচস্পতিমিশ্রকৃত)—এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, নং জি ৮৬৮২।

বিবেকার্ণব (শ্রীনাথকৃত)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নং ১৫৩৬।

শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব (শ্রীনাথকৃত)—এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, নং জি ৩৬৮৯।

শ্রাদ্ধদীপিকা (শ্রীনাথকৃত)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নং স্মৃ ৩৯৬।

শ্রাদ্ধবিবেকটীকা (গোবিন্দানন্দকৃত)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নং স্মৃ ২১৬২।

শ্রাদ্ধবিবেকটীকা (শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃত)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নং স্মৃ ১৫৩৯।

শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা (শ্রীনাথকৃত)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নং স্মৃ ৪০৩।

সারমঞ্জরী (শ্রীনাথকৃত)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নং ১৫০৮।

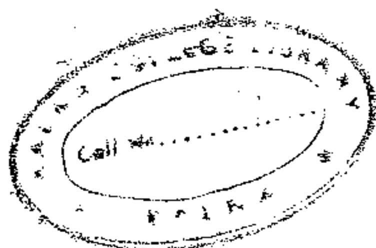
স্মৃতিরত্নহার (বৃহস্পতিরায়মুকুটকৃত)—এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, নং ২১৩৮।

নির্দেশিকা

গ্রন্থকার

বিশ্বরূপ
বিষ্ণু ১৮
বৃহস্পতি
২২১, ২২
২৭১
বৃহস্পতি
৬৬, ৮৪,
বৌধায়ন
ব্যাস ৪৯,
ভবদেবভট্ট
৩৮, ৯৯,
২৪৫, ২৬৭
২৭১, ২৭২
ভরতশিরো
ভট্টনারায়ণ
মনু ২, ৩,
১১২, ১১৪,
২১২, ২১৩,
২৩৭, ২৪০,
২৬৫, ২৬৮,
মাধবাচার্য
মেধাতিথি
যম ৪৯, ১০
যাজ্ঞবল্ক্য ১
২৩০, ২৩৪,
২৭২, ২৭৪, ২
যোগলোক
রঘুনাথ শিরো
রামভদ্রন্যায়াল
রুদ্রধর ৮৪, ২

গ্রন্থ


Call No.